হুমায়ূন আহমেদ

নিষিদ্ধ বাংলাদেশ

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক সময় আমি খুব ঘর-কুনো ধরনের ছিলাম। কোথাও যেতে ভাল লাগতো না। নিজের অতি পরিচিত জায়গা ছেড়ে দু'দিনের জন্যে বাইরে যাবার প্রয়োজন হলেও গায়ে জ্বর আসতো। সেই আমাকে সাত বছরের জন্যে দেশ ছেড়ে আমেরিকা যেতে হলো। সাত বছর পার করে ফিরে আসার পর পরিচিত সবাই আমার কাছ থেকে শুধু আমেরিকার গল্প শুনতে চায়। আমি গল্প শোনাই। যাই বলি তাই দেখি সবার ভাল লাগে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম গল্পগুলি লিখে ফেলব। লেখা হলো, 'হোটেল মোতাল ইন'। দীর্ঘদিন দেশে কাটানোর পর আবার তিন মাসের জন্যে আমেরিকা গেলাম। সেবার আগের আমেরিকা বদলে গেছে। কিংবা কে জানে হয়তো আমিই বদলে গেছি। নতুন চোখে দেখা আমেরিকা নিয়ে লিখলাম, 'মে ফ্লাওয়ার'। তারপর মনে হলো আমার নিজের জীবনটাওতো কেউ জানে। লিখে ফেললে কেমন হয়? আমার অবশ্য নিতান্ত ব্যক্তিগত গল্প সবাইকে বলা কি ঠিক হবে? ভাবতে ভাবতে লিখে ফেললাম, 'অনন্ত প্রহর', 'আমার আপন আঁধার', 'এই আমি'। একইভাবে লেখা হলো 'আমার বোনেরা'। এরাই আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করে, ব্যক্তিগত ডায়েরী হিসেবে আমি যা লিখছি সবই কি সত্যি?

প্রতিবারই এই প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বলেছি, আবারো বললাম। কেউ কেউ এরপরও লেখা আমার পাঠকরা আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছেন, এই আমার জীবনের পরম পাওয়া।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সূচিপত্র

শোনা কথা	৯	সমুদ্র দর্শন	২৫৫
একজন অদ্ভুত বাবা	১৬	কবি সাহেব	২৫৯
আমার মা	২৪	লেখালেখি খেলা	২৬৭
জোছনার ফুল	২৯	শ্বেতপদ্ম	২৭০
মোটা শংকর এবং		শিল্পী সুলতান	২৭৩
ওয়েজ ফুটবল ক্লাব	৩৮	লাভ মন্ত্র	২৭৮
বাড়ি দাদার বাড়ি	৩৯	ঝাড়ুটিকি খাতাওরা	২৮৩
পারুল আপা	৪৫	ইংলিশ ম্যান	২৮৭
স্বপ্নলোকের চাবি	৫১	হিজ মাস্টারস ভয়েজ	২৯৪
সাহিত্য বাসর	৫৮	নুহাশ এবং সে	২৯৯
পদ্মপাতায় জল	৬০	বটবৃক্ষ	৩০৩
আমার বন্ধু উনু	৬৭	ভাইভা	৩০৬
জাদলের দিন	৭১	হোটেল আহমেদিয়া	৩১১
শেষ পর্বে শঙ্খনদী	৭৭	এই আমি	৩১৭
মে ফ্লাওয়ার	৮৮	চোখ	৩২৭
আমার আপন আঁধার	১৩৩	উৎসব	৩৩৮
হোটেল গ্রেস্তার ইন	১৯৭	উদ্দেশ	৩৩৯
বাংলাদেশ নাইট	২১২	পেন্ট্রিফায়েড ফরেস্ট	৩৪২
প্রথম তুলারপাত	২১৯	সে	৩৪৪
জননী	২২১	নারিকেল মামা	৩৫০
এই পরবাসে	২২৫	পরীক্ষা	৩৫৩
ম্যারাথন কিস	২৩২	আমার বন্ধু সফিক	৩৫৬
লাস ভেগাস	২৩৪	মিসির আলি ও অন্যান্য	৩৬১
শীলার জন্ম	২৩৯	বর্ষাযাপন	৩৭০
পাখি	২৪২	ফ্রাংকেনস্টাইন	৩৭৪
ক্যাম্পে	২৪৫	ট্রান্সিপসর রাইত	৩৭৯
যাকে কিবা আসে যায়	২৫১	লালচুল	৩৮৩

Nirjoy

www.BanglaBook.org



শোনা কথা

আমি অসম্ভব স্মৃতিধর।

পঞ্চাই বছরের একজন মানুষও তার ছেলেবেলার কথা মনে করতে পারে। মস্তিষ্কের অযুত নিযুত নিওরোনে বিচিত্র প্রক্রিয়ায় স্মৃতি জমা হয়ে থাকে। কিছুই নষ্ট হয় না। প্রকৃতি নষ্ট হতে দেয় না। অথচ আশ্চর্য, অতি শৈশবের কোন কথা তার মনে থাকে না। দু'বছর বা তিন বছর বয়সের কিছুই সে মনে করতে পারে না। মাতৃগর্ভের কোন স্মৃতি থাকে না, জন্মমুহূর্তের কোন স্মৃতিও না। জন্মসময়ের স্মৃতিটি তার থাকা উচিত ছিল। এত বড় একটা ঘটনা অথচ এই ঘটনার স্মৃতি প্রকৃতি মুছে ফেলে। মনে হয় প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য এতে কাজ করে। প্রকৃতি হয়ত চায় না পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা আমরা মনে করে রাখি।

আমি যখন মন ঠিক করে ফেললাম ছেলেবেলার কথা লিখব, তখন খুব চেষ্টা করলাম জন্মমুহূর্তের স্মৃতির কথা মনে করতে এবং তারো পেছনে যেতে, যেমন মাতৃগর্ভ। কেমন ছিল মাতৃগর্ভের সেই অন্ধকার? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করল। এল এস ডি (Lysergic acid dietlylamide) নামের এক ধরনের ড্রাগ না-কি মাতৃগর্ভ এবং জন্মমুহূর্তের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। আমেরিকা থাকাকালীন সময়ে এই ড্রাগের খানিকটা জোগাড় করেছিলাম। সাহসের অভাবে খেতে পারিনি। কারণ এই হেলুসিনেটিং ড্রাগ প্রায়ই মানুষের মানসিক অবস্থায় বড় রকমের ঢেউ তোলে।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, খুব পুরানো কথা আমার কিছুই মনে নেই। তবে জন্মের চার বছরের পর থেকে অনেক কিছুই আমি মনে করতে পারি। সেই সব কথাই লিখব। শুরুটা করছি শোনা কথার উপর নির্ভর করে। শোনা কথার উপর নির্ভর করাও বেশ কঠিন। একই গল্প একেক জন দেখি একেক রকম করে বলেন। যেমন একজন বললেন, 'তোমার জন্মের সময় খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল।' অন্য একজন বললেন, 'কৈ না তো, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিল এইটা খেয়াল আছে, ঝড়বৃষ্টি তো ছিল না।'

আমি সবার কথা শুনে শুনে একটি ছবি দাঁড় করিয়েছি। এই ছবি খানিকটা এদিক-ওদিক হতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি এমন কেউ না যে আমার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] লিখতে হবে! কোন ভুলচুক করা যাবে না। থাকুক [illegible]। আমাদের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়েই তো আছে ভুল এবং ভ্রান্তি।

আমার জন্ম ১৩ই নভেম্বর। ১৯৪৮ সন। শনিবার, রাত ১০টা তিরিশ মিনিট। শুনেছি ১৩ সংখ্যাটাই অশুভ। এই অশুভের সংগে যুক্ত হল শনিবার। শনি-মঙ্গলবারও নাকি অশুভ। রাতটাও কৃষ্ণপক্ষের। জন্মমুহূর্তে দপ করে হারিকেন নিভে গেল। ঘরে রাখা বালতির পানি উল্টে গেল। একজন ডাক্তার, যিনি গত তিনদিন ধরে মার সংগে আছেন; তিনি টর্চ লাইট জ্বেলে তার আলো ফেললেন আমার মুখে। ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, এই জানোয়ারটা তার মাকে মেরেই ফেলছিল।

আমি তখন গভীর বিস্ময়ে টর্চ লাইটের ধাঁধানো আলোর দিকে তাকিয়ে আছি। চোখ বড় বড় করে দেখছি — এসব কি? অন্ধকার থেকে এ আমি কোথায় এলাম? জন্মের পর পর কাঁদতে হয়। তাই নিয়ম।

চারপাশের রহস্যময় জগৎ দেখে কাঁদতেও ভুলে গেছি। ডাক্তার সাহেব আমাকে কাঁদাবার জন্য ঠাশ করে গালে চড় বসালেন। আমি জন্মমুহূর্তেই মানুষের হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়ে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলাম। ঘরে উপস্থিত আমার নানীজান আনন্দিত স্বরে বললেন, 'বামুন রাশির ছেলে'। বামুন রাশি বলার অর্থ প্রেসেন্টার সংগে যুক্ত রক্তখাগী শিরাটি বামুনের পৈতার মত আমার গলা পেঁচিয়ে আছে।

শিশুর কান্নার শব্দ আমার নানাজানের কানে যাওয়ামাত্র তিনি ছুটে এসে বললেন, ছেলে না মেয়ে?

ডাক্তার সাহেব রহস্য করবার জন্যে বললেন, মেয়ে, মেয়ে। ফুটফুটে মেয়ে।

নানাজান তৎক্ষণাৎ আধমণ মিষ্টি কিনতে লোক পাঠালেন। যখন জানলেন মেয়ে নয় ছেলে তখন আবার লোক পাঠালেন — আধমণ নয় এবার মিষ্টি আসবে একমণ। এই সমাজে পুরুষ এবং নারীর অবস্থান যে ভিন্ন তাও জন্মলগ্নেই জেনে গেলাম।

নভেম্বর মাসের দুর্দান্ত শীত।

গারো পাহাড় থেকে উড়ে আসছে অসম্ভব শীতল হাওয়া। মাটির মালশায় আগুন করে নানীজান সেঁক দিয়ে আমাকে গরম করবে চেষ্টা করছেন। আশেপাশের বৌ-ঝিরা একের পর এক আসছে এবং আমাকে দেখে মুগ্ধ গলায় বলছে — 'সোনার পুতলা।'

এতক্ষণ যা লিখলাম সবই শোনা কথা। মার কাছ থেকে শোনা। কিন্তু আমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ আমি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের মানুষ। আমাকে দেখে সোনার পুতলা বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার কিছু নেই; তাছাড়া জন্মমুহূর্তের এতসব কথা আমার মা'রও মনে থাকার কথা নয়। তাঁর তখন জীবন সংশয়। প্রসব বেদনায় পুরো তিনদিন কাটা মুরগির মত ছটফট করেছেন। অতিরিক্ত রকমের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] হচ্ছে। পাড়াগাঁর মত জায়গায় তাঁকে রক্ত দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থাতেও তিনি লক্ষ্য করছেন, তাঁর সোনার পুতলা গভীর বিস্ময়ে চারপাশের পৃথিবীকে দেখছে, কাঁদতে ভুলে গেছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার ধারণা, মা যা বলেছেন তা অন্যদের কাছ থেকে শুনেই বলেছেন।

ধরে নিচ্ছি, মা যা বলেছেন সবই সত্যি। ধরে নিচ্ছি, এক সময় আমার গাত্রবর্ণ [illegible] সোনার মত ছিল। ধরে নিচ্ছি, আমার জন্মের আনন্দ প্রকাশের জন্য সেই রাতে [illegible] মিষ্টি কিনে বিতরণ করা হয়েছিল। মিষ্টি কেনার অংশটি বিশ্বাসযোগ্য। নানাজানের অর্থবিত্ত তেমন ছিল না, কিন্তু তিনি দিলদরিয়া ধরনের মানুষ ছিলেন। আমার মা ছিলেন তাঁর সবচে' আদরের প্রথমা কন্যা। বিয়ে হয়ে যাবার পরও যে-কন্যার মাথার চুল তিনি নিজে পরম যত্নে আঁচড়ে দিতেন। এই অতি আদরের কন্যার বিয়ের সময়ও তিনি জমিটমি বিক্রি করে খরচের চূড়ান্ত করলেন। পিতৃহৃদয়ের মমতা প্রকাশ করলেন দু'হাত খুলে টাকা খরচের মাধ্যমে।

উদাহরণ দেই — মোহনগঞ্জ স্টেশন থেকে বর আসবে, হাঁটাপথে পাঁচ মিনিটের রাস্তা। পাল্কির ব্যবস্থা করলেই হয়। আমার নানাজান হাতির ব্যবস্থা করলেন। সুসং দুর্গাপুর থেকে দুটি হাতি আনানো হল। যে লোক এই কাজ করতে পারে, সে তাঁর প্রিয় কন্যার প্রথম সন্তান জন্মের খবরে বাজারের সমস্ত মিষ্টি কিনে ফেলতে পারে।

আমার বাবা তখন সিলেটে। বিশ্বনাথ থানার ওসি।

ছেলে হবার খবর তাঁর কাছে পৌঁছল। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বেচারার খুব শখ ছিল প্রথম সন্তানটি হবে মেয়ে। তিনি মেয়ের নাম ঠিক করে বসে আছেন। এক গাদা মেয়েদের ফ্রক বানিয়েছেন। রূপার মল বানিয়েছেন। তাঁর মেয়ে মল পায়ে দিয়ে ঝমঝম করে হাঁটবে — তিনি মুগ্ধ হয়ে দেখবেন। ছেলে হওয়ায় সব পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল। তিনি একগাদা ফ্রক ও রূপার মল নিয়ে ছেলেকে দেখতে গেলেন। পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এইসব মেয়েলি পোশাক আমাকে দীর্ঘদিন পরতে হয়। বাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মা আমার মাথার চুলও লম্বা রেখে দেন। সেই বেণী করা চুলেও রঙবেরঙের রীবন পরে আমার শৈশবের শুরু।

বাবা-মা'র প্রথম সন্তান হচ্ছে চমৎকার একটি জীবন্ত খেলনা। এই খেলনার সবই ভাল। খেলনা যখন হাসে, বাবা-মা হাসেন। খেলনা যখন কাঁদে বাবা-মা'র মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। আমার বাবা-মা'র ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। তাঁরা তাঁদের শিশু পুত্রের ভেতর নানান প্রতিভার লক্ষণ দেখে বার-বার চমৎকৃত হলেন। হয়ত আমাকে চাবি দেয়া একটা ঘোড়া কিনে দেয়া হল, আমি সংগে সংগে ঘোড়া ভেঙে ফেললাম। আমার বাবা পুত্রপ্রতিভায় মুগ্ধ, হাসিমুখে বললেন, দেখ দেখ ছেলের কি কৌতূহল! সে ভেতরের কলকব্জা দেখতে চায়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তখন আমাকে খাওয়ানোর জন্য মা থালায় করে খাবার নিয়ে গেলেন, আমি সেই থালা উড়িয়ে ফেলে দিলাম। বাবা আমার প্রতিভায় মুগ্ধ — দেখ দেখ, ছেলের রাগ দেখ। রাগ থাকা ভাল। এই যে থালা সে উড়িয়ে ফেলে দিল এতে প্রমাণিত হল তার পছন্দ অপছন্দ দু'টিই খুব তীব্র।

এই সময় বই ছিঁড়ে ফেলার দিকেও আমার ঝোঁক দেখা গেল। হাতের কাছে বই পাওয়ামাত্র টেনে ছিঁড়ে ফেলি। এর মধ্যেই বাবা আমার প্রতিভার লক্ষণ দেখতে পেলেন। তিনি মাকে বুঝালেন — এই যে সে বই ছিঁড়ছে, তার কারণ বইয়ের লেখা সে পড়তে পারছে না, বুঝতে পারছে না। যে জিনিস সে বুঝতে পারছে না সেই জিনিস সে নষ্ট করে দিচ্ছে। এটি প্রতিভার লক্ষণ।

আদরে বাঁদর হয়।

আমি পুরোপুরি বাঁদর হয়ে গেলাম। এবং আমার প্রতিটি বাঁদরামিতে প্রতিভার লক্ষণ দেখে আমার বাবা-মা বারবার চমৎকৃত হতে লাগলেন। বাবা-মা'র সংগে যুক্ত হলেন বাবার এক বন্ধু গনি সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী। এই নিঃসন্তান দম্পতি তাঁদের বুভুক্ষু হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা আমার জন্যে ঢেলে দিলেন। তাঁদের ভালবাসার একটা ছোট্ট নমুনা দিচ্ছি। একদিন বেড়াতে এসে দেখেন আমি চামচে করে চিনি খাচ্ছি। গনি চাচা বললেন, আরে এ তো আগ্রহ করে চিনি খাচ্ছে। চিনি খেতে পছন্দ করে তা তো জানতাম না। তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে গেলেন। ফিরে এলেন পাঁচ সের চিনি নিয়ে। মেঝেতে পাটি পেতে আমাকে বসিয়ে দিলেন। আমার চারদিকে চিনি ছড়িয়ে দেয়া হল। গনি চাচা হৃষ্টচিত্তে বললেন, খা বেটা, কত চিনি খাবি — খা।

আমাকে ঘিরে বাবা-মা'র আনন্দ স্থায়ী হল না। আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কালান্তক জ্বর। টাইফয়েড। তখন টাইফয়েডের অষুধ বাজারে আসেনি। রুগীকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কিছুই করণীয় নেই। যতই দিন যেতে লাগল মা'র শরীর ততই কাহিল হতে থাকল। এক সময় দেখা গেল তিনি কাউকে চিনতে পারছেন না। এক গভীর রাতে বাবাকে ঘুম ভাঙিয়ে অত্যন্ত অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আমার পাশে এই যে ছোট্ট ছেলেটা শুয়ে আছে, এ কে?

বাবা হতভম্ব হয়ে গেলেন। মা বললেন, এই ছেলেটা এখানে কেন? এ কার ছেলে?

আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হল নানাজানের কাছে। সিলেটের বিশ্বনাথ থেকে ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে। পিতৃমাতৃ স্নেহ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে আমার দ্বিতীয় জীবন শুরু হল। আমার নানীজান আমাকে লালন-পালনের ভার গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর একটি মেয়ে হয়েছে। তাঁর এক কোলে সেই মেয়ে, অন্য কোলে আমি। নানীজানের বুকের দুধ খেয়ে দু'জন এক সংগে বড় হচ্ছি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] ঘরে ভোগার পর মা সেরে উঠলেন কিন্তু টাইফয়েড তার প্রবল থাবা [illegible] গেল। মা'র মস্তিস্ক বিকৃতি দেখা গেল। কাউকে চেনেন না। যার সংগে দেখা হয় [illegible]ই বলেন, কত টাকা লাগবে তোমার বল তো? আমার কাছে অনেক টাকা আছে। [illegible]কা চাইবে তওই পাবে। ফেরত দিতে হবে না।

[illegible]লেই তোষকের নিচ থেকে লক্ষ লক্ষ কাল্পনিক টাকা বের করতে শুরু করেন। [illegible] মাঝে এই সব কাল্পনিক টাকা জানালা দিয়ে উড়িয়ে দেন। চিকন স্বরে চেঁচিয়ে [illegible]. টাকা নিয়ে যাও। টাকা। আমি টাকা উড়াচ্ছি। যার যত দরকার, নাও। ফেরত [illegible] হবে না।

[illegible] বিয়ের পর খুব কষ্টে পড়েছিলেন। টাকা-পয়সার কষ্ট। বিশ্বনাথ থানার ওসি [illegible]বে বাবার বেতন ছিল আশি টাকা। বেতনের এই আশিটি টাকা বাবা তাঁর [illegible]খেয়ালী স্বভাবের জন্য অতি দ্রুত খরচ করে ফেলতেন। মাসের দশ তারিখেই বাবার [illegible] একটা পয়সা নেই। থানার ওসি'দের টাকা-পয়সার অভাব হবার কথা না। কিন্তু [illegible] লিখতে গিয়ে গর্ব এবং অহংকারে বুক ভরে যাচ্ছে যে আমার বাবা ছিলেন সাধু [illegible]কৃতির মানুষ। বেতনের টাকাই ছিল তাঁর একমাত্র রোজগার। মা'র কাছে শুনেছি, [illegible]লিশের রেশনই তাঁদের বাঁচিয়ে রাখত। মাসের প্রথমেই রেশন তোলা হত। রেশনে [illegible]ল, ডাল এবং তেল পাওয়া যেত। সারা মা'সে তাঁদের খাবারের মেন্যু ছিল ডাল, [illegible]লের বড়া এবং নিমপাতা ভাজা। বাসার সংগে লাগোয়া একটা নিমগাছ ছিল। সেই [illegible]মের কচি পাতা ভাজা করা হত। মাকে শাড়ি কিনে দেবার সামর্থ্য বাবার ছিল না। [illegible]'র শাড়ি পাঠাতেন নানাজান। সতেরো বছরের একটি মেয়ে যে মোটামুটি সচ্ছলতায় [illegible]নুষ হয়েছে তার জন্য এই অর্থকষ্ট বড়ই ভয়াবহ ছিল। অর্থনৈতিক পীড়ন তাঁর উপর [illegible] প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল মানসিক বিকৃতির সময় তাই ফুটে বের হল। যার সংগেই [illegible]খা হয় তাঁকেই মা এক লাখ বা দু'লাখ টাকা দিয়ে দেন।

দু'বছর এমন করেই কাটল। আমি নানীজানের কাছে। মা বাবার সংগে সিলেটে। [illegible]রোপুরি পাগল একজন মানুষ।

এক শ্রাবণ মাসের রাতে মা'র ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে ঝুম বৃষ্টি। হাওয়ায় বাড়ি যেন [illegible]ড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির পেছনের ঝাঁকড়া জাম গাছে শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। মা [illegible]বাকে ডেকে তুলে ভয়ার্ত স্বরে বললেন, বাতি জ্বালাও, ভয় লাগছে।

বাবা চমকে উঠলেন। দিব্যি সুস্থ মানুষের মত কথাবার্তা।

হ্যারিকেন জ্বালানো হল। মা তীব্র স্বরে বললেন, আমার ছেলে কোথায়?

বাবা তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মন আশা-নিরাশায় দুলছে। তাহলে কি মাথা ঠিক [illegible]য়ে গেল?

কথা বলছ না কেন? আমার ছেলে কোথায়?

আয়েশা, তোমার কি সবকিছু মনে পড়ছে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার ছেলে কোথায়?

ও আছে। ও ভাল আছে, তোমার মা'র কাছে আছে। তুমি দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে ছিলে। তাকে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না, তুমি শান্ত হও। কাল ভোরেই তোমাকে নিয়ে আমি মোহনগঞ্জ রওনা হব।

আমি অসুস্থ ছিলাম?

হ্যাঁ।

মা উঠে গিয়ে একটা আয়না আনলেন। আয়নায় নিজেকে দেখে চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল। মাথা ভর্তি চুল ছিল। কোন চুল নেই। দাঁতের রঙ কুচকুচে কালো। আয়নায় যার ছায়া পড়েছে সে উনিশ বছরের তরুণী নয়, যেন ষাট বছর বয়সের এক বৃদ্ধা।

আয়েশা, তোমার কি সব মনে পড়ছে?

হ্যাঁ।

বল তো কত তারিখে আমাদের বিয়ে হয়েছিল?

আষাঢ় মাসে। পয়লা আষাঢ়।

আনন্দে বাবর চোখও ভিজে উঠল।

বাইরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি। ঘরে নিবুনিবু হারিকেনের রহস্যময় আলো। সেই আলোয় মূর্তির মত বসে আছেন পুত্রবিরহকাতর এক মা, যিনি এই কিছুক্ষণ আগে তাঁর হারানো স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন।

বাবা মাকে নিয়ে মোহনগঞ্জ উপস্থিত হলেন। আমকে মা'র কোলে বসিয়ে দেয়া হল। মা বিস্মিত হয়ে বললেন, এই কি আমার ছেলে?

নানীজান বললেন, হ্যাঁ।

ছেলে এত বড় কেন?

ছেলের বয়স দুই বছর, বড় হবে না?

কথা বলতে পারে?

পারে, সব কথা বলতে পারে।

মা নানীজানের দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বললেন, আমার ছেলের কোন অনাদর হয়নি তো?

নানীজান হেসে ফেললেন।

আমার ছেলের সোনার মত গায়ের রঙ ছিল। ও এত কালো হল কেন?

সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে।

কেন, আপনারা দেখেন না? কেন আমার ছেলে সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে?

মা যতই রাগ করেন সবাই তত হাসে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] মানুষ। মাতা-পুত্রের মিলনদৃশ্য দেখতে ভেঙে বৌ-ঝিরা এসেছে। [illegible] আবার একমণ মিষ্টি কিনতে লোক পাঠিয়েছেন।

[illegible]পরের মধ্যমণি হয়ে আমার মা একটা জলচৌকিতে আমাকে কোলে নিয়ে বসে [illegible]। এই তাঁর মুখে তৃপ্তি, এই তাঁর চোখে জল। মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলছে। [illegible] মধুরতম একটি দৃশ্য সবাই দেখছে মুগ্ধ হয়ে। এর মধ্যে মা সবাইকে সচকিত [illegible] একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা করলেন। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'আমার এই ছেলের শৈশব [illegible] কেটেছে, আল্লাহ তার বাকি জীবনটা তুমি সুখে সুখে ভরে দিও। বাকি জীবনে [illegible] কোন দুঃখ না পায়।'

[illegible]র মা'র এই প্রার্থনা গ্রহণ করেননি। এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি বারবার দুঃখ [illegible]। বারবার হৃদয় হা-হা করে উঠেছে। চারপাশের মানুষদের নিষ্ঠুরতা, [illegible]নতায় আহত হয়ে কতবার মনে হয়েছে — এই পৃথিবী বড়ই বিষাদময়! আমি [illegible] পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোন পৃথিবীতে যেতে চাই, যে পৃথিবীতে মানুষ নেই। চারপাশে [illegible] শোভিত বৃক্ষরাজি। আকাশে চিরপূর্ণিমার চাঁদ। যে চাঁদের ছায়া পড়েছে [illegible]ঙ্গী নামের এক নদীতে। সেই নদীর স্বচ্ছ জলে সারাক্ষণ খেলা করে জোছনার [illegible] দূরের বন থেকে ভেসে আসে। অপার্থিব সংগীত।

মা আমাকে নিয়ে সিলেটে চলে এলেন। কিছুদিন তাঁর নিশ্চয়ই খুব সুখে কাটল। [illegible] সুখই স্থায়ী হয় না। এই সুখও স্থায়ী হল না, আবার টাইফয়েড হল। টাইফয়েডের [illegible] হয়ত লুকিয়ে ছিল: প্রাণসংহারক মূর্তিতে সে আবার আত্মপ্রকাশ করল। বাবা [illegible]হারা হয়ে পড়লেন। মা সারাদিন প্রবল জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। মাঝে [illegible] জ্ঞান ফিরে এলে ব্যাকুল হয়ে তাঁর শিশুপুত্রকে খুঁজেন। সেই শিশুকে তাঁর কাছে [illegible] দেয়া হয়। মা কাকুতি-মিনতি করেন, ওকে একটু দেখতে দাও। একবার শুধু [illegible]।

কাজের মেয়ে আমাকে নিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। মা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে [illegible]। গভীর বিষাদ এবং গভীর আনন্দে তাঁর চোখে জল আসে।

এর মধ্যেই একদিন ডাক্তার সাহেব বাবাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনার স্ত্রী বাঁচবেন না। আপনি মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

বাবা বললেন, কোন আশাই কি নেই?

না। টাইফয়েড দ্বিতীয়বার হলে আর রক্ষা নেই, তবে . . .

তবে কি?

টাইফয়েডের নতুন একটা অষুধ বাজারে এসেছে। শুনেছি অষুধটা কাজ করে। [illegible]ঙ্গাতে হয়তবা পাওয়া যায়। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আসামের শিলচরে বাবা লোক পাঠালেন। অষুধ পাওয়া গেল না। বাবা স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সেই প্রস্তুতির প্রমাণ হচ্ছে আমার নামকরণ। আমার নাম রাখলেন কাজল। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালির অপুর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। অপুর ছেলের নাম ছিল কাজল। আমার ভাল নাম রাখা হল শামসুর রহমান। বাবার নাম ফয়জুর রহমান। বাবার নামের সংগে মিলিয়ে ছেলের নাম। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত আমাকে শামসুর রহমান নাম নিয়ে চলাফেরা করতে হল। সপ্তম বছরে বাবা হঠাৎ সেই নাম বদলে রাখলেন হুমায়ূন আহমেদ। বছর দুই হুমায়ূন আহমেদ নামে চলার পর আবার আমার নাম বদলে দেবার ব্যবস্থা হল। আমি কঠিন আপত্তি জানালাম। বারবার নাম বদলানো চলবে না। আমাদের সব ভাইবোনই প্রথম ছ'সাত বছর এক নাম, তারপর অন্য নাম। আমার বাবার মৃত্যুর পর তাঁর পেনসন এবং গ্রাচুইটির টাকা-পয়সা তুলতে গিয়ে বিরাট যন্ত্রণায় পড়লাম। দেখা গেল, তিনি তাঁর টাকা-পয়সা তাঁর স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়েকে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তিন ছেলেমেয়ের যে নাম লিখে রেখে গেছেন, এখন কারোরই সেই নাম নেই। বাবা তাঁর ছেলেমেয়ের নাম বদলেছেন। কিন্তু কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে ভুলে গেছেন।

আমি এখন আমার বিচিত্র বাবা সম্পর্কে বলব। মৃত্যুপথযাত্রী মা'র প্রসংগটা আপাতত থাক। শুধু এইটুকু বলে রাখি, তিনি দ্বিতীয়বার টাইফয়েডের ধাক্কাও সামলে উঠেন জনৈক হিন্দু সাধুবাবার ফুঁ দেয়া তার্পিন তেল খেয়ে। নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তার্পিন টাইফয়েডের অষুধ নয়। নিশ্চয়ই অন্য কোন ব্যাপার আছে। আমি যা শুনেছি তাই লিখলাম। সাধুবাবার ফুঁ দেয়া তার্পিন খেয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে কেউ ফিরে আসবে এই তথ্য হজম করা আমার পক্ষে বেশ কঠিন। যেহেতু মা দাবি করছেন, সেহেতু লিখছি।

এবার বাবার কথা বলি।



একজন অদ্ভুত বাবা

আমার ছোট ভাই মহাম্মদ জাফর ইকবাল তার লেখা প্রথম গ্রন্থ 'কপোট্রনিক সুখদুঃখে'র উৎসর্গপত্রে লিখেছে ঃ

'পৃথিবীর সবচে ভালমানুষটিকে বেছে নিতে বললে
আমি আমার বাবাকে বেছে নেব।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] উৎসর্গপত্রে লেখকরা সব সময় আবেগের বাড়াবাড়ি করেন। আমার [illegible] এই উৎসর্গপত্র আবেগপ্রসূত ধরে নিতে খানিকটা অসুবিধা আছে। সে যদি [illegible] পৃথিবীর সবচে' ভাল মানুষ আমার বাবা এবং মা, তাহলে আবেগের ব্যাপারটি [illegible] সে তা না করে বাবার কথাই লিখেছে। পৃথিবীর সবচে' ভাল মানুষের মধ্যে [illegible] পারে না। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে তার উৎসর্গপত্র আবেগপ্রসূত নয়। চিন্তাভাবনা [illegible] লেখা। ইকবালকে আমি যতটুক চিনি, সে চিন্তাভাবনা না করে কখনো কিছু বলে [illegible] লিখেও না।

আমার বাবা পৃথিবীর সবচে' ভাল মানুষদের একজন কি-না তা জানি না, তবে [illegible] একজন মানুষ, তা বলতে পারি। তাঁর মত খেয়ালি, তাঁর মত আবেগবান মানুষ [illegible] পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। আবেগ ছাড়াও তাঁর চরিত্রে আরো সব বিস্ময়ের [illegible] ছিল; তিনি ছিলেন জন স্টেইনবেকের উপন্যাস থেকে উঠে-আসা এক [illegible] চরিত্র।

সবার আগে ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। রাত প্রায় বারোটা। রঙমহল সিনেমা হল [illegible] সেকেণ্ড শো ছবি দেখে বাবা এবং মা রিকশা করে ফিরছেন। বড় একটা দিঘির [illegible] দিয়ে রিকশা যাচ্ছে। মা হঠাৎ বললেন, আহা দেখ কি সুন্দর দিঘি! টলটল করছে [illegible]। ইচ্ছে করছে পানিতে গোসল করি।

বাবা সংগে সংগে বললেন, রিকশা থামাও।

রিকশাওয়ালা থামল।

বাবা বললেন, চল দিঘিতে গোসল করি।

মা হতভম্ব। এই গভীর রাতে দিঘিতে নেমে গোসল করবেন কি? নিতান্ত পাগল না হলে কেউ এরকম বলে?

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, দেখ আয়েশা, একটাই আমাদের জীবন। এই এক জীবনে আমাদের বেশির ভাগ সাধই অপূর্ণ থাকবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেসব সাধ আছে, যা মেটানো যায়, তা মেটানোই ভাল। তুমি আস আমার সংগে।

বাবা হাত ধরে মাকে নামালেন। স্তম্ভিত রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে দেখল হাত ধরাধরি করে দুজন নেমে গেল পুকুরে।

এই গল্প যতবার আমার মা করেন ততবার তাঁর চোখে পানি এসে যায়। তাঁর নিজের ধারণা, তাঁর জীবনে যে অল্পকিছু শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এসেছিল ঐ পুকুরে অবগাহন তার মধ্যে একটি।

বাবার চরিত্রকে স্পষ্ট করার জন্যে আরো কিছু ঘটনার উল্লেখ করি। বাবা তখন সিলেট সদরে পুলিশের ইন্টেলিজেন্সিতে আছেন। পদমর্যাদায় সাব-ইন্সপেক্টর। বেতন সর্বসাকুল্যে মাসে নব্বুই টাকা। সেই টাকার একটা অংশ দেশের বাড়িতে চলে যায়, এক অংশ ব্যয় হয় বই কেনা বাবদ। বাকি যা থাকে তা দিয়ে [illegible] কষ্টে সংসার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] নিয়ে যান মা। যাকে বলে ভয়াবহ জীবন সংগ্রাম। জীবন সংগ্রামের এই অংশটি বাবার কখনো চোখে পড়ে না, কারণ দেশের বাড়িতে পাঠানো টাকা এবং বই কেনার টাকা আলাদা করে বাকি টাকাটা মার হাতে তুলে দেন। বাবার দায়িত্ব শেষ। বাকি মাস টেনে নিয়ে যাবার দায়িত্ব হচ্ছে মা'র। তিনি তা কিভাবে নেবেন সেটা তাঁর ব্যাপার। বাবার কোনই মাথাব্যথা নেই।

এই রকম অবস্থায় মাসের প্রথম তারিখে বাবাকে খুব হাসিমুখে বাড়ি ফিরতে দেখা গেল। তিনি বিশ্বজয় করা হাসি দিয়ে বললেন, আয়েশা একটা বেহালা কিনে ফেললাম।

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, কি কিনে ফেললে?

বেহালা।

বেহালা কি জন্যে?

বেহালা বাজানো শিখব।

কত দাম পড়ল?

দাম সস্তা, সত্তর টাকা। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বলে এই দামে পাওয়া গেল।

বাবা সংসার চালাবার জন্যে মা'র হাতে দশটা টাকা তুলে দিলেন। মা হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না।

বাবার খুব শখ ছিল ওস্তাদ রেখে তাঁর কাছে বেহালা বাজানো শিখবেন। ওস্তাদকে বেতন দিয়ে বেহালা বাজানো শেখার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। কাজেই অতি যত্নে বেহালা তুলে রাখা হল। একদিন সামর্থ্য হবে তখন ওস্তাদ রেখে বেহালা বাজানো শেখা হবে।

মাঝে মাঝে দেখতাম কাঠের বাক্স থেকে তিনি বেহালা বের করছেন। অতি যত্নে ধুলো সরাচ্ছেন। ছড়ে রজন মাখাচ্ছেন এবং একসময় লাজুক ভঙ্গিতে বেহালায় ছড় ঘসছেন। কান্নার মত এক রকম আওয়াজ উঠছে বেহালা থেকে। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি।

বাবার অসংখ্য অপূর্ণ শখের মত বেহালা বাজানো শেখার শখও পূর্ণ হয়নি। বাক্সবন্দি থাকতে থাকতে এক সময় বেহালার কাঠে ঘূণ ধরে গেল। ছড়ের সুতা গেল ছিঁড়ে। বেহালা চলে এল আমাদের দখলে। আমার ছোটবোন শেফু বেহালার বাক্স দিয়ে পুতুলের ঘর বানাল। বড় চমৎকার হল সেই ঘর। ডালা বন্ধ করে সেই ঘর হাতলে ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

আরেক দিনের ঘটনা। শীতকালের এক ভোরে মা'র গলা শুনে ঘুম ভেঙে গেল। কি নিয়ে যেন বাবার সঙ্গে রাগারাগি করছেন। এ রকম তো কখনো হয় না। তাঁরা ঝগড়া-টগড়া অবশ্যই করেন, তবে সবটাই চোখের আড়ালে। আজ হল কি? আমি কান পেতে আছি যদি কিছু টের পাওয়া যায়। কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না। মা বারবার শুধু বলছেন, ঘোড়া দিয়ে তুমি করবে কি? আমাকে বুঝিয়ে বল, কে পুষবে এই ঘোড়া?

বাবা বলছেন, এত রাগছ কেন? একটা কোন ব্যবস্থা হবেই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, আমরা নিজেরা খেতে পাচ্ছি না, এর মধ্যে ঘোড়া! তোমার কি মাথা খারাপ হল?

আমি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে একটা ঘোড়া কেনা হয়েছে।

আমাকে জেগে উঠতে দেখে বাবা হাসিমুখে বললেন, ঘরের বাইরে গিয়ে দেখে আয় ঘোড়া কিনেছি।

কি অদ্ভুত কাণ্ড! ঘরের বাইরে সুপারি গাছের সঙ্গে বাঁধা বিশাল এক ঘোড়া। ঘোড়াটাকে আমার কাছে আকাশের মত বড় মনে হল। সে ক্রমাগত পা দাপাচ্ছে এবং ফোঁস-ফোঁস করে শব্দ করছে। আমাদের কাজের ছেলে আছদ [তার নাম সম্ভবত আসাদ, সে বলত আছদ] ভীত মুখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘটনা হচ্ছে -- বাবা মাকে না জানিয়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে এ পর্যন্ত জমা সব টাকা তুলে একটা ঘোড়া কিনে ফেলেছেন। এই সেই ঘোড়া: মহাতেজী প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি প্রাণী। যে প্রাণীদের সঙ্গে বাবার প্রথম পরিচয় হয় সারদা পুলিশ একাডেমীতে। তাঁর বড়ই পছন্দ হয়। বাবা তাঁর পছন্দের জিনিস যে করেই হোক জোগাড় করেন। এতদিন পর ঘোড়াও জোগাড়। হল তখন পুলিশ অফিসাররা ব্রটিশ নিয়মের সূত্র ধরে ঘোড়া পুষলে অ্যালাউন্স পেতেন। বাবা আশা করছেন সেই অ্যালাউন্সের টাকাতেই এর পোষার খরচ উঠে আসবে।

ঘোড়া সুপারি গাছের সঙ্গে বাঁধা। বাবা-মা'র মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হচ্ছে। উত্তাপ পুরোটাই মা-ই চালাচ্ছেন, বাবা শুধু কাটান দেয়ার চেষ্টা করছেন।

কি করবে তুমি এই ঘোড়া দিয়ে, শুনি? সিলেট শহরে ঘোড়ায় করে ঘুরবে?

হুঁ। অসুবিধা কি? ছেলেমেয়েদেরও ঘোড়ায় চড়া শেখাব।

ছেলেমেয়েরা ঘোড়ায় চড়া শিখে কি করবে?

কিছু করবে না, একটা বিদ্যা শেখা থাকল।

ঘোড়ার পেছনে কত খরচ হবে সেটা ভেবেছ?

এত ভাবলে বেঁচে থাকা যায় না।

বেঁচে থাকা যাক আর না যাক, এই ঘোড়া তুমি এক্ষুনি বিদেয় কর।

পাগল হয়েছ? এত শখ করে কিনলাম!

বাবা ছিলেন আবেগ-নির্ভর মানুষ। যুক্তি দিয়ে তাকে টলানো মুশকিল। কিন্তু তাঁকেও টলতে হল। কারণ ঘোড়া দ্বিতীয় দিনেই লাথি মেরে আছদের পা ভেঙে ফেলল। মা হাতে অস্ত্র পেয়ে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, তোমার ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ ঘোড়াকে ঘিরে নাচানাচি করে। লাথি খেয়ে ওরা মারা পড়বে। তাই কি তুমি চাও? বাবা ঘোড়া বিক্রি করে দিলেন। সেই টাকায় কিনলেন একটা দামী কোডাক

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কাজেকর্ম। তবে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ঘোড়ার জীন রেখে দিলেন। আমাদের খেলার সামগ্রী তালিকায় আরেকটি জিনিস যুক্ত হল।

দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জিনিসের প্রতি তাঁর আমৃত্যু শখ ছিল — একটি হচ্ছে পামিস্ট্রি, অন্যটি ফটোগ্রাফি। তাঁর কোডাক ক্যামেরা তিনি আগলে রাখতেন যক্ষের ধনের মত। শুধু যে ছবি তুলতেন তাই না, সেই ছবি নিজেই ডেভেলপ এবং প্রিন্ট করতেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমাদের শৈশবের আনন্দময় মুহূর্তের একটি হচ্ছে বাবাকে ঘিরে আমরা বসে আছি। একটা গামলায় পানি। সেই পানিতে কিছু কাগজ ভাসছে। ধবধবে সাদা কাগজ। আস্তে আস্তে মানুষের মুখের আদল ফুটতে শুরু করেছে। আমরা আনন্দে লাফাচ্ছি। বাবার মুখে আনন্দের হাসি। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের কথা লিখছি। সেই সময় পুলিশের একজন দরিদ্র সাব-ইন্সপেক্টর নিতান্তই শখের কারণে ঘরে ডার্করুম বানিয়ে ছবি প্রিন্ট করছেন — ব্যাপারটা বেশ মজার।

পামিস্ট্রি নিয়েও বাবার উৎসাহ ছিল বাড়াবাড়ি রকমের। আমার মনে হয়, তাঁর মূল ঝোঁকটা ছিল রহস্যময়তার দিকে। তিনি রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন ফটোগ্রাফিতে, ঝুঁকে পড়েছেন সেদিকে। রহস্য ছিল জ্যোতিষ বিদ্যায়, সেদিকেও ঝুঁকলেন।

কিছুদিন পর পরই ছুটির দিনের সকালে একটা আতসি কাচ নিয়ে বসতেন। গম্ভীর গলায় বলতেন, বাবারা আস তো দেখি, হাতের রেখায় কোন পরিবর্তন হল কি-না।

একবার ইকবালের হাত দেখে বললেন — চমৎকার রেখা। চন্দ্র এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রও ভাল। দীর্ঘ আয়ু। তুই খুব কম করে হলেও আশি বছর বাঁচবি। সেই রাতের ঘটনা। ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দে সবার ঘুম ভেঙে গেল। ইকবাল হাউমাউ করে কাঁদছে। কি হয়েছে, কি হয়েছে? সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আশি বছর পর আমি মরে যাব এই জন্যে খুব খারাপ লাগছে, আর কান্না পাচ্ছে।

বাবা বললেন, গণনায় ভুল হতে পারে। আরেকবার দেখা দরকার। কই, ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দেখি।

গভীর রাতে বাবা তাঁর আতসি কাচ নিয়ে বসলেন। আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে বসলাম। ইকবালের এক হাত বাবার কাছে, অন্য হাতে সে চোখ কচলাচ্ছে। বাবা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, আগের গণনায় ভুল হয়েছিল। তোর হাতে আছে ইচ্ছামৃত্যুর চিহ্ন। তোর হবে ইচ্ছামৃত্যু।

ইচ্ছামৃত্যু কি?

যতক্ষণ পর্যন্ত মরার ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুই মরবি না। বেঁচে থাকবি।

কোন দিন যদি মরার ইচ্ছা না হয়?

তাহলে বেঁচে থাকবি। মরবি না।

ইকবাল হৃষ্টচিত্তে ঘুমুতে গেল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জ্যোতিষবিদ্যা কোন বিদ্যা নয়। জ্যোতিষবিদ্যা হচ্ছে এক ধরনের অপবিদ্যা, অজ্ঞান। মানুষের ভবিষ্যৎ তার হাতের রেখায় থাকে না। থাকার কোন কারণ নেই। [illegible] অর্থাৎের সঙ্গে বলছি, আমাদের সব ভাইবোন সম্পর্কে তিনি যা বলে [illegible]ছিলেন, তা মিলে গিয়েছিল। তিনি নিজের মৃত্যু সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী [illegible]করেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর কপালে অপঘাত মৃত্যু লেখা। সেই মৃত্যু হবে ভয়ংকর [illegible]।

[illegible]তথ্য তিনি হাত দেখে পেয়েছিলেন না অন্য কোন সূত্রে পেয়েছিলেন আমার জানা নেই। মিলগুলি কাকতালীয় বলেই মনে হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরেকটি বিষয়েও জড়িত ছিলেন। [illegible] প্রেতচর্চা বলা যেতে পারে। প্লেনচেট, চক্র, ভূত নামানো এইসব নিয়ে খুব [illegible]উৎসাহী ছিল। দাদাজান এই নিয়ে বাবার উপর খুব বিরক্ত ছিলেন। তিনি বাবাকে [illegible] তওবা করালেন যাতে তিনি কোনদিন প্রেতচর্চা না করেন। বাবা তওবার পর [illegible]চর্চা ছেড়ে দেন, তবে এই বিষয়ে বই পড়া ছাড়েননি। বাবার সংগ্রহের বড় অংশ [illegible] প্রেতচর্চা বিষয়ক বইপত্র।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, তিনি আস্তিক মানুষ ছিলেন। আমরা কখনো তাঁকে রোজা [illegible]তে দেখিনি। নামাজ খুব নিয়মিত পড়তেন না, তবে রোজ রাতে এশার নামাজে দাঁড় [illegible]। গম্ভীর স্বরে সূরা আবৃত্তি করতেন। পরিবেশ হয়ে উঠতো রহস্যময় ।

আমার বাবা যে একজন রহস্যময় পুরুষ ছেলেবেলায় তা কখনো বুঝতে পারিনি। [illegible] থেকেই নিয়েছিলাম সবার বাবাই এরকম। আমার বাবা অন্যদের চেয়ে আলাদা [illegible]। তাছাড়া বাবার সঙ্গে আমাদের কিছু দূরত্বও ছিল। ছেলেমেয়েদের প্রতি [illegible]দের বাড়াবাড়ি তাঁর চরিত্রে ছিল না। নিজে খুব ব্যস্তও থাকতেন। সারাদিন অফিস [illegible]কেলে বই পড়তে যেতেন কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে। ফিরতে ফিরতে [illegible]। দিনের পর দিন কাটতো, তাঁর সঙ্গে আমাদের কথা হত না। এই কারণে মনে মনে চাইতাম তাঁর যেন কোন-একটা অসুখ হয়। বাবার অসুখ খুবই মজার ব্যাপার। অসুখ হলে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের চারপাশে বসিয়ে উঁচুগলায় কবিতা আবৃত্তি [illegible]। এতে নাকি তাঁর অসুখের আরাম হত।

এই অসুখের সময়ই তিনি একবার ঘোষণা করলেন, সঞ্চয়িতা থেকে যে একটা কবিতা মুখস্থ করে তাঁকে শোনাতে পারবে সে এক আনা পয়সা পাবে। দুটো মুখস্থ করলে দু'আনা।

আমি বিপুল উৎসাহে কবিতা মুখস্থ করতে শুরু করলাম। এর মধ্যে কোন [illegible]প্রীতি কাজ করেনি। আর্থিক ব্যাপারটাই ছিল একমাত্র প্রেরণা। যথাসময়ে একটা কবিতা মুখস্থ হয়ে গেল। নাম 'এবার ফেরাও মোরে'। দীর্ঘ কবিতা। এই দীর্ঘ কবিতাটা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মুখস্থ করার পেছনের কারণ হল, এটা বাবার খুব প্রিয় কবিতা। তাঁদের সময় না-কি বি.এ. ক্লাসে পাঠ্য ছিল।

বাবা আমার কবিতা আবৃত্তি শুনলেন।

কোন ভুল না করে এই দীর্ঘ কবিতাটি বলতে পারায় তিনি আনন্দে অভিভূত হলেন। এক আনার বদলে আমি চার আনা পয়সা পেলাম। সাহিত্যবিষয়ক কর্মকাণ্ড থেকে ওটাই ছিল আমার প্রথম রোজগার।

প্রসঙ্গ থেকে আবার সরে এসেছি। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বুঝতে পারছি, এরকম সমস্যা বারবার হবে, মূলধারা থেকে সরে আসব উপধারায়। কে জানে সেই উপধারাই হয়তবা মূলধারা। তাছাড়া আত্মজীবনীমূলক রচনায় মূল্যহীন অংশগুলিই বেশি মূল্য পায়।

গান-বাজনা বাবার বড়ই প্রিয় ছিল। বি. এ. পাস করার পর কোলকাতায় কি একটা পার্ট-টাইম কাজ জুটিয়ে কিছু পয়সা করেন। তা দিয়ে যে বস্তুটি কিনেন তার নাম কলের গান। দম দিয়ে চালানো কলের গান। কোডাক ক্যামেরাটা ছাড়া অন্য কোন জাগতিক বস্তুর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না ; কিন্তু এই যন্ত্রটির প্রতি তাঁর মমতার সীমা ছিল না। পার্ট-টাইম চাকরিটি চলে যাবার পর তিনি অথৈ জলে পড়েন। কোলকাতায় যে মেসে থাকতেন তার ভাড়া বাকি পড়ে। শখের জিনিস এক এক বিক্রি করে ফেলার অবস্থায় পৌঁছে যান। বিক্রি করার মত অবশিষ্ট যা থাকে তা হচ্ছে কলের গান, যা বিক্রি করা আমার বাবার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সেই সময় তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা বললেন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সংগে দেখা করলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষিত মুসলমান ছেলে তাঁর কাছে চাকরির আবেদন করলেই কাজ সমাধা। কিছু-না-কিছু তিনি জুটিয়ে দেবেনই। বাবা বি. এ. পাস করেছেন ডিসটিংশন নিয়ে। খুব শখ ছিল ইংরেজি সাহিত্যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়বেন। অর্থের অভাবে তা হয়ে উঠছে না। সেই সময় মুসলমান ছেলেদের চাকরি-বাকরির প্রায় সব দরজাই বন্ধ। বাবা ঠিক করলেন, দেখা করবেন শেরে বাংলার সংগে। এই অভাব আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

অতিব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী বাবাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল ঃ

বি. এ. পাস করেছ?

জ্বি।

ফলাফল কি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] ডিসটিংশন ছিল।

[illegible], খুব খুশি হলাম শুনে। এম. এ. পড়বে তো?

[illegible] ইচ্ছা আছে।

[illegible] আছে বললে হবে না — পড়তেই হবে। তুমি কি আমার কাছে বিশেষ কোন [illegible] চাও?

[illegible] খুবই লজ্জা লাগল। তিনি বললেন, জ্বি না, আমি আপনার সঙ্গে দেখা [illegible] এসেছি। অন্য কোন কারণে না।

[illegible] বাংলা বেশ খানিকক্ষণ বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, সবাই আমার [illegible] তদবির নিয়ে আসে। অনেকদিন পর একজনকে পাওয়া গেল যে কোন তদবির [illegible] আসেনি। আমি খুব আনন্দিত হলাম। তুমি এম. এ. পাস করার পর পেশা হিসাবে [illegible] বেছে নেবে। আমরা ধারণা, তুমি ভালো শিক্ষক হবে।

বাবা সেই রাতেই কোলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের কুতুবপুরে চলে [illegible]। বাড়ি থেকে সাত মাইল দূরে মীরকাশেম নগরের এক স্কুলে বিপুল উৎসাহে [illegible] শুরু করেন। মাসের শেষে বেতন নিতে গেলে হেড মাস্টার সাহেব বিস্মিত [illegible] বললেন, আদায়পত্র কিছুই নেই, বেতন দেব কি? দেখা যাক পরের মাসে।

পরের মাসেও একই অবস্থা। তার পরের মাসেও তাই। হেড মাস্টার সাহেব মাথা [illegible] বললেন, শিক্ষকতা হচ্ছে মহান পেশা; আত্মনিবেদন থাকতে হয়। শুধু টাকা [illegible] করলে কি হয়?

অভাব-অনটনে বাবার জীবন পর্যুদস্ত হয়ে গেল। চাকরির দরখাস্ত করেন — [illegible] পান না। এর মধ্যে বিয়েও করে ফেলেছেন। স্ত্রীকে নিজের কাছে এনে রাখার [illegible] নেই। ঘোর অমানিশা। এই অবস্থায় কি মনে করে জানি ব্রিটিশ সরকারের বেঙ্গল [illegible] সাব-ইন্সপেক্টরির পরীক্ষায় বসলেন। সেই সময়ের অত্যন্ত লোভনীয় এই [illegible] নির্বাচিত হবার জন্যে কঠিন সব পরীক্ষায় বসতে হত। তিনি পরীক্ষা দিতে [illegible] গ্রহের ফেরে এই পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গেলেন; ট্রেনিং নিতে গেলেন পুলিশ [illegible] সারদায়।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পুলিশের চাকরিটি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। বাবার [illegible] পর দেখা গেল, এই জীবনে তিনি চার হাজারের মত বই এবং পোস্টাপিসের [illegible] বই-এ একশত তিরিশ টাকা ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। বইয়ের সেই বিশাল [illegible] হও পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নির্দেশে পিরোজপুরের একদল হৃদয়হীন মানুষ লুট [illegible] নিয়ে যায়। বাবাকে ধরে নিয়ে যায় বলেশ্বর নদীর তীরে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর [illegible] বিদ্রোহের কারণে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। ভরা পূর্ণিমায় ফিনকি ফোঁটা [illegible] জ্যোৎস্নায় তাঁর রক্তাক্ত দেহ ভাসতে থাকে বলেশ্বর নদীতে। হয়ত নদীর শীতল জল

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গাঁও গাঁও সে রাতে ধুয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। পূর্ণিমার চাঁদ তার সবটুকু আলো ঢেলে দিয়েছে তার ভাসন্ত শরীরে। মমতাময়ী প্রকৃতি পরম আদরে গ্রহণ করেছে তাঁকে।

এই প্রসঙ্গ থাক। এই প্রসঙ্গে আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। বরং মা'র কথা বলি।



আমার মা

আমার মা ছিলেন তাঁর পরিবারের প্রথম সন্তান। শ্যামলা ধরনের একহারা গড়নের মেয়ে। অতি আদরের মেয়ে। কেমন করে জানি সবার ধারণা হল, এই মেয়ে তেমন বুদ্ধিমতী হয়নি। তাঁকে বুদ্ধিমতী বানানোর জন্যে ছোট বয়সেই পাঠিয়ে দেওয়া হল বারহাট্টায়। বারহাট্টায় আমার মা'র মামার বাড়ি। মা'র নানীজান অসম্ভব বুদ্ধিমতী। তিনি যদি ট্রেনিং দিয়ে এই মেয়েকে কিছুটা মানুষ করতে পারেন।

তাঁর ট্রেনিং-এ তেমন কাজ হল না। মা'র বুদ্ধি বিশেষ বাড়ল না। তবে ক্লাস টুতে তখন সরকারী পর্যায়ে একটি বৃত্তি পরীক্ষা হত। মা এই পরীক্ষা দিয়ে মাসে দু' টাকা হারে বৃত্তি পেয়ে চারদিকে চমক সৃষ্টি করে ফেললেন। একি কাণ্ড! মেয়েমানুষ সরকারী জলপানি কি করে পায়?

মা'র দুর্ভাগ্য, বৃত্তির টাকা তিনি পাননি। কারণ তাঁকে উপরের কোন ক্লাসে ভর্তি করান হল না। মেয়েদের পড়াশোনার দরকার কি! চিঠি লিখতে পারার বিদ্যা থাকলেই যথেষ্ট। না থাকলেও ক্ষতি নেই। মেয়ে মানুষের এত চিঠি লেখালেখিরই বা কি প্রয়োজন? তারা ঘর-সংসার করবে। নামাজ-কালাম পড়বে। এর জন্যে বাংলা-ইংরেজি শেখার দরকার নেই। তারচে' বরং হাতের কাজ শিখুক। রান্নাবান্না শিখুক, আচার বানান শিখুক, পিঠা বানান শিখুক। বিয়ের সময় কাজে লাগবে।

আমার মা পড়াশোনা বাদ দিয়ে এইসব কাজ অতি যত্নের সঙ্গে শিখতে লাগলেন। তাছাড়া নানীজান প্রতি বৎসর একটি করে পুত্র বা কন্যা জন্ম দিয়ে ঘর ভর্তি করে ফেলছেন। তাঁর সর্বমোট বারোটি সন্তান হয়। বড় মেয়ে হিসেবে ছোট ছোট ভাইবোনদের মানুষ করার কিছু দায়িত্বও মা'র উপর চলে আসে।

এই করতে করতে একদিন তাঁর বয়স হয়ে গেল পনেরো। কি সর্বনাশের কথা! পনেরো হয়ে গেছে, এখনো বিয়ে হয়নি! বারহাট্টা থেকে কঠিন সব চিঠি আসতে লাগল যেন অবিলম্বে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করা হয়। চারদিকে সুপাত্র খোঁজা চলতে লাগল। একজন সুপাত্রের সন্ধান আনলেন মা'র দূরসম্পর্কের চাচা, শ্যামপুরের দুদু মিয়া। দুদু

Nirjoy

www.BanglaBook.org

... গণ্যমান্য মানুষ। বি. এ. পাস করেছেন। দেশ নিয়ে মাথা ঘামান। কি করে ... মুসলমানদের রাতারাতি শিক্ষিত করা যায়, সেই চিন্তাতেই তাঁর বেশির ... কাটে। শ্যামপুরের অতি দুর্গম অঞ্চলে তিনি ইতিমধ্যে একটা স্কুল দিয়ে ...। সেই স্কুলে একদল রোগাভোগা ছেলে সারাদিন স্বরে অ, স্বরে আ বলে ...। এ মানুষটি এইসব কর্মকাণ্ডের মূলে তাঁর বিচারবুদ্ধির উপর খুব আস্থা রাখা ...। তবু আমার নানাজান তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত ...:

... কি করে?

... করে না। করার মধ্যে যা করে তা হল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে সারাদিন ...।

... তাকে চেন কি করে?

... দিন তার সঙ্গে কোলকাতার এক মেসে ছিলাম। তাকে খুব ভাল করে দেখার ... হয়েছে।

... ড়ির অবস্থা কি?

... ড়ির অবস্থা শোচনীয়।

... ছেলের নিকট আত্মীয়স্বজন কে আছেন?

... কেউ নেই। সবাই হতদরিদ্র। তবে ছেলের বাবা উলা পাস। বড় মৌলানা — অতি ... ব্যক্তি।

অতি সজ্জন ব্যক্তি দিয়ে কাজ হবে না। ছেলের মধ্যে তো তেমন কিছু দেখছি না। ... দিন যে ছেলে বই পড়ে, সে আবার কেমন ছেলে? বই পড়লে তো সংসার চলে না।

দুদু মিয়া খানিকক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, এত ভাল ছেলে আমি আমার জীবনে ... খনি। এইটুক বলতে পারি।

দেখতে কেমন?

রাজপুত্র!

কি বললে?

রাজপুত্র!

ছেলে দেখতে রাজপুত্রের মত শুধু এই কারণেই নানাজান ছেলের বাবার সঙ্গে কথা ...লতে রাজি হলেন। কথা বলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

আমার দাদা মৌলানা আজিমুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরবি-ফারসিতে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। অতি বিনয়ী মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি হাত তুলে যে প্রার্থনা করেন তার থেকে মানুষটির চরিত্র স্পষ্ট হবে বলে আমার ধারণা। তিনি বলেন —

Nirjoy

www.BanglaBook.org

"হে পরম করুণাময়, আমার পুত্র-কন্যা এবং তাদের পুত্র-কন্যাদের তুমি কখনো অর্থ-বিত্ত দিও না। তাদের জীবনে যেন অর্থকষ্ট লেগেই থাকে। কারণ টাকা-পয়সা মানুষকে ছোট করে। আমি আমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে 'ছোট মানুষ' চাই না। বড় মানুষ চাই।"

আমার দাদার চরিত্র আরো স্পষ্ট করার জন্যে আমি আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমার মেট্রিক পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। কেমন করে যেন পরীক্ষায় খুব ভাল করে ফেলি। পাঁচটি লেটার নিয়ে বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে যাই। টেলিগ্রামে দাদাকে এই খবর পাঠান হয়। যে পিওন দাদাকে টেলিগ্রামটি দেন দাদা তাঁকে বসতে বলেন।

পিওন বসে আছেন। দাদা ভেতর বাড়ি চলে গেছেন। বেশ খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, শোকরানা নামাজ পড়ার জন্যে খানিক বিলম্ব হয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। ভাই, আমি অতি দরিদ্র একজন মানুষ, এই মুহূর্তে আমার কাছে যা টাকা-পয়সা ছিল সবই আমি নিয়ে এসেছি। আপনি এই টাকা গ্রহণ করলে আমি মনে শান্তি পাব। কারণ আজ যে খবর আপনি আমাকে দিলেন এত ভাল খবর এই জীবনে আমি পাই নাই।

এই বলে দাদা নগদ টাকা এবং ভাঙতি পয়সায় প্রায় চল্লিশ টাকা একটা রুমালে বেঁধে বিস্মিত পিওনের হাতে দিলেন। শুধু তাই না, বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, আমি খুব খুশি হব আপনি যদি দুপুরে চারটা ডালভাত আমার সঙ্গে খান।

তার কিছুদিন পরেই আমি দাদার একটা চিঠি পাই। তাতে তিনি লিখলেন — "তোমাকে ছোটবেলায় একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তুমি জবাব দিতে পার নাই। আমার মন খারাপ হইয়াছিল। আমার ধারণা ছিল তোমার বুদ্ধি তেমন নাই। আজ তুমি তা ভুল প্রমাণিত করিয়াছ। আমি জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এই সময়ে তোমার কারণে মনে প্রবল সুখ পাইলাম। মৃত্যুপথযাত্রী একজন বৃদ্ধকে তুমি সুখী করিয়াছ — আল্লাহ তোমাকে তার প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ সবাইকে সবার প্রাপ্য দেন।"

যে প্রশ্নটির জবাব শৈশবে দিতে পারিনি সেটা বলি। তখন ক্লাস টুতে পড়ি। সিলেটের বাসায় দাদা বেড়াতে এসেছেন। অসহ্য গরম। হাতপাখায় হাওয়া খাচ্ছেন। হঠাৎ আমাকে বললেন, 'এই শোন, পাখার ভেতর তো বাতাস ভরা নেই। তবু পাখা নাড়লেই আমরা বাতাস পাই কিভাবে? বাতাসটা আসে কোত্থেকে?'

আমি সেই কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

দাদা দুঃখিত গলায় বললেন, আমার ধারণা ছিল — তুই পারবি। তুই তো আমার মনটাই খারাপ করে দিলি।

প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি — আবার প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] কোনো কথাবার্তা না বলে শুধুমাত্র ছেলের বাবার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা [illegible] একজন বেকার ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবার প্রস্তুতি নিয়ে [illegible]।

[illegible] 'বিবাহিত জীবন কি' তা বোঝানোর জন্যে বর্ষীয়ান মহিলারা দূর-দূর [illegible] এলেন। নকশি পিঠা তৈরি হয়ে টিনবন্দি হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলায় [illegible] তৈরি করতে করতে পাড়ার বৌরা মিহি গলায় বিয়ের গীত গাইতে [illegible]।

[illegible] কি মনে করে চলে গেলেন মৈমনসিংহ। ছেলে নাটক-নভেল পড়ে, [illegible] তার জন্যে প্রস্তুত থাকা দরকার। দু'একটা নাটক-নভেল পড়া থাকলে [illegible] সুবিধা হবে।

লাইব্রেরিতে গিয়ে বললেন, ভাল একটা নভেল দিন তো। আমার মেয়ের জন্যে — [illegible] দিবেন।

লাইব্রেরিয়ান গম্ভীর মুখে বললেন, মেয়েছেলেকে নাটক-নভেল বই দেওয়া ঠিক [illegible] একটা ধর্মের বই নিয়ে যান — তাপসী রাবেয়া।

[illegible] না, একটা নভেলই দেন।

দোকানদার একটা বই কাগজে মুড়ে দিয়ে দিল। নানাজান মা'র হাতে সেই বই [illegible] দিলেন। মা'র জীবনে এটাই প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসের নাম — 'নৌকাডুবি'। [illegible] শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম উপন্যাস পড়েই মা মোহিত। একবার, দু'বার, [illegible] বার পড়া হল, তবু যেন ভাললাগা শেষ হয় না।

বাসর রাতে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো বই-টই পড়েছ? এই ধর, [illegible]-উপন্যাস?

মা লাজুক ভঙ্গিতে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

দুই-একটা বইয়ের নাম বলতে পারবে?

মা ক্ষীণ স্বরে বললেন, নৌকাডুবি।

গভীর বিস্ময়ে বাবা দীর্ঘ সময় কোন কথা বলতে পারলেন না। এই অজ পাড়াগাঁয়ের একটি মেয়ে কি-না রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' পড়ে ফেলেছে?

সেই রাতে বাবা-মা'র মধ্যে আর কি কথা হয়েছে আমি জানি না। জানার কথাও নয়। তাঁরা আমাকে বলেননি। কিন্তু আমি কল্পনা করে নিতে পারি, কারণ আমি এবং আমার অন্য পাঁচ ভাইবোন তো তাঁদের সঙ্গেই ছিলাম। লুকিয়ে ছিলাম তাঁদের ভালবাসায়।

গ্রামের যে বোকা ধরনের মেয়ে বিয়ের পর শহরে চলে এল, আমার ধারণা, সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী মেয়েদেরই একজন। আমি এখনো তাঁর বুদ্ধির ঝলকে চমকে চমকে উঠি। মা শুধু যে বুদ্ধিমতী তাই না, অসম্ভব সাহসী এবং স্বাধীন ধরনের মহিলা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

১৬ ডিসেম্বরের পর মা আমাদের ভাইবোন সবাইকে নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন। হাতে একটি পয়সাও নেই। এই অবস্থায় পুরানা পল্টনে বাড়ি ভাড়া করলেন। আমাদের সবাইকে একত্র করে বললেন, তোরা তোদের পড়াশোনা চালিয়ে যা। সংসার নিয়ে তাদেরকে ভাবতে হবে না। আমি দেখব।

পুরানা পল্টনের ঐ বাড়িতে আমাদের কোন আসবাবপত্র ছিল না। আমরা মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে ঘুমুতাম। কেউ বেড়াতে এলে তাকে মেঝেতেই বসতে হত।

মা নানান সমিতিতে ঘুরে ঘুরে সেলাইয়ের কাজ জোগাড় করলেন। দিনরাত মেশিন চালান। জামা-কাপড় তৈরি করেন। সেলাইয়ের রোজগারের সঙ্গে বাবার পেনসনের কিছু টাকা যুক্ত হয়ে সংসার চলত। তিনি শুধু যে ঢাকার সংসার চালাতেন তাই না, মোহনগঞ্জে তাঁর বাবার বাড়ির সংসারও এখান থেকেই দেখাশোনা করতেন। অনেক কাল আগে গ্রামের এই বোকা-বোকা ধরনের লাজুক কিশোরী মেয়েটি কখনো কল্পনাও করতে পারেনি কি কঠিন সংগ্রামময় জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্যে। যুদ্ধক্লান্ত এই বৃদ্ধা এখন কি ভাবেন আমি জানি না। তাঁর পুত্রকন্যারা নানান ভাবে তাঁকে খুশি করতে চেষ্টা করে। তিনি তাদের সে সুযোগ দিতে চান না। আমার ছোট ভাই ডঃ জহির ইকবাল আমেরিকা থেকে টিকিট পাঠিয়ে দিয়ে লিখল — মা, আপনি আসুন, আপনাকে আমেরিকা এবং ইউরোপ ঘুরিয়ে দেখাব। আপনার ভাল লাগবে।

মা বললেন, যে জিনিস তোমার বাবা দেখে যেতে পারেননি, আমি তা দেখব না।

আমি বললাম, আম্মা, আপনি কি হজ্বে যেতে চান? যেতে চাইলে বলুন, ব্যবস্থা করি।

না।

ছোটবেলায় দেখেছি আপনি জবী দিয়ে তাজমহলের ছবি এঁকেছিলেন। তাজমহল দেখতে চান; কবে?

না। আমি একা একা কিছু দেখব না।

বাবা যে সব জিনিস খেতে পছন্দ করতেন তাঁর মৃত্যুর পর কোনদিন সেই খাবার বাসায় রান্না করেননি। সেইসব খাবারের একটি হচ্ছে বুটের ডাল দিয়ে গরুর গোশত। আর একটি বরবটির চচ্চড়ি। আহামরি কোন খাবার নয়।

আমি একবার বললাম, আমাদের জন্যে আপনার কি কোন উপদেশ আছে?

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, উপদেশ নয়, একটি আদেশ আছে। আদেশটি হচ্ছে — কেউ যদি কখনো তোমাদের কাছে টাকা ধার চায়, তোমরা 'না' বলবে না। আমাকে অসংখ্যবার মানুষের কাছে ধারের জন্যে হাত পাততে হয়েছে। ধার চাওয়ার লজ্জা এবং অপমান আমি জানি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

(অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলি) মা'র অসাধারণ ইএসপি বা অতিন্দ্রীয় ক্ষমতা ছিল। প্রায় সময়ই ভবিষ্যতে কি ঘটনা ঘটবে তা হুবহু বলে দিতে পারতেন। মা'র এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পর্কে বাবা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। মা'কে তিনি ঠাট্টা করে ডাকতেন, 'মহিলা পীর'। মা'র এই ক্ষমতা বাবার মৃত্যুর পরপরই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। *



জোছনার ফুল

আমাদের বাসা ছিল সিলেটের মীরাবাজারে।

শাদা রঙের একতলা দালান। চারদিকে সুপারি গাছের সারি। ভেতরের উঠোনে একটি কুয়া। কুয়ার চারপাশ বাঁধান। বাড়ির ডানদিকে প্রাচীন কয়েকটা কাঁঠাল গাছ। কাঁঠাল গাছের পাতায় আলো-আঁধারের খেলা। কুয়ার ভেতর উঁকি মারছে নীল আকাশ। একটু দূরে দুটো আতাফল গাছ। সোনালি রঙের আতাফলে পুরো গাছ সোনালি হয়ে আছে। পাকা আতার লোভে ভিড় করছে রাজ্যের পাখি। তাদের সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে গেছে কাকদের। কান পাতা দায়। এমন একটা রহস্যময় পরিবেশে আমার শৈশবের শুরু। শুরুটা খুব খারাপ না। তবু শৈশবের কথা মনে হলেই প্রথমে কিছু দুঃখময় স্মৃতি ভিড় করে। কিছুতেই তাদের তাড়াতে পারি না। সেগুলো দিয়েই শুরু করি।

একদিন কি যেন একটা অপরাধ করেছি। কাপ ভেঙে ফেলেছি কিংবা পাশের বাড়ির জালানায় ঢিল মেরেছি। অপরাধের শাস্তি দেয়া হবে. মা শাস্তির ভার দিলেন আমার মেজো চাচাকে। তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। সিলেটে এম. সি. কলেজে আই. এ. পড়তেন এবং প্রতি বছর ফেল করতেন। মেজো চাচা আমাকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। আমাকে একহাতে শূন্যে ঝুলিয়ে কুয়ার মুখে ধরে বললেন, দিলাম ছেড়ে।

আমার সমস্ত শরীর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সত্যি যদি ছেড়ে দেন! নিচে গহীন কুয়া। একটা হাত ধরে আমাকে কুয়ার ভেতর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মেজো

---

* আমার ছেলেবেলা গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর কি মনে করে জানি মা আমেরিকা যেতে রাজি হলেন। ছামাস সেখানে কাটিয়ে এসেছেন; কিছুদিন আগে আমাকে বললেন হজ্ব করতে চান।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

চাচা মাঝে মাঝে এমন ভঙ্গি করছেন যেন আমাকে সত্যি সত্যি ছেড়ে দিচ্ছেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আর কোনদিন করব না। আর কোনদিন না।

আমার বয়স তখন কত? পাঁচ কিংবা ছয়। নিতান্তই শিশু। এরকম একটা শিশুকে কুয়ায় ঝুলিয়ে যে ভয়ংকর মানসিক শাস্তি চাচা মেজো দিলেন তা ভাবলে আমি আজো আতংকে নীল হয়ে যাই। লিখতে লিখতে চোখের সামনে সেই অতলস্পর্শী কুয়া ভেসে উঠছে। বুক ধড়ফড় করা শুরু হয়েছে।

আমার মেজো চাচা কিংবা আমার মা দু'জনের কেউই বুঝলেন না একটি শিশুকে এইভাবে মানসিক শাস্তি দেয়া যায় না। এটা অমানবিক। এ ধরনের শাস্তিতে শিশুর মনোজগতে বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। বরং তাঁরা দু'জনই দেখলেন — আমি একটিমাত্র জিনিসকেই ভয় পাই, সেটা কুয়ায় ঝুলিয়ে ধরা। কাজেই বারবার আমাকে এই শাস্তি দেয়া হতে লাগল।

অসম্ভব দুষ্ট ছিলাম। নানান ভাবে সবাইকে জ্বালাতন করতাম। শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু এত কঠিন শাস্তি না, যে শাস্তি চিরকালের মত আমার মনে ছাপ ফেলে যাবে।

আমাকে এই অমানবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে আমার ছোটবোন শেফু। তাকেও একদিন এই শাস্তি দেয়া হল। মেজো চাচা তাকে কুয়ার ভেতরে ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, দিলাম ছেড়ে।

সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, দেন ছেড়ে।

চাচা বললেন, সত্যি সত্যি ছেড়ে দেব?

সে থমথমে গলায় বলল, ছাড়েন। আপনাকে ছাড়তে হবে।

শেফুর কথাবার্তায় আমার চাচা এবং মা দু'জনই খুব মজা পেলেন। বাবা অফিস থেকে ফেরামাত্র তাঁকে এই ঘটনা বলা হল। বাবা অবাক হয়ে বললেন, এদের এইভাবে শাস্তি দেয়া হয়? কৈ আমি তো জানি না। কি ভয়ংকর কথা! এই জাতীয় শাস্তির কথা আর যেন কোনদিন না শুনি।

মা বললেন, এরা বড় যন্ত্রণা করে। তুমি তো বাসায় থাক না। তুমি জান না।

বাবা কঠিন গলায় বললেন, এ ধরনের শাস্তির কথা আর যেন না শুনি।

শাস্তি বন্ধ হল, কিন্তু মন থেকে স্মৃতি মুছল না। কতদিন পার হয়েছে, অথচ এখনো দুঃস্বপ্নের মত গহীন কুয়াটার কথা মনে পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, আমার এই চাচা শুধু শাস্তিদাতাই ছিলেন না, প্রচুর আদরও তাঁর কাছে পেয়েছি। আমার অক্ষরজ্ঞানও হয়েছে তাঁর কাছে।

কুয়ার হাত থেকে বাঁচলেও মাকড়সার হাত থেকে বাঁচলাম না। মাকড়সার ব্যাপারটি বলি। কোন-এক বিচিত্র এবং জটিল কারণে আমাদের ছ' ভাইবোনেরই ভয়ংকর মাকড়সা ভীতি আছে। নিরীহ ধরনের এই পোকাটিকে দেখামাত্রই আমাদের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] মানসিকতে এক ধরনের বিপ্লব ঘটে যায়। আমরা আতংকে ঘৃণায় শিউরে উঠি, গা ঘিন ঘিন করে, চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। মনোবিজ্ঞানীরা এই ভীতির [illegible] একটা ব্যাখ্যা দেবেন। আমার কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই।

মাকড়সা ভীতির মাত্রা বুঝানোর জন্যে আমি আমাদের তিন ভাইবোনের তিনটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

আমার ছোট বোন শেফু কলেজে অধ্যাপনা করে। একদিন রিকশা করে ক্লাসে যাচ্ছে, হঠাৎ রিকশা থেকে একটা মাকড়সা তার শাড়িতে উঠে পড়ল। সে লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শাড়ি খুলে দূরে ছুঁড়ে মারা দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মাকড়সা! আমার শাড়িতে মাকড়সা! রিকশাওয়ালা হৃদয়হীন নয়। তারা শাড়ি থেকে মাকড়সা সরিয়ে হাতে শাড়ি তুলে দিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আমার ছোট ভাই ডঃ জাফর ইকবালকে নিয়ে। সে শিকাগো বাস স্টেশনের টয়লেটে গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করল ইউরিন্যালে সবুজ রঙের একটা বড়সড় মাকড়সা। সে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে বের হয়ে এল। লোকজন দৌড়ে এল, পুলিশ ডাকা হল, সবার ধারণা কোন খুনটুন হয়ে গেছে।

এবার আমার নিজের কথা বলি। ঢাকা থেকে বরিশাল যাচ্ছি। বি এম কলেজে প্রাণীবিজ্ঞান শাস্ত্রের এম. এস-সি. পরীক্ষার এক্সটারন্যাল হয়ে। প্রথম শ্রেণীর একটি কেবিন রিজার্ভ করা। রাত দশটার মত বাজে। হঠাৎ দেখি কেবিনের ছাদে বিশাল এক মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আমি ছিটকে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। দশ টাকা কবুল করে একজন ঝাড়ুদার নিয়ে এলাম। সে অনেক খুঁজেও মাকড়সা পেল না, কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। কেবিনে আর ঢুকলাম না। যদি মাকড়সা আবার কোন অন্ধকার কোণ থেকে বের হয়ে আসে। প্রচণ্ড শীতের রাত পার করে দিলাম ডেকে ডেকে হাঁটাহাঁটি করে। যতবার মাকড়সার কথা মনে পড়ল ততবারই শিউরে উঠতে লাগলাম।

এই ভীতি আমরা ভাইবোনেরা জন্মসূত্রে নিয়ে এসেছি। হয়তবা আমাদের জীনের ছেচল্লিশটি ক্রমোজমের কোন-একটিতে গণ্ডগোল আছে, যার কারণে এই অস্বাভাবিক ভীতি।

শৈশবে আমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে এই মাকড়সা ভীতিও কাজে লাগান হত। অধিকাংশ শিশুর মত আমারো রাতে ঘুম আসত না। মা বিরক্ত হয়ে মেজো চাচাকে বলতেন, ওকে ঘুম পাড়িয়ে আন।

মেজো চাচা আমাকে কোলে নিয়ে চলে যেতেন বাড়ির দক্ষিণে কাঁঠাল গাছের কাছে। সেই কাঁঠাল গাছে বিকটাকার মাকড়সা জাল পেতে চুপচাপ বসে থাকত। আমাকে সেইসব মাকড়সাদের কাছে নিয়ে গিয়ে বলা হত — ঘুমাও। না ঘুমালে মাকড়সা গায়ে দিয়ে দেব। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তাম। এখন আমার ধারণা, ঘুম

Nirjoy

www.BanglaBook.org

না, ভয়ে হয়তবা অচেতনের মত হয়ে যেতাম। কেউ তা বুঝতে পারত না। ভাবত ঘুম পাড়ানোর চমৎকার অষুধ তাঁদের কাছে আছে।

এখন ভাবলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। না বুঝে বয়স্ক মানুষরা নিতান্তই অবোধ একটি শিশুর উপর কি ভয়াবহ নির্যাতনই না চালিয়েছেন।

আমি ছেলেবেলার কথা লিখব বলে স্থির করার পর আমার সব আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখে জানালাম — আমার ছেলেবেলা সম্পর্কে কেউ যদি কোন কিছু জানেন আমাকে যেন লিখে জানান। আমার এই আহ্বানের জবাবে ছোটচাচা ময়মনসিংহ থেকে যে চিঠি লিখলেন তার অংশবিশেষ এই রকম — "হুমায়ূন শৈশবে বড়ই দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। রাত্রিতে কিছুতেই ঘুমাইত না। তখন তাহাকে মাকড়সার কাছে নিয়া গেলে দুই হাতে গলা জড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে অচেতন হইয়া যাইত। ইহার কি যে কারণ কে জানে।"

কুয়া এবং মাকড়সা এ দু'টি জিনিস বাদ দিলে আমার শৈশবকে অসাধারণ আনন্দময় সময় বলা যায়। আমার ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। আজকালকার মায়েরা সন্তান চোখের আড়াল হলেই চোখ কপালে তুলে হৈচৈ শুরু করে দেন। আমাদের সময় অবস্থা ভিন্ন ছিল। শিশুদের খোঁজ পড়ত শুধু খাওয়ানোর সময়। তাদের পড়াশোনা নিয়েও বাবা-মা'দের খুব দুশ্চিন্তা ছিল না। একটি শিশু শিক্ষা এবং ধারাপাতের চটি একটা বই এবং স্লেট-পেনসিল কিনে দিলেই বাবা-মা'রা মনে করতেন অনেক করা হল। বাকি পড়াশোনা ধীরে-সুস্থে হবে, এমন তাড়া কিসের? ক্লাস ওয়ান-টুর পরীক্ষাগুলিতে ফার্স্ট হতে হবে এমন কোন কথা নেই। পাস করে পরের ধাপে উঠতে পারলেই হল। না পারলেও ক্ষতি নেই, পরের বার উঠবে। স্কুল তো পালিয়ে যাচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটার এক ধরনের ঢিলেঢালা ভাব।

এমনিতেই নাচুনি বুড়ি, তার উপর ঢাকের বাড়ি। বাবা আদেশ জারি করলেন, তাঁর ছেলেমেয়েদের যেন পড়াশোনার ব্যাপারে কোন চাপ না দেয়া হয়। পড়াশোনার জন্যে সারা জীবন তো পড়েই রইল, শিশুকালটা আনন্দে কাটুক। মহানন্দে সময় কাটতে লাগল। শিশুদের আনন্দের উপকরণ চারদিকে ছড়ানো। অতি তুচ্ছ বিষয় থেকেও তারা আনন্দ আহরণ করে। আমিও তাই করছি। আমার মা'র কোলে তখন আমার তৃতীয় ভাই ইকবাল। মা তাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। আমার দিকে তাকানোর সময় নেই। আমি মনের আনন্দে একা একা ঘুরি। যা দেখি তাই ভাল লাগে। ক্লান্তিহীন হাঁটা। মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলি। তখন একে-তাকে জিজ্ঞেস করতে হয়, মীরাবাজার কোন দিকে?

আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতেও বাসায় কাউকে কখনো চিন্তিত হতে দেখিনি। দুপুরে খাবার সময় উপস্থিত থাকলেই হল। দুপুরের খাবার শেষ হবার পর আরো আনন্দ। মা দিবানিদ্রায়। ঝিম ধরা দুপুর। আমি ঘুরছি। নিজের মনের আনন্দে। এই পর্যায়ে একজন আইসক্রিমওয়ালার সংগে আমার খাতির হয়ে গেল। তখনকার আইসক্রিমওয়ালারা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] দুটা আইসক্রিমের বাক্স নিয়ে মধুর গলায় ডাকত, দুধমালাই, আইসক্রিম, [illegible]!

[illegible]কম আইসক্রিম ছিল। দু'পয়সা দামের সাধারণ আর একআনা দামের [illegible]। আইসক্রিম খাবার পরম সৌভাগ্য মাসে দু'একবারের বেশি হত না। হবার [illegible] নয়। যাই হোক, এমনি এক ঝিম-ধরা দুপুরে 'চাই দুধমালাই, আইসক্রিম' শুনে [illegible] থেকে বের হলাম। আইসক্রিমওয়ালা বলল, আইসক্রিম কিনবে?

আমি মনের দুঃখ মনে চেপে বললাম, না। পয়সা নাই। আইসক্রিমওয়ালা কিছুক্ষণ [illegible] ভেবে বলল, খাও একটা আইসক্রিম, পয়সা লাগবে না।

আমার তখন বিস্মিত হবার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে। কি বলে এই লোক? না [illegible]ই দিয়ে দিচ্ছে কোহিনূর হীরা! লোকটি একটা আইসক্রিম বের করে হাতে দিয়ে [illegible]. আরাম করে খাও। আমি বসে বসে দেখি।

[illegible] উবু হয়ে বসল। আমি অতি দ্রুত আইসক্রিম শেষ করলাম। কেউ দেখে [illegible]লে সমস্যা হতে পারে। দেখল না। রোজ এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। ঠিক [illegible]পুরে বেলা সমস্ত মীরাবাজারের মায়েরা যখন ঘুমে অচেতন, তখন সে আসে। চাপা [illegible]র ডাকে, এই খোকা এই।

আমি ছুটে বের হয়ে আসি। সে আইসক্রিম বের করে দেয়। আমি মহানন্দে খাই। [illegible]তে খেতে মনে হয়, আমার মানবজন্ম সার্থক হল। পুরো এক মাস ধরে এই ব্যাপার [illegible]লল। তারপর মা কি করে জানি টের পেলেন। তিনি আঁতকে উঠলেন, তাঁর ধারণা, এ [illegible]লেধরা। বাসার সবারই ভয়, আমাকে নিয়ে যাবে। বাবাকে খবর দিলেন। তিনিও [illegible]ন্তিত হলেন এবং অফিস বাদ দিয়ে এক দুপুরে বাসায় বসে রইলেন [illegible]আইসক্রিমওয়ালাকে ধরতে হবে। বেচারা ধরা পড়ল।

বাবা তাঁর পুলিশী গলায় কঠিন ধমক দিলেন। মেঘ স্বরে বললেন, তুমি একে রোজ [illegible]আইসক্রিম খাওয়াও, কারণটা কি?

এমনি খাওয়াই স্যার, কোন কারণ নাই।

বিনা কারণে কিছুই হয় না — তুমি কারণ বল।

আইসক্রিমওয়ালা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবার হাজারো প্রশ্নের জবাব [illegible]ল না। বাবা পুরো মাসে ত্রিশটি আইসক্রিম হিসাব করে তাকে দাম দিয়ে দিলেন এবং [illegible]লেন, আর কখনো যে সে না আসে। সে টাকা নিয়ে চলে গেল কিন্তু পরদিনই [illegible]বার এল। একটা দুধমালাই আইসক্রিম বের করে নিচুগলায় বলল, খোকা তুমি খাও। [illegible]র তোমার সংগে আমার দেখা হবে না। আমি আইসক্রিম বেচা ছেড়ে দিব।

আমি চিন্তিত স্বরে বললাম, কেন?

সে তার জবাব না দিয়ে কোমল গলায় বলল, খোকা, আমার কথা মনে থাকবে?

আমি বললাম, হুঁ থাকবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মানুষকে দেয়া বেশির ভাগ কথাই আমি রাখতে পারিনি। কিন্তু হতদরিদ্র আইসক্রিমওয়ালার কথা আমি মনে রেখেছি। এখনো মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি কি জন্যে সে বিনাপয়সায় আমাকে আইসক্রিম খাওয়াতো? আমার বয়েসী কোন ছেলে কি তার ছিল যে অল্প বয়সে মারা গেছে? দরিদ্র পিতা তার স্নেহ ঢেলে দিয়েছে অচেনা একটি শিশুকে? না কি অন্য কোন কারণ আছে?

রহস্যময় এই পৃথিবীতে কিছু কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। প্রায় তিরিশ বছর পর আইসক্রিম খাওয়ার ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি হল। তখন শ্যামলীতে থাকি। আইসক্রিমওয়ালা এসেছে। আমার বড় মেয়ে নেভা আমার কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে ছুটে গেল আইসক্রিম কিনতে। আইসক্রিম হাতে হাসিমুখে ফিরে এসে বলল, আইসক্রিমওয়ালা আমার কাছ থেকে টাকা নেয়নি। বিনা টাকায় আইসক্রিম দিল। বলল, টাকা দিতে হবে না।

আমার স্ত্রী চমকে উঠে বলল, নির্ঘাৎ ছেলেধরা। তুমি এক্ষুনি নিচে যাও।

আমি নিচে গেলাম না। ছেলেবেলার সেই আইসক্রিমওয়ালার কথা ভেবে বড়ই মন কেমন করতে লাগল।

শীতের শুরুতে আমার আনন্দময় আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা যেতে লাগল। শুনলাম আমি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পুরোপুরি বাঁদর হয়ে গেছি। প্যান্ট পরা বলে লেজটা দেখা যায় না। প্যান্ট খুলে ফেললে লেজও দেখা যাবে। আমার বাঁদর জীবনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্যই আমাকে নাকি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হবে। আমার প্রথম স্কুলে যাওয়া উপলক্ষে একটা নতুন খাকি প্যান্ট কিনে দেয়া হল। সেই প্যান্টের কোন জীপার নেই। সারাক্ষণ হা হয়ে থাকে। অবশ্যি তা নিয়ে আমি খুব একটা উদ্বিগ্ন হলাম না। নতুন প্যান্ট পরছি — এই আনন্দেই আমি আত্মহারা।

মেজো চাচা আমাকে কিশোরীমোহন পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দিয়ে এলেন এবং হেড মাস্টার সাহেবকে বললেন, চোখে চোখে রাখতে হবে। বড়ই দুষ্ট।

আমি অতি সুবোধ বালকের মত ক্লাসে গিয়ে বসলাম। মেঝেতে পাটি পাতা। সেই পাটির উপর বসে পড়াশোনা। ছেলেমেয়ে সবাই পড়ে। মেয়েরা বসে প্রথম দিকে, তাদের পেছনে ছেলেরা। আমি খানিকক্ষণ বিচার-বিবেচনা করে সবচে' রূপবতী বালিকার পাশে ঠেলেঠুলে জায়গা করে বসে পড়লাম। রূপবতী বালিকা অত্যন্ত হৃদয়হীন ভঙ্গিতে তুই তুই করে সিলেটি ভাষায় বলল, এই তোর প্যান্টের ভেতরের সবকিছু দেখা যায়।

ক্লাসের সব ক'টা ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে হেসে উঠল। মেয়েদের আক্রমণ করা অনুচিত বিবেচনা করে সবচে' উচ্চস্বরে যে ছেলেটি হেসেছে, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। হাতের কনুইয়ের প্রবল আঘাতে রক্তারক্তি ঘটে গেল। দেখা গেল ছেলেটির

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] দাঁত ভেঙ্গে গেছে। হেড মাস্টার সাহেব আমাকে কান ধরে সারাক্ষণ [illegible] নির্দেশ দিলেন। ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ দিলেন — এ মহাগুণ্ডা। তোমরা [illegible] থাকবে। খুব সাবধান। পুলিশের ছেলে গুণ্ডা হওয়াই স্বাভাবিক।

[illegible] ঘণ্টা বারোটার মধ্যে ছুটি হয়ে যায়। এই দুই ঘণ্টা আমি কান ধরে দাঁড়িয়ে [illegible]। আমার সময়টা যে খুব খারাপ কাটল, তা নয়। স্কুলের পাশেই আনসার [illegible]। তাদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। লেফট রাইট, লেফট রাইট। দেখতে বড়ই [illegible]। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, বড় হয়ে আনসার হব।

[illegible] দ্বিতীয় দিনেও শাস্তি পেতে হল। মাস্টার সাহেব অকারণেই আমাকে শাস্তি [illegible]। হয়ত প্রথম দিনের কারণে আমার উপর বেগে ছিলেন। তিনি মেঘস্বরে [illegible], পাঁঠা মেয়েদের সঙ্গে বসে আছে কেন? এ্যাই, তুই কান ধরে দাঁড়া।

[illegible] দিনেও সারাক্ষণ কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

[illegible] আশ্চর্যের ব্যাপার, তৃতীয় দিনেও একই শাস্তি। তবে এই শাস্তি আমার [illegible] ছিল। আমি একটা ছেলের স্লেট ভেঙ্গে ফেললাম। ভাঙ্গা স্লেটের টুকরায় তার হাত [illegible] গেল। আবার রক্তপাত, আবার কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি।

আমি ভাগ্যকে স্বীকার করে নিলাম। ধরেই নিলাম যে স্কুলের দু'ঘণ্টা আমাকে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। মাস্টার সাহেবেরও ধারণা হল যে আমাকে কানে ধরে সারাক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে আমি অন্যদের বিরক্ত করার সুযোগ পাব না।

আজকের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি সত্যি আমাকে পাঠশালার প্রথম শ্রেণীটি কান ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাটাতে হয়েছে। তবে আমি একা [illegible] না, বেশির ভাগ সময় আমার সঙ্গী ছিল শংকর। * সে খানিকটা নির্বোধ [illegible] ছিল। ক্লাসে দু'জন শংকর ছিল। আমি যার কথা বলছি তার নাম মাথামোটা শংকর। মোটা বুদ্ধি অর্থে মাথামোটা নয়, আসলেই শরীরের তুলনায় তার মাথা [illegible] বড় ছিল। ক্লাস ওয়ানে সে যতখানি লম্বা ছিল, ক্লাস ফাইভে উঠার পরও [illegible] ততখানি লম্বাই রইল, শুধু মাথাটা বড় হতে শুরু করল।

ক্লাসে শংকর ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু জুটল না। সে আমার সঙ্গে ছায়ার মত [illegible] রইল। আমি যেখানে যাই সে আমার সঙ্গে আছে। মারামারিতে সে আমার মত [illegible] নয়, তবে মারামারির সময় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আঁ-আঁ ধরনের গরিলার মত শব্দ [illegible] প্রতিপক্ষের দিকে ছুটে যেত। এতেই অনেকের পিলে চমকে যেত।

শংকরকে নিয়ে শিশুমহলে আমি বেশ ত্রাসের সঞ্চার করে ফেলি।

এই সময় স্কুলে কিছুদিনের জন্যে কয়েকজন ট্রেনিং স্যার এলেন। ট্রেনিং স্যার [illegible] ব্যাপারটা কি আমরা কিছুই জানি না। হেড স্যার শুধু বলে গেলেন, নতুন স্যাররা

---

* এই শংকর বর্তমানে বাংলাদেশের ছবিতে অভিনয় করে বলে শুনেছি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমাদের কিছুদিন পড়াবেন। দেখা গেল নতুন স্যাররা বড়ই ভাল। পড়া না পারলেও শাস্তি দেবার বদলে মিষ্টি করে হাসেন। হৈ চৈ করলেও ধমকের বদলে করুণ গলায় চুপ করতে বলেন। আমরা মজা পেয়ে আরো হৈ চৈ করি। একজন ট্রেনিং স্যার, কেন জানি না, সব ছাত্রছাত্রীকে বাদ দিয়ে আমাকে নিয়ে পড়লেন। অদ্ভুত সব প্রশ্ন করেন। আমার যা মনে আসে বলি আর উনি গম্ভীর মুখে বলেন, তোর এত বুদ্ধি হল কি করে? বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার! তোর ঠিকমত যত্ন হওয়া দরকার। তোকে নিয়ে কি করা যায় তাই ভাবছি। কিছু-একটা করা দরকার।

কিছু করার আগেই স্যারের ট্রেনিংকাল শেষ হয়ে গেল। তিনি চলে গেলেন। তবে কেন জানি কিছুদিন পরপরই আমাকে দেখতে আসেন। গভীর আগ্রহে পড়াশোনা কেমন হচ্ছে তার খোঁজ নেন। সব বিষয়ে সবচে' কম নম্বর পেয়ে ক্লাস টু'তে ওঠার সংবাদ পাবার পর স্যারের উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। শুধু যে উৎসাহে ভাটা পড়ে তাই না, উনি এতই মন খারাপ করেন যে আমার নিজেরো খারাপ লাগতে থাকে।

ক্লাস টু'তে উঠে আমি আরেকটি অপকর্ম করি। যে রূপবতী বালিকা আমার হৃদয় হরণ করেছিল, তাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলি। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করি বড় হয়ে সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছে কি না। প্রকৃতির কোন-এক অদ্ভুত নিয়মে রূপবতীরা শুধু যে হৃদয়হীন হয় তাই না, খানিকটা হিংস্র স্বভাবেরও হয়। সে আমার প্রস্তাবে খুশি হবার বদলে বাঘিনীর মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খামচি দিয়ে হাতের দু'তিন জায়গার চামড়া তুলে ফেলে। স্যারের কাছে নালিশ করে। শাস্তি হিসেবে দুই হাতে দুটি ইট নিয়ে আমাকে নীল ডাউন হয়ে বসে থাকতে হয়।

প্রেমিক পুরুষদের প্রেমের কারণে কঠিন শাস্তি ভোগ করা নতুন কোন ব্যাপার নয়, তবে আমার মত এত কম বয়সে প্রেমের এমন শাস্তির নজির বোধহয় খুব বেশি নেই।

স্কুল আমার ভাল লাগত না। মাস্টাররা অকারণে কঠিন শাস্তি দিতেন। পাঠশালা ছুটির পর বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি যাচ্ছে, এ ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। আমাদের পাঠশালায় প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা। কিন্তু একটা ক্লাস থেকে অন্য ক্লাস আলাদা করা নয়, অর্থাৎ কোথাও কোন পার্টিশনের ব্যবস্থা নেই। কোন ক্লাসে একজন শাস্তি পেলে পাঠশালার সবাই তা দেখে বিমলানন্দ ভোগ করত। শিক্ষকরাও যে মমতা নিয়ে পড়াতেন, তাও না। তাঁদের বেশির ভাগ সময় কাটত ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি দেয়ার কলাকৌশল বের করার কাজে, পড়ানোর সময় কোথায়? আমার পরিষ্কার মনে আছে, একজন শিক্ষক ক্লাস ফোর-এর একজন ছাত্রের দিকে একবার পাঁচ জোড়া জুতা ছুঁড়ে মারেন। ছাত্রটির মাথা ফেটে যায়। অজ্ঞান হয়ে-যাওয়া ছাত্রের মাথায় প্রচুর পানি ঢালাঢালি করে তার জ্ঞান ফেরান হয়। জ্ঞান ফেরার পর প্রথম যে প্রশ্নটি তাকে করা হয় তা হচ্ছে, আর এই রকম করবি কোন দিন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলি ঃ

একদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি চারদিকে চাপা উত্তেজনা। পড়াশোনা এবং শাস্তি দুটোই বন্ধ। শিক্ষকদের মুখ হাসি হাসি। আমাদের জানান হল, আমেরিকা নামের এক ধনী দেশ আমাদের দরিদ্র দেশের ছেলেমেয়েদের কিছু সাহায্য দিয়েছে। সেই সাহায্য আমাদের দেয়া হবে।

সাহায্য হিসেবে আমরা সবাই এক টিন গুঁড়া দুধ এবং এক টিন মাখন পেলাম। দুই টিন নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে গেলাম। মা বিস্মিত হয়ে বললেন, কী দিয়েছে?

আমি বললাম, দুধ। স্যার বলেছেন, পাকিস্তানের সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দুই টিন করে দিয়েছে! মা অবাক বিস্ময়ে বললেন, একটা দেশ কত ধনী হলে এমন সাহায্য দিতে পারে? মা আমেরিকার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ হলেন। আমরা সকালের নাশতায় রুটি মাখন খেতে শুরু করলাম।

টিন দুটি শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় দফায় আবার পাওয়া গেল। এবং জানা গেল প্রতি মাসে দু'বার করে দেয়া হবে। স্কুলের হেড মাস্টার সাহেবের ঘর দুধ এবং মাখনের টিনে ভর্তি হয়ে গেল। মার মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হল। আমেরিকা নামের সোনার দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে তিনি সম্ভবত শোকরানা নামাজও আদায় করলেন।

কিন্তু হেড স্যারের ঘর ভর্তি ছিল দুধ এবং মাখনের টিনে, আমরা আর পেলাম না। হেড মাস্টার সাহেব ঠিক করলেন, ছাত্রদের স্কুলেই দুধ বানিয়ে খাওয়ান হবে। দুধ বানাবার আনুষঙ্গিক খরচ আছে। চুলা কিনতে হবে, ছাত্রদের জন্যে মগ কিনতে হবে, জ্বালানির খরচ আছে। এইসব খরচ মেটান হবে মাখনের টিন বিক্রি করে।

দুই তিন দিন তাই হল। বিশাল কড়াইয়ে দুধ জ্বাল দেয়া হল। অতি অখাদ্য সেই পদার্থ জোর করে আমাদের খাওয়ান হল। শারীরিক শাস্তির চেয়েও সেই শাস্তি ভয়াবহ ছিল। আমরা প্রতিটি ছাত্রছাত্রী মনেপ্রাণে প্রার্থনা করলাম, আল্লাহ তুমি আমাদের এই দুধের হাত থেকে বাঁচাও।

আল্লাহ শিশুদের প্রার্থনা শুনলেন। শাস্তি বন্ধ হল। দুধ খাওয়ান শেষ হল। আমাদের শিক্ষকেরা সবাই রিকশা ভর্তি করে দুধ ও মাখনের টিন বাড়ি নিয়ে গেলেন। আমার বয়স তখন খুবই কম। এই বয়সে দুর্নীতি সম্পর্কে কোন ধারণা হবার কথা নয়, কিন্তু আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরাই সেই ধারণা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। আমার জীবনে শিক্ষকেরা এসেছেন দুষ্টগ্রহের মত। আমি সারা জীবনে অনেক কিছু হতে চেয়েছি — আইসক্রিমওয়ালা, জুতা পালিশওয়ালা থেকে ডাক্তার, ব্যারিস্টার কিন্তু কখনো শিক্ষক হতে চাইনি। চাইনি বলেই বোধহয় এখন জীবন কাটাচ্ছি শিক্ষকতায়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



মাথামোটা শংকর এবং গ্রীন বয়েজ ফুটবল ক্লাব

থ্রী থেকে ফোরে উঠব।

বার্ষিক পরীক্ষা এসে গেছে। বাড়িতে বাড়িতে পড়াশোনার ধুম। আমি নির্বিকার। বই নিয়ে বসতে ভাল লাগে না। যদিও পড়তে বসতে হয়। সেই বসাটা পুরোপুরিই ভান। সবাই দেখল, আমি বই নিয়ে বসে আছি, এই পর্যন্তই। তখন প্রতি সন্ধ্যায় সিলেট শহরে মজাদার ব্যাপার হত — তার নাম 'লেমটন লেচকার'। কথাটা বোধহয় — 'লণ্ঠন লেকচার'-এর বিকৃত রূপ। ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে জায়গায় জায়গায় সিনেমা দেখনা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ম্যালেরিয়া এইসব ভাল ভাল জিনিস। আমাদের কাজের ছেলে রফিক খোঁজ নিয়ে আসে আজ কোথায় লেমটন লেকচার হচ্ছে — মুহূর্তে আমরা দু'জন হাওয়া। রফিক তখন আমার বন্ধুস্থানীয়। তার কাছ থেকে বিড়ি খাওয়ার উপর কোর্স নিচ্ছি। বিড়ি খেলে কচি পেয়ারা পাতা চিবিয়ে মুখের গন্ধ নষ্ট করতে হয় এসব গুহ্যবিদ্যা শিখে নিচ্ছি। এই জাতীয় শিক্ষায় আমার আগ্রহের কোন অভাব দেখা যাচ্ছে না।

লেমটন লেচকারের ভূত আমার ঘাড় থেকে নামানোর অনেক চেষ্টা করা হল। নামান গেল না। মা হাল ছেড়ে দিলেন। এখন আর সন্ধ্যা হলে পড়তে বসতেও বলেন না। আমি মোটামুটি সুখে আছি বলা চলে।

এমন এক সুখের সময়ে মাথামোটা শংকর খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, তার মা তাকে বলেছেন সে যদি ক্লাস থ্রী থেকে পাস করে ফোর-এ উঠতে পারে তাহলে তাকে ফুটবল কিনে দেবেন।

সে আমার কাছে এসেছে সাহায্যের জন্য। কি করে এক ধাক্কায় পরের ক্লাসে ওঠা যায়। একটা চামড়ার ফুটবলের আমাদের খুবই শখ। সেই ফুটবল এখন মনে হচ্ছে খুব দূরের ব্যাপার নয়। সেই দিনই পরম উৎসাহে শংকরকে পড়াতে বসলাম। যে করেই হোক তাকে পাস করাতে হবে। দু'জন একই ক্লাসে পড়ি। এখন সে ছাত্র, আমি শিক্ষক। ওকে পড়ানোর জন্যে নিজেকে প্রথম পড়তে হয়, বুঝতে হয়। যা পড়ি কিছুই শংকরের মাথায় ঢোকে না। মনে হয় তার দুই কানে রিফ্লেকটর লাগান। যা বলা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] বিফ্লেক্টরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, ভেতরে ঢুকতে পারে না। যাই হোক, [illegible] পরিশ্রমে ছাত্র তৈরি হল। দু'জন পরীক্ষা দিলাম। ফল বের হলে দেখা গেল, আমার ছাত্র ফেল করেছে এবং আমি স্কুলের সমস্ত শিক্ষকদের স্তম্ভিত করে প্রথম হয়ে গেছি। ফুটবল পাওয়া যাবে না এই দুঃখে রিপোর্ট কার্ড হাতে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরলাম।

এই ক্ষুদ্র ঘটনা বাবাকে খুব মুগ্ধ করল। বাসায় যেই আসে বলেন, আমার এই ছেলের কাণ্ড শুনুন। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরেছে। কারণ হল . . .

এই ঘটনার আরেকটি সুফল হল বাবা মা'কে ডেকে বলে দিলেন — কাজলকে পড়াশোনা নিয়ে কখনো কিছু বলার দরকার নেই। ও ইচ্ছা হলে পড়বে, ইচ্ছা না হলে না। তাকে নিজের মত থাকতে দাও।

আমি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম।

এই আনন্দের চেয়েও বড় আনন্দ, বিশেষ বিবেচনায় মাথামোটা শংকরকে প্রমোশন দিয়ে দেয়া হল। তার মা সেই খুশিতে তাকে একটা এক নম্বরী ফুটবল এবং পাম্পার কিনে দিলেন।

গীন বয়েজ ফুটবল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হল। আমি ক্লাবের প্রধান এবং শংকর আমার অ্যাসিসটেন্ট। আমাদের বাসার কাজের ছেলে রফিক আমাদের ফুলব্যাক। অসাধারণ পেলোয়াড়।



নানার বাড়ি দাদার বাড়ি

একদিন স্কুল থেকে বাসায় ফিরে দেখি — মা'কে আজ অন্যরকম লাগছে। তাঁর চেহারায় খুকি খুকি ভাব চলে এসেছে। কথা বলছেন অনেকটা সুরেলা গলায়। ব্যাপারটা কি?

অসাধারণ ব্যাপার একটা ঘটেছে — আমরা নানার বাড়ি এবং দাদার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। আমার শৈশবের সবচে' আনন্দময় সময় হচ্ছে এই দু'জায়গায় বেড়াতে যাওয়া। প্রতি দু'বছর পরপর একবার তা ঘটত। আমার মনে হত, এত আনন্দ এত উত্তেজনা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সহ্য করতে পারব না। অজ্ঞান হয়ে যাব। আমরা ছুটিতে যাচ্ছি। ছুটিতে যাচ্ছি। ছুটিতে যাচ্ছি।

ছুটি!

সিলেট মেলে রাতে চড়ব। গভীর রাতে সেই ট্রেন ভৈরবের ব্রীজে উঠবে। আমরা যদি ঘুমিয়ে পড়ি আমাদের ডেকে তোলা হবে। গভীর বিস্ময়ে দেখব ভৈরবের ব্রীজ। ভোরবেলায় ট্রেন পৌঁছবে গৌরীপুর জংশন। ঘুম ভাঙবে চা-ওয়ালাদের অদ্ভুত গলার চা-গ্রাম চা-গ্রাম শব্দে। মিষ্টি লুচি দিয়ে সকালের নাশতা। চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা গৌরীপুর জংশনে যাত্রাবিরতি। কী আনন্দ! কী আনন্দ! স্টেশনের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ঘুরে বেড়াও। ওভারব্রীজে উঠে তাকিয়ে দেখ পিপীলিকার সারির মত ট্রেনের সারি। দূরের দিগন্তে বিস্তৃত ধানের ক্ষেত! সেই ক্ষেতে নেমেছে শাদা বকের দল! তারা উড়ে উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে। আরো অনেক দূরে মেঘের কোলে নীলরঙা গারো পাহাড়। এইগুলি কি এই পৃথিবীর দৃশ্য? না, এই পৃথিবীর দৃশ্য নয় — ধুলোমাটির এই পৃথিবী এত সুন্দর হতে পারে?

নানার বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে নিশুতি রাত। কিন্তু স্টেশন গমগম করছে। নানার বাড়ির এবং তাদের আশেপাশের বাড়ির সব পুরুষ চলে এসেছেন। মহিলারাও এসেছেন। তাঁরা স্টেশনে ঢুকেননি, একটু দূরে হিন্দুবাড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন।

দরজা দিয়ে নামার সুযোগ নেই। তার আগেই আমাকে কেউ হাত বাড়িয়ে জানালা দিয়ে কোলে তুলে নিয়েছেন। একজনের কোল থেকে আরেকজনের কোলে ঘুরছি। মা খুশিতে ক্রমাগত কাঁদছেন। আহা কি আনন্দময় দৃশ্য!

দুটি হ্যাজাক বাতিতে রাস্তা আলো করে আমরা রওনা হলাম। দুপাশে অন্ধকার করা গাছপালায় রাজ্যের জোনাকি জ্বলছে, নিভছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে কালীবাড়ি। মা কালী জিভ বের করে শিবের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, নানার বাড়ি পৌঁছতে তাহলে দেরি নেই। অসংখ্য শিয়াল একসঙ্গে ডাকছে -- রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হল বোধহয়।

একবার বলেছি, আবারও বলি, আমার জীবনের সবচে' আনন্দময় সময় কেটেছে নানার বাড়িতে। বাড়িটার তিনটা ভাগ -- মূল সেতবাড়ি, মাঝের ঘর, বাংলাঘর।

বাংলাঘরের সামনে প্রকাণ্ড খাল। বর্ষায় সেই খাল কানায় কানায় ভরা থাকে। ঘাটে বাঁধা থাকে নৌকা। কাউকে বললেই নৌকা নিয়ে খানিকটা ঘুরিয়ে আনে।

মূল বাড়ির পেছনে ঘন জঙ্গল। এমনই ঘন যে গাছের পাতা ভেদ করে আলো আসে না। সেই জঙ্গলের ভেতর 'সার দেয়াল'। সার দেয়াল হল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নানাদের শক্তিমান পূর্বপুরুষদের কবরস্থান। জঙ্গলে কত বিচিত্র ফলের গাছ — লটকান, ডেউয়া, কামরাঙ্গা . . .।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] চরিত্রের মানুষ। আমাদের মন ভুলানোর জন্যে সবার সে কী [illegible] আমার এক মামা (নজরুল মামা) কোত্থেকে ভাড়া করে ধোপাদের এক গাধা [illegible] গাধা যে আসলেই গাধা সেটা বোঝা গেল — সাত চড়ে রা নেই। পিঠে [illegible] পা, পিঠ থেকে নাম — কিছু বলবে না। শুধু পেছনের দিকে যাওয়া নিষেধ। হঠাৎ লাথি বসাতে পারে।

[illegible] আনন্দ দেয়ার জন্যে ঘুড়ি উড়ান হবে। সেই ঘুড়ি নৌকার পালের চেয়েও [illegible] আকাশে উঠলে প্লেনের মত আওয়াজ হতে থাকে। ঘুড়ি বেঁধে রাখতে হয় [illegible] সঙ্গে, নয়ত উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে।

[illegible] লাটিম খেলা। প্রকাণ্ড এক লাটিম। লাটিম ঘুরানোর জন্যে লোক লাগে। [illegible]। লাটিম ঘুরতে থাকে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজে। আওয়াজে কানে তালা ধরে যায়।

একটু রাত বাড়লে ফাডার টাক্কর (পাঁঠার টক্কর)। দুটি হিংস্র ধরনের বাঁকা শিংয়ের পাঁঠার মধ্যে যুদ্ধ। দুপ্রান্ত থেকে এরা ঘাড় বাঁকিয়ে ছুটে আসবে। প্রচণ্ড শব্দে একজনের [illegible] অন্যজন আঘাত করবে। আগুনের ফুলকি বের হবে শিং থেকে। শুরু হবে [illegible] যুদ্ধ, ভয়াবহ দৃশ্য!

আমাদের কেউ গভীর রাতে আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলবেন। তারা 'আউল্লা' [illegible] যাচ্ছেন। সঙ্গে যাব কি না। ব্যাপারটা হল আলো দিয়ে মাছ মারা। অল্প পানিতে [illegible] একের তীব্র আলো ফেলা হয়। সেই আলোয় দেখা যায় শিং, মাগুর শুয়ে আছে। আলোতে এদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় — নড়তে-চড়তে পারে না। তখন ধোর দিয়ে তাদের [illegible] ফেলা হয়।

খুব ভোরে নানাজানের সঙ্গে ভ্রমণ। নানাজানের হাতে দুনলা বন্দুক। তিনি যাচ্ছেন [illegible] দিকে, আমরা পেছনে পেছনে আছি। ছররা গুলিতে তিন-চারটা বক একসঙ্গে [illegible] পড়ল। মৃত পাখিদের ঝুলিয়ে আমরা এগুচ্ছি — নাকে আসছে মাটির গন্ধ, মৃত পাখিদের রক্তের গন্ধ, বারুদের গন্ধ।

সারাদিন পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি, নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনা — এই আনন্দের যেমন শুরু নেই তেমনি শেষও নেই। ছোটদের শোবার ব্যবস্থা মাঝের ঘরে। ঢালাও বিছানা। বিছানার একপ্রান্তে মা বসে আছেন, পরিচিত জনরা আসছে। গল্প হচ্ছে, পান খাওয়া হচ্ছে, রাত বাড়ছে। কী চমৎকার সব রাত!

নানার বাড়ি ঘিরে আমার অদ্ভুত সব স্মৃতি। মাঝে মাঝে স্বপ্নদৃশ্যের মত এরা উঠে আসে। জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারি না। কয়েকটি স্মৃতি উল্লেখ করছি ঃ

ক) সাপে-কাটা রুগীকে ওঝা চিকিৎসা করছে — এই দৃশ্য নানার বাড়িতেই প্রথম দেখি। রুগী জলচৌকিতে বসে আছে, ওঝা মন্ত্র পড়তে পড়তে হাত ঘুরাচ্ছে। সেই ঘুরন্ত হাত অতি দ্রুত নেমে আসছে রুগীর গায়ে। চিকিৎসার শেষ পর্যায়ে কাঁইক্যা মাছের কাঁটা দিয়ে রুগীর পা থেকে দূষিত রক্ত বের করা হচ্ছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খ) মেয়ের ডাক শুনে ঝাঁক বেঁধে কই মাছ পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসছে এবং পাগলপণ চেষ্টা করছে শুকনো দিয়ে বোন-এক গন্তব্যে যেতে। কেন তারা বর্ষার প্রথম মেঘগর্জনে এমন পাগল হয়, কে বলবে।

গ) ভূতে-পাওয়া রুগীর চিকিৎস করতেও দেখলাম। ভূতের ওঝা এসে রুগীর সামনে ঘর কেটে সেই ঘরে সরিষা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। রুগী যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলছে, আর মারিস না। আর মরিস না।

ঘ) এক হিন্দুবাড়িতে নপুংসক শিশুর জন্ম হল। কোত্থেকে খবর পেয়ে একদল হিজড়া উপস্থিত। শুরু হল নাচানাচি। নাচানাচির এক পর্যায়ে এরা গা থেকে সব কাপড় খুলে ফেলল : ঝুড়ি ভর্তি করে ডিম নিয়ে এসেছিল, সেইসব ডিম ছুঁড়ে মারতে লাগল বাড়িতে। এক সময় শিশুটি তাদেরকে দিয়ে দেয়া হল। মহানন্দে তারা চলে যাচ্ছে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে শিশুটির মা। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় এমন একটি দৃশ্য। আমার নিজের চোখে দেখা।

ঙ) এক সন্ধ্যায় নানার বাড়িতে ঢিল পড়তে লাগল। ছোট ছোট ঢিল নয় — ক্ষেত থেকে উঠিয়ে আনা বিশাল মাটির চাঙড়। নানীজান বললেন, কয়েকটা দুষ্ট জ্বীন আছে। মাঝে মাঝে এরা উপদ্রব করে। তবে ভয়ের কিছু নাই, এইসব ঢিল কখনো গায়ে লাগে না।

ব্যাপারটা পরীক্ষা করবার জন্যে উঠোনে খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করলাম। আশেপাশে ঢিল পড়ছে, গায়ে পড়ছে না — বেশ মজার ব্যাপার।

নিশ্চয় এর লৌকিক কোন ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা থাকলেও আমার জানা নেই। জানতেও চাই না। নানার বাড়ির অনেক রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে এটিও থাকুক। সব রহস্য ভেদ করে ফেলার প্রয়োজনই বা কি?

এবার দাদার বাড়ি সম্পর্কে বলি।

দাদার বাড়ির একটি বিশেষ পরিচিতি ঐ অঞ্চলে ছিল এবং খুব সম্ভব এখনো আছে —'মৌলবি বাড়ি'। এই বাড়ির নিয়ম-কানুন অন্য সব বাড়ি থেকে শুধু যে আলাদা তাই না — ভীষণ রকম আলাদা। মৌলবি বাড়ির মেয়েদের কেউ কোন দিন দেখেনি, তাদের গলার স্বর পর্যন্ত শুনেনি। এই বাড়িতে গানবাজনা নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, ভেতরের বাড়িতেও বড় বড় পর্দা। একই বাড়ির পুরুষদের ও মেয়েদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলতে হত। ভাবের আদান-প্রদান হত ইশারায় কিংবা হাততালিতে : যেমন, পর্দার এ পাশ থেকে দাদাজান একবার হাততালি দিলেন। তার মানে তিনি পানি চান। দুবার হাত তালি -- পান-সুপারি। তিনবার হাত তালি — মেয়েদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে, আরো নিঃশব্দ হতে হবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমাদের হল পীর বংশ ; দাদার বাবা জাঙ্গির মুন্সি ছিলেন এই অঞ্চলের নামী পীর সাহেব। তাঁকে নিয়ে প্রচলিত অনেক গল্প-গাঁথার একটি গল্প বলি ঃ জাঙ্গির মুন্সি দূর গ্রামের মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। সেই আমলে যানবাহন ছিল না। দশ মাইল পথ হেঁটে যেতে হল। দুপুরে পৌঁছলেন। মেয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে ফেরার পথে মনে হল, মা আমার পাঞ্জাবীর একটা বোতাম খুলে গেছে। তুমি সুঁই-সূতা দিয়ে একটা বোতাম লাগিয়ে দাও। বোতাম ঘরে আছে তো ?

মেয়ে বোতাম লাগিয়ে দিল। তিনি দশ মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে এসেই মাত্র মনে হল, বিরাট ভুল হয়েছে। তাঁর কন্যা যে বোতাম লাগাল সে কি স্বামীর অনুমতি নিয়েছে? স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর সংসারের জিনিস ব্যবহার করা তো ঠিক না। তিনি আবার রওনা হলেন, অনুমতি নিয়ে আসা যাক। আবার কুড়ি মাইল হাঁটা।

আমি নিজে অবশ্যি এই গল্প অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি আমার ধারণা, মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে এসে তাঁর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আবার মেয়েকে দেখার ইচ্ছা হল। গল্পটা অজুহাত তৈরি করে রওনা হলেন।

দাদার বাড়ির কঠিন সব অনুশাসনের নমুনা হিসেবে একটা গল্প বলি। আমার ফুপুরা খুব সুন্দরী। পীর পরিবারের বংশধররা সচরাচর রূপবান হয়। তারাও ব্যতিক্রম না। দু'জন ফুপুই পরীর মত। বড় ফুপুর বিয়ের বয়স হলে বাবা তাঁর জন্যে একজন ছেলে পছন্দ করলেন। ছেলে বাবার বন্ধু। ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ.। ছেলেও অত্যন্ত রূপবান। বাবা তাঁর বন্ধুকে সঙ্গে করে গ্রামের বাড়িতে এলেন। দাদাজানের ছেলে পছন্দ হল। মেয়ে দেখান হল। কারণ ধর্মে না-কি বিধান আছে, বিয়ের আগে ছেলে মেয়েকে এবং মেয়ে ছেলেকে অন্তত একবার দেখতে পারবে। ছেলে, মেয়ে দেখে মুগ্ধ। সেই রাতের কথা। বাবা তাঁর বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছেন খোলা প্রান্তরে বাবার বন্ধু গান ধরল। রবীন্দ্রনাথের গান তখন শিক্ষিত মহলে গাওয়া শুরু হয়েছে।

গানটি হল — আজি এ বসন্তে . . .

গান গাওয়ার খবর দাদাজানের কানে পৌঁছল। তিনি বাবাকে ডেকে নিয়ে বললেন, এই ছেলে যে গান জানে তা তো তুমি বল নাই।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, সে গান জানে।

এইখানে মেয়ে বিয়ে দিব না। তুমি জেনেশুনে গান-জানা ছেলে এ-বাড়িতে আনলে কেন ?

গান গাওয়া ক্ষতি কি ?

লাভ-ক্ষতির ব্যাপার না। আমরা কয়েক পুরুষ ধরে যে-নিয়ম মানছি আমার জীবিত অবস্থায় তার কোন ব্যতিক্রম হবে না। তুমি যদি রাগ কর আমার কিছুই বলার নাই। রাগ করে বাড়িতে আসা বন্ধ করলেও করতে পার ;

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দাদাজান তাঁর মেয়েকে নিজে দেখেশুনে পৃথিবী থেকে দূরে সরে-থাকা একটি পরিবারে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

আমরা যখন দাদার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, খবর পেয়ে বড় ফুপু আসতেন পাল্কি করে। পাল্কি অনেক দূরে অপেক্ষা করত। ফুপুর স্বামী খোঁজ নিতে আসতেন — আমরা যে এসেছি, আমাদের সঙ্গে কলের গান আছে কি-না! যদি জানতেন কলের গান আছে সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যেতেন।

ধীরে ধীরে দাদার বাড়ির মানসিকতার পরিবর্তন হয়। যে-গান এই বাড়িতে নিষিদ্ধ ছিল সেই গানও চালু হয়। দাদার নির্দেশেই হয়। আমার ছোট বোন ফেরুর গলায় — "তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে" গান শোনার পর দাদাজান নির্দেশ দেন — গান চলতে পারে।

দাদার বাড়ি প্রসঙ্গে অদ্ভুত একটা কথা বলি। দাদার বাবা জাহির মুনসির ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল। দাদাজানেরও ইচ্ছামৃত্যু হয়। মৃত্যুর সাতদিন আগে সবাইকে ডেকে তিনি তার মৃত্যুর সময় বলেন, কেউ মনে কোন আফসোস রাখবে না। মন শান্ত কর। আমাকে কেউ যদি বিশেষ কোন সেবা-যত্ন করতে চাও করতে পার।

দাদাজানের বলা সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যু হয় সজ্ঞানে। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে আমার ছোটচাচাকে ডেকে বলেন, আমি তাহলে যাই।

পৃথিবী বড়ই রহস্যময়।

দাদাজানদের বাড়িঘর অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম, গোছানো। মানুষগুলি হৈ-চৈ করে কম, কাজ করে বেশি। দাদার বাড়িতে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল না। দাদাজান আমাদের চোখে-চোখে রাখতেন। আদব-কায়দা, ভদ্রতা শেখাতেন। সন্ধ্যাবেলা নামাজ শেষ করেই গল্প করতে বসতেন। সবই ঈশপের গল্পের মত: গল্পের শেষে একটা মোরাল থাকত। মোরাল আছে এমন গল্প ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু দাদাজানের গল্প ভাল লাগত। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

নানার বাড়ি থেকে দাদার বাড়িতে এলে শুরুতে খানিকটা দমবন্ধ দমবন্ধ লাগত। তবে দাদার বাড়িরও আলাদা মজা ছিল। বাড়ির বাংলাঘরে দুটি কাঠের আলমিরায় ছিল অসংখ্য বই। আসলে এই দুটি আলমিরা নিয়েই একটা পাবলিক লাইব্রেরি। আজিমুদ্দিন আহমেদ পাবলিক লাইব্রেরি। আজমুদ্দিন আহমেদ আমার দাদার নাম। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে বাবা এই লাইব্রেরি করেন। লাইব্রেরির চাঁদা মাসে এক আনা। এই লাইব্রেরি থেকে কেউ কোনদিন বই নিয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমরা দাদার বাড়িতে উপস্থিত হলেই শুধু চাবি খুলে বই বের করা হত। চাবি চলে আসত আমার হাতে। দাদার বাড়িতে পুকুরপাড়ে বটগাছের মত বিশাল এক কামরাঙ্গা গাছ ছিল। সেই কামরাঙ্গা গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বই পড়ার আনন্দের কোন তুলনা হয় না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাবা বায়গায় জায়গায় লোক পাঠিয়ে গ্রাম্য গায়কদের আনতেন। তাঁরা তাঁদের বাদ্যযন্ত্র হাতে উপস্থিত হতেন — রোগাভোগা, অনাহারক্লিষ্ট মানুষ কিন্তু তাঁদের চোখ বড়ই স্বপ্নময়।

দাদার বাড়িতে গান-বাজনা হবার কোন উপায় নেই। অনেকটা দূরে বাবার এক বন্ধুর বাড়ির উঠোনে গানের আসর বসত। হাত উঁচু করে যখন গাতক ঢেউ-খেলান শরীর, মাথার লম্বা বাবড়ি ঝাঁকিয়ে গানে টান দিতেন —

"আমার মনে বড় দুক্ক
বড় দুক্ক আমার মনে গো।"

তখন তাঁর মনের 'দুক্ক' ছড়িয়ে যেত শ্রোতাদের মনে। চোখ ভরে জল আসত। গান চলত গভীর রাত পর্যন্ত। রাত যত গভীর হত গানে ততই আধ্যাত্মিক ভাব প্রাধান্য পেতে থাকত। শেষের দিকে সেগুলি আর গান থাকত না — হয়ে উঠত প্রার্থনা-সঙ্গীত। আমরা ছোটরা অবশ্যি তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছি। আমাদের কোলে করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে কোন-এক অদ্ভুত উপায়ে গান শুনতে পাচ্ছি।



পারুল আপা

স্কুল আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মত ছিল। স্কুলের বাইরের জীবনটা ছিল আনন্দময়। সেই আনন্দের মাঝখানে দুঃস্বপ্নের মতই উদয় হলেন পারুল আপা। লম্বা বিষাদময় চেহারার একটি মেয়ে। চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড়। থাকেন আমাদের একটি বাসার পরের বাসায়।

তার বাবা ওভারশিয়ার। রোগা একজন মানুষ। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটেন। চিকন গলায় কথা বলেন। নিজের মেয়েদের অকারণে হিংস্র ভঙ্গিতে মারেন। সেই মার ভয়াবহ মার। যে কোন অপরাধে পারুল আপাদের দুবার শাস্তি হয়। প্রথমে বাবার হাতে, পরেরবার মায়ের হাতে। শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে একটা ধারণা দেই। পারুল আপা একবার একটা প্লেট ভেঙে ফেললেন। সেই প্লেট ভাঙার শাস্তি হল, চুলের মুঠি ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা। পারুল আপা পরিবারের সবচেয়ে বড় মেয়ে। তারা অনেকগুলি বোন, কোন ভাই নেই। নিয়ম করে প্রতি বছর পারুল আপাদের একটি করে বোন হয়। তার বাবা-মা দুজনেরই মুখ অন্ধকার হয়ে যায়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

যে সময়ের কথা বলছি তখন পারুল আপার বয়স বার-তের, বয়োসন্ধি কাল। বাবা-মা'র অত্যাচারে বেচারী জর্জরিত। তার মা তাঁকে ডাকেন হাবা নামে। অথচ তিনি মোটেই হাবা ছিলেন না। তাঁর অসম্ভব বুদ্ধি ছিল। হৃদয় ছিল আবেগ ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ। কোন-এক বিচিত্র কারণে তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও ভালবাসা আমার উপর উজাড় করে দিলেন। যে ভালবাসা না চাইতেই পাওয়া যায়, তার প্রতি কোন মোহ থাকে না। পারুল আপার ভালবাসা আমার অসহ্য বোধ হত। অসহ্য বোধ হবার আরো একটি কারণ ছিল। তাঁর চেহারা তেমন ভাল ছিল না। আমার চরিত্রের বড় রকমের দুর্বল দিকের একটি হচ্ছে, মেয়েদের দৈহিক রূপের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ। যে দেখতে ভাল না, সে হাজারো ভাল হলেও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রূপবতীদের বেলায় আমি অন্ধ। তাদের কোন ত্রুটি আমার চোখে পড়ে না। তাদের দৈহিক সৌন্দর্যই আমার সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বলতে ইচ্ছে করে, আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার।

থাক সে কথা, পারুল আপার কথা বলি। তিনি ভালবাসার কঠিন শিকলে আমাকে বাঁধতে চাইলেন। আমাকে ভুলানোর জন্যে তাঁর সে কি চেষ্টা! বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে আমাকে দিতেন। স্কুলের টিফিনের জন্যে তাঁকে সামান্য পয়সা দেয়া হত। তিনি না খেয়ে সেই পয়সা জমিয়ে রাখতেন আমার জন্যে। এর প্রতিদানে মাঝে মাঝে তাঁর সংগে স্কুলে যেতে হত। সেটা অতি বিরক্তিকর ব্যাপার। তিনি ক্লাস করছেন, আমি বেজার মুখে তাঁর পাশে বসে। তিনি একটা হাতে আমার গলা জড়িয়ে আছেন।

সে সময় অধিকাংশ মেয়েই ছোট ভাইদের স্কুলে নিয়ে আসত। ছোট ভাইরা অনেক সময় অভিভাবকের মত কাজ করত। বাবা-মারা নিশ্চিন্ত থাকতেন মেয়ের সংগে পুরুষ-প্রতিভূ একজন কেউ আছে। পারুল আপার সংগে স্কুলে গিয়ে একবার বিরাট সমস্যায় পড়লাম। স্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতর একজন পাগল ঢুকে গেছে। মেয়েমহলে আতংক, ছোটাছুটি। আমি পারুল আপার নজর এড়িয়ে পাগল দেখতে গেলাম। কি আশ্চর্য, পাগল আমার চেনা। শুধু চেনা না, খুবই চেনা। উনি হচ্ছেন সুরসাগর প্রাণেশ দাস, বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। প্রায়ই বাসায় আসেন। তখন গানের জলসা বসে। আমাদের বাসায় হারমোনিয়াম নেই, আমরা ছুটে গিয়ে লায়লা ডাক্তারদের বাসা থেকে হারমোনিয়াম নিয়ে আসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি গান-বাজনা করেন। গায়ক প্রাণেশ দাস, শ্রোতা আমার বাবা। এইসব ওস্তাদী ধরনের গান আমাদের ভাল লাগে না, শুধু বাবা একাই আহা আহা করেন।

প্রাণেশ কাকু পাগল হয়ে গেছেন আমার জানা ছিল না। এখন অবাক হয়ে দেখি তিনি বিচিত্র ভঙ্গি করে মেয়েদের দিকে ছুটে ছুটে যাচ্ছেন। মেয়েরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible]। একে অন্যের উপর গড়িয়ে পড়ছে। আমি অসীম সাহসী। এগিয়ে গেলাম [illegible] দিকে। প্রাণেশ কাকু আমাকে চিনতে পারলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, কি রে [illegible] ভাল?

আমি বললাম, জ্বি ভাল। আপনি এ-রকম করছেন কেন?

প্রাণেশ কাকু লজ্জিত গলায় বললেন, মেয়েগুলিকে ভয় দেখাচ্ছি।

ভয় দেখাচ্ছেন কেন?

মেয়েগুলি বড় বজ্জাত। তোর বাবা ভাল আছেন?

জ্বি।

হারমোনিয়াম কিনতে বলেছিলাম, কিনেছে?

জ্বি না।

শ'খানেক টাকা হলে সিঙ্গেল রীড হারমোনিয়াম পাওয়া যায়। কিনে ফেললে হয়। [illegible]-রোজ অন্যের বাসা থেকে আনা — তুই তোর বাবাকে বলবি।

জ্বি আচ্ছা।

আর আমার মাথা যে খারাপ হয়ে গেছে এই খবরটাও দিস। বাড়িতে বেঁধে রাখে। তুই এখানে চুপচাপ দাঁড়া, আমি মেয়েগুলিকে আরেকটু ভয় দেখিয়ে আসি। তারপর তোকে নিয়ে তোদের বাসায় যাব।

জ্বি আচ্ছা।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রাণেশ কাকু আরো কয়েকবার প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে ফিরে এসে আমার হাত ধরে গেটের দিকে রওনা হলেন। আর তখনই হাতে লম্বা একটা লাঠি নিয়ে রণরংগিনী মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন পারুল আপা। তাঁর মূর্তি প্রাণ-সংহারক। তিনি তীব্র গলায় বললেন, একে ছাড়েন। একে না ছাড়লে লাঠি দিয়ে এক বাড়িতে আপনার মাথা ফাটিয়ে দেব। ছাড়েন বলছি। পাগলের সিক্সথ্ সেন্স খুব ডেভেলপড হয় বলে আমার ধারণা। প্রাণেশ কাকু সংগে সংগে বুঝলেন, আমার হাত না ছাড়লে এই মেয়ে সত্যি সত্যি তার ছোট শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করবে। তিনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন। পারুল আপা ছুটে এসে ছোঁ মেরে আমাকে কোলে করে নিয়ে গেলেন — এত প্রবল উত্তেজনা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। পারুল আপা হাত-পা এলিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

পারুল আপা ছিলেন যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়ে আমার জ্ঞানদাত্রী। পুরুষ এবং রমণীর ভেতর বাহ্যিক সম্পর্ক ছাড়াও যে অন্য এক ধরনের সম্পর্ক আছে তা প্রথম জানলাম তাঁর কাছে। তখন আমার বয়স আট। ক্লাস থ্রীতে উঠেছি। জটিল সম্পর্কের বিষয় জানার জন্যে বয়সটা খুবই অল্প। খুবই হকচকিয়ে গেলাম — এসব কি বলছে পারুল আপা! কি অদ্ভুত কথা!

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পারুল আপার কথা বিশ্বাস করার কোনই কারণ দেখলাম না। কিন্তু উনিই বা বানিয়ে বানিয়ে এমন অদ্ভুত কথা বলবেন কেন?

নর-নারীর সম্পর্কের জটিলতা ব্যাখ্যা করার পেছনে পারুল আপার একটা কারণ ছিল। কারণ হচ্ছে, আমাদের পাশের বাসার ভদ্রলোক। উনাদের বাড়িতে পনেরো-ষোলো বছরের সুন্দর মত একটি কাজের মেয়ে ছিল। মেয়েটি ভদ্রলোককে বাবা ডাকত। হঠাৎ শুনি, তিনি এই মেয়েটিকে বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোকের দু'টি বড় মেয়ে কলেজে পড়ে। তারা খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। ভদ্রলোকের স্ত্রী ঘনঘন ফিট হতে লাগলেন। ঘটনাটা চারপাশে বড় ধরনের আলোড়ন তৈরি করল। বড়রা সবাই এই ঘটনা নিয়ে আলাপ করে। সেই আলাপে আমি উপস্থিত হলে চোখ বড় বড় করে বলে — "এই ভাগ!"

কাজেই আমি নিজেই পারুল আপার কাছে জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কি। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, বিয়ে না করে উপায় কি — ঐ মেয়ের পেটে বাচ্চা।

পেটে বাচ্চা হলে বিয়ে করতে হয় কেন?

তোকে বলা যাবে না। খুব লজ্জার কথা।

না, আমাকে বলতে হবে।

কাউকে বলবি না তো?

না, বলব না।

কসম খা।

কিসের কসম?

বল, বিদ্যা।

বিদ্যা।

বল, কোরান।

কোরান।

বল, টিকটিকি।

টিকটিকি বলব কেন? টিকটিকি আবার কি রকম কসম?

টিকটিকির যেমন লেজ খসে যায় — তুই যদি এই কথা কাউকে বলিস তাহলে তোর জিভও খুলে পড়ে যাবে!

আমি ভয়ে ভয়ে টিকটিকির নামেও কসম করলাম — আর পারুল আপা গন্দম ফলের সেই বিশেষ জ্ঞান আমাকে দিয়ে দিলেন। আমার মনে আছে, মনে খুব বড় ধরনের আঘাত পেলাম। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হল, না এসব মিথ্যা। এসব হতেই পারে না। ব্যাপারটা নিয়ে আমি যে কারে সঙ্গে আলাপ করব সেই উপায় নেই। টিকটিকির কসম খেয়েছি। জিহ্বা খুলে পড়ে যেতে পারে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

: সময় পাশের বাড়ির ঐ ভদ্রলোকের বড় মেয়েটির হাসি-রোগ হল। সারাক্ষণ খা খা। খিলখিল করে হাসে। গভীর রাতেও ঘুম ভেঙে শুনি পাশের বাড়ি থেকে হাসির শব্দ আসছে। গভীর রাতে সেই হাসি শুনে বড় ভয় লাগত। গা শিরশির করত। মেয়েটির কোথায় যেন বিয়ে ঠিক হয়েছিল — বাবার এই কাণ্ডে তার বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পরই হাসি-রোগ হয়। তার কয়েকদিন পরই তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ভদ্রলোকের মেয়ে আমি নানু ডাকতাম। মেয়ে দুটিকে খালা। তারা আমাকে খুবই স্নেহ করত। কাছে ডেকে নিয়ে বড়দের মত কাপে করে চা খেতে দিত। দু' নম্বর বোনটি আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত — তার মত সুন্দরী কোন মেয়ে আমি দেখেছি কি-না। এর উত্তরে আমি তৎক্ষণাৎ বলতাম, 'না।'

সত্যিই তো?

হ্যাঁ, সত্যি।

আমি বেশি সুন্দর, না আপা?

আপনি।

সত্যি-বিদ্যা-কোরান বল।

সত্যি-বিদ্যা-কোরান।

তাঁরা চলে যাবার পর পাশের বাড়ি অনেক দিন খালি পড়ে রইল। আমার বেশ কিছুদিন খুব মন খারাপ গেল। অল্প বয়সের মন-খারাপ ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমার বেলায়ও হল না। তাছাড়া মন-খারাপ ভাব কাটানোর মত একটা রহস্যময় ঘটনাও ঘটল। একদিন খুব ভোরে দুজন বিচিত্র-দর্শন লোক কোদাল নিয়ে পাকুড় আপাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকল। তারা নাকি কবর খোঁড়ার লোক। ভেতরের দিকের উঠানে তারা কবর খুঁড়তে শুরু করল! এই ঘটনা শুধু যে শিশুদের মনেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল তা নয়, বড়রাও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। আমার মা'র ধারণা হল ভদ্রলোক তাঁর কোন-এক মেয়েকে মেরে ফেলেছেন। এখন গোপনে কবর দিয়ে দেয়া হচ্ছে। বাবা মা'কে ধমক দিলেন — এইসব অদ্ভুত ধারণা তুমি পাও কোথায়? নিশ্চয়ই অন্য কোন ব্যাপার।

আসলেই অন্য ব্যাপার, তবে কম রোমাঞ্চকর না: ওভারশিয়ার কাকুর পকেট থেকে একশ' টাকা চুরি করেছে তাঁর পিওন। অথচ সে তা স্বীকার করছে না। কবর খোঁড়া হচ্ছে সেই কারণেই। পিওন একটা কোরান শরীফ হাতে নিয়ে কবরে নামবে এবং কোরান শরীফ হাতে নিয়ে বলবে — সে টাকা নেয়নি। যদি সে মিথ্যা কথা বলে তাহলে আর কবর থেকে উঠতে পারবে না। কবর তাকে আটকে ফেলবে।

সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার জন্য আমরা দল বেঁধে কবরের চারপাশে দাঁড়ালাম। পিওন হাতে কোরান শরীফ নিয়ে কবরে নামল। সে থরথর করে কাঁপছে। গা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দিয়ে ঘাম ঝরছে। তাকে দেখাচ্ছে পাগলের মত। ওভারশিয়ার কাকু বললেন — এ্যাঁ, তুই টাকা চুরি করেছিস?

ছে — না।

সত্যি কথা বল। মিথ্যা বললে কবরে আটকে যাবি।

টাকা চুরি করি নাই স্যার।

তোর হাতে কোরান শরীফ, তুই কবরে দাঁড়িয়ে আছিস — মিথ্যা বললে আর উঠতে পারবি না।

তখন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হল। পিওনের হাত থেকে কোরান শরীফ পড়ে গেল। সে জ্ঞান হারিয়ে কবরের ভেতর পড়ে গেল।

ওভারশিয়ার কাকু বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন, বলছিলাম না, টাকা এই হারামজাদাই নিয়েছে।

কবর বন্ধ করা হল, কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করা হল না। বিশাল একটা গর্তের মত হয়ে রইল, যে গর্তের দিকে তাকালেই ভয় ভয় লাগত। এছাড়াও আরো সব ভয়াবহ খবর কানে আসতে লাগল — যেমন গভীর রাতে না-কি এই কবরের ভেতর থেকে ভারি গলায় কে ডাকে — আয় আয়। একবার কবর খোড়া হয়ে গেলে কাউকে না কাউকে সেখানে যেতে হয়। কবর তার উদর পূর্ণ করবার জন্য মানুষকে ডাকে।

আমি পারুল আপাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিলাম। কি দরকার ঐ ভূতুড়ে বাড়িতে যাবার। পারুল আপার সঙ্গে যোগাযোগও কমে গেল, কারণ তাঁর স্কুলের খাতায় একটি প্রেমপত্র পাওয়া গেছে। সম্বোধনহীন সেই প্রেমপত্রে তিনি একজনকে অনুরোধ করেছেন তাঁকে চুমু খাবার জন্যে। কেন জানি আমার মনে হয়, ঐ প্রেমপত্রটি তিনি আমাকেই লিখেছিলেন। কারণ আমি ছাড়া অন্য কোন ছেলের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না। এবং একবার তাঁকে চুমু খাবার জন্যে লাজুক গলায় আমাকে অনুরোধও করেছিলেন। আমি এই অদ্ভুত প্রস্তাবে হেসে উঠায় খুব লজ্জাও পেয়েছিলেন। তাঁর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। জানালার শিক ধরে মাঝে মাঝে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আমাকে দেখলেই তিনি চিকন গলায় ডাকেন। আমি পালিয়ে যাই। তাঁর বাবা-মা তাঁকে বন্দী করে রাখায় আমি এক ধরনের স্বস্তি বোধ করি। এখন আমাকে বিরক্ত করার সুযোগ তাঁর নেই। পারুল আপার বন্দী জীবন আমাকে বেশিদিন দেখতে হয়নি। তাঁরা মীরবাজারের বাসা বদলে কোথায় যে-চলে গেলেন; হারিয়ে গেলেন পুরোপুরি!

মানুষ দ্বিতীয়বার শৈশবে ফিরে যেতে পারে না। পারা গেলে আমি অবশ্যই এই অসহায় অভিমানী, দুঃখী কিশোরীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম। আজ তিনি কোথায়

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] আছেন, আমি জানি না। শুধু প্রার্থনা করি — যেখানেই থাকুন যেন [illegible] দিতে থাকে। পৃথিবী ও মানুষের কাছে সুখ তাঁর প্রাপ্য।



স্বপ্নলোকের চাবি

[illegible] আপা নেই, কাজেই স্কুলের দুঃসহ দুঘণ্টা কোনক্রমে পার করে দেবার পরের [illegible] মহানন্দের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা।' [illegible]-গোছানো সুন্দর বাড়ি দেখলেই হুট করে ঢুকে পড়ি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই [illegible] বের করে দেয়া হয়। এর মধ্যে একটি বাড়িতে ভিন্ন ব্যাপার হল। এই [illegible] মীরাবাজারেই। আমাদের বাসার কাছে। বিশাল কম্পাউণ্ড, গাছগাছালিতে [illegible] ধবধবে শাদা রঙের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। এই বাড়িতে কে থাকেন তাও [illegible] জানি, সিলেট এম. সি. কলেজের অধ্যাপক। আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় [illegible] প্রফেসার সাব, অতি অতি অতি জ্ঞানী লোক। যাকে দূর থেকে দেখলেই পুণ্য [illegible]। তবে এই প্রফেসার সাহেব না-কি পাকিস্তানে থাকবেন না, দেশ ছেড়ে কোলকাতা [illegible] যাবেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর না-কি চাকরিও হয়েছে। তিনি চেষ্টা [illegible] বাড়ি বিক্রির।

এক দুপুরে গেট খোলা পেয়ে হুট করে সেই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম। [illegible]পালার কি শান্ত শান্ত ভাব। মনে হয় ভুল করে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এক বাড়ির বাগানে [illegible] পড়েছি। আনন্দে মন ভরে গেল। একা একা অনেকক্ষণ হাঁটলাম। হঠাৎ দেখি, [illegible]ণার দিকের একটি গাছের নিচে পাটি পেতে একটি মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। [illegible]র জীবনে এত সুন্দর মেয়ে আর দেখিনি। মনে হল, তার শরীর শাদা মোমের [illegible]রি। পিঠ ভর্তি ঘন কালো চুল। ষোলো-সতেরো বছর বয়স। দৈত্যের হাতে বন্দিনী [illegible] রাজকন্যারাও এত সুন্দর হয় না। মেয়েটি হাত ইশারায় ডাকল। প্রথমে ভাবলাম, দৌড়ে [illegible]লিয়ে যাই। পর মুহূর্তেই সেই ভাবনা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে গেলাম।

কি নাম তোমার খোকা?

কাজল।

কি সুন্দর নাম! কাজল। তোমাকে মাখতে হয় চোখে, তাই না?

কিছু না বুঝেই আমি মাথা নাড়লাম।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি, তুমি একা একা হাঁটছ। কি ব্যাপার?

আমি চুপ করে রইলাম।

কি জন্যে এসেছ এ বাড়িতে?

বেড়াতে।

ও আচ্ছা -- বেড়াতে? তুমি তাহলে অতিথি। অতিথি নারায়ণ। তাই না?

আবারও না বুঝে আমি মাথা নাড়লাম। সে বলল, তুমি এখানে চুপচাপ দাঁড়াও; নড়বে না। আমি আসছি।

মেয়েটি চলে গেল। ভেবে পেলাম না সে অনধিকার প্রবেশের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করতে গেল কি-না। দাঁড়িয়ে থাকাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে? পালিয়ে যাওয়াই উচিত। অথচ পালাতে পারছি না।

মেয়েটি ফিরে এসে বলল, চোখ বন্ধ করে হাত পাত।

আমি তাই করলাম। কি যেন দেয়া হল আমার হাতে। তাকিয়ে দেখি কদমফুলের মত দেখতে একটা মিষ্টি।

খাও, মিষ্টি খাও। মিষ্টি খেয়ে চলে যাও। আমি এখন পড়াশোনা করছি। পড়াশোনার সময় কেউ হাঁটাহাঁটি করলে বড় বিরক্তি লাগে। মন বসাতে পারি না। আমি চলে এলাম এবং দ্বিতীয় দিনে আবার উপস্থিত হলাম।

আবার মেয়েটি মিষ্টি এনে দিল। কোন সৌভাগ্যই একা একা ভোগ করা যায় না। আমি তৃতীয় দিনে আমার ছোট বোনকে সংগে নিয়ে উপস্থিত। মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, এ কে?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, এ আমার ছোটবোন। এ-ও মিষ্টি খুব পছন্দ করে।

মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। সে হাসতে হাসতে বলল, খুকী, তোমার নাম কি?

আমার বোন উদ্বিগ্ন চোখে আমার দিকে তাকাল। নাম বলাটা ঠিক হবে কি-না সে বুঝতে পারছে না; আমি ইশারায় তাকে অভয় দিতেই সে বলল, আমার নাম শেফু।

শেফু? অর্থাৎ শেফালী। কী সুন্দর নাম! তোমরা দুজন চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাক।

আমরা চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি। আজ অন্যদিনের চেয়ে বেশি সময় লাগছে। এক সময় চোখ মেললাম। মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ বিষণ্ন। সে দুঃখিত গলায় বলল, আজ ঘরে কোন মিষ্টি নেই। তোমাদের জন্যে একটা বই নিয়ে এসেছি। খুব ভাল বই। বইটা নিয়ে যাও। দাঁড়াও, আমার নাম লিখে দেই।

সে মুক্তার মত হরফে লিখল, দুজন দেবশিশুকে ভালবাসা ও আদরে — শুক্লাদি।

বই নিয়ে বাসায় ফিরলাম। বইটার নাম 'ক্ষীরের পুতুল'। লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাতায় পাতায় ছবি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শৈশবের 'পুতুল' হচ্ছে আমার প্রথম পড়া 'সাহিত্য'। সাহিত্যের প্রথম পাঠ আমি আমার মা'র কাছ থেকে পাইনি। বাবার বিশাল লাইব্রেরি ছিল। সেই লাইব্রেরির শেলফে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত। সমস্ত বই তিনি তালাবন্ধ করে রাখতেন। বাবার পাঠযোগ্য বই আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নাগালের বাইরে ছিল। বাবা হয়ত ভাবতেন, এইসব বই পড়ার সময় এখনো হয়নি।

শুক্লাদি তা ভাবেননি। তিনি অসাধারণ একটি বই একটি বাচ্চা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তার স্বপ্নজগতের দরজা খুলে দিলেন। স্বপ্নজগতের দরজা সবাই খুলতে পারেনা। দরজা খুলতে সোনার চাবি দরকার। ঈশ্বর যার-তার হাতে সেই চাবি দেন না। শুক্লাদি থাকে অল্পকিছু মানুষের কাছে। শুক্লাদি সেই অল্পকিছু মানুষদের একজন।

শুক্লাদির সংগে আমার ঐ বই পাওয়ার পর আর দেখা হয়নি। তিনি কোলকাতার কোন কলেজে পড়াশোনা করতেন। ছুটি শেষ হবার পর কোলকাতা চলে গেলেন। তার কিছুদিন পর প্রফেসর সাহেব বাড়ি বিক্রি করে ইণ্ডিয়া চলে গেলেন। যিনি বাড়ি কিনলেন তিনি প্রথমে গাছগুলি সব কাটিয়ে ফেললেন। বাড়িটিকে ঘিরে যে স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন।

কত না নিঝুম দুপুরে এই শ্রীহীন বাড়ির গেটের কাছে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদিয়েছি। গভীর দুঃখে আমার চোখ ভেঙে জল এসেছে।

বাসায় এসেই বসেছি ক্ষীরের পুতুল নিয়ে। এই বই নিয়ে বসলেই ভেঙে-যাওয়া স্বপ্ন ফিরে আসত। মুহূর্তে চলে যেতাম অন্য কোন পৃথিবীতে। কি অদ্ভুত পৃথিবীই না ছিল সেটি!

শুক্লাদির দেয়া ক্ষীরের পুতুল বইটি উনিশ শো একাত্তর পর্যন্ত আমার সংগে ছিল। একাত্তরে অনেক প্রিয় জিনিসের সঙ্গে বইটিও হারিয়েছি। কিন্তু সত্যি কি হারিয়েছি? হৃদয়ের নরম ঘরে যাদের স্থান দেয়া হয় তারা কি কখনো হারায়? কখনো হারায় না। শুক্লাদির কথা যখনই মনে হয় তখনি বলতে ইচ্ছা করে, 'জনম জনম তব তরে কাঁদিব।'

'ক্ষীরের পুতুল' বইটি আমার জীবনধারা অনেকখানি পাল্টে দিল। এখন আর দুপুরে ঘুরতে ভাল লাগে না। শুধু গল্পের বই পড়তে ইচ্ছে করে। কুয়োতলার লাগোয়া একটা ঘর, দুপুরের দিকে একেবারে নিরিবিলি হয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে জানালায় হেলান দিয়ে গল্পের বই নিয়ে বসি। জানালার ওপাশে কাঁঠাল গাছের গুচ্ছ। সেই কাঁঠাল গাছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাক ডাকে। এছাড়া চারদিকে কোন শব্দ নেই। অদ্ভুত নৈঃশব্দের জগৎ। এটা যেন চেনা-জানা পৃথিবী নয়, অন্য কোন ভুবন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বই-এ পাতার পর পাতা অতি দ্রুত উল্টে যাচ্ছি। এইসব বই বাবার আলমিরা থেকে চুরি করা। মা জেগে উঠার আগে রেখে দিতে হবে। ধরা পড়লে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। একদিন ধরা পড়লাম। বাবার হাতেই ধরা পড়লাম। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কী বই পড়ছিস? দেখি, দেখি বইটা!

তিনি বই হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বইয়ের নাম — "প্রেমের গল্প"। তিনি খনখনে গলায় বললেন, পড়েছিস এই বই?

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, হুঁ।

বুঝেছিস কিছু?

হুঁ।

কী বুঝেছিস?

কী বুঝেছি ব্যাখ্যা করতে পারলাম না। বাবা বই নিয়ে আলমিরায় তালাবন্ধ করে রাখলেন। আমি ভয়ে অস্থির। নিশ্চয়ই গুরুতর কোন শাস্তির ব্যবস্থা হবে। সন্ধ্যাবেলা তিনি বললেন, কাপড় পরে আমার সঙ্গে চল।

আমি কোন কথা না বলে কাপড় পরলাম। কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না। তিনি রিকশা করে আমাকে নিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে। বই-এর এক বিশাল সংগ্রহ। যে-দিকে চোখ যায়, শুধু বই, বই আর বই। আমাকে লাইব্রেরির মেম্বার করে দিলেন। শান্ত গলায় বললেন, এখানে অনেক ছোটদের বই আছে, আগে এইগুলি পড়ে শেষ কর। তারপর বড়দের বই পড়বি।

প্রথমদিনের দু'টি বই নিজে পছন্দ করে দিলেন। দু'টি বইয়ের একটির নাম মনে আছে — টম কাকার কুটির। কী অপূর্ব বই! এই বইটি পড়বার আনন্দময় স্মৃতি এখনো চোখে ভাসে। ঝুমঝুম করে বৃষ্টি পড়ছে। সিলেটের বৃষ্টি — ঢালাও বর্ষণ। আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে বই নিয়ে বসেছি। টম কাকার গল্প পড়তে পড়তে চোখে নেমেছে অশ্রুর বন্যা। সমস্ত হৃদয় জুড়ে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করছি। হঠাৎ করে মহৎ সাহিত্যকর্মের মুখোমুখি হলে যা হয়, তাই হচ্ছে — প্রবল আবেগে চেতনা আলোড়িত হচ্ছে।

আমার বই পড়ার অভ্যাস মা খুব সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। প্রায়ই বিরক্ত হয়ে বলেন, এই ছেলে দিনরাত আউট বই পড়ে। যখন সবাই খেলাধুলা করছে সে অন্ধকারে বই নিয়ে বসেছে। চোখ নষ্ট হবে তো।

চোখ আমার সত্যি সত্যি খারাপ হল। যদিও তা বুঝতে পারলাম না। বাইরের পৃথিবী আবছা দেখি। আমার ধারণা, অন্য সবাইও তাই দেখে। ক্লাস ফাইভে উঠে প্রথম চশমা নেই। চোখের ডাক্তার আমার চোখ পরীক্ষা করে আঁৎকে উঠে বললেন, এই ছেলে তো অন্ধের কাছাকাছি। এতদিন সে চালিয়েছে কিভাবে? প্রথম চশমা পরে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] হয়ে ভাবি -- চারদিকের জগৎ এত স্পষ্ট! কী আশ্চর্য! দূরের [illegible] আগে দেখা যায়?

[illegible] কথায় ফিরে আসি।

[illegible] মুসলিম সাহিত্য সংসদের সদস্য হওয়ায় সবচে' কষ্টে পড়ল আমার ছোট [illegible] - শেফু এবং ইকবাল। মীরাবাজার থেকে একা এতদূর হেঁটে যেতে ভাল [illegible]। আমি এদের সঙ্গে নিয়ে যাই। পথ আর ফুরাতে চায় না। পথে দু'তিন [illegible] হয়ে বিশ্রাম করতে বসি। আমার সব ক্লান্তি, সব কষ্ট দূর হয়ে যায় যখন [illegible] থাকে পাই। আনন্দে ঝলমল করতে থাকি। শেফু এবং ইকবাল আমার এই [illegible] গ্রহণ করতে পারে না। শুধুমাত্র আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে তাদের দিনের [illegible] নষ্ট করতে হয়।

[illegible]কে রোজ দু'টি করে বই দিতে গিয়ে একদিন লাইব্রেরিয়ানের ধৈর্যেরও বাঁধ [illegible] গেল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, এখন থেকে একটি করে বই নেবে। দুটো না। [illegible] এইসব আজেবাজে গল্পের বই পড়ে কোন লাভ নেই। এখন থেকে পড়বে [illegible] কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এইসব শিখতে হবে। নাও, আজকে এই [illegible] নিয়ে যাও।

[illegible] খুব মন খারাপ করে বইটা হাতে নিলাম। বইয়ের নাম 'জানবার কথা'। [illegible] দু'তিন পাতা পড়লাম। এতটুকুও আকর্ষণ করল না। পরদিন ফেরত দিতে [illegible]। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক বললেন, পড়েছ?

[illegible] বললাম, হুঁ।

[illegible] হাত থেকে বই নিয়ে কয়েকটা পাতা উল্টে বললেন, আচ্ছা বল, গ্লোবের [illegible]?

[illegible] বলতে পারলাম না। তিনি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, বাঁদর ছেলে -- যাও, [illegible] এই ভাল মত পড়ে তারপর আস।

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে আমি আর কখনো যাইনি। 'জানবার কথা' [illegible]ও ফেরত দেয়া হয়নি। বাসায় ফিরে 'জানবার কথা' খুটি খুটি করলাম, কিছুক্ষণ [illegible]লাম। আমি প্রচণ্ড অভিমানী হয়ে জন্মেছি। অভিমান নামক ব্যাপারটি কম নিয়ে [illegible]নো ভাল। এই জিনিসটি আমাদের বড়ই কষ্ট দেয়।

বই পড়ার আগ্রহে সাময়িক ভাটা দেখা দিল। আগের জগতে ফিরে গেলাম -- ঘুরে [illegible]ানো। ইতিমধ্যে চুরিবিদ্যা খানিকটা রপ্ত হয়েছে। লক্ষ্য করেছি, মা ভাঙতি পয়সা [illegible]খন তোষকের নিচে। সিকি, আধুলি, আনি-দুআনি — ঠিক কত আছে, সেই হিসেব [illegible]ও নেই। ভাঙতি পয়সার মধ্যে সবচে' ছোট হচ্ছে — সিকি। একবার একটা সিকি [illegible]য়ে সমস্ত দিন আতংকে নীল হয়ে রইলাম । সারাক্ষণ মনে হল, এই বোধহয় মা [illegible]বেন, সিকি কে নিয়েছে? মা তেমন কিছু করলেন না। পরদিন সেই সিকি নিয়ে এবং

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পাশে চাচা গোলাকে নিয়ে চায়ের স্টলে চা খেতে গেলাম। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বড়রা যেমন দোকানে চা খায়, আমরাও তেমনি খাব। দোকানদার নিশ্চয়ই দুই খুদে কাস্টমার পেয়ে বিস্মিত হয়েছিল। সে যত্ন করে আমাদের দুজনকে গ্লাসে করে দু'কাপ চা দিল। একটা পরোটা ছিড়ে দু'ভাগ করে দু'জনের হাতে দিল এবং কোন পয়সা নিল না। হাতের সিকি হাতেই রয়ে গেল। অতঃপর দু'জনে একটা রিকশায় উঠে পড়লাম। কোন গন্তব্য নেই — যতদূর রিকশা যায়। তখন রিকশা ভাড়া ছিল বাঁধা। শহরের এক মাথা থেকে আরেক মাথা যাওয়া যেত এক সিকিতে। রিকশাওয়ালা আমাদের জল্লারপাড়ের কাছে নামিয়ে দিল। সেখান থেকে মহানন্দে হেঁটে বাসায় ফিরলাম। মনে হল, চুরিবিদ্যা খুব খারাপ কিছু নয়।

মা'র তোষকের নিচ থেকে প্রায়ই পয়সা উধাও হতে লাগল। একদিন কাজের ছেলে রফিক পয়সা চুরির জন্যে প্রচণ্ড বকা খেল। তোষকের নিচে পয়সা রাখাও বন্ধ হয়ে গেল। বড় কষ্টে পড়লাম। এখন একমাত্র ভরসা দেশের বাড়ি থেকে বেড়াতে-আসা মেহমানরা।

আমাদের বাসায় মেহমান লেগেই থাকত। দাদার বাড়ির দিকের মেহমান, মা'র বাড়ির দিকের মেহমান, কেউ আসত শহর দেখতে, কেউ শাহজালাল সাহেবের মাজার দেখতে, কেউ বা চিকিৎসা করাতে। মেহমানরা দয়াপরবশ হয়ে এক আনা বা দু'পয়সা বাড়িয়ে দিতেন — পৃথিবীটাকে বড়ই সুন্দর মনে হত। ছুটে যেতাম দোকানে। কত অপূর্ব সব খাবার — হজমি! দু'পয়সায় অনেকখানি পাওয়া যেত, টকটক ঝালালো স্বাদ। খানিকটা মুখে দিলেই জিভ কালো কুচকুচে হয়ে যেত! এক আনায় পাওয়া যেত দু'গোল্লা সরষে তেল মাখানো, বিচি ছাড়ানো তেঁতুল। বাদাম ভাজা আছে, বুট ভাজা আছে। যদু মিয়ার দোকানে পাওয়া যেত দুধ চকলেট। এক আনায় চারটা, তবে আমার জন্যে একটা ফাউ। পাঁচটা।

মিষ্টি পানের একটা দোকান ছিল, তার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই দোকানি ছোট্ট একটা পান বানিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলত, ভাগ্! কী সুস্বাদু ছিল সেই মিষ্টি পান!

গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম দেশের বাড়ির মেহমানদের জন্য। মেহমান আসা মানেই আনন্দ। শহর দেখানোর জন্যে আমি চমৎকার গাইড। একদিন না একদিন তাঁরা রঙমহল সিনেমা হলে ছবি দেখতে যাবেন। আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে। আমাকে নেয়ার ব্যাপারে তাঁরা তেমন আপত্তিও করবেন না। কারণ আমার জন্যে আলাদা করে টিকিট করতে হবে না। আমি ছবি দেখবো কোলে বসে, কিংবা দাঁড়িয়ে। বাড়িতে মেহমান থাকার আরেকটি বড় সুবিধা হচ্ছে, সেই সময় মা'র শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যেত। বড় ধরনের অপরাধেও মা কঠিন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার শাস্তি ছাড়া অন্য শাস্তি দিতেন না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমাদের মধ্যে একজনের কথা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি বাবার দিকের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। ভাঁটি অঞ্চলের মানুষ। খুনের দায়ে হাজতে ছিলেন। জামিনে ছাড়া পেয়ে কয়েকদিন থাকতে এলেন আমাদের এখানে। অসম্ভব রুগ্ন একজন মানুষ। যক্ষ্মা নামের কালব্যাধিতে ধরেছে। সারাক্ষণ কাশছেন। কাশির সঙ্গে টাটকা রক্ত পড়ছে।

তিনি বাসায় এসেই মাকে ডেকে বললেন, রাজরোগে ধরেছে গো মা। এই ব্যাধি ভালো। তোমার ছেলেপুলের সংসার। ভেবেচিন্তে বল, আমাকে রাখবে? তিন-চার দিন থাকতে হবে। হোটেলে থাকতে পারি কিন্তু হোটেলে থাকতে ইচ্ছা করছে না। তুমি ভেবেচিন্তে বল।

মা বললেন, আপনি অবশ্যই আমার এখানে থাকবেন।

খুব ভাল কথা। তাই থাকব। বেশিদিন বাঁচব না। যে কয়টা দিন আছি পরিচিত মানুষদের মধ্যে থাকতে চাই। তবে মা, আমি যে থাকব আমার কিছু শর্ত আছে।

কী শর্ত?

নিজের মত বাজার-সদাই করব। এর জন্যে মনে কষ্ট নিও না। আমার অনেক রোগের অভাব আছে, টাকা-পয়সার অভাব নাই। কি মা — রাজি?

মাকে রাজি হতে হল। আমরা পরম বিস্ময়ে দেখলাম — মাত্র চারদিন যে থাকবে তার জন্যে বস্তাভর্তি পোলাওয়ের চাল আসছে, টিনভর্তি ঘি, চিনি। সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা চিতল মাছ চলে এল, ঝাঁকাভর্তি মুরগি।

তিনি নিজে এতসব খাবার-দাবারের কিছুই খেলেন না। মাকে বললেন, আমাকে এক চামুচ আলো চালের ভাত আর এক চামুচ ঘি দিও। এর বেশি আমি কিছু খেতে পারি না। আল্লাহ আমার রিজিক তুলে নিয়েছেন।

শৈশবে যে অল্প কিছু মানুষ আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল উনি ছিলেন তাঁর একজন। ভাঁটি অঞ্চলের জমিদার বংশের মানুষ। এঁদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় মানুষ একযোগে এদের বসতবাড়ি আক্রমণ করে। এঁরা তখন আত্মরক্ষার জন্যে কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে বন্দুক নিয়ে দোতলা থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। পঞ্চাশের মত মানুষ আহত হয়, মারা যায় ছ'জন। জমিদার বাড়ির সকল পুরুষদের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ আসামী হিসেবে সবাইকে বেঁধে নিয়ে আসে। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত যে মানুষটির কথা বলছি তিনিও আসামিদেরই একজন। পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিতে বলেছেন — বাড়ি যখন আক্রান্ত হয় তখন আমিই বন্দুক নিয়ে বের হই। আমি একাই গুলি করি — হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার। শাস্তি হলে আমার শাস্তি হবে। অন্য কারোর নয়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ফজার ব্যাপার হল, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনই যোগ ছিল না। এই ধরনের স্বীকারোক্তি তিনি করেছেন অন্যদের বাঁচাবার জন্যে। তাঁর যুক্তি হল — আমার যক্ষ্মা হয়েছে, আমি তো দু'দিন পর এমনিতেই মারা যাচ্ছি। ফাঁসিতেই না হয় মরলাম। অন্যরা রক্ষা পাক। তাছাড়া বাকি সবারই বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। আমি চিরকুমার মানুষ, আমি বেঁচে থাকলেই কি, মরলেই কি!

যক্ষ্মা রুগীর চোখ এমনিতেই উজ্জ্বল হয়। উনার চোখ আমার কাছে মনে হল ঝিকমিক করে জ্বলে। সারাক্ষণ ধবধবে সাদা বিছানায়, সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে মূর্তির মত বসে থাকেন। আমি বড়ই বিস্ময় অনুভব করি। একদিন হাত ইশারা করে আমাকে ডাকলেন, আমি এগিয়ে যেতেই তীব্র গলায় বললেন, তুই সব সময় আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করিস কেন? খবরদার, আর আসবি না! ছোট পুলাপান আমি পছন্দ করি না।

আহত ও অপমানিত হয়ে তাঁর ঘর থেকে আমি বের হয়ে আসি, কিন্তু তাঁর প্রতি যে গভীর ভালবাসা আমি লালন করি তার হেরফের হয়নি। মামলা চলাকালীন সময়ে জেল-হাজতে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার মনে আছে, তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে আমি বালিশে মুখ গুঁজে দীর্ঘ সময় কাঁদি।



সাহিত্য বাসর

বাবার অসংখ্য বাতিকের একটি হল — সাহিত্য-বাতিক। মাসে অন্তত দু'বার বাসায় 'সাহিত্য বাসর' নামে কি যেন হত। কি যেন হত বলছি এই কারণে যে, আমরা ছোটরা জানতাম না কি হত। আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সাহিত্য চলাকালীন সময়ে আমরা হৈচৈ করতে পারতাম না, উঁচু গলায় কথা বলতে পারতাম না, শব্দ করে হাসতেও পারতাম না। এর থেকে ধারণা হত, বসার ঘরে তাঁরা যা করছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে একদিন খানিকটা শুনলাম। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হল। একজন খুব গম্ভীর মুখে একটা কবিতা পড়ল। অন্যরা তার চেয়েও গম্ভীর মুখে শুনল, তারপর কেউ বলল, ভাল হয়েছে, কেউ বলল মন্দ, এই নিয়ে তর্ক বেঁধে গেল। নিতান্তই ছেলেমানুষি ব্যাপার। একদিন একজনকে দেখলাম, রাগ করে তাঁর লেখা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অন্য দু'জন ছুটে গেল তাকে ধরে আনতে। ধরে আনা হল। বয়স্ক একজন মানুষ অথচ হাউমাউ করে কাঁদছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড! কাণ্ড এখানেই শেষ না। ছিঁড়েকুচি কুচি করা কাগজ এরপর

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] লাগানো হতে লাগল। সেই লেখা পড়া হল, সবাই বলল, অসাধারণ। [illegible] বাবার প্রাণপ্রিয় সাহিত্য বাসর।

[illegible] জীবন তিনি সাহিত্য সাহিত্য করে গেলেন। কতবার যে তিনি ঘোষণা [illegible], এবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যে মনোনিবেশ করবেন। চাকরি [illegible] সাহিত্য দুটো একসঙ্গে হয় না।

[illegible]কে বোঝাই ছিল তার অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ। ঘরে [illegible] টানানো। বাবার সাহিত্য-প্রেমের স্বীকৃতি হিসেবে আমাদের বসার ঘরে বড় একটা [illegible] সার্টিফিকেট ঝুলানো, যাতে লেখা — 'ফয়জুর রহমান আহমেদকে [illegible] সাহিত্যসুধাকর উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।'

এই উপাধি তাঁকে কারা দিয়েছে, কেন দিয়েছে কিছুই এখন মনে করতে পারছি [illegible]। শুধু মনে আছে বাঁধানো সার্টিফিকেটটির প্রতি বাবার মমতার অন্ত ছিল না। বাবার [illegible] মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিফলকে আমি এই উপাধি এবং শোকগাথা রবীন্দ্রনাথের দু'লাইন [illegible] ব্যবহার করি।

দূর-দূরান্ত থেকে কবি-সাহিত্যিকদের হঠাৎ আমাদের বাসায় উপস্থিত হওয়া ছিল [illegible] ধরনের ঘটনা। বাবা এদের কাউকে নিমন্ত্রণ করে আনাতেন না। তাঁর সামর্থ্য [illegible] না, তিনি যা করতেন তা হচ্ছে মনিঅর্ডার করে তাঁদের নামে পাঁচ টাকা বা দশ [illegible] পাঠিয়ে কৃপনে লিখতেন --

জনাব,

আপনার . . . কবিতাটি . . . পত্রিকার . . . সংখ্যায় পড়িয়া মনে বড় তৃপ্তি পাইয়াছি। উপহার হিসেবে আপনাকে সামান্য কিছু অর্থ পাঠাইলাম। উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

ইতি প্রতিভামুগ্ধ —

ফয়জুর রহমান আহমেদ

(সাহিত্যসুধাকর)

ঐ কবি নিশ্চয়ই তাঁর কাব্যের জন্যে নানান প্রশংসাবাক্য শুনেছেন, কিন্তু মনিঅর্ডারে টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা না ঘটারই কথা। প্রায় সময়ই দেখা যেত, আবেগে অভিভূত হয়ে যশোহর বা ফরিদপুরের কোন কবি বাসায় উপস্থিত হয়েছেন।

এম্নিভাবে উপস্থিত হলেন কবি রওশন ইজদানী। পরবর্তীকালে তিনি খাতেমুন নবীউন গ্রন্থ লিখে আদমজী পুরস্কার পান। তবে যখনকার কথা বলছি, তখন তাঁর কবিখ্যাতি তেমন ছিল না।

আমার পরিষ্কার মনে আছে, লুঙ্গি পরা ছাতা হাতে এক লোক রিকশা থেকে নেমে ভাড়া নিয়ে রিকশাওয়ালার সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। জানলাম, ইনি বিখ্যাত

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কবি রওশন ইজদানী। আমাদের বলে দেয়া হল যেন হৈচৈ না করি, চিৎকার না করি। ঘরে একজন কবি বাস করছেন! কবিতা লেখার মুডে থাকলে সেই মুডের ক্ষতি হবে।

দেখা গেল, কবি সারা গায়ে সরিষার তেল মেখে রোদে গা মেলে পড়ে রইলেন। আমাকে ডেকে বললেন — এ্যাই. মাথা থেকে পাকা চুল তুলে দে।

কবি-সাহিত্যিকরা আলাদা জগতে বাস করেন, মানুষ হিসেবে তাঁরা অন্যরকম বলে যে প্রচলিত ধারণা আছে কবি রওশন ইজদানীকে দেখে আমার মনে হল ঐ ধারণা ঠিক না। তাঁরা আর দশটা মানুষের মতই, আলাদা কিছু না।

আমার আদর-যত্নে, খুব সম্ভব পাকা চুল তোলার দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে একদিন ডেকে বললেন, খাতা-কলম নিয়ে আয়, তোকে কবিতা লেখা শিখিয়ে দেই।

আমি কঠিন গলায় বললাম, আমি কবিতা লেখা শিখতে চাই না।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তাহলে কি শিখতে চাস?

কিছুই শিখতে চাই না।

আসলেই তাই। শৈশবে ক'রোর কাছ থেকে আমি কিছুই শিখতে চাইনি। এখনো চাই না। অথচ আশ্চর্য, আমার চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁরা ক্রমাগত আমাকে শেখাতে চান। অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ভাষা এবং বাংলা বানানের শিক্ষকরা আমার চারপাশে আছেন। পণ্ডিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে আঠারো উনিশ বছরের তরুণী সবাই আমার শিক্ষক। সবাই আমাকে শেখাতে চান। হয়ত ভালবাসা থেকেই চান, কিন্তু আমার কিছুই শিখতে ইচ্ছা করে না। জানতে ইচ্ছে করে না। 'জানবার কথা' নামের একটি বই শৈশবেই ছিড়ে কুচিকুচি করে ফেলেছিলাম এই কারণেই।



পদ্মপাতায় জল

আমাদের পাশের বাসায় থাকত নাদু দিলুরা।

তারাও আমাদেরই মতই অল্প আয়ের বাবা-মা'র পুত্র কন্যা। সবাই একসঙ্গে ধুলোমাটিতে গড়াগড়ি করে বড় হচ্ছি। ও-মা একদিন শুনি, ওরা বড়লোক হয়ে গেছে! দেখতে দেখতে ওদের কাপড়-চোপড় পাল্টে গেল। কথাবার্তার ধরন-ধারণও বদলে গেল। এখন আর ওরা দাঁড়িয়াবান্দা কিংবা চি-বুড়ি খেলার জন্যে আমাদের কাছে আসে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

উপলক্ষে ওরা নতুন কাপড় তো পেলই, সেই সঙ্গে পেল ট্রাই সাইকেল। ট্রাই সাইকেল শিশুমহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। আমিও এর আগে এই জিনিস দেখিনি। একটা ছোট্ট একটা রিকশা। এর মধ্যে আবার বেলও আছে। টুং টুং করে বাজে। এই বিস্ময়কর বাহনটিতে একবার শুধু চড়তে পারার দুর্লভ সৌভাগ্যের জন্যে আমি তখন আমার সমস্ত পৃথিবী দিয়ে দিতে পারি। চেষ্টা করে বিফল হলাম। সবসময় নাদুর সঙ্গে একজন কাজের মেয়ে থাকে। আমি কাছে গেলেই সে খ্যাঁক করে ওঠে। হাত দিয়ে একটু দেখার অনুমতি চাইলাম, সেই অনুমতিও পাওয়া গেল না। আমরা শেষমেশ সমস্ত কাজকর্ম ভুলে ট্রাই সাইকেল ঘিরে গোল হয়ে বসে রইলাম। অনেক চিন্তা করে দেখলাম, ট্রাই সাইকেল কিনার কথা বাবাকে কি বলা যায়? মনে হল, সেটা ঠিক হবে না। বাবার তখন চরম আর্থিক সমস্যা যাচ্ছে। তাঁর সবচে' আদরের ছোটবোন অসুস্থ। সেই বোনের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁর বহন করতে হচ্ছে। ঈদে আমরা ভাইবোনেরা কোন কাপড়-চোপড় পাইনি। শেষ মুহূর্তে বাবা আমাদের তিন ভাইবোনকে একটা প্লাস্টিকের চশমা কিনে দিলেন। যা চোখে দিলে আশেপাশের জগৎ নীল বর্ণ ধারণ করে। কাপড় না পাওয়ার দুঃখ রঙিন চশমায় ভুললাম। তারচে'ও বড় কথা, দিলু সেই চশমার বিনিময়ে আমাকে তার ট্রাই সাইকেল খানিকটা স্পর্শ করার দুর্লভ সুযোগ দিল। সে বড়ই আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

যতই দিন যেতে লাগল এদের রমরমা সমসমা বাড়তেই লাগল। শুনলাম, তাদের জন্যে বিশাল দুতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। বাড়ি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কোন রকম কষ্টেসৃষ্টে এখানেই থাকবে। এর মধ্যে এই দুই ভাইবোনের জন্মদিন হল। জন্মদিন বলে যে একটা ব্যাপার আছে আমার তা জানা ছিল না। এই দিনে উৎসব হয়। খানাদানা হয়। উপহার নিয়ে লোকজন আসে কে জানত। আমরা অভিভূত।

শেফু একদিন বাবাকে গিয়ে বলল, আমার জন্মদিন করতে হবে।

বাবা খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ঠিক আছে মা, করা হবে। কিন্তু শুধুই একবার। এই উৎসব আমি দ্বিতীয়বার করবো না। তোমরা বড় হবার চেষ্টা কর। অনেক বড়, যাতে সারা দেশের মানুষ তোমাদের জন্মদিনের উৎসব করে। বাবা-মার করতে না হয়।

শেফু বলল, সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে বড় হবার।

আমি দেখলাম সুযোগ ফসকে যাচ্ছে। শুধু শেফুর জন্মদিন হবে আমার হবে না, এ কেমন কথা। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, বাবা, আমিও খুব বড় হবার চেষ্টা করব। আমারো জন্মদিন করতে হবে। বাবা বললেন, আচ্ছা তোমারও হবে।

শুধু ইকবাল ঘোষণা করল সে বড় হতে চায় না। ছোটই থাকতে চায়। তার জন্মদিন লাগবে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। নভেম্বরের ৯ তারিখ শেফুর জন্মদিন। দেখতে দেখতে ৯ তারিখ এসে পড়ল। আমরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ করলাম, এই উপলক্ষে কাউকে বলা হল না। বাবা বললেন, আমরা নিজেরা নিজেরা উৎসব করব। কাউকে বলব না।

পায়েস ছাড়া অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য তৈরি হল না। আমাদের মন ভেঙে গেল। সন্ধ্যার পর জন্মদিনের উৎসব শুরু হল। বাবা 'বীর পুরুষ' কবিতা আবৃত্তি করলেন। প্রাণেশ কাকু তিনটা গান গাইলেন। পায়েস খাওয়া হল। তারপর বাবা ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়ে শেফুর হাতে একটা উপহারের প্যাকেট তুলে দিলেন। সেই উপহার দেখে আমাদের সবার বিস্ময়ে বাকরোধ হয়ে গেল। আমার দরিদ্র বাবা খুবই দামী উপহার কিনেছেন। চীনেমাটির চমৎকার খেলনা 'টি সেট'। যা দেখলে একালের শিশুদেরও চোখ কপালে উঠে যাবার কথা।

শেফু কাঁদতে কাঁদতে বলল, এত সুন্দর জিনিস সে তার জীবনে দেখেনি। আনন্দে সারারাত সে ঘুমাতে পারল না। বারবার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দেখে আসে টি সেট ঠিকঠাক আছে কি-না। সেই রাতে আমি নিজেও উদ্বেগে ঘুমুতে পারলাম না। আর মাত্র তিন দিন পর আমার জন্মদিন। না জানি কি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। গোপন সূত্রে খবর পেলাম, আমার জন্যে দশগুণ ভাল উপহার অপেক্ষা করছে। খবর দিলেন মা। মা'র খবর খুবই নির্ভরযোগ্য।

জন্মদিন এসে গেল। গান, কবিতা আবৃত্তির পালা শেষ হবার পর আমার হাতে উপহারের প্যাকেট তুলে দেয়া হল। প্যাকেট খুলে দেখি একটা বাঁধানো ফ্রেমে দীর্ঘ একটি কবিতা। বাবা ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছেন। কবিতার প্রথম দু'টি চরণ --

সাতটি বছর গেল পরপর আজিকে পরেছো আটে,
তব জন্মদিন নয়ত মলিন ভয়াল বিশ্ব হাটে . . .

বাবা খুবই আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, উপহার পছন্দ হয়েছে? অনেক কষ্টে কান্না চাপা দিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে পছন্দ হয় নাই।

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা খানিকক্ষণ শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, এই উপহার এখন তোর কাছে সামান্য মনে হচ্ছে। এমন একদিন আসবে যখন আর সামান্য মনে হবে না।

বাবা কবি ছিলেন না। হৃদয়ের তীব্র আবেগ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তিনি কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর অতি আদরের ছোটবোনের মৃত্যুর খবর পাবার পর তিনি কাঁদতে কাঁদতে কবিতা লিখতে বসেছেন। চোখের জলে লেখা সেই দীর্ঘ কবিতা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] কবিতা হয়নি। কিন্তু যে আবেগের তাড়নায় কলম হাতে নিয়েছিলেন সেই [illegible] কোন খাদ ছিল না। বাবার কাছ থেকে প্রথম শিখলাম, মনের তীব্র ব্যথা [illegible] একটি উপায় হচ্ছে কিছু লেখা। যে লেখা ব্যক্তিগত দুঃখকে ছড়িয়ে দেয় [illegible]।

[illegible] হচ্ছেন আমার দেখা প্রথম কবি।

আমার দেখা দ্বিতীয় কবি হচ্ছেন আমাদের বড় মামা ফজলুল করিম। তিনিও [illegible] বাসায় থাকতেন এবং এম. সি. কলেজে আই. এ. পড়তেন। আমার মেজো [illegible] যেমন প্রতি বছর পরীক্ষা দিয়ে ফেল করতেন, বড় মামা ফেল করতেন পরীক্ষা না [illegible] পরীক্ষা না দেবার চমৎকার সব যুক্তি বের করতেন। এইসব যুক্তিতে অতি [illegible]ই মাকে কাবু করে ফেলতেন।

পরীক্ষার আগের দিন মুখ গম্ভীর করে বলতেন, বুবু, এই বছরও পরীক্ষা দিব না [illegible] সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কেন? এই বছর আবার কি হল?

গত বৎসর পাসের হার বেশি ছিল, কাজেই এই বৎসর কম হবে। পরীক্ষা দিলে [illegible]ল করতে হবে। আগামী বৎসর চেষ্টা চালাব ইনশাল্লাহ্।

এই বৎসর পরীক্ষাটা দে, পাস-ফেল পরের ব্যাপার।

আরে না। পরীক্ষা দিয়ে এনার্জি লস করার কোন মানে হয় না।

বলাই বাহুল্য, পরের বৎসর তিনি পরীক্ষা দেন না। কারণ রুটিন খুব খারাপ [illegible]য়েছে। গ্যাপ কম। তবুও দিতেন কিন্তু এনার্জি লসের ভয়ে দিচ্ছেন না। বড় মামা সব [illegible]র্জি জমা করে রাখলেন এবং শুভক্ষণে পুরো এনার্জি নিয়ে জনৈকা তরুণীর প্রেমে [illegible]ড় গেলেন। প্রেমের আবেগে কবিতার পর কবিতা বের হতে লাগল। আমার উপর [illegible]য়িত্ব পড়ল এইসব কবিতা যথাস্থানে পৌঁছে দেবার। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই [illegible]য়িত্ব পালন করে যেতে লাগলাম।

তরুণীর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় প্রেমে ভাটার টান ধরল। গোটা পঞ্চাশেক বিরহের [illegible]তা লিখে বড় মামা হৃদয়-যাতনা কমালেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বড় মামার [illegible]ইসব কবিতা কিন্তু বেশ ভাল ছিল বলে আমার ধারণা। তিনি এইসব কবিতা প্রকাশ [illegible]রার ব্যাপারে কোন রকম আগ্রহ দেখাননি কিংবা পরবর্তী সময়ে কবিতা লেখার [illegible]ও করেননি। তাঁর ভাবটা এরকম, এইসব কবিতা তিনি শুধু দুজনের জন্যেই [illegible]খেছেন — তৃতীয় কারোর জন্যে নয়।

আমি নিজে নানানভাবে বড় মামার কাছে ঋণী। গল্প বলে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে [illegible]লার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর এই ক্ষমতা আমাকে বারবার বিস্মিত করত। [illegible]ই গল্প যখন বড় মামার কাছে শুনতাম, তখন অন্য রকম হয়ে যেত। এর কারণ [illegible]তে পারতাম না, তবে কারণ নিয়ে ভাবতাম এটা মনে আছে। জীবনের প্রথম ছবি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আঁকা তাঁর কাছ থেকেই শিখি। তিনি হাতি আঁকার চমৎকার একটা সহজ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। এই কৌশলে আমি তিন হাজারের মত হাতি এক মাসের মধ্যে এঁকে ফেলি। বাড়ির সাদা দেয়াল পেন্সিলে আঁকা হাতিতে হাতিময় হয়ে যায়।

তাঁর একটা সাইকেল ছিল। সারাদিন সাইকেলে করে ঘুরতেন। মাঝে মাঝে আমাকে পেছনে বসিয়ে বেড়াতে বের হতেন। সাইকেল চলত ঝড়ের গতিতে। এই সাইকেল বড় মামার প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে একদিন মোটর সাইকেল হয়ে গেল। যখনই সাইকেল চলে ভটভট শব্দ হয়। লোকজন অবাক হয়ে তাকায়। দেখতে সাইকেল অথচ শব্দ হচ্ছে মোটর সাইকেলের, ব্যাপারটা কি? ব্যাপার কিছুই না, দু' টুকরা শক্ত পিসবোর্ড সাইকেলের সঙ্গে এমনভাবে লাগানো যে চাকা ঘুরামাত্র স্পোকের সঙ্গে পিসবোর্ডের ধাক্কা লেগে ফটফট শব্দ হয়। শিশুরা প্রতিভার সবচেয়ে বড় সমজদার। আমরা বড় মামার প্রতিভার দীপ্তি দেখে বিস্মিত। আমাদের বিস্ময় আকাশ স্পর্শ করল যখন তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করলেন। হাঙ্গার স্ট্রাইকের কারণ মনে নেই, শুধু মনে আছে দরজার গায়ে বড় বড় করে লেখা — "আমরণ অনশন। নিরবতা কাম্য।" তিনি একটা খাটে শবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। বাবা পুরো ব্যাপারটায় মজা পেয়ে খুব হাসাহাসি করছেন। বড় মামা তাতে মোটেও বিচলিত হচ্ছেন না। তাঁর হাঙ্গার স্ট্রাইক ভাঙানোর কোন উদ্‌যোগ নেয়া হল না। একদিন কাটল, দু'দিন কাটল, তৃতীয় দিনও পার হল। তখন সবার টনক নড়ল। মা কান্নাকাটি শুরু করলেন। বাড়িতে টেলিগ্রাম গেল। চতুর্থদিন সন্ধ্যায় বড় মামা এক গ্লাস সরবত খেয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন এবং গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন — এ দেশে থাকবেন না। কোন ভদ্রলোকের পক্ষে এ দেশে থাকা সম্ভব নয়। তিনি বিলেত যাবেন।

তখন বিলেত যাওয়া খুব সহজ ছিল। দলে দলে সিলেটিরা বিলেত যাচ্ছে। মামারও পাসপোর্ট হয়ে গেল। তিনটা নতুন স্যুট বানানো হল। মামা স্যুট পরে ঘুরাফেরা করেন। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। কাঁটা চামচ দিয়ে ভাত-মাছ খান। দেখতে বড় ভাল লাগে।

শেষ পর্যন্ত বিলেত যাওয়া হল না। মামা বললেন — আরে দূর দূর, দেশের উপর জিনিস নাই। বিদেশ গিয়ে আমি ঘাস কাটবো না-কি? আমি ভালই আছি। বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি তাহলে যাচ্ছ না?

জ্বি না।

কি করবে কিছু ঠিক করেছ?

আই এ. পরীক্ষা দেব; এইবার উড়া উড়া শুনেছি মেক্সিমাম পাস করবে। পরীক্ষা অবশ্য দিলেন না, কারণ পরীক্ষার আগে আগে খবর পেলেন, এইবার কোশ্চেন খুব টাফ হবে। গতবার ইজি হয়েছিল, এইবার টাফ। টাফ কোশ্চেনে পরীক্ষা দেয়ার কোনো মানে হয় না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] একটা ক্যারাম বোর্ড কিনে ফেললেন। মামা এবং চাচা দু'জনে মিলে গভীর [illegible] টুকুস টুকুস করে ক্যারাম খেলেন। বড় সুখের জীবন তাঁদের।

[illegible] জীবনও সুখের, কারণ বাসার প্রধান শাসক বাবা অনুপস্থিত। তিনি [illegible] পেয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়েছেন। তাঁকে বদলি করা হয়েছে দিনাজপুরের [illegible]। সেই সময় বর্ডার রক্ষার দায়িত্ব ছিল পুলিশের উপর। বাবা চলে গেলেন [illegible]। মামার পূর্ণ স্বাধীনতা। কারোরই কিছু বলার নেই।

[illegible] সময় দেশে বড় ধরনের খাদ্যাভাব দেখা দিল। ভয়াবহ অবস্থা। হাজার হাজার [illegible] খাবারের সন্ধানে শহরে জড়ো হয়েছে। থালা হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে।

[illegible]লেট শহরে অনেকগুলি লঙ্গরখানা খোলা হল। লঙ্গরখানায় বিরাট ডেকচিতে [illegible] রান্না করা হয়। ক্ষুধার্ত মানুষদের একবেলা খিচুড়ি খাওয়ানো হয়।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত ওদের খাওয়া দেখি। কলার পাতা কেটে লাইন ধরে সবাই [illegible]। প্রত্যেকের পাতায় দু'হাতা করে খিচুড়ি দেয়া হয়। কত আনন্দ, কত আগ্রহ [illegible]ই না তারা সেই খিচুড়ি খায়। ওদের আনন্দে ভাগ বসানোর জন্যই হয়ত বা এক [illegible]পুরে কলার পাতা নিয়ে ওদের সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। সেই খিচুড়ি অমৃতের মত [illegible]। এরপর থেকে রোজই দুপুর বেলায় লঙ্গরখানায় খেতে যাই। একদিন বোনকেও [illegible] গেলাম। সে মহানন্দে কলার পাতা নিয়ে আমার সঙ্গে বসে গেল। খাওয়ার [illegible]মাঝি পর্যায়ে এক ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে আমাদের দু' ভাইবোনের সামনে এসে [illegible]ড়ালেন। কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বললেন, এরা কারা?

ধরা পড়ে গেলাম। কানে ধরে আমাদের দু'জনকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হল। আমার [illegible] ক্রমাগত কাঁদতে লাগলন। লঙ্গরখানায় খাওয়ার অপমানে তাঁর না-কি মাথা কাটা [illegible]ছে। লঙ্গরখানায় আমি পাতা পেতে খেয়েছি এতে লজ্জিত বা অপমানিত বোধ করার [illegible] আছে তা আমি ঐ দিন বুঝতে পারিনি। আজো পারি না।

নিঃসন্তান গনি চাচার জীবনে এই সময় একটি বড় ঘটনা ঘটল। এক ভিখিরি মা [illegible]ছেলে কোলে নিয়ে এসেছে ভিক্ষা করতে। ফুটফুটে ছেলে। গনি চাচার ছেলেটাকে বড়ই [illegible]পছন্দ হল। তিনি প্রস্তাব দিলেন ছেলেটাকে তিনি আদর-যত্নে বড় করবেন, তার [illegible]বিনিময়ে ভিখিরি মা দশ টাকা পাবে। কিন্তু কোনদিন এই ছেলেকে তার ছেলে বলে দাবি [illegible]করতে পারবে না। মা রাজী হয়ে গেল।

এই ঘটনা আমার মনে বড় ধরনের ছাপ ফেলেল।

এখনো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখি, ভিখিরি মা মুখ কালো করে ঘরের বারান্দাতে বসে আছে। গনি চাচার স্ত্রী তার ছেলে কোলে বারান্দায় এসে ধমকাচ্ছেন — কি চাও তুমি? তোমাকে না বলেছি, কখনো আসবে না। কেন এসেছ?

ব্যথিত মা করুণ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে উঠে চলে যাচ্ছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভিখিরিণীর হাত থেক বাঁচার জন্যে গনি চাচা কয়েকবার বাড়ি বদল করলেন। কোন লাভ হল না। যেখানই যান সেখানেই মা উপস্থিত হয়। সারাদিন বারান্দায় বসে থাকে।

শেষটায় গনিচাচা চেষ্টা-চরিত্র করে সিলেট থেকে বদলি হয়ে গেলেন মৌলভীবাজার। হতদরিদ্র মার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন একটি শিশু। আমার তখন বয়স অল্প, খুবই অল্প। পৃথিবীর জটিলতা বোঝার বয়স নয়, তবুও মনে হল — এটা অন্যায়। খুব বড় ধরনের অন্যায়। ঐ ভিখিরিণী মা'র সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেখা হত। আমি তার পেছনে পছনে হাঁটতাম। বিড়বিড় করে সে নিজের মনে কথা বলত। নিজের দুপাশে থুথু ফেলত ফেলতে এগুত। হয়ত তার মাথা খারাপ হয়েছিল। একজন ভিখিরিণীর মাথা খারাপ হওয়া এমন কোন বড় ঘটনা নয়। জগৎ সংসারের তাতে কিছুই যায় আসে না। পৃথিবী চলে তার নিজস্ব নিয়মে। সেইসব নিয়ম জানার জন্য এক ধরনের ব্যাকুলতা আমার মধ্যে হয়ত তৈরি হয়েছিল। অনেক ধরনের প্রশ্ন মনে আসত কাউকে করতে পারতাম না। প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের মনেই খুঁজতে হত।

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় — এই প্রশ্নটা একদিন মনে এল। ভাল মানুষেরা বেহেশতে, খারাপ মানুষেরা দোজখে — এ সহজ উত্তর মনে ধরল না। মনে হল — উত্তর এত সহজ নয়। মৃত্যু-সম্পর্কিত জটিল প্রশ্নটি মনে আসার কারণ আছে: কারণটা বলি।

একদিন সিলেট সরকারী হাসপাতালের সামনে দিয়ে আসছি। হঠাৎ দেখি নর্দমায় একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকজন ভিড় করে দেখছে। কৌতূহল মিটে গেলে চলে যাচ্ছে। আমিও দেখতে লাগলাম। মৃতদেহ দেখে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। কারণ মৃত মানুষটির ঠোঁটে হাসি। তার চোখ বন্ধ, কিন্তু হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে আছে। দেখেই মনে হয় কোন একটা মজার ঘটনায় চোখ বন্ধ করে সে হাসছে। আমার বুকে ধক করে ধাক্কা লাগল।

দৌড়ে পালিয়ে এলাম।

মৃতদেহটির হাসি-হাসি মুখের ছবি নিজের মন থেকে কিছুতেই মুছতে পারলাম না। বিকেলে আবার দেখতে গেলাম। মৃতদেহ আগের জায়গাতেই আছে। তার মুখের হাসিরও কোন হেরফের হয়নি।

পরদিন আবার গেলাম। লাশ সরানো হয়নি। তবে মুখের হাসি আর চোখে পড়লো না। অসংখ্য লাল পিপড়ে সারা শরীর ঢাকা। লোকটির গায়ে যেন লাল রঙের একটা চাদর। খুব ইচ্ছা করল চাদর সরিয়ে তার মুখটি আরেকবার দেখি। দেখি, এখনো কি সেই মুখে হাসি লেগে আছে।?

আমি বাসায় ফিরলাম কাঁদতে কাঁদতে। বাসায় ফিরেই শুনি, বাবার চিঠি এসেছে — আমরা সিলেটে আর থাকব না। চলে যাব দিনাজপুরে, জায়গাটির নাম জগদল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] কথা আর মনে রইল না। আনন্দে লাফাতে লাগলাম।

"[illegible] শ্লোকটির কথা আর মনে রইল না।" বলাটা বোধহয় ঠিক হল না; মনে ঠিকই রইল, শুধু চাপা পড়ে গেল। একমাত্র শিশুরাই পারে সব ঘটনা সহজ ভঙ্গিতে গ্রহণ করা [illegible] দিয়ে ঢেকে রাখতে। তারা একটি স্মৃতি থেকে অতি দ্রুত চলে যেতে পারে [illegible]তে। সব আলাদা আলাদা রাখা। ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। মাঝে মাঝে ঢাকনার [illegible] খুলে দেখে নেয় সব ঠিকঠাক আছে কি-না। কোন কিছুই সে নষ্ট করতে বা ফেলে [illegible] না।

কষ্টকর স্মৃতি মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা আমি শুধু বড়দের মধ্যেই দেখি। [illegible]দের মধ্যে দেখি না।



আমার বন্ধু উনু

[illegible] সঙ্গে আমার পরিচয় ফুটবল খেলার মাঠে। রোগা টিঙটিঙে একটা ছেলে বড় বড় [illegible], খাদা নাক, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল।

দু' দলে তুমুল খেলা চলছে। আমি মাঠের বাইরে। গায়ে জ্বর বলে খেলতে পারছি [illegible]। এমন সময় উনুকে লক্ষ করলাম। সে খুব মন দিয়ে ঘাস খাচ্ছে।

সত্যি সত্যি ঘাস খাচ্ছে। দু'আঙুলে ঘাসের কচি পাতা দ্রুত তুলে চপচপ শব্দে [illegible]য়ে খাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, ঘাস খাচ্ছ কেন?

সে গম্ভীর গলায় বলল, আমার ইচ্ছা।

বলে পুরো সুফি-সাধকদের নির্লিপ্ততা নিয়ে ঘাস চিবুতে লাগল। এমনভাবে চিবুচ্ছে [illegible] অতি উপাদেয় কোন খাবার। তার খাওয়া দেখে জিভে পানি চলে আসে। আমি [illegible] সামলাতে পারলাম না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, ঘাস খাচ্ছ কেন?

সে উদাস গলায় বলল, ভাইটামিন আছে।

এরকম একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব না হওয়ার কোন কারণই নেই। দশ মিনিটের [illegible]য় আমরা জন্মের বন্ধু হয়ে গেলাম। সে শিখিয়ে দিল ঘাসের কোন অংশ খেতে হয়। [illegible]ন অংশ খেতে হয় না। দু'টা পাতার মাঝখানে সুতার মত যে ঘাসটা বের হয় সেটাই [illegible]। তবে ডগার খানিকটা বাদ দিতে হবে। ডগাটা বিষ।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] আমার চেয়ে এক ক্লাস উপরে পড়ে। আমাদের স্কুলে না, অন্য কি একটা স্কুলে। তার মা নেই, বাবার সঙ্গে থাকে। বাবা প্রতিদিন রুটিন করে উনুকে দু'বেলা মারেন। স্কুল থেকে ফিরে আসার পর একবার, সন্ধ্যাবেলা খেলার মাঠ থেকে ফিরে আসার পর একবার। সেই মারও দর্শনীয় মার। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মারপর্ব শেষ হবার পরই দু'জনই অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যেন কিছুই হয়নি।

উনুর বাবা ছোট চাকরি করতেন। বাসার সাজসজ্জা অতি দরিদ্র। বাঁশের বেড়ার ঘর। পাশেই ডোবা। ময়লা নোংরা পানি। খেলা শেষ করে বাসায় ফিরে উনু সেই নোংরা পানিতে দিব্যি হাত-মুখ ধুয়ে ফেলে।

উনুর বাবাকে মানুষ হিসেবে আমার খুব পছন্দ হল। ছোটদের সঙ্গে কথা বলেন এমনভাবে যেন তারা ছোট না। তাঁর সমবয়স্ক মানুষ। আমাকে একদিন বললেন, এই যে আই আই চুন্দ্রীগর সাহেব দেশের ভার নিল, লোকটা কেমন? তোমার কি মনে হয় ভালমন্দ কিছু হবে?

আই আই চুন্দ্রীগর কে? সে কবেই বা দেশের ভার নিল কিছুই জানি না। তবু খুব বুদ্ধিমান মানুষের মত মাথা নাড়লাম। মুখে বললাম, হবে।

উনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মনে হয় না। সব এক। দেয়াশলাইয়ের কাঠি। ঘষ কইরা একবার জ্বলল, তারপর শেষ। চমৎকার সব উপমা আমি উনার কাছে শুনেছি। যেমন মেয়ে মানুষ সম্পর্কে তাঁর একটা ছড়া।

"মায়ে পুরা
ভইনে থুরা
কন্যায় পাই,
স্ত্রীর কপালে
কিছুই নাই।"

এই ছড়ার অর্থ জানি না। অসংখ্যবার তাঁর কাছে শুনেছি বলে এখনো মনে আছে।

উনু একবার আমাকে চিতই পিঠা খাওয়াবার দাওয়াত দিল। তার বাবা চিতই পিঠা বানাবেন। যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। উঠানে চুলায় পিঠা সেঁকা হচ্ছে। পিতা এবং পুত্র মিলে বানাচ্ছে। গল্পগুজব করতে করতে পিঠা খাওয়া হচ্ছে। ওদের দু'জনকে দেখে যা হিংসা লাগল। মনে হল ওরা কত সুখী! আমার যদি মা না থাকত কি চমৎকার হত!

উনুর কপালে সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। তার বাবা বিয়ে করে ফেললেন। উনু গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল, সৎমার সংসারে থাকব না। দেশান্তর হব।

আমি বললাম, কোথায় যাবে?

এখনো ঠিক করি নাই। ত্রিপুরা, আসাম এক জায়গায় গেলেই হয়।

আমার বন্ধুকে একা ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ঠিক করলাম আমিও সঙ্গে যাব। বন্ধুর শোকে আমার ভিতরে খানিকটা বৈরাগ্য এসে গেছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পর সকালে সিলেট রেলস্টেশন থেকে ছাড়ছে এমন একটি ট্রেনের কামরায় দু'জন উঠে বসলাম। ট্রেন কোথায় যাচ্ছে কিছুই জানি না। ট্রেন ছাড়ার পরপরই আমার মধ্যে দেশান্তরী হবার যাবতীয় আগ্রহ কর্পূরের মত উবে গেল। বাসার জন্য খুব যে মন খারাপ হল তা না। প্রচণ্ড ভয়ে অস্থির হলাম এই ভেবে যদি টিকিট চেকার উঠে তখন কি হবে? কান্না শুরু করলাম। ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার শব্দও বাড়তে লাগল। কেন জানি বাকি ঘটনা আমার পরিষ্কার মনে নেই। আবছা আবছা মনে আছে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে আমাদের নামিয়ে দেয়া হল। ধবধবে শাদা পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক গাড়ি করে আমাদের সিলেট শহরে পৌঁছে দেন। আমার ভেতর থেকে দেশান্তরী হবার বাসনা পুরোপুরি চলে গেলেও উনুর ভেতর সেটা থেকেই যায়। প্রতিমাসে অন্তত একবার হলেও সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তিনচারদিন কোথায় কোথায় কাটিয়ে আবার ফিরে আসে।

উনু শুধু যে আমার বন্ধু ছিল তাই না, শিক্ষকও ছিল। জগতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি। যেমন আকাশে প্লেন দেখলেই দৌড়ে গাছের নিচে কিংবা বাড়ির ভেতর ঢোকা উচিত। কারণ প্লেনের যাত্রীরা পেসাব-পায়খানা করলে তা মাথায় এসে পড়তে পারে।

নানান ওষুধপত্রের টোটকা দাওয়াইও তার জানা ছিল। যেমন মুখে ডিম নিয়ে যেসব লাল লাল পিঁপড়া হেঁটে যায় ঐসব পিঁপড়া দৈনিক পাঁচটা করে খেলে অর্শ রোগ সেরে যায়।

যেহেতু আমার অর্শরোগ ছিল না কাজেই সেই মহৌষধ পরীক্ষা করে দেখা হয়ে উঠেনি।

উনুকে আমি কখনো হাসি-খুশি দেখেনি। সারাক্ষণ সে চিন্তিত ও বিষণ্ন। শুধু একদিন হাসতে হাসতে দৌড়ে তাকে আমাদের বাসার দিকে আসতে দেখা গেল। জানলাম তার একটা বোন হয়েছে। দেখতে সে নাকি পরীর মত সুন্দর। জন্মের পরপর সে হাসতে শিখে গেছে। সারাক্ষণই নাকি হাসছে।

আমি পরদিন সদাহাস্যময়ী উনুর ভগ্নিকে দেখতে গেলাম। উনুর মা শাড়ির আঁচল ফাঁক করে লাল টুকটুকে শিশুটিকে দেখিয়ে খুশি-খুশি গলায় বললেন, নজর লাগাইও না। মাটিতে থুক দেও। যাতে শিশুটির উপর নজর না লাগে সে জন্যেই আমি এবং উনু দু'জনই মাটিতে এক গাদা থুথু ফেললাম। এই ঘটনার খুব সম্ভব এক সপ্তাহের ভেতর উনুর বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন।

অন্যের দুঃখে অভিভূত হবার মত বয়স বা মানসিকতা কোনটাই তখন ছিল না। কাজেই এই ঘটনা আমার মনে কোন ছাপ ফেলল না। আমাদের বাসায়ও তখন বড় ধরনের সমস্যা। গনি চাচার চাকরি চলে গেছে। এন্টি-করাপশনের মামলা চলছে তাঁর বিরুদ্ধে। জেল হয়ে যাবে, মোটামুটি নিশ্চিত। তিনি কপর্দকশূন্য অবস্থায় তাঁর স্ত্রী এবং

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পালক-পুত্রকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসে উঠেছেন। গনি চাচার স্ত্রী রাতদিন কাঁদেন। সেই কান্নাও ভয়াবহ কান্না। চিৎকার, মাটিতে গড়াগড়ি। আমরা ছোটরা অবাক হয়ে দেখি।

গনি চাচা উঠোনে পাটি পেতে সারাদিন শুয়ে থাকেন এবং তালপাতার পাখায় হাওয়া খান। দীর্ঘদিন তাঁরা আমাদের বাসায় রইলেন। দু'টি সংসার টানতে গিয়ে মা হিমসিম খেয়ে গেলেন। তাঁর অতি সামান্য যেসব সোনার গয়না ছিল সব বিক্রি হয়ে গেল। সেবার ঈদে আমরা কেউ কোন কাপড় পেলাম না। আমাদের বলা হল, অল্পদিন পরেই বড় ঈদ আসছে। বড় ঈদে সবাই ডাবল ডাবল কাপড় পাব।

যেহেতু খানিকটা বড় হয়েছি চারপাশের জগৎ কিছুটা হলেও বুঝতে শিখেছি, সে কারণে মনের কষ্ট পুরোপুরি দূর করতে পারছি না। মন খারাপ করে ঘুরে বেড়াই। আশেপাশের বাচ্চারা বাবাদের হাত ধরে দোকানে যায়। কলরব করতে করতে ফিরে আসে।

মনের কষ্ট দূর করতে উনুর চেয়ে ভাল কেউ নেই। মুহূর্তের মধ্যে সে অন্যের মন-খারাপ ভাব দূর করে দিতে পারে যদিও সে নিজে আগের চেয়েও বিষণ্ন হয়ে যায়।

উনুকে বাসায় পেলাম না, উনুর মাকেও না। তারা সবাই কোথায় নাকি চলে গেছে। খুব খারাপ লাগল। উনুদের পাশের বাসার এক ছেলে বলল, উনু জল্লারপাড়ের এক চায়ের দোকানে কাজ করে। বাবাবিহীন সংসারের দায়িত্ব এই বয়সেই সে মাথায় নিয়ে নিয়েছে।

খুজে খুঁজে একদিন তাকে বের করলাম। ময়লা হাফপেন্ট পরা। টেবিলে-টেবিলে চা দিচ্ছে। আমি বাইরে থেকে ডাকলাম, এ্যাই উনু। সে তাকাল কিন্তু দোকান থেকে বেরিয়ে এল না।

বাসায় ফিরে এলাম।

বাসায় খুব আনন্দ। খুব উত্তেজনা। বাবা জগদল থেকে আমাদের নিতে এসেছেন এবং ঘোষণা করেছেন এই ঈদেই আমাদের সবাইকে কাপড় এবং জুতা দেয়া হবে। কেনাও হবে আজ।

আনন্দে লাফাতে লাগলাম।

উনুর কথা মনে রইল না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



জগদলের দিন

আমার শৈশবের অদ্ভুত স্বপ্নময় কিছু দিন কেটেছে জগদলে। জগদলের দিন আনন্দময় হবার অনেকগুলি কারণের প্রধান কারণ স্কুলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। সেখানে কোন স্কুল নেই। কাজেই পড়াশোনার যন্ত্রণা নেই। মুক্তির মহানন্দ।

আমরা থাকি এক মহারাজার বসতবাড়িতে। যে বাড়ির মালিক অল্প কিছুদিন আগেই দেশ ছেড়ে ইণ্ডিয়াতে চলে গেছেন। বাড়ি চলে এসেছে পাকিস্তান সরকারের হাতে। মহারাজার বিশাল এবং প্রাচীন বাড়ির একতলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা। পুরোটা তালাবন্ধ। শুধু দুতলা নয়। কয়েকটা ঘর ছাড়া বাকি সবটা তালাবন্ধ। কারণ মহারাজা জিনিসপত্র কিছুই নিয়ে যাননি। ঐ সব ঘরে তাঁর জিনিসপত্র রাখা।

ঐ মহারাজার নাম আমার জানা নেই। মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনিও বলতে পারলেন না। তবে তিনি যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন তার অসংখ্য প্রমাণ এই বাড়িতে ছড়ানো। জঙ্গলের ভেতর বাড়ি। সেই বাড়িতে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর ছিল নিজস্ব জেনারেটর। দাওয়াতের চিঠি ছেপে পাঠানোর জন্যে যিনি সাইজের একটা ছাপাখানা।

বাবাকে অসংখ্যবার বলতে শুনেছি — মহারাজার রুচি দেখে মুগ্ধ হতে হয়। আহা, কত বই। কত বিচিত্র ধরনের বই।

বাবা অনেক লেখালেখি করলেন, যাতে বইগুলি অন্তত সরকারী পর্যায়ে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। তাঁর লেখালেখিতে কোন কাজ হল না। বাবা কতবার যে দীর্ঘশ্বাসের বেদনায় বললেন — আহা, চোখের সামনে বইগুলি নষ্ট হচ্ছে, কিছু করতে পারছি না। তিনি ইচ্ছা করলেই সমস্ত বই নিজের সংগ্রহে যুক্ত করতে পারতেন। তাতে বইগুলি রক্ষা পেত। তিনি তা করলেন না। পরের জিনিস, নিজের মনে করার প্রশ্নই আসে না। তিনি হা-হুতাশ করতে লাগলেন। চোখের সামনে বই নষ্ট হতে লাগল। হোক নষ্ট, তাতে আমাদের অর্থাৎ ছোটদের তেমন কিছুই যায় আসে না। কারণ আমাদের সামনে অন্য একটি জগৎ খুলে গেছে।

বাড়ির সামনে বিশাল বন। একটু দূরেই নদী। যে নদীর পানি কাকের চোখের মত স্বচ্ছ। নদীর তীরে বালি ঝিকমিক করে জ্বলে। নদীটিই পাকিস্তান এবং ইণ্ডিয়ার সীমানা। সারাক্ষণ অপেক্ষা করতাম কখন দুপুর হবে — নদীতে যাব গোসল করতে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঝরনার নদীতে নামলে উঠার নাম নেই। তিন ভাই বোন নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি করছি, পড়ন্ত হয়ত একজনকে জোর করে ধরে পাড়ে নিয়ে রাখল। আনতে গেল অন্যজনকে। যে পাড়ে পাড়ে যে আছে সে লাফিয়ে নামল।

বিকেলগুলিও কম রোমাঞ্চকর ছিল না। প্রতিদিনই বাবা কাঁধে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে বলতেন — চল, বনে বেড়াতে যাই। কাঁধে বন্দুক নেয়ার কারণ হচ্ছে প্রায়ই বাঘ বের হয়। বিশেষ করে চিতা বাঘ।

বাবার সঙ্গে সন্ধ্যা পর্যন্ত বনে ঘুরতাম। ক্লান্ত হয়ে ফিরতাম রাতে। ভাত খাওয়ার আগেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসত। কত বিচিত্র শব্দ আসত বন থেকে। আনন্দে এবং আতংকে শিউরে শিউরে উঠতাম।

সবাই ঘুমুতাম একটা ঘরে। বিশাল তিনটা খাট একত্র করে ফুটবলের মাঠের আকৃতি একটা বিছানা তৈরি করা হত। বিছানার উপরে সেই মাপে তৈরি এক মশারি। রাতে বাথরুম পেলে মশারীর ভেতর থেকে নামা নিষিদ্ধ ছিল, কারণ খুব কাঁকড়া বিছা এবং সাপের উপদ্রব।

কাঁকড়া বিছাগুলি সাপের মতই মারাত্মক। একবার কামড়ালে বাঁচার আশা নেই, এমনি তার বিষ। মৃত্যু সঙ্গে নিয়ে কাঁকড়া বিছা মেঝেতে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। আমি বিছানায় বসে মুগ্ধ হয়ে দেখছি। এই ছবি এখনো চোখে ভাসে।

আমাদের আশেপাশে কোন জনমানব ছিল না। অনেক দূরে বনের ভেতর একজন কম্পাউণ্ডার থাকতেন। সভ্য মানুষ বলতে তিনিই। তাঁর বড় মেয়েটির নাম আরতী। আমার বয়সী, বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে। দেবী প্রতিমার মত শান্ত মুখশ্রী, কিন্তু সেই শ্রীময়ী চেহারার সঙ্গে স্বভাবের কোন মিল নেই। একদিন সকালে আমাদের বাসার সামনে এসে মিহি সুরে ডাকতে লাগল — কাজল, এই কাজল।

আমি বের হয়ে এলাম। যেন কত দীর্ঘদিনের চেনা। সেই ভঙ্গিতে বলল, বনে বেড়াতে যাবে? উচ্চারণ বিশুদ্ধ শান্তিপুরী। গলার স্বরটিও ভারি মিষ্টি। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, হ্যাঁ।

সে আমাকে নিয়ে বনে ঢুকে গেল। ক্রমেই সে ভেতরের দিকে যাচ্ছে। আমি এক সময় শংকিত হয়ে বললাম, ফেরার পথ মনে আছে? সে আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যে এরকম অদ্ভুত কথা কখনো শুনেনি। তারপরই হঠাৎ একটা দৌড় দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

আমি স্তাবলাম, নিশ্চয় লুকোচুরি জাতীয় কোন খেলা। আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা। আমি খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে করতে কাতর গলায় ডাকতে লাগলাম — আরতী, এ্যাই আরতী।

তার কোন খোঁজ নেই। এই অদ্ভুত মেয়ে আমাকে বনে রেখে বাসায় চলে গেছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] শেষ করতে গিয়ে আরো গভীর বনে ঢুকে পড়লাম। একসময় [illegible] ফেলে কাদতে বসলাম। জনৈক কাঠকুড়ানো সাঁওতাল যুবক এই অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে বাসায় দিয়ে আসে।

দু দিন পরেক পর আরতি আবার এসে ডাকতে লাগল — এই কাজল, এই। আমি দেখা হওয়ামাত্র বলল, বনে যাবে?

আমি খুব ভাল করে জানি, এই মেয়ে আমাকে আবার আগের দিনের মত গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে চলে আসবে। তবু তার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না। পরে যা হোক হবে। আপাতত খানিকক্ষণ এই রূপবতী পাগলী মেয়ের সঙ্গে থাকা যাক। আমার সে তাই করল। এর জন্যে তার উপর আমার কোন রকম রাগ হল না। বরং মনে হল এই মেয়েটির পাশাপাশি থাকার বিনিময়ে আমি আমার সমস্ত পৃথিবী দিয়ে দিতে পারি। এই মোহকে কি বলা যায়? প্রেম? প্রেম সম্পর্কে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা তো কোথাও খাটে না। তাহলে এই প্রচণ্ড মোহের জন্ম কোথায়? আমি জানি না। শুধু জানি, মেয়েটির বাবা একদিন তার পরিবার-পরিজন নিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে ইণ্ডিয়া চলে যান। এই খবর পেয়ে গভীর শোকে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে থাকি। মা যখন জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? আমি বললাম, পেটে ব্যথা। বলে আরো জোরে কাঁদতে লাগলাম। পেট-ব্যথার অসুখ হিসেবে পেটের নিচে বালিশ দিয়ে আমাকে সারাদিন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হল। বাবা আমাকে দু'কৌটা বায়োকেমিক ওষুধ দিলেন। তখন তিনি বায়োকেমিক অসুখ নিয়ে খুব মেতেছেন। চমৎকার একটা ব্যাপার তাঁর অসুখ থাকে। বারোটা শিশির বারো রকমের অসুখ। পৃথিবীর সব রোগ-ব্যাধি এই শিশির ঔষধে আরোগ্য হয়। অনেকটা হোমিওপ্যাথির মত। তবে হোমিওপ্যাথিতে যেমন অসুখের সংখ্যা অনেক, এখানে মাত্র বারোটা।

বাবার বায়োকেমিক চিকিৎসায় আমার বিরহ-ব্যথা অনেকটা দূর হল। এই পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয় এমন মনোভাব নিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। কিছুক্ষণের ভেতরই আবার বিছানায় উঠতে হল। কারণ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। বাবা-মা দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল — লক্ষণ ভাল নয়। নিশ্চয় ম্যালেরিয়া। সেই সময়ে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া কুখ্যাত ছিল। একবার কাউকে ধরলে তার জীবনীশক্তি পুরোপুরি নিঃশেষ করে দিত। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমরা প্রতিষেধক হিসেবে বায়োকেমিক ওষুধ ছাড়াও প্রতি রবিবারে পাঁচ গ্রেন করে কুইনাইন খাচ্ছি। তারপরও ম্যালেরিয়া ধরবে কেন?

বাবা এই ভয়ংকর জায়গা থেকে বদলির জন্য চেষ্টা-তদবির করতে লাগলেন। শুনে আমার মন ভেঙ্গে গেল। এত সুন্দর জায়গা, এমন চমৎকার জীবন — এসব ছেড়ে কোথায় যাব? ম্যালেরিয়ায় মরতে হলেও এখানেই মরব। তাছাড়া ম্যালেরিয়া অসুখটা আমার বেশ পছন্দ হল। যখন জ্বর আসে তখন কী প্রচণ্ড শীতই না লাগে। শীতের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জন্যেই বোধহয় শরীরে এক ধরনের আবেশ সৃষ্টি হয়। জ্বর যখন বাড়তে থাকে তখন চোখের সামনের প্রতিটি জিনিস আকৃতিতে ছোট হতে থাকে। দেখতে বড় অদ্ভুত লাগে। একসময় নিজেকে বিশাল দৈত্যের মত মনে হয়। কী আশ্চর্য অনুভূতি!

শুধু আমি একা নই, পালা করে সব ভাইবোন জ্বরে পড়তে লাগলাম। একজন জ্বর থেকে উঠতেই অন্যজন জ্বরে পড়ে। জ্বর আসেও খুব নিয়মিত। আমরা সবাই জানি কখন জ্বর আসবে। সেই সময়ে লেপ-কাঁথা গায়ে জড়িয়ে আগেভাগেই বিছানায় শুয়ে পড়ি।

প্রতিদিন ভোরে তিন ভাইবোন রাজবাড়ির মন্দিরের চাতালে বসে রোদ গায়ে মাখি। এই সময় আমাদের সঙ্গ দেয় বেঙ্গল টাইগার। বেঙ্গল টাইগার হচ্ছে আমাদের কুকুরের নাম। না, আমাদের কুকুর নয়, মহারাজার কুকুর। তাঁর নাবি অনেকগুলি কুকুর ছিল। তিনি সব কটাকে নিয়ে যান কিন্তু এই কুকুরটিকে নিতে পারেননি। সে কিছুতেই রাজবাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি।

মা তাকে দু'বেলা খাবার দেন। মাটিতে খাবার ঢেলে দিলে সে খায় না। থালায় করে দিতে হয়। শুধু তাই না, খাবার দেবার পর তাকে মুখে বলতে হয় -- খাও।

খানদানি কুকুর। আদব-কায়দা খুব ভাল। তবে বয়সের ভারে সে কাবু। সারাদিন বাড়ির সামনে শুয়ে থাকে। হাই তোলে, ঝিমুতে ঝিমুতে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে।

এক ভোরবেলার কথা। আমার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। আমি কম্বল গায়ে দিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে আছি। আমার সঙ্গে শেফু এবং ইকবাল। মা এসে আমাদের মাঝখানে শাহীনকে [আমার চার নাম্বার ভাই] বসিয়ে দিয়ে গেলেন। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তার দিকে নজর রাখা, সে যেন হামাগুড়ি দিয়ে চাতাল থেকে পড়ে না যায়।

মা চলে যাবার পরপরই হিসহিস শব্দে পেছনে ফিরে তাকালাম। যে-দৃশ্য দেখলাম সে-দৃশ্য দেখার জন্য মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। মন্দিরের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কেউটে সাপ বের হয়ে আসছে। মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে। ফণা তুলে এদিক-ওদিক দেখে, আবার মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে, আবার ফণা তুলে। আমরা তিন ভাইবোন ছিটকে সরে গেলাম। শাহীন একা বসে রইল, সাপ দেখে তার আনন্দের সীমা নেই। সে চেষ্টা করছে সাপটির দিকে এগিয়ে যেতে। আর তখনই বেঙ্গল টাইগার ঝাঁপিয়ে পড়ল সাপটির উপর। ঘটনা এত দ্রুত ঘটল যে আমরা কয়েক মুহূর্ত বুঝতেই পারলাম না কি হচ্ছে। এক সময় শুধু দেখলাম কুকুরটা সাপের ফণা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। বেঙ্গল টাইগার ফিরে যাচ্ছে নিজের জায়গায়। যেন কিছুই হয়নি। নিজের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড সে শেষ করল।

সাপ কুকুরটিকে কামড়াবার সুযোগ পেয়েছিল কিনা জানি না। সম্ভবত কামড়ায়নি কারণ কুকুরটি বেঁচে রইল, তবে নড়াচড়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। দ্বিতীয় দিনে তার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] পড়ল এবং দগদগে ঘা দেখা দিল। এই থেকে মনে হয় সাপ সম্ভবত [illegible]। সাপের বিষ কুকুরের ক্ষেত্রে হয়ত তেমন ভয়াবহ নয়।

[illegible] দু'দিন কাটল। কুকুরটি চোখের সামনে পচে-গলে যাচ্ছে। তার কাতর ধ্বনি [illegible] করা মুশকিল। গা থেকে গলিত মাংসের দুর্গন্ধ আসছে।

বাবা মাকে ডেকে বললেন, আমি এর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। তুমি বন্দুক বের [illegible] আমাকে দাও।

বাবা আমাদের চোখের সামনে পরপর দুটি গুলি করে কুকুরটিকে মারলেন। শান্ত [illegible] বললেন, যে আমার ছেলের জীবন রক্ষা করেছে তাকে আমি গুলি করে [illegible]। একে বলে নিয়তি!

আমার কাছে বাবাকে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম মানুষদের একজন বলে মনে হল। [illegible]কে কিছুতেই বুঝাতে পারছিলাম না এমন একটি কাজ তিনি কি করে করতে [illegible]লেন। রাগে দুঃখে ও অভিমানে রাতে ভাত না খেয়ে শুয়ে পড়েছি। বাবা আমাকে [illegible]কে নিয়ে বারান্দায় বসালেন।

দু'জন চুপচাপ বসে আছি। চারদিকে ঘন অন্ধকার। তক্ষক ডাকছে। বাড়ির [illegible]পাশের আমের বনে হাওয়া লেগে বিচিত্র শব্দ উঠছে।

বাবা কিছুই বললেন না। হয়ত অনেক কিছুই তাঁর মনে ছিল। মনের ভাব প্রকাশ [illegible]রতে পারলেন না। এক সময় বললেন, যাও ঘুমিয়ে পড়।

কুকুরটি আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

আমার মনে আছে — এই নিয়ে আমি কিছু একটা লিখতে চেষ্টাও করেছিলাম। রচনাটির নাম দিয়েছিলাম বেঙ্গল টাইগার কিংবা আমাদের বেঙ্গল টাইগার। সম্ভবত এই রচনাই আমার প্রথম সাহিত্য। বলাই বাহুল্য, অতি তুচ্ছ রচনা। কিন্তু হৃদয়ের গভীর যাতনায় যার জন্ম তাকে তুচ্ছই বা করি কি করে?

জগদলে বেশিদিন থাকা হল না। বাবা বদলি হলেন দিনাজপুরের পচাগড়ে [পঞ্চগড়]। এই জায়গা সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে ভোরবেলা বাসার সামনে এসে দাঁড়ালে কাঞ্চনজংঘার ধবল চূড়া দেখা যেত। মনে হত পাহাড়টা রূপার পাতে মোড়া। সূর্যের আলো পড়ে সেই রূপা চকচক করছে। বাবা আমাদের মধ্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করবার জন্যেই হয়ত এক ভোরবেলায় ঘোষণা করলেন, কাঞ্চনজংঘাকে নিয়ে যে একটা কবিতা লিখতে পারবে সে চার আনা পয়সা পাবে। অনেক চেষ্টা করেও কোন কবিতা দাঁড় করাতে পারলাম না। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আরো মন খারাপ হল যখন আমাদের তিন ভাইবোনকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হল।

স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গেলেন বড় মামা। তিনজনই কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছি। এই পৃথিবীর হৃদয়হীনতা কেউই সহ্য করতে পারছি না। বড় মামা উপদেশ দিতে দিতে নিয়ে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মাতেন। "বিদ্যা অমূল্য ধন," "পড়াশোনা করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে" — এইসব।

অমূল্য ধন বা গাড়ি-ঘোড়া কোন কিছুরই প্রতি আকর্ষণ বোধ করছি না।

বড় মামা আমাদের চোখের জল অগ্রাহ্য করে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। শুধু এই নয়, হেড মাস্টার সাহেবকে বললেন, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে আমি বিনা বেতনে আপনাদের স্কুলে পড়াব। আপাতত আমার কিছু করার নেই। হাতে প্রচুর অবসর।

হেড মাস্টার রাজি হলেন। আমি খানিকটা আশার আলো দেখতে পেলাম। যাই হোক, একজন স্যার হলেন আমাদের নিজেদের এবং অতি প্রিয় মানুষ। স্কুলের দিনগুলি হয়ত খারাপ যাবে না। দ্বিতীয় দিনেই বড় মামা আমাদের ক্লাসে অংক করাতে এলেন। আমি হাসিমুখে চেঁচিয়া উঠলাম — "বড় মামা।"

মামার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। হুংকার দিয়ে বললেন — মামা? মামা মানে? চড় দিয়ে সব দাঁত খুলে ফেলব। স্কুলে আমি তোমাকে চিনি না। তুমিও আমাকে চেন না। বল ৬ -এর ঘরের নামতা বল। পাঁচ ছয় কত?

আমি হতভম্ব।

একি বিপদ ! ছয়ের ঘরের নামতা জানি না এটা বড় মামা খুব ভাল করেই জানেন। কারণ তিনি আমাদের পড়ান।

তিনি দুনিয়া-কাঁপানো হুংকার দিলেন, কি, পারবে না?

না।

না আবার কি? বল, জ্বি না।

জ্বি না।

বল, জ্বি না স্যার।

জ্বি না স্যার।

না পারার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা হবে। আত্মীয় বলে আমার কাছ থেকে পার পাওয়া যাবে না। আমার চোখে সব সমান। সবাই ছাত্র। ক্লাস-ক্যাপ্টেন কোথায়? যাও, বেত নিয়ে আস।

বেত আনা হল। এবং সত্যি সত্যি বড় মামা ছয়টি বেতের বাড়ি দিলেন — যেহেতু ছয়ের ঘরের নামতা।

স্কুলে মোটামুটি আতংকের সৃষ্টি হয়ে গেল। ছাত্রমহলে রটে গেল ভয়ংকর রাগী একজন স্যার এসেছেন। অতি কড়া, তার ক্লাসে নিঃশ্বাস ফেলা যায় না।

বড় মামার চাকরি দীর্ঘস্থায়ী হল না। স্থানীয় এস.ডি.ও. সাহেবের ছোটভাইকে কানে ধরে উঠাবসা করাবার কারণে তাঁর চাকরি চলে গেল। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বড় মামা আবার আগের মূর্তিতে ফিরে এসেছেন। গল্প করছেন, আমাদের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দাদা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথায় গেলে না-কি রাতের বেলা দার্জিলিং শহরের বাতি দেখা যায়, নিয়ে গেলেন।

গভীর রাত পর্যন্ত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছি। দার্জিলিং শহরের বাতি আর দেখা যায় না। উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। কিছুই দেখা গেল না। বড় মামা বিরক্ত হয়ে বললেন, ওদের আজ বোধহয় ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে। আরেকদিন আসতে হবে! অসাধারণ দৃশ্য! না দেখলে জীবন বৃথা।

একদিন সাইকেলের সামনে বসিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন পাহাড়ী নদী দেখাতে। প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে নালার মত একটা জলাধার পাওয়া গেল। মামা বললেন, তুমি ঘুরে বেড়াও। আমি এই ফাঁকে একটা কবিতা লিখে ফেলি। মামা নদীর পাড়ে বসে রোলটানা খাতায় কবিতা লিখতে বসলেন। দীর্ঘ কবিতা লেখা হল। কবিতার নামটা মনে আছে। —

"হে পাহাড়ী নদী"

বড় মামার এই কবিতা স্থানীয় একটি পত্রিকায় ছাপাও হল। পচাগড়ের দিনগুলি আমাদের কাছে এক সময় সহনীয় হয়ে উঠল এবং ভাল লাগতে লাগল। আমার একজন বন্ধু জুটে গেল যে নর্দমার পানিতে মাছ মারার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। দুজনেই বড়শি হাতে নর্দমায় নর্দমায় ঘুরে বেড়াই। নর্দমায় টেংরা, লাটি এবং পুঁটি মাছ পাওয়া যায়। আমার বন্ধুর পকেটে নারিকেলের মালায় থাকে কেঁচো। সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক টুকরা কেঁচো নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বড়শিতে গেঁথে পানিতে ফেলে দেয়। দেখতে বড় ভাল লাগে।



শেষ পর্বে শঙ্খনদী

পচাগড় থেকে বাবা বদলি হলেন রাঙ্গামাটিতে।

দেশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ। ভাগ্য ভাল হলে দেখা যাবে রাঙ্গামাটি খুব জঙ্গলী জায়গা — স্কুল নেই। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, স্কুল আছে না কি?

তিনি বললেন, অবশ্যই আছে। স্কুল থাকবে না কেন? রাঙ্গামাটি বেশ বড় শহর! খুব সুন্দর শহর!

Nirjoy

www.BanglaBook.org

স্কুল আছে শুনে একটু মনমরা হয়ে গেলাম। নিরবছিন্ন সুখ বলে কিছুই নেই। কাপাসে হাঁড়ি থাকে, চাঁদে থাকে কলংক। স্কুলের যন্ত্রণা সহ্য করতেই হবে বলে মনে হচ্ছে।

চিটাগাং থেকে রাঙ্গামাটি যেতে হয় লঞ্চর মার্কা বাসে। রাস্তা অসম্ভব খারাপ। পাহাড়ের গা ঘেঁষে বাস যখন উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন বাসের হেল্পার চেঁচিয়ে বলে, আল্লাহর নাম নেন। ইঞ্জিন বন্ধ হইতে পারে।

সত্যি সত্যি স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ভবিষ্যৎবাণী এমন ফলে গেছে দেখে কণ্ডাক্টরের মুখে বিমলানন্দের হাসি। ড্রাইভার বাস থেকে বের হয়ে নিশ্চিত মনে বিড়ি খাচ্ছে। তার নির্বিকার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রায়ই ঘটে।

বাস কখন ছাড়বে জিজ্ঞেস করতেই সে সুফি-সাধকের মত নির্লিপ্ত গলায় বলল, আল্লাহর হুকুম হইলেই ছাড়ব। আমরা বাসযাত্রীরা বাস থেকে নেমে আল্লাহর হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মা আমাদের সর্বকনিষ্ঠ বোনটির কান্না থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ ভ্রমণে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ক্রমাগত কাঁদছে। বাবা আমাদের নিয়ে বের হয়েছেন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগুচ্ছি — এ কোথায় এসে পড়লাম? স্বপ্নপুরীর মত সুন্দর দেশ। চারদিকে পাহাড়ের সারি ঢেউয়ের মত দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। মাথার উপর ঘন নীল আকাশ। বাতাসে কেমন যেন বুনো বুনো গন্ধ। রাস্তার পাশ ঘেঁষে ঝরণা বয়ে যাচ্ছে। কি পরিষ্কার তার পানি। বাসযাত্রীরা আঁজলা ভরে সেই পানি খাচ্ছে।

কিছুদূর এগুতেই যে দৃশ্য দেখলাম তা দেখার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। হাতির খেদা থেকে আনা একপাল হাতি। প্রতিটি হাতির পা দড়ি এবং শিকল দিয়ে বাঁধা। রুগ্ণ ভয়ার্ত চেহারা। সব মিলিয়ে সাত থেকে আটটা হাতি। দু'টি হাতির বাচ্চাও আছে। এরা বাঁধা নয়, ছোটাছুটি করছে। দেখতে অবিকল পুতুলের মত। বাচ্চা দু'টি দেখে মনে হল তারা সময়টা কাটাচ্ছে খুব আনন্দে।

খেদার মালিক এগিয়ে এলেন। বাবাকে বললেন সর্বমোট একুশটা হাতি ধরা পড়েছে। দশটা বিক্রি হয়েছে, তিনটা মারা গেছে। এখানে যে ক'টা আছে সে ক'টাও মারা যাবে। কোন হাতি কিছু খাচ্ছে না। খেদার মালিক বলল, হাতির বাচ্চা একটা নেবেন না-কি স্যার?

বাবা কিছু বলবার আগেই আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম, নিব নিব।

বাবার মুখ দেখে মনে হল প্রস্তাবটা তিনি একেবারে ফেলে দিচ্ছেন না। বিবেচনাধীন আছে। তিনি নিচু গলায় বললেন, দাম কত?

দাম নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। বলতে গেলে বিনা দামে বিক্রি হবে। আপনি চান কি-না বলেন? নিলে আমার উপকার হয়। বাচ্চা দু'টা এখন সমস্যা। ডিসি সাহেব একটা নিবেন বলেছিলেন, এখন বলছেন – না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

হাতির বাচ্চা শেষ পর্যন্ত কেনা হল না। কারণ এরা এখনো দুগ্ধপোষ্য। প্রতিদিন অন্তত দুশ এদের খাওয়াতে হবে। আমরা মন খারাপ করে বাসে ফিরে এলাম। বাবা বললেন, পাহাড়ী জায়গায় আছি — হাতির বাচ্চা জোগাড় করা কোন সমস্যা হবে না। একটা হাতির বাচ্চা কেনা যেতে পারে। আগে একটু গুছিয়ে বসি। তোমাদের মন খারাপ করার কোন কারণ নেই। এই বলে তিনি নিজেই সবচে' বেশি মন খারাপ করলেন। বাস ঠিকঠাক হতে অনেক সময় লাগল। আমরা রাঙ্গামাটি পৌঁছলাম দুপুর বারটায়। আমাদের বাসা মূল শহর থেকে অনেকখানি দূরে। একটা পাহাড়ের মাথা কেটে ছটা বাড়ি বানানো হয়েছে। ঐ ছটা বাড়ির একটা আমাদের। অতি নির্জন জায়গা। চারদিকে ঘন বন। অদ্ভুত সব আওয়াজ আসছে বন থেকে। মা ভীত গলায় বললেন, এ কোথায় এনে ফেললে? বাবার মুখও শুকিয়ে গেল। এরকম বিরাণ ভূমিতে বাসা, তা কোনসময় তিনিও ভাবেননি।

বাসা আমাদের খুব পছন্দ হল। পাহাড়ের উপর বাসায় আমরা থাকব এরকম তো কখনো ভাবিনি। এরকম বাসা মানে আকাশের কাছাকাছি থাকা। কি সৌভাগ্য আমাদের! তারপর যখন শুনলাম আশেপাশে কোন স্কুল নেই, আমাদের স্কুলে যেতে হবে না, তখন মনে হল আমি আনন্দে পাগল হয়ে যাব।

সারাদিন খেলা। নতুন একটা খেলা বের করেছি। পাখি পাখি খেলা। দু'হাত পাখির ডানার মত উঁচু করে এক দৌড়ে পাহাড় থেকে নিচে নামা। এক সময় আপনাআপনি গতি বাড়তে থাকে — মনে হয় সত্যি উড়ে চলেছি — পাখি হয়ে গেছি।

সন্ধ্যার পর বই নিয়ে বসি। সেটাও এক ধরনের খেলা। পড়া-পড়া খেলা। কারণ পড়া দেখিয়ে দেবার কেউ নেই। শাসন করার কেউ নেই।

বাবা প্রায় সারা মাস ট্যুরে থাকেন। মা সবচে' ছোট বোনটিকে নিয়ে ব্যস্ত। বড় মামাও সঙ্গে নেই। এই প্রথম উনি ঠিক করেছেন আমাদের সঙ্গে আসবেন না। বড় হলেও পরিবারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জীবন নষ্ট করার কোন মানে হয় না। নিজের পায়ে দাঁড়াবেন।

ছোট ছোট এতগুলো বাচ্চা সামলিয়ে মাকে একা সংসার দেখতে হয়। তার উপর ভৌতিক সমস্যা দেখা দিল। আমাদের রান্নাঘর অনেকখানি দূরে। মা রান্না করার সময় প্রায়ই দেখতে পান একটা ছায়ামূর্তি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে। তিনি আতংকে অস্থির হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যা মেলাবার পরই সবাইকে একটা ঘরে বন্ধ করে হারিকেন জ্বালিয়ে বসে থাকেন। ঘুমুতে পারেন না। ঐ ছায়ামূর্তিকে অনেক দেখার চেষ্টা করলাম, সে দেখা দিল না। মা ছাড়া তাকে আর কেউ দেখে না। তবে এক সন্ধ্যায় তার খড়মের খটখট শুনলাম। কে যেন খড়ম পায়ে বারান্দায় হাঁটছে। মা ভয়ে শাদা হয়ে গেলেন। উঁচু গলায় আয়াতুল কুরশী পড়তে লাগলেন। সারারাত ঘুমুলেন না, আমাদেরও ঘুমুতে দিলেন না। পরদিন একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটলো। বড় মামা এসে উপস্থিত। তিনি খুব সিরিয়াস

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গলায় বললেন, বুবু ভাববেন না যে আপনাদের সঙ্গে থাকব। দু'দিনের জন্যে এসেছি। আমাকে রাখার জন্য শত অনুরোধ করলেও লাভ হবে না। আমার নিজের একটা জীবন আছে। আপনার ফ্যামিলীর সঙ্গে ঘুরাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

মা বললেন, ঠিক আছে, দু'দিন পরে চলে যাস।

আগেভাগে বলে রাখছি যাতে পরে যন্ত্রণা না করেন।

যন্ত্রণা করব না।

দু'দিন থাকব। মাত্র দু'দিন। দুই দিন দুই রাত।

আচ্ছা ঠিক আছে।

মামার সেই দু'দিন পরবর্তী আট বছরেও শেষ হল না। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতে লাগলেন।

বান্দরবান এসে তিনি সংগীতের দিকে মন দিলেন। জারি গান। নিজেই গান লিখেন — সুর দেন। জারি গান একা একা হয় না। তাল দিতে হয়। তাল দেবার জন্যে একদল শিশু জুটে গেল। মামা মাথায় গামছা বেঁধে একটা লাইন বলেন, আমরা হাততালি দিতে দিতে বলি — আহা বেশ বেশ বেশ।

শুধু বেশ বেশ বললে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও নাড়তে হয়। মাথা নাড়া এবং হাততালির মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় থাকতে হয়। ভুল করলে বড় মামা রাগ করেন।

রাতের বেলা গল্পের আসর। লেপের নিচে বসে তুলারাশি ব্রজকন্যার গল্প শোনার আনন্দের সঙ্গে কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না।

এক রাতে এরকম গল্প শুনছি। হঠাৎ শুনি মটমট শব্দ। তারপর মনে হল চারদিক যেন আলো হয়ে উঠেছে। 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার উঠল। আমাদের ঠিক সামনের বাসায় আগুন ধরে গেছে। বাড়ি কাঠের। টিনের ছাদ। পুরো বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে। পাহাড়ের উপর পানির কোন ব্যবস্থা নেই। আগুনে বাড়ি পুড়ে ছাই হবে — কিছুই করা যাবে না। অবস্থা এমন যে আশেপাশের সবগুলি বাড়িতেও আগুন ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। বড় মামা আমাদের কোলে করে আগুন থেকে যতটা সম্ভব দূরে রেখে আসলেন। আমাদের মাথার উপর ভেজা কম্বল — কারণ আগুনের ফুলকি উড়ে উড়ে আসছে। চোখ বড় বড় করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দেখলাম। ভয়ংকরেরও এক ধরনের সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য থেকেও চোখ ফেরানো যায় না। এক সময় অবাক হয়ে দেখি, জ্বলন্ত বাড়ির টিনের চালগুলি আকাশে উড়তে শুরু করেছে। প্লেনের মত ভোঁ ভোঁ শব্দ করতে করতে একেকটা টিন একেকদিকে উড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বাড়িতে আগুন লেগে গেল, সেখান থেকে তৃতীয় বাড়ি। চারদিকে আগুন নিয়ে ভেজা কম্বল মাথায় দিয়ে আমরা বসে আছি। মনে হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে আগুন আমাদের গ্রাস করবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমাদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবারও কোন উপায় নেই। কি ভয়াবহ অবস্থা!

আশ্রমটিতে আমরা ছিলাম পাঁচ মাসের মত। অগ্নিপর্বের কিছুদিন পরই বাবা আমাদের বদলি হলেন বান্দরবনে। দোহাজারী পর্যন্ত ট্রেন। সেখান থেকে নৌকায়। সারাদিন নৌকা চলল শঙ্খনদীতে। ভোরবেলা এসে পৌঁছলাম বান্দরবন। ঘন অরণ্য-ঘেরা ছোট্ট শহরতলি। অল্প কিছু বাড়িঘর। ইট-বিছানো ছোট্ট একটা রাস্তা। রাস্তার দুপাশের কয়েকটি দোকানপাট।

গ্রামে যেমন সাপ্তাহিক হাট বসে এখানেও তাই। বুধবারে সাপ্তাহিক হাট। পাহাড়ি লোকজন বুধবারে এসে উপস্থিত হয়। কত বিচিত্র জিনিসই তারা বিক্রি করতে আনে। বাঁদরের মাংস, সাপের মাংস। যুবক মেয়েরাও আসে! তাদের কোমরে এক চিলতে কাপড় ছাড়া সারা গা উদোম। কি বিচিত্র জায়গা! বান্দরবন অনেকটা উপত্যকার মত। চারপাশেই পাহাড়। এইসব পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে ঝুম চাষ হয়। প্রতি সন্ধ্যায় একটা না একটা পাহাড় জ্বলতে থাকে।

বান্দরবনের বাসায় প্রথম দিনেই এক কাণ্ড হল। রাত নটার মত বাজে। বাইরে "হেল্প হাম হিউ" — বিকট শব্দ। একসঙ্গে সবাই জানালার কাছে ছুটে এলাম। কি সর্বনাশ! একটা রাক্ষস দাঁড়িয়ে আছে। রাক্ষসের হাতে কেরোসিনের কুপি। সে কেরোসিনের কুপিতে ফুঁ দিতেই তার মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হল। আমরা সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আমার মা পর্যন্ত ভয় পেয়ে বললেন — "এইটা কি?"

রাক্ষস তখন মানুষের মত গলায় বলল, ভয় পাবেন না। ছোট খোকাখুকীরা ভয় পাবেন না। আমি বহুরূপী। ভয় পাবেন না।

বান্দরবনেই আমার প্রথম এবং শেষ বহুরূপী দেখা। এই জিনিস আর কোথাও দেখিনি। সে প্রতিমাসে দু'তিন বার সাজ পোশাক পরে বের হত। কোন রাতে সাজত ভালুক, কোন রাতে জলদস্যু। ভোরবেলা দীন হীন মুখে বাসায় এসে বলত, খোকাখুকীরা আম্মাকে বলেন, আমি বহুরূপী। কিছু সাহায্য দিতে বলেন।

তখন আমার খুব কষ্ট লাগত। মনে হত, সমস্ত পৃথিবীর রহস্য যার হাতের মুঠোয় — সে কি না দিনে এসে মলিন মুখে ভিক্ষা করে। এত অবিচার কেন এই পৃথিবীতে?

এরকম বুনো এবং জংলা জায়গায়ও রাজপ্রাসাদ আছে। মারমা রাজার বাড়ি! দূর থেকে দেখি। কাছে যেতে ভয় ভয় লাগে। মারমারা রাজাকে দেখে দেবতার মত। রাজবাড়ির দিকে চোখ তুলে তাকায় না -- এতে না-কি পাপ হয়।

বান্দরবনের সবই ভাল — শুধু মন্দ দিকটা হল — এখানে একটা স্কুল আছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমাদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হল।

মন পুরোপুরি ভেঙ্গে গেল। স্কুলে আমার একমাত্র আনন্দের ব্যাপার হল মগ রাজার এক মেয়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে। গায়ের রং শঙ্খের মত শাদা। চুল হাঁটু ছড়িয়েও অনেকদূর নেমে গেছে। আমরা ক্লাস সিক্সে পড়ি কিন্তু তাকে দেখায় একজন তরুণীর মত। তার চোখ দু'টি ছোট ছোট, গালের হনু খানিকটা উঁচু হওয়ায় যেন তার রূপ আরো খুলেছে।

ক্লাসে আমি স্যারদের দিকেও তাকাই না। বোর্ডে কি লেখা হচ্ছে তাও পড়তে চেষ্টা করি না। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি রাজকন্যার দিকে। সত্যিকার রাজকন্যা।

আমার এই অস্বাভাবিক আচরণ রাজকন্যার চোখে পড়ল কি-না জানি না, তবে একজন স্যারের চোখে পড়ল। তিনি আমাকে বিষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। প্রতিটি ক্লাসেই তিনি আমাকে প্রশ্নে-প্রশ্নে জর্জরিত করেন, কিন্তু আমাকে আটকাতে পারেন না। কারণ ইতিমধ্যে আমি একটা জিনিস বুঝে ফেলেছি — আমার স্মৃতিশক্তি অসম্ভব ভাল। যেকোন পড়া একবার পড়লেই মনে থাকে। সব পড়াই একবার অন্তত পড়ে আসি। স্যার আমাকে কিছুতেই কায়দা করতে পারেন না। বার বার জাল কেটে বের হয়ে আসি।

কোন অধ্যবসায়ই বৃথা যায় না। স্যারের অধ্যবসায়ও বৃথা গেল না, আমাকে আটকে ফেললেন। সমকোণ কাকে বলে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বলতে পারলাম না।

রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে-ও পারল না। না পারারই কথা।

রাজকন্যারা সব সময়েই খানিকটা হাবা ধরনের হয়। স্যার রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন — পড়া পারনি কেন?

রাজকন্যা জবাব দিল না। তার ছোট ছোট চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল। সেই অশ্রুবর্ষণ দৃশ্যে যে কোন পাষাণ দ্রবীভূত হবে। স্যার দ্রবীভূত হলেন। রাজকন্যাকে বসতে বললেন। আমার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা হল। বিচিত্র শাস্তি। বড় একটা কাগজে লেখা হল —

"আমি পড়া পারি নাই।
আমি গাধা।"

সেই কাগজ গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হল। স্যার একজন দপ্তরিকে ডেকে আনলেন। এবং কঠিন গলায় বললেন, এই ছেলেকে সব ক'টা ক্লাসে নিয়ে যাও। ছাত্ররা দেখুক।

আমি অপমানে নীল হয়ে গেলাম। টান দিয়ে গলার কাগজ ছিড়ে স্যারের দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বললাম, আপনি গাধা। তারপর এক দৌড় দিয়ে স্কুল থেকে বের হয়ে গেলাম। বাসায় ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। আমি শঙ্খনদীর তীর ঘেঁসে দৌড়াচ্ছি। আমাকে যেতে হবে অনেক অনেক দূরে। লোকালয়ে আমার থাকা চলবে না। কেউ যেন কোনদিন আমাকে আর না দেখে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পাঠিয়ে শঙ্খনদীর তীর থেকে বাবা আমাকে ধরিয়ে আনলেন। আমি এখনো কাঁপছি। না জানি কি শাস্তি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

বাবা শান্ত গলায় বললেন, তুমি তোমার স্যারকে যা বলেছ তার জন্য তুমি লজ্জিত?

আমি বললাম — না।

বাবা দ্বিতীয়বার বললেন, তুমি আবার ভেবে চিন্তে বল, তুমি কি লজ্জিত?

লজ্জিত হওয়া উচিত। স্যারেরা তোমাকে পড়ান। তোমাদের শাস্তি দেয়ার অধিকার তাঁদের আছে। তুমি আমার সঙ্গে চল। স্যারের কাছে ক্ষমা চাইবে।

আমি বাবার সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে রওনা হলাম। স্যারের কাছে ক্ষমা চাইলাম। আমার জন্য প্রার্থনার পর বাবা বললেন, মাস্টার সাহেব, আমার এই ছেলেটা খুব অভিমানী। সে বড় ধরনের কষ্ট পেয়েছে। অপমানিত বোধ করেছে। তাকে আমি কয়েকদিন এই স্কুলে পাঠাব না। সে বাসায় থাকবে।

কি বলছেন আপনি?

আমার ছেলের অপমান আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। বাবা আমাকে কোলে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। পরদিন হেড মাস্টার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের সব শিক্ষক বাসায় উপস্থিত। তাঁরা বাবাকে রাজি করাতে এসেছেন যাতে আমি আবার স্কুলে যাই। বাবা রাজি হলেন না। তাঁর এক কথা, আমি তাকে স্কুলে পাঠাব না।

সারাদিন একা একা বাসায় থাকি। কিছুতেই সময় কাটে না। ছোট দুই ভাইবোন স্কুলে। মা ব্যস্ত। আমার কিছু করার নেই। আমি স্কুলের সময়টা শঙ্খনদীর তীর ধরে হেঁটে হেঁটে কাটাই।

বাবা মাঝে মাঝে আমাকে ট্যুরে নিয়ে যান। কখনো রুমা, কখনো বান্দরবান, কখনো রাঙ্গামাটি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার পেছনে বাবার যে উদ্দেশ্য কাজ করছিল তা হল প্রকৃতির রূপের দিকে আমার চোখ ফেরানো। তিনি আমাকে মোটা একটা খাতা এবং কলম দিলেন যাতে আমি কি কি দেখছি তা গুছিয়ে লিখি। একদিন খাতা দেখতে চাইলেন।

যা যা লেখা হয়েছে তা পড়ে বড়ই বিরক্ত হলেন। প্রকৃতি সম্পর্কে খাতায় কিছুই লেখা নেই। যা লেখা তা পড়ে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দিলেই পরিস্কার হবে।

মঙ্গলবার
আজ আমরা রুমা থানায় পৌঁছিয়াছি।
দুপুরে ভাত খাইয়াছি। মুরগির গোশ্‌ত এবং আলু। ডাল ছিল।
ডাল খাই নাই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাবা বললেন, তুই কি দিয়ে ভাত খেলি তা বিতং করে লেখার কি দরকার? অন্যরা এই খবর জেনে কি করবে?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, অন্যদের জন্যে তো আমি লিখি নাই। আমি লিখেছি আমার জন্য।

কোন দিন কি খেয়েছিস তার খোঁজেই বা তোর কি দরকার? এই যে এত সুন্দর জলপ্রপাত তোকে দেখিয়ে আনলাম সেই প্রপাতটার কথা লিখলি না কেন?

জলপ্রপাতের কথা লিখলে কি হবে?

যারা জলপ্রপাতটা দেখেনি তারা লেখা পড়ে বুঝবে জিনিসটা কেমন। যা, লিখে নিয়ে আয়। দেখি পারিস কি-না।

সেই জলপ্রপাত আমাকে মোটেই আকর্ষণ করেনি। ছোট্ট পানির ধারা উপর থেকে নিচে পড়ছে। নিচে গর্ত মত হয়েছে। গর্ত ভর্তি ঘোলা পানি। জলপ্রপাতের একটি জিনিস আমার ভাল লাগল — পানির ধারার চারদিকে সূক্ষ্ম জলচূর্ণের জন্যে অসংখ্য রামধনু দেখা যায়। আমি রামধনু সম্পর্কে লিখলাম। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে — ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি বালকের সেই লেখা পড়ে আমার সাহিত্যিক বাবা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শুধু মুগ্ধ না — প্রায় অভিভূত হবার মত অবস্থা।

জলপ্রপাত বিষয়ক রচনার কারণে উপহার পেলাম — রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। গল্পগুচ্ছের প্রথম যে গল্পটি পড়ি তার নাম 'মেঘ ও রৌদ্র' পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। তারপর চোখ মুছে আবার গোড়া থেকে পড়া শুরু করলাম। আমার নেশা ধরে গেল।

বান্দরবন পুলিশ লাইব্রেরিতে অনেক বই।

বাবা সেই লাইব্রেরির সেক্রেটারি। রোজ বই নিয়ে আসেন। আমি সারাদিন পড়ি। মাঝে মাঝে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হয়। সেই যন্ত্রণা নিয়েও পড়ি। বিকেলে শঙ্খনদীর তীরে বেড়াতে যাই।

নদীর তীরেই আমার পরিচয় হল নিশাদাদার সঙ্গে। তাঁর ভাল নাম নিশানাথ ভট্টাচার্য, তাঁর বাবা পুলিশের এ.এস.আই। নিশাদাদা বিরাট জোয়ান। কয়েকবার মেট্রিক দিয়েছেন — পাস করতে পারেননি। পড়াশোনায় তাঁর কোন মন নেই। তাঁর মন শরীরচর্চায়। নদীর তীরে তিনি ঘণ্টা খানিক দৌড়ান। ডন-বৈঠক করেন। শেষ পর্যায়ে সারা গায়ে ভেজা বালি মেখে নদীর তীরে শুয়ে থাকেন। এতে না-কি রক্ত ঠাণ্ডা হয়। রক্ত ঠাণ্ডা হওয়া শরীরের জন্য ভাল।

স্বাস্থ্যরক্ষার নানান উপদেশ তিনি আমাকেও দেন। কথায় কথায় বলেন — **Health is wealth.** বুঝলে হুমায়ূন, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাঁর সঙ্গে যে কোন গল্প করলেই তিনি কিভাবে কিভাবে জানি সেই গল্প স্বাস্থ্যরক্ষায় নিয়ে যান। আমার বড় মজা লাগে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শেষ ঘোর বর্ষা।

বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত। নিশাদাদা ভিজতে ভিজতে আমাদের বাসায় এসে হাজির। আমার মাকে ডেকে বললেন, মাসিমা, মাছ ধরতে যাচ্ছি। খেপ জালে মাছ ধরা। হুমায়ূনকে নিয়ে যাচ্ছি। একা একা মাছ ধরতে ভাল লাগে না। দর্শক ছাড়া মাছ ধরা যায় না। ছাতা দিয়ে দিন। ছাতা থাকলে বৃষ্টিতে ভিজবে না।

নিশাদাদার সঙ্গে ছাতা-মাথায় আমিও রওনা হলাম। নদীর তীরে এসে মুখ শুকিয়ে গেল। ঘোলা পানিতে শঙ্খনদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তীব্র স্রোত। বড় বড় গাছের গুড়ি ভেসে আসছে। এই শঙ্খনদী আগের ছোট্ট পাহাড়ী নদী না — এই নদী মূর্তিমতী মৃত্যু।

নিশাদাদা জাল ফেললেন। কি যেন ঘটে গেল। শঙ্খনদী যেন হাত বাড়িয়ে তাঁকে কোলে নিয়ে নিল। একবারের জন্যও তার মাথা ভেসে উঠল না। আমি ছুটতে ছুটতে চিৎকার করতে করতে বাসায় ফিরলাম।

নিশাদাদার লাশ পাওয়া গেল সন্ধ্যায়। সাত মাইল ভাটিতে। আমার সমস্ত পৃথিবী উলট পালট হয়ে গেল। পরের অবিশ্বাস্য ঘটনাটি লিখতে সংকোচ লাগছে, না লিখেও পারছি না।

সেই রাতের ঘটনা।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাবা মাত্র শ্মশান থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে বসেছেন। মা জেগে আছেন। পুরো ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা দু'জনই আচ্ছন্ন। হঠাৎ তাঁদের কানে মনে হল কে যেন বারান্দায় হেঁটে হেঁটে আসছে। আমাদের ঘরের সামনে এসে পদশব্দ থেমে গেল। অবিকল নিশাদাদার গলায় কে যেন বলল, হুমায়ূনের খোঁজে এসেছি। হুমায়ূন কি ফিরেছে?

বাবা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বের হলেন। চারদিকে ফকফকা জোছনা। কোথাও কেউ নেই।

এই ঘটনার নিশ্চয়ই কোন লৌকিক ব্যাখ্যা আছে। বাবা-মা দু'জনেই ঐ রাতে একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। আচেতন মনে ছিল মৃত ছেলেটি। তাঁরা এক ধরনের অডিটরি হেলুসিনেশনের স্বীকার হয়েছেন। এইতো ব্যাখ্যা। আমি নিজেও এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছি। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্য ব্যাখ্যাটিই বা খারাপ কি? একজন মৃত মানুষ আমার প্রতি গভীর ভালবাসার কারণে ছুটে এসেছে অশরীরী জগৎ থেকে। উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করছে — হুমায়ূন কি ফিরেছে?

আমার শৈশব কেটে গেল মানুষের ভালবাসা পেয়ে পেয়ে।

কি অসীম সৌভাগ্য নিয়েই না আমি এই পৃথিবীতে জন্মেছি!

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নিশাদাদার মৃত্যুর পরপর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শিশু-মন মৃত্যুর এই চাপ সহ্য করতে পারল না। প্রচণ্ড জ্বরে আচ্ছন্ন থেকে কয়েকদিন কেটে গেল। মাঝে মাঝে মনে হত আমি শূন্যে ভাসছি। শরীরটা হয়ে গেছে পাখির পালকের মত। সারাক্ষণ একটা ঘোর ঘোর অবস্থা। এই ঘোরের মধ্যেই আমাকে দেখতে এল মুরং রাজার মেয়ে। সহপাঠি রাজকন্যা। আচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে সেদিন আরো সুন্দর মনে হল। পৃথিবীর সমস্ত রূপ যেন সে তার শরীরে ধারণ করেছে।

সে অনেক কথাই বলল। তার কিছুই আমার মনে নেই, শুধু মনে আছে, এক সময় মাথা দুলাতে দুলাতে বলছে — তুমি এত পাগল কেন?

তার এই সামান্য কথা — কি যে ভাল লাগল! সেই ভাললাগায় এক ধরনের কষ্টও মিশে ছিল। যে কষ্টের জন্ম এই পৃথিবীতে নয় — অন্য কোন অজানা ভুবনে।

আমার শৈশব কেটে গেছে দুঃখ মেশানো আনন্দে-আনন্দে। যতই দিন যাচ্ছে সেই আনন্দের পরিমাণ কমে আসছে। আমি জানি, এক সময় আমার সমস্ত পৃথিবী দুঃখময় হয়ে উঠবে। তখন যাত্রা করব অন্য ভুবনে, যেখানে যাবতীয় আনন্দ-বেদনার জন্ম।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে সিলেটের মীরাবাজারের বাসায় এক গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, দেখি মশারির ভেতর ঠিক আমার চোখের সামনে আলোর একটা ফুল ফুটে আছে। বিস্ময়, ভয় ও আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম — এটা কি, এটা কি?

বাবা জেগে উঠলেন, মা জাগলেন, ভাইবোনেরা জাগল। বাবা আমার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, জোছনার আলো ঘরের ভেন্টিলেটর দিয়ে মশারির গায়ে পড়েছে। ভেন্টিলেটরটা ফুলের মত নকশা কাটা। কাজেই তোমার কাছে মনে হচ্ছে মশারির ভেতর আলোর ফুল। ভয়ের কিছুই নেই, হাত বাড়িয়ে ফুলটা ধর।

আমি হাত বাড়াতেই সেই আলোর ফুল আমার হাতে উঠে এল কিন্তু ধরা পড়ল না। বাকি রাতটা আমার নির্ঘুম কাটল। কতবার সেই ফুল ধরতে চেষ্টা করলাম — পারলাম না। সৌন্দর্যকে ধরতে না-পারার বেদনায় কাটল আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন। আমি জানি সম্ভব না, তবু এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি যদি একবার জোছনার ফুল ধরতে পারি — মাত্র একবার। এই পৃথিবীর কাছে আমার এর চেয়ে বেশি কিছু চাইবার নেই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



ম স্লাওয়ার

দেশের বাইরে বেড়াতে যাবার সুযোগে আনন্দিত হন না এমন মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প। আমি সেই খুব অল্পদের একজন। বাইরে যাবার সামান্য সম্ভাবনাতেই আমি আতংকগ্রস্ত হই। আতংকগ্রস্ত হবার কারণ আছে — এখন পর্যন্ত আমি কোন বিদেশযাত্রা নির্বিঘ্নে শেষ করতে পারিনি।

একবার কিছু লেখকের সঙ্গে চীন গিয়েছিলাম। আমাদের দলনেতা ফয়েজ ভাই। তিনি সারাক্ষণ আমাকে গার্ড দিয়ে রাখছেন যাতে হারিয়ে না যাই। তাঁর ধারণা, প্রথম সুযোগেই আমি হারিয়ে যাব। হারালাম না, তবে চোখে খোঁচা লাগিয়ে মহাবিপদ বাধালাম। ডাক্তার দুটি চোখ ব্যান্ডেজ করে বন্ধ করে দিলেন। পুরো অন্ধ। লেখকরা আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি তাদের পেছনে তাদের হাত ধরে ধরে হাঁটছি। এই হচ্ছে আমার চীন দেখা।

পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে গিয়ে কি ঝামেলায় পড়েছিলাম একটু বলে নেই। সাতদিনের জন্যে গিয়েছি বোম্বে। এলিফেন্ট গুহা, অজন্তা ইলোরা সব দেখা হল। কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই হল। এখন দেশে ফিরব। রাত তিনটায় প্লেন। বাংলাদেশ বিমান। বলা তো যায় না, আমার যা কপাল, প্লেন যদি আগেভাগে চলে আসে! এই ভয়ে রাত দুটা থেকে এয়ারপোর্টে বসে আছি। সঙ্গে টাকা-পয়সা যা ছিল সব শেষ মুহূর্তের বাজারে শেষ করা গেল। এখন বিমানের জন্যে অপেক্ষা। যথাসময়ে ইংল্যান্ড থেকে বিমান এল। বোর্ডিং পাস নিতে গেছি, বাংলাদেশ বিমানের লোকজন বলল, এক্সেস থেকে প্লেন ওভারবুকিং হয়ে এসেছে, আপনাকে নেয়া যাবে না। আমি আঁৎকে উঠে বললাম, সে কি! চব্বিশ ঘণ্টা আগেই তো টিকিট ওকে করানো।

'বললাম তো, যাত্রী বোঝাই। কিচ্ছু করা যাবে না।'

প্লেন আমাকে রেখে চলে গেল। শীতের রাত। সঙ্গে একটা পয়সা নেই। এখানে কাউকে চিনিও না। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে . . .

এইসব তো ছোটখাট বিপদ। ইংল্যান্ডের হিথ্রো বিমান বন্দরে একবার মহাবিপদে পড়েছিলাম। দুই কন্যা এবং স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরছি। পাসপোর্ট যাতে নিরাপদে থাকে সেইজন্যে গুলতেকিনের হ্যান্ডব্যাগে রাখা আছে। গুলতেকিন আমার স্ত্রীর নাম। এই ভয়াবহ নাম তার দাদা রেখে গেছেন। বিয়ের পর বদলাতে চেয়েছিলাম, পারিনি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'চাঁদের মাটি দেখেছেন?'

'চাঁদের মাটি তো বাংলাদেশেই দেখেছি। উনিশশো সত্তর সনে আমেরিকান অ্যাপোলো চন্দ্রশিলা নিয়ে এসেছিল।'

'চাঁদের মাটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছেন?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'চাঁদের মাটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখা যায়?'

'হ্যাঁ যায়। মিউজিয়ামে সেই ব্যবস্থা আছে। যাবেন।?'

'অবশ্যই যাব। চাঁদের মাটি স্পর্শ করা তো চাঁদকে স্পর্শ করা। এই সুযোগ পাওয়া যাবে তা তো কখনো কল্পনা করিনি।'

আনন্দে আমার চোখ ঝলমল করতে লাগল। ইয়াসমিন হাসতে হাসতে বলল, আমি জানতাম চন্দ্রশিলা হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় শুনে আপনি খুব এক্সাইটেড ফিল করবেন। এই কারণেই সবার শেষে আপনার জন্যে এই প্রোগ্রাম রেখে দিয়েছি।

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে বিকেলে পৌঁছলাম মিউজিয়ামে। অনেক কিছুই দেখার আছে সেখানে — রাইট ব্রাদার্সের তৈরি প্রথম বিমান, যে লুনার মডিউল চাঁদে নেমেছিল — সেই লুনার মডিউল, আরো কত কি . . . !

কিছুই দেখলাম না, এগিয়ে গেলাম চন্দ্রশিলার দিকে।

উঁচু একটি আসনে চাঁদের মাটি সাজানো। উপরে লেখা — এই চন্দ্রশিলা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে।

আমি এবং গুলতেকিন একসঙ্গে চাঁদের পাথরে হাত রাখলাম। আমার রোমাঞ্চ বোধ হল। গভীর আবেগে চোখে পানি এসে গেল। কত-না পূর্ণিমার রাত মুগ্ধ চোখে এই চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় ও আবেগে অভিভূত হয়েছি। সেই চাঁদ আজ স্পর্শ করলাম। আমার এই মানবজীবন ধন্য।

আমেরিকার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধে মন দ্রবীভূত হল। আমেরিকানদের অনেক দোষ ত্রুটি, তবুও তো এরা আমাকে এবং আমার মত আরো অসংখ্য মানুষকে রোমাঞ্চ ও আবেগে অভিভূত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। ধরাছোঁয়ার বাইরের যে চাঁদ, তাকে নিয়ে এসেছে মাটির পৃথিবীতে। এই শতক শেষ হবার আগেই তারা যাত্রা করবে মঙ্গলগ্রহের দিকে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে আবারও অভিভূত করবে। আমেরিকা আমি পছন্দ করি না, তবু চন্দ্রশিলায় হাত রেখে মনে মনে বললাম — তোমাদের জয় হোক।

ইয়াসমিন ক্যামেরা হাতে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। কোমল গলায় বলল, দাদাভাই হাসুন, আপনাদের তাঁবু খুলে যাচ্ছি. আপনি চাঁদের মাটিতে হাত দিয়ে এমন মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org



গাঢ় যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙল। মনে হল সারা গায়ে কাঁটা ফুটে গেছে। নির্ঘাত কোন দুঃস্বপ্ন। সাম্প্রতিক ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন দেখছি। আমি চোখ মেলে দেখি — দুঃস্বপ্ন নয়, আসলেই কাঁটা ফুটেছে। বিছানাময় গোলাপ ফুল। পাশ ফিরতেই গায়ে গোলাপের কাঁটা বিধল। ব্যাপার বুঝতে বেশি সময় লাগল না। আজ আমার জন্মদিন। আমার কন্যারা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে বিছানাময় কাঁটাসুদ্ধ গোলাপ বিছিয়ে রেখেছে। ফুলের কাঁটাই বিঁধেছে। ফুলশয্যা সবসময় আনন্দময় নয়।

আমি আবার চোখ বন্ধ করে ফেললাম। এখন জেগে উঠা যাবে না। আমার কন্যারা নিশ্চয় আমাকে জাগাবার জন্যেও কোন বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওদের বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। কাঁটার ঘা শরীরে নিয়ে গভীর ঘুমের ভান করলাম।

বিকট শব্দে রেকর্ড প্লেয়ার বেজে উঠলো। এই হচ্ছে আমাকে জাগাবার কৌশল। কয়েকদিন ধরে যে গানটি বাজাচ্ছি কন্যারা সেই গানটি ফুল ভল্যুমে দিয়ে দিয়েছে। কানের পর্দা ফেটে যাবার অবস্থা। সুচিত্রা মিত্র আকাশ ফাটিয়ে গাইছেন,

"পাখি আমার নীড়ের পাখি
অধীর হল কেন জানি
আকাশ কোণে যায় শোনা কি
ভোরের আলোর কানাকানি।।"

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। তিন কন্যা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো —"হেপি বার্থ ডে!" বড় কন্যার হাতে একটা ট্রে। সেই ট্রে'তে একটা কাপ। কানায় কানায় ভর্তি চা। উপরে দুধের সর ভাসছে। মনে হচ্ছে কন্যারা তাদের সমস্ত প্রতিভা ব্যয় করে চা বানিয়েছে।

আমি বিছানায় গোলাপ দেখে বিস্মিত হবার ভান করলাম, আমার প্রিয় গানটি বাজছে দেখে মহা আনন্দিত হবার ভান করলাম। ওদের বানানো হিমশীতল সরবত সদৃশ চা মুখে দিয়ে তৃপ্তির ভান করলাম। ছোট মেয়ে বলল, আব্বু, তোমার কী খুব আনন্দ হচ্ছে?

আমি বললাম, হচ্ছে। এত আনন্দ হচ্ছে মনে হয় চোখে পানি এসে যাবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আমাদেরো খুব আনন্দ হচ্ছে। কারণ আজ আমরা কেউ স্কুলে যাচ্ছি না। সারাদিন ঘরে থাকব।'

'খুব ভাল কথা।'

'আজ আমরাই তোমার জন্য রান্না করব।'

'তোমরা কী রান্না জান?'

'না, জানি না — মা দেখিয়ে দেবে।'

'খুব ভাল।'

'আমাদের চা কেমন লাগল বাবা?'

'অসাধারণ লাগল। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সেরা চা খাচ্ছি।'

'আরেক কাপ বানিয়ে নিয়ে আসব?'

'না, আর আনতে হবে না।'

'জন্মদিনে তোমার জন্য আমরা উপহার কিনেছি। শার্ট কিনেছি।'

'বাহ্ বাহ্ — কোথায়?'

তিন কন্যার কিনে-আনা উপহার গায়ে দিলাম। পৃথিবীর সমস্ত মেয়েরাই মনে করে তাদের বাবা বিশালকায় একজন মানুষ। আমার মেয়েরাও যে তার ব্যতিক্রম না তাদের কেনা শার্ট গায়ে দিয়ে পরিষ্কার বোঝা গেল। শার্ট পাঞ্জাবীর চেয়েও লম্বা। কাঁধের ঝুল নেমে এসেছে কনুই-এ।

মেজো মেয়ে শংকিত গলায় বলল, শার্টটা কী তোমার একটু বড় বড় লাগছে?

'না তো। গায়ে খুব ভাল ফিট করেছে। আজকাল লম্বা শার্ট পরাই ফ্যাশন।'

হাজী সাহেবের লম্বা কুর্তার মত শার্ট গায়ে দিয়ে বারান্দায় এসে দেখি মেঝেময় ভাঙা কাচের টুকরা। ফুলদানিতে ফুল রাখতে গিয়ে কন্যারা দুটো ফুলদানি ভেঙেছে। কাজের মেয়েকে ভাঙা কাচ সরাতে দেয়া হচ্ছে না-কারণ এই বিশেষ দিনে আমার তিন কন্যাই না-কি ঘরের সব কাজ করবে।

বারান্দায় এসে বসলাম। রবীন্দ্র সংগীত বন্ধ হয়েছে বলে খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছি। দিনের শুরুতে রিবন্দ্র সংগীত শুনতে আমার ভাল লাগে না। এক কাপ চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। বলার সাহস পাচ্ছি না। বলামাত্রই তিনজন ছুটে যাবে রান্নাঘরে। আগুন-টাগুন ধরিয়ে একটা কাণ্ড করবে।

মেজো মেয়ে বলল, বাবা, তোমার কেমন লাগছে?

'খুব ভাল লাগছে, মা।'

'আনন্দ হচ্ছে?'

'অসম্ভব আনন্দ হচ্ছে।'

'তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না।'

আমি আনন্দিত হবার অভিনয় করলাম, অভিনয় খুব ভাল হল না। বড় মেয়ে বলল, বাবা গান দেব?

'গান থাক মা।'

'তোমার সব প্রিয় গান ক্যাসেট করে রেখেছি।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পালে দাও।'

প্রথম গানটি কী কাকতালীয় ভাবেই মিলে গেল — অবুন্ধতী হোম গাইছেন,

"সখী বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা।
একি আর ভাল লাগে?"

আচ্ছা, আজ আমার হয়েছেটা কী? এত চেনা গান অচেনা লাগছে কেন? কত শতবার এই গান শুনেছি, কই কখনো তো এত বিষণ্ন বোধ করি নি? আজ কেন পাথরের মতো মনে হচ্ছে — বেলা তো চলেই গেল। হাসি-খেলায় বেলা পার করে দিলাম। আর তো ভালো লাগছে না।

কেউ যেন কানের কাছে গুনগুন করে বলছে — না চাইতেই তুমি অনেক পেয়েছ। এ জীবনে তুমি দেখেছ ৫১৬টি ভরা পূর্ণিমা। তুমি পার করেছ ৪৩টি বর্ষা। এত সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

বাবা-মা'র যে ভালোবাসায় আমার জন্ম, তাতে মনে হয় কোনো খাদ ছিল না। দীর্ঘ ৫৩ বছরে একদিনের জন্যেও আমার মনে হয়নি বৃথাই এই পৃথিবীতে জন্মেছি। প্রচণ্ড দুঃসময়েও বেঁচে থাকার আনন্দ অনুভব করেছি। বৈশাখ মাসে যখন আকাশ অন্ধকার করে কালবোশেখী আসে, তখন মনে হয়, কী ক্ষতি ছিল পৃথিবীটা যদি আরেকটু কম সুন্দর হত। এত সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যাব কী করে?

অয়োময়ের জন্যে গান লিখতে গিয়ে লিখেছিলাম, "আমার মরণ চাঁদনি পহর যাইতে যেন হয়।" আজ মনে হচ্ছে ভুল গান লেখা হয়েছে, ভুল প্রার্থনা। চাঁদনি পহর যাতে আমি মরতে পারব না। নতুন গান লিখতে হবে। প্রার্থনা জানাতে হবে যেন ভরা জোৎস্নায় সেই বিশেষ পাল্কি আমার দুয়ারে এসে না থামে।

একবার নর্থ ডাকোটা থেকে গাড়িতে করে সিয়াটল যাচ্ছি, পথে মন্টানায় বিশ্রামাপনের জন্য থামলাম। চারদিকে পাহাড়ঘেরা সমতলভূমি। বাচ্চাদের হোটেলে শুইয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। রূপার থালার মত প্রকাণ্ড চাঁদ উঠেছে। অপূর্ব জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না ভেঙে আলো-আঁধারের অপূর্ব নকশা তৈরি হয়েছে পাহাড়ের গায়ে। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মহান সৌন্দর্যের মুখোমুখি হলে এক ধরনের তীব্র হাহাকার মনের ভেতরে আপনা-আপনি জন্মায় -- সুন্দরের উৎস সন্ধানে ব্যাকুলতা জাগে।

সৌন্দর্য দেখে দেখে জীবন কাটিয়ে দিলাম, এই সুন্দরের জন্ম কোথায়, কোন দিন তার খোঁজ করলাম না। এই জীবনে সম্ভব হল না — হায়! অন্য কোন জীবনও তো নেই, থাকলে চেষ্টা করা যেত।

ছোটবেলায় আমাদের মীরাবাজারের বাসায় একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ বেড়াতে আসতেন। আমার বাবা-মা দু'জনই ছিলেন তাঁর ভক্ত। এই চিরকুমার মানুষটি না-কি মহাপুরুষ পর্যায়ের। ঘুরে বেড়াতেন খালি পায়ে, অতি তুচ্ছ বিষয়ে হা-হা করে হাসতেন। তখন আমার ধারণা হল — মহাপুরুষদের খালি পায়ে থাকতে হয়, অকারণে হাসতে হয়। এক সন্ধ্যার কথা-তিনি বেড়াতে এসেছেন। মা বললেন, আপনি খুব ভালো দিনে এসেছেন, আমার কাজলের জন্যে একটু প্রার্থনা করুন। আজ কাজলের জন্মদিন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তিনি আমাকে টেনে কোলে তুলে বললেন — গা দিয়ে ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছে, কী রে ব্যাটা, গায়ে ঘামের গন্ধ কেন? এই বলেই চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করলেন, পরম করুণাময়, এই ছেলের অন্তর থেকে তুমি অন্ধকার দূর কর।

তাঁর প্রার্থনা ঈশ্বর গ্রহণ করেন নি। আমার অন্তরে এমন সব অন্ধকার আছে যা দেখে আমি নিজেও মাঝে মাঝে ভয়ে চমকে উঠি। কাউকে সেই অন্ধকার দেখতে দেই না। আলোকিত অংশটাই দেখতে দেই, কারণ এই আঁধার আমার আপন আঁধার; আমার নিজস্ব অনন্ত অম্বর।

হুমায়ূন আহমেদ
১৩ই নভেম্বর ১৯৯১

এই জীবনে বেশির ভাগ কাজই আমি করেছি ঝোঁকের মাথায়। হঠাৎ একটা ইচ্ছে হল, কোনদিকে না তাকিয়ে ইচ্ছাটাকে সম্মান দিলাম। পরে যা হবার হবে; দু'একটা উদাহরণ দেই — আমাদের সময় সায়েন্সের ছেলেদের ইউনিভার্সিটিতে এসে ইংরেজী বা ইকনমিক্স পড়া ছিল ফ্যাশন। আমিও ফ্যাশনমত ইকনমিক্সে ভর্তি হয়ে গেলাম। এক বন্ধু পড়বে কেমিস্ট্রি। তাকে নিয়ে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে এসেছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। কেমিস্ট্রির একজন স্যার হঠাৎ বারান্দায় এলেন। তাঁকে দেখে আমি মুগ্ধ। কী স্মার্ট, কী সুন্দর চেহারা! তিনি কী মনে করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম ইকনমিক্স জলে ভেসে যাক। আমি পড়ব কেমিস্ট্রি। ভর্তি হয়ে গেলাম কেমিস্ট্রিতে। ঐ স্যারের নাম মাহবুবুল হক; কালিনারায়ণ স্কলার। ভৌত রসায়নের ওস্তাদ লোক। যিনি অংক কষিয়ে কষিয়ে পরবর্তী সময়ে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন!

পি এইচ ডি করতে গেলাম ভৌত রসায়নে। কোর্স ওয়ার্ক সব শেষ করেছি। দু'বছর কেটে গেছে। একদিন বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট টানছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তিনশ' দশ নম্বর রুমে বুড়ো এক ভদ্রলোক ক্লাস নিতে ঢুকলেন। রোগা লম্বা একজন মানুষ। গায়ে আলখাল্লার মত কোট। আমার কী যে খেয়াল হল কে জানে। আমিও সেই ক্লাসে ঢুকলাম। সমস্ত কোর্স শেষ করেছি, আর কোর্স নিতে হবে না। কাজেই এখন নিশ্চিন্ত মনে একটা ক্লাসে ঢোকা যায়।

বুড়ো ভদ্রলোকের নাম জেনো উইক্স্। পলিমার রসায়ন বিভাগের প্রধান। আমি তাঁর লেকচার শুনে মুগ্ধ। যেমন পড়ানোর ভঙ্গি তেমনই বিষয়বস্তু। দৈত্যাকৃতি অণুর বিচিত্র জগৎ। ক্লাস শেষে আমি তাঁকে গিয়ে বললাম, আমি আপনার বিভাগে আসতে চাই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] প্রফেসর সব শুনে খুব রাগ করলেন। আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন। তুমি যা করতে যাচ্ছ, খুব বড় ধরনের বোকামিও তা করে না। পি-এইচ ডি [illegible] তোমার অনেক দূর এগিয়েছে। কোর্স ওয়ার্ক শেষ করেছ এবং খুব ভালভাবে পাশ। এখন বিভাগ বদলাতে চাও কেন? মাথা থেকে এসব ঝেড়ে ফেলে দাও।

[illegible] ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। ঢুকে গেলাম পলিমার রসায়নে। প্রফেসর [illegible] চেষ্টা অনেক করলেন। আমাকে ভাল একটা স্কলারশীপ দিলেন। বইপত্র [illegible] সাহায্য করলেন। কাজ শুরু করলাম পলিমার রসায়নের আর এক জাঁদরেল [illegible] প্রফেসর গ্লাসের সঙ্গে। পলিমারের সব কোর্স যখন নিয়ে শেষ করেছি তখন প্রফেসর গ্লাস আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন, মাই ডিয়ার সান, দয়া করে এখন শখের বসে অন্য কোন ক্লাসে গিয়ে বসবে না। ডিগ্রী শেষ কর। আরেকটা কথা — [illegible] আমেরিকান সিটিজেনশীপ পাওয়ার ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

আমি বললাম, আমেরিকান সিটিজেনশীপ দিয়ে আমি কী করব?

'তুমি চাও না?'

'না, আমি চাই না; ডিগ্রী হওয়ামাত্র আমি দেশে ফিরে যাব।'

'বিদেশী ছাত্ররা শুরুতে সবাই এ-রকম বলে। শেষে আর যেতে চায় না।'

'আমি চাই।'

ডিগ্রী শেষ করে দেশে ফিরলাম। সাত বছর আমেরিকায় কাটিয়ে যে সম্পদ নিয়ে এলাম তা হল নগদ পঞ্চাশ ডলার, দুই স্যুটকেস ভর্তি বাচ্চাদের পুরানো খেলনা, এক স্যুটকেস বই এবং প্রচুর চকলেট!

আমি যে সব সময় ইমপালস্-এর উপর চলি তা কিন্তু না; কাজে-কর্মে, চিন্তা-ভাবনায় আমি শুধু যে গোছানো তা না, অসম্ভব গোছানো। কখন কী করব, কতক্ষণ করব তা আগে ভাগে ঠিক করা, কঠিন কঠিন। সময় ভাগ করা তারপরেও হঠাৎ হঠাৎ কেন জানি মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। উদ্ভট একটা কাণ্ড করে বসি। কোন সুস্থ মাথার মানুষ যা কখনো করবে না।

গুলতেকিনের সঙ্গে বিয়ে হয় এমন ঝোঁকের মাথায়। তখন আমি হতদরিদ্র। লেকচারার হিসেবে ইউনিভার্সিটি থেকে সব মিলিয়ে সাত শ' আটশ' টাকা পাই। দুই ভাইবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাবর রোডের এক বাসায় থাকি। সে বাসা সরকারী বাসা। এভিকশন নোটিস হয়ে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট নিজে এসে বলে গেছেন বাড়ি ছেড়ে দিতে। পনেরো দিনের নোটিস। বাড়ি না ছাড়লে পুলিশ দিয়ে উঠিয়ে দেয়া হবে। টাকা পয়সার দিক দিয়ে একেবারে নিঃস্ব। মাসের শেষের দিকে বেশির ভাগ সময়ই বাসে করে ইউনিভার্সিটিতে আসার পয়সাও থাকে না। হেঁটে হেঁটে আমি ক্লাসে যাই। ক্লাস শেষ করে ক্লান্ত হয়ে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরি। নিতান্ত পাগল না হলে এমন অবস্থায় কেউ বিয়ের চিন্তা করে না। আমি করলাম এবং আমার মনে হল গুলতেকিন নাম্নী এই বালিকাটিকে পাশে না পেলে আমার চলবে না। গুলতেকিনের মা-বাবা আমার কাছে মেয়ে বিয়ে দেবেন না। বড় মেয়েরই বিয়ে হয় নি। ক্লাস টেনে-পড়া মেয়ের বিয়ে হবে কি করে? কী করা যায় কিছুই ভেবে পাই না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

একদিন গুলতেকিন ডিপার্টমেন্টে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি বললাম, চল এক কাজ করি — আমরা কোর্টে বিয়ে করে ফেলি।

সে চোখ বড় বড় করে বলল, কেন? কোর্টে বিয়ে করব কেন?

'খুব মজা হবে। নতুন ধরনের হবে। ব্যাপারটা খুব নাটকীয় না? তোমাকে ভাবার জন্যে তিন মিনিট সময় দিলাম। তুমি ভেবে দেখ, তারপর বল।'

সে ভাবার জন্যে তিন মিনিটের মত দীর্ঘ সময় নিল না। এক মিনিট পরেই বলল, চলুন যাই। কিন্তু আমি তো শাড়ি পরে আসি নি। সালোয়ার-কামিজ পরে কী বিয়ে করা যায়?

কোর্টে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না। কনের বয়স পনের। এই বয়সে বিয়ে হয় না। আমি কোন উপায় না দেখে তার ফুপু খালেদা হাবীবকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। আমার সাহিত্যপ্রতিভার পুরোটাই ঢেলে দিলাম চিঠিতে। চিঠি পড়ে তিনি বিস্মিত এবং খুব সম্ভব মুগ্ধ। কারণ তিনি গুলতেকিনের পরিবারের সবাইকে ডেকে দৃঢ় গলায় বললেন, এই ছেলের সঙ্গেই গুলতেকিনের বিয়ে দিতে হবে। অন্য কোথাও নয়। ভবিষ্যতে যা হবার হবে।

আমার চিঠির জবাবে তিনি আমাকে লিখলেন — "আপনার অদ্ভুত চিঠি পেয়েছি। এত বানান ভুল কেন?"

তাঁরা ক্লাস টেনে-পড়া মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে বিয়ে হবে। এই খবরে আমার এবং আমার মা'র মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হাতে একটা পয়সা নেই। যে কোন মুহূর্তে আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। এই অবস্থায় বিয়ে! কে জানে নতুন বউ নিয়ে বাসায় এসে দেখা যাবে পুলিশ দিয়ে সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। নতুন বউ নিয়ে রাস্তায় রাত কাটাতে হবে।

সংসারের সবরকম দায়-দায়িত্ব থেকে আমার মা আমাকে দূরে সরিয়ে রাখেন। এবারো তাই করলেন। আমাকে ডেকে বললেন, তুই এমন মুখ কালো করে থাকিস না তো। আমি যা করার করব।

মা তাঁর সর্বশেষ সম্বল বাবার দেয়া হাতের একজোড়া বালা, যা তিনি চরম দুঃসময়েও যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছিলেন, বিক্রি করে বিয়ের বাজার করলেন। জিনিসপত্রগুলি হল খুব সস্তা ধরনের কিন্তু তাতে মিশে গেল আমার বাবা এবং মা'র ভালবাসা। আমি জানতাম ভালবাসার এই কল্যাণময় স্পর্শেই আমার অনিশ্চয়তা, হতাশা কেটে যাবে।

বউ নিয়ে বাসায় ফিরে বড় ধরনের চমক পেলাম। আমার শোবার ঘরটি অসম্ভব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে আমার ছোট বোন। আমাদের কোন ফ্যান ছিল না। কিন্তু আজ মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। বিছানায় কি সুন্দর ভেলভেটের চাদর। খাটের পাশে দুটি সুন্দর বেতের চেয়ার। বেতের চেয়ারের পাশে ছোট্ট একটা টেবিলে একগাদা রক্ত গোলাপ। গোলাপের পাশে একটা চিঠিও পেলাম. মেজো বোন শিখুর লেখা চিঠি —

"দাদা ভাই,

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দুঃখ যে সব গান পছন্দ করতে তার সব কটি টেপ করা আছে। কথা বলতে বলতে তোমরা যদি ক্লান্ত হয়ে পড় তাহলে ইচ্ছা করলে গান শুনতে পার। দরজার কাছে একটা ক্যাসেট প্লেয়ার রেখে দিয়েছি।"

ক্যাসেট প্লেয়ার চালু করতেই সুচিত্রা মিত্রের কিন্নর কণ্ঠ ভেসে এল -- ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন, তবে কেন মিছে এ ভালবাসা?

গভীর আবেগে আমার চোখে জল এসে গেল। আমি সেই জল গোপন করবার জন্যে জানালা দিয়ে তাকিয়ে বললাম, কেমন লাগছে গুলতেকিন?

সে নিচু গলায় বলল, বুঝতে পারছি না। কেমন যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন লাগছে।

'ঘুম পাচ্ছে?'

'না।'

সারারাত আমরা গান শুনে কাটিয়ে দিলাম। দু'জনের কেউই কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। গান শোনা ছাড়া উপায় কী?

পরদিন ভোরবেলা খুব দুঃখজনক ব্যাপার ঘটল। যাদের বাসা থেকে সিলিং ফ্যান ধার করে আনা হয়েছিল তারা ফ্যান খুলে নিয়ে গেল।

গুলতেকিন বিস্মিত হয়ে বলল, ওরা আমাদের ফ্যান খুলে নিচ্ছে কেন?

আমি মাথা নিচু করে রইলাম। জবাব দিতে পারলাম না। বিছানার চমৎকার চাদর, বেতের চেয়ার, ক্যাসেট প্লেয়ার সবই তারা নিয়ে গেল। এমন কি টেবিলে রাখা সুন্দর ফুলদানিও অদৃশ্য। গুলতেকিন হতভম্ব। সে বলল, এসব কী হচ্ছে বলুন তো? ওরা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে কেন? আমরা বুঝি রাতে গান শুনব না?

গুলতেকিনের প্রশ্নের জবাব দেবার মত মানসিক অবস্থা তখন আমার নেই। আমার জন্যে আরো বড় সমস্যা অপেক্ষা করছে। বাসার সামনে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। আজ আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেবে। এই কারণেই সবাই তড়িঘড়ি করে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

মা পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে লজ্জায় কাঁপছি। আমার ছোটবোন এসে বলল, দাদাভাই, তুমি ভাবীকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে চলে যাও। এই নোংরা ব্যাপারটা ভাবীর সামনে না হওয়াই ভাল। তাড়াতাড়ি কর। পুলিশ ঘরে ঢুকে পড়ার আগেই কর।

আমি গুলতেকিনকে নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। বৈশাখ মাসের ঘন নীল আকাশ, পেঁজাতুলার স্তূপীকৃত মেঘ, চনমনে রোদ। আমরা রিকশা করে যাচ্ছি। হুড ফেলে দিয়েছি। আমার মনের গোপন ইচ্ছা -- পৃথিবীর সবাই দেখুক, এই রূপবতী বালিকাটিকে আমি পাশে পেয়েছি। গভীর আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ। বাসায় এখন কী হচ্ছে তা এখন আমার মাথায় নেই। ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়েও ভাবছি না। বর্তমানটাই সত্যি। অতীত কিছু না — ভবিষ্যৎ তো দূরের ব্যাপার। আমরা বাস করি বর্তমানে — অতীতেও না, ভবিষ্যতেও না।*

---

* শহীদ পরিবার হিসেবে পাওয়া ঐ বাড়ি থেকে পুলিশ আমাদের বের করে দিয়েছিল। আমরা একটি রাত কাটিয়েছিলাম খোলা আকাশের নিচে। খুব মন্দ কাটে নি। আকাশ ছিল তারা ভরা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। উনিশশো' পঁয়ষট্টি সন — একটা স্যুটকেস এবং 'হোল্ডঅল' নামক বস্তুতে লেপ-তোষক ভরে ঢাকা কলেজের সাউথ হোস্টেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। আজ আমাকে সীট দেয়া হবে। একটু ভয় ভয় লাগছে। কারণ শুনতে পাচ্ছি যত ভাল রেজাল্টই হোক সবাইকে সীট দেয়া হবে না। যাদের দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে বলে মনে হবে হোস্টেল সুপার তাদের বাতিল করে দেবেন। তাঁর কথাই শেষ কথা। আপীল চলবে না।

আমি দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে নই। কিন্তু চেহারায় সেই ব্যাপারটা আছে কি-না বুঝতে পারছি না। চেহারা দেখে যদি আমাকে দুষ্ট প্রকৃতির মনে হয় তাহলে তো সর্বনাশ! আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি চেহারায় এক ধরনের গোবেচারা ভাব ফুটিয়ে তুলতে।

সুপারের ঘরে ডাক পড়ল। সুপার একবারো আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, ২০৬ নম্বর রুম। জানালার কাছের সীট। কোন ফাজলামি বদমায়েশি করা চলবে না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রোল কল হবে। রোল কলের সময় যদি পরপর দু'দিন সীটে না পাওয়া যায় তাহলে সীট ক্যানসেল। মনে থাকবে?

'জ্বি স্যার, থাকবে।'

'ভাল ভাল ছেলে ঢাকা কলেজে পড়তে আসে। অল্প কিছু ভাল থাকে, বেশির ভাগই বাঁদর হয়ে যায়। কথাটা যেন মনে থাকে।'

'মনে থাকবে স্যার।'

'হোস্টেল ফিস দাও। এক মাসের খাবার বাবদ ৩৮ টাকা। সীট ভাড়া পাঁচ টাকা, অন্যান্য ফী পাঁচ টাকা। মোট আটচল্লিশ।'

আমি আটচল্লিশ টাকা দিয়ে ঢাকা কলেজ সাউথ হোস্টেলে ভর্তি হয়ে গেলাম। আতংকে বুক কাঁপছে। মনে হচ্ছে জেলখানা। এর আগে কখনো বাবা, মা, ভাইবোন ছেড়ে এত দূরে থাকি নি। কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। কলেজের ছাত্র, কাঁদলে সবাই হাসাহাসি করবে। চোখের পানি আসি-আসি করেও আসছে না।

সেই সময়ে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন জালালুদ্দিন আহমেদ। অতি কড়া লোক। তাঁর আইন-কানুন বড়ই কঠিন। তৃতীয় দিনেই তাঁর পরিচয় পেলাম। নর্থ হোস্টেলের এক ছাত্র সেকেণ্ড শো সিনেমা দেখে হোস্টেলে ফিরছিল। কপালের ফেরে বেচারা প্রিন্সিপ্যাল স্যারের সামনে পড়ে গেল। স্যার শীতল গলায় বললেন, কাল ভোর দশটার আগেই তুমি হোস্টেল ছেড়ে চলে যাবে। তুমি দুষ্ট গরু। দুষ্ট গরু আমি গোয়ালে রাখব না।

দুষ্ট গরুকে পরদিন সকাল নটায় কাঁদতে কাঁদতে রিকশায় বেডিংপত্র তুলে চলে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] দেখা গেল। তাকে তখন মোটেই দুষ্ট গরু মনে হচ্ছিল না।

আমরা সবাই সাবধান হয়ে গেলাম। নিঃশ্বাস ফেলতেও সাবধানে ফেলি। প্রিন্সিপ্যাল স্যার যদি আবার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনে ফেলেন। প্রচণ্ড পড়াশোনার চাপ। রাতে রোল কল। মাঝে মাঝে গভীর রাতে চেকিং। ভয়াবহ অবস্থা। এর মধ্যে [illegible] কোনদিকে যায় বুঝতেই পারি না — সমস্যা হয় ছুটির দিনে। ছুটির দিন আর কাটতে চায় না। ছুটির দিন আইন-কানুন কিছু দুর্বল থাকে। রাত ন'টার সময় প্রিন্সিপ্যাল স্যারের সামনে পড়ে গেলে তিনি শুধু কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করেন — কি নাম? হুজুর বাহাদুরের কি নাম? এই পর্যন্তই। পরদিন সকালে বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে যেতে হয় না। ছুটির দিনে হোস্টেলের ছাত্ররা আত্মীয়স্বজনের বাসায় যায়। কেউ কেউ যায় বলাকা সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে। আইয়ুব খানের কল্যাণে তখন ছাত্রদের সিনেমা দেখা খুব সহজ। ছাত্র হলে সরকারী ট্যাক্স দিতে হয় না। টিকিটের দাম অর্ধেক। মুশকিল হচ্ছে ঢাকায় তখন আমার কোন আত্মীয়স্বজন নেই। অর্ধেক দামে সিনেমার টিকিট কেনার মত পয়সাও নেই। সময় কাটানোর জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো শুরু করলাম। সকাল বেলা বেরিয়ে পড়ি। দুপুরের আগে হোস্টেলে ফিরে ভাত খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি। ফিরি সন্ধ্যা মেলাবার পর।

এরকম ঘুরতে ঘুরতেই মুখলেসুর রহমান নামের একজনের দেখা পেলাম। তার পেশা অদ্ভুত। ম্যাজিক দেখায়। এবং টাকার বিনিময়ে ম্যাজিকের কৌশল বলে দেয়। ম্যাজিকের যন্ত্রপাতি বিক্রি করে। অপূর্ব সব ম্যাজিক। তাকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যেই সে দেখাচ্ছে চারটা টেক্কা। নিমিষেই চার টেক্কা হয়ে গেল চার বিবি। এখানেই শেষ নয় — ফুঁ দেয়ামাত্র চার বিবিও অদৃশ্য। বিবির জায়গায় শাদা তাস। মুখলেসুর রহমান তাস চারটা পকেটে রেখে বিড়ি ধরিয়ে বলল, কেউ যদি এই তাস কিনতে চান — পাঁচ টাকা, মাত্র পাঁচ টাকা। আর যদি শুধু কৌশল জানতে চান, তিন টাকা। তিন টাকা। তিন টাকা ।

যার ভেতর সামান্যতম কৌতূহল অবশিষ্ট আছে তার পক্ষে এই অপূর্ব খেলার কৌশল না জেনে বাড়ি যাওয়া সম্ভব না। আমার কৌতূহল প্রবল, আমার পায়ে শিকড় গজিয়ে গেছে। আমি নড়তে পারছি না। তিন টাকা দিয়ে কৌশল জানলাম। তবে কৌশল বলার আগে আমাকে তিন পীরের, মা-বাবার এবং ভাতের কসম কাটতে হল — এই কৌশল কাউকে বলা যাবে না। মুখলেসুর রহমান যা বলে আমি তাতেই রাজি। আমাকে জানতেই হবে। না জানলে আমি পাগল হয়ে যাব।

কৌশল জানার পর মনটা ভেঙে গেল। এত বড় ফাঁকি! মানুষকে ধোঁকা দেয়ার এত সহজ পদ্ধতি? আমি এমন বোকা! এই সহজ ধোঁকা বুঝতে পারলাম না? আমার তিনটা টাকা চলে গেল? তিন টাকায় ছ'দিন সকালের নাশতা হত। রাগে-দুঃখে আমার চোখে প্রায় পানি এসে গেল। মুখলেসুর রহমান সম্ভবত আমার মনের অবস্থা বুঝল। সে উদাস এবং খানিকটা বিষণ্ণ গলায় বলল, তুমি খেলার ফাঁকিটা দেইখা মন খারাপ করলা? ফাঁকির পেছনে বুদ্ধিটা দেখলা না? এই বুদ্ধির দাম হাজার টেকা।

ম্যাজিসিয়ানের দার্শনিক ধরনের কথায়ও আমার মন মানল না। ফাঁকি হচ্ছে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ফাঁক। ফাঁকির পেছনে বুদ্ধি থাকুক আর না থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না। মন খারাপ করে হোস্টেলে চলে এলাম ঠিকই কিন্তু আমার নেশা ধরে গেল। ছুটির দিন হলেই আমি খুঁজে খুঁজে মুখলেসুর রহমানকে বের করি। সে সাধারণত বসে গুলিস্তান এলাকায়। মাঝে মাঝে ফার্মগেটের কাছে। পরের বার তার কাছ থেকে শিখলাম দড়ি কাটার কৌশল। দড়ি কেটে দু'খণ্ড করা হয়। নিমিষের মধ্যে সেই দড়ি জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়। কৌশল এত সহজ কিন্তু করা হয় অতি নিপুণ ভঙ্গিতে। দড়ি কাটার কৌশল শিখতে আমার পাঁচ টাকা চলে গেল। শিখলাম পয়সা তৈরির কৌশল। চার আনা, আট আনার মুদ্রা বাতাস থেকে তৈরি করে ঝনঝন করে টিনের কৌটায় ফেলা হয়। এই কৌশল শিখতে দশ টাকা চলে গেল। তবে এই খেলা কাউকে দেখাতে পারলাম না। এই খেলা দেখানোর জন্যে পামিং জানা দরকার। পামিং হচ্ছে হাতের তালুতে কোন বস্তু লুকিয়ে রাখার কৌশল। আমার পামিং জানা নেই।

হোস্টেলে থাকার জন্য বাসা থেকে সামান্যই টাকা পাই। সেই সামান্য টাকার বড় অংশই চলে যাচ্ছে ম্যাজিকে। আমাকে মিথ্যা করে চিঠি লিখতে হয় —"বই কিনতে হবে, টাকা দরকার। কলমটা হারিয়ে গেছে, নতুন কলম দরকার।"

দু'বছর পর আমি ঢাকা কলেজ থেকে পাস করে বেরুলাম। বন্ধুমহলে আমি তখন ম্যাজিসিয়ান হুমায়ূন বলে পরিচিত। ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ম্যাজিকের ভূত আমাকে ছাড়ল না। আমি তখন সিন্দাবাদ। ম্যাজিকের ভূত আমার ঘাড়ে বসে আছে। যতবার নামাতে যাই ততবারই সে আরো জোরে আমার গলা চেপে ধরে।

পুরানো ঢাকার আজলাদ হোসেন লেনে তখন একজন বৃদ্ধ ওস্তাদের সন্ধান পেয়েছি। বিহারের লোক। পামিং-এর রাজা বলা যায়। হাঁসের প্রকাণ্ড ডিম সে হাতের তালুতে লুকিয়ে ফেলে। তার এক ফুট সামনে বসে থাকা মানুষটিরও বোঝার উপায় নেই যে, সে প্রকাণ্ড একটা ডিম হাতের তালুতে লুকিয়ে রেখেছে। সে শুধু যে হাতের তালুতে ডিম লুকিয়ে রাখছে তাই না, এক হাত থেকে অন্য হাতে সেই ডিম দ্রুত চালান করে দিচ্ছে। চোখের পলকের চেয়েও তার হাতের গতি দ্রুত; তাকে আমি ডাকি ওস্তাদজী। লোকটা মহা ঠগ — আমার কাছ থেকে টাকা নেয় কিন্তু কিছু শেখায় না। বিরসমুখে বলে পামিং শেখানোর কিছু নাই — প্র্যাকটিস কর, প্র্যাকটিস।

সেই প্র্যাকটিস কিভাবে করব তাও বলে দেয় না। অনেক অনুরোধের পর আমার হাতের তালু খানিকক্ষণ টিপেটুপে বলে — তোমার হাত শক্ত। এই হাতে পামিং হবে না। বেহুদা পরিশ্রম। বরং ম্যাজিকের এক গল্প শোন।

ওস্তাদজী এন্নিতে বাংলাতেই কথা বলে তবে গল্পের তোড় এসে গেলে বিহারী কথা শুরু হয়, যার এক বর্ণও আমি বুঝি না। এক সময় ওস্তাদজীর স্ত্রী এসে কড়া ধমক লাগায় এবং আমার দিকে উগ্র চোখে তাকিয়ে বলে, নিকালো — আভি নিকালো। অত্যন্ত অপমানসূচক কথা কিন্তু আমি সেই অপমান গায়ে মাখি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের মাঝামাঝি সময়ে এক প্রতিভা প্রদর্শনীর আয়োজন হল। গান-নাচ-আবৃত্তি যে যা জানে। টিএসসি-তে বিশাল ব্যবস্থা। আমিও উপস্থিত হলাম আমার 'ম্যাজিক প্রতিভা' নিয়ে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

...ল ভর্তি ছাত্র-শিক্ষক। বিরাট মঞ্চ। চোখ-ধাঁধানো আলো। ভয়ে আমার পা কাঁপছে; মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। জিভ সীসার মত ভারী হয়ে গেছে। শুধু তাই না, মাইক্রোফোনও মনে হয় খানিকটা বড় হয়ে গেছে। মুখ থেকে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে; অনেক কষ্টে প্রথম আইটেম দেখালাম। ট্রায়াঙ্গুলার বাক্স থেকে কবুতর এবং মুরগি বের করার খেলা, এই বাক্স আমার নিজের না — অন্য এক জাদুকরের কাছ থেকে কুড়ি টাকায় ভাড়া করে এনেছি। প্রথম খেলা খুব জমে গেল। প্রচণ্ড হাততালি। আমার আড়ষ্টতা কেটে গেল; দ্বিতীয় আইটেম 'এন্টি গ্রেভিটি বটল'; একটা বোতল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উপেক্ষা করে শূন্যে ভাসবে। এটিও জমে গেল। আমার মনে হয় ছাত্র-ছাত্রীরা গান শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল — আমার সামান্য ম্যাজিকে যে কারণে তাদের উল্লাসের সীমা রইল না। সেদিন 'খেলা' ভালই দেখিয়েছিলাম। কারণ এক সপ্তাহ না যেতেই টিভি থেকে ডাক পেলাম। তারা একটা প্রোগ্রাম করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে অনুষ্ঠান, যেখানে আমার জন্যে পাঁচ মিনিট বরাদ্দ করা আছে। মিনিটে দশ টাকা হিসেবে আমি পাব পঞ্চাশ টাকা। আমার আনন্দ এবং বিস্ময়ের সীমা রইল না। ঠিক করলাম মুদ্রা তৈরির খেলা দেখাব। শূন্য থেকে মুদ্রা তৈরি করে তিনের কৌটায় ফেলা। ঝনঝন শব্দ হতে থাকবে — এক সময় কৌটা মুদ্রায় ভর্তি হয়ে যাবে।

পুরোটাই হাতের কৌশল। খুবই প্র্যাকটিস দরকার। আমি দরজা বন্ধ করে প্র্যাকটিস করি। নিরলস সাধনা যাকে বলে । এর চেয়ে অনেক কম সাধনায় ঈশ্বর ধরা দেন। মহসিন হলের প্রধান হাউস টিউটর তখন অধ্যাপক এমরান। তিনি একদিন জরুরি চিঠি পাঠিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন আছে।

'কি কমপ্লেইন স্যার?'

'ঘর বন্ধ করে তুমি না-কি সারারাত কি-সব কর। ঝনঝন শব্দ হয়। কেউ ঘুমুতে পারে না। তুমি কি কর?'

'স্যার, ম্যাজিক শিখি।'

'তুমি কি ম্যাজিক শেখার জন্যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছ? এটা কি ম্যাজিকের স্কুল? খবর্দার, আর যেন ঝনঝনানি না শুনি, আর একবার ঝন-ঝন হলে সীট ক্যানসেল। মনে থাকে যেন।'

আমি বিমর্ষমুখে রুমে ফিরে এলাম। তবে প্র্যাকটিস বন্ধ হল না। কৌটার নিচে তুলা দিয়ে প্র্যাকটিস চালাতে লাগলাম। যথাসময়ে টিভি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। তখন টিভি ছিল ডিআইটি ভবনে। সব প্রগ্রাম হত লাইভ। আমার নিজের অনুষ্ঠান নিজে দেখতে পেলাম না। তাতে আমার আনন্দের কমতি হল না। স্টুডিও থেকে বের হয়ে মনে হল সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে তরুণ জাদুকরকে।

আমার কোন নেশা দীর্ঘস্থায়ী হয় না — এটা হয়ে গেল। মানুষকে বিস্মিত করতে পারার আলাদা আনন্দ আছে। সেই আনন্দে বুঁদ হয়ে রইলাম। কেমিস্ট্রি পড়া চালিয়ে যাচ্ছি — চালাতে হয় বলেই চালানো। ডিপার্টমেন্টের স্যাররা প্রায়ই খবর দেন —

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] একটা জন্মদিনের পার্টি আছে, ম্যাজিক দেখিয়ে যাও। আমি মহা উৎসাহে রিকশায় করে বাক্স-টাক্স নিয়ে রওনা হই। একদিন ঢাকা জুট মিলে ম্যাজিক দেখিয়ে দু'শ টাকা পেলাম। একশ' চলে গেল যন্ত্রপাতির ভাড়ায়। একশ' লাভ।

মহসিন হলে যে ঘরে আমি থাকি সেখানে খাঁচায় চারটা কবুতর এবং একটা টিয়া পুষি। ম্যাজিকে কবুতর, টিয়া এসব লাগে। আমার একটাই স্বপ্ন — "ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব ম্যাজিসিয়ানস"-এর সদস্য হব। এই সদস্যপদের জন্যে আকাঙ্ক্ষার কারণ হল ঢাকায় দু'জন জার্মান জাদুকর এসেছিলেন। দু'জনই "ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব ম্যাজিসিয়ানস"-এর সদস্য। তাঁরা হোটেল শাহবাগে জাদু দেখিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করেছেন। আমি নিজে হয়েছি স্তম্ভিত, তখন আর্থিকভাবে খুব অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও দু'বার তাদের শো দেখলাম। নেশা লেগে গেল। কঠিন নেশা।

এখন বলি নেশা কি করে কাটল সেই গল্প। নেশা পুরোপুরি কেটে গেল আমার বাসর রাতে। বালিকাবধূকে মুগ্ধ করার জন্য রাত তিনটার দিকে তাকে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলাম। হয়ত খুব সাবধান ছিলাম না কিংবা নবপরিণীতা স্ত্রীর সামনে নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম --- দড়ি কাটার খেলাটা সে ধরে ফেলল এবং খুব হাসতে লাগল। দ্বিতীয় খেলাটায়ও একই অবস্থা।

মেয়েটি তার স্বামীকে চূড়ান্ত রকমের অপদস্ত করল। সে ত' বুঝতেও পারল না। আমি তৃতীয় ম্যাজিক দেখাতে যাচ্ছি। সে বলল, রাখুন তো আপনার ম্যাজিক, এইসব কি শুরু করেছেন ? রাত বাজে তিনটা।

ঐ রাতেই আমার শেষ ম্যাজিক শো হল। আর কখনো ম্যাজিক দেখাই নি বা দেখাতে উৎসাহ বোধ করি নি।

বিয়ের দশ বছর পর গুলতেকিন হঠাৎ করে বলতে শুরু করল — বাসর রাতে আমি খুব বোকামি করেছি। আমার উচিত ছিল বিস্মিত হবার ভান করা। সরি, তোমাকে ঐ রাতে খুব লজ্জা দিয়েছি । বয়স কম ছিল। বুঝতে পারি নি যে তুমি এত আগ্রহ করে আমাকে বিস্মিত করার চেষ্টা করছ। এখন একবার ম্যাজিক দেখাও — দেখ, আমি কি পরিমাণ মুগ্ধ হই। ম্যাজিকের কৌশল ধরার চেষ্টা করব না — চেষ্টা করব বিস্মিত হবার।

বিয়ের পর পনেরো বছর হয়েছে। পনেরো বছরে কোন ম্যাজিক দেখাই নি। তার পরের "কিম আশ্চর্যম!" হঠাৎ ইংল্যান্ড থেকে চিঠি এসে উপস্থিত — আমাকে 'ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব ম্যাজিসিয়ানস' এর সদস্যপদ দেয়া হয়েছে। এই অতি আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব হয়েছে আমার জাদুকর বন্ধু জুয়েল আইচের কারণে। এই সদস্যপদটি আমাকে বিস্মিত করবার সুন্দর ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব ম্যাজিসিয়ানের চিঠিটি এসে পৌঁছল আমার জন্মদিনে। কাকতালীয় ব্যাপার তো বটেই। মাঝে মাঝে কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে বলেই আমাদের এই জীবন এবং এই পৃথিবী এত মজার।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] শীতের সকাল। রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যানের ঘরে ভীত মুখে দাঁড়িয়ে [illegible]। ঘরটা প্রকাণ্ড হলেও অন্ধকার। দিনের বেলাতেও আলো জ্বলছে। সেই আলো-[illegible] প্রথম যা চোখে পড়ছে তা হল অপরিচিত একজন মানুষের তৈলচিত্র। [illegible] রাগী-রাগী চোখে তাকিয়ে আছেন। যেন পৃথিবীর সবার উপরেই তিনি বিরক্ত। [illegible]-এর গন্ধে আমার নিঃশ্বাস আটকে আসছে। ঘরে কোন ধোঁয়া নেই, তবু [illegible] কাঠ-কয়লা পোড়ানোর ধোঁয়ায় ঘর ভরে আছে।

চেয়ারে ছোটখাট একজন মানুষ বসে আছেন -- তিনিই খোন্দকার মোকাররম [illegible]। চোখে ভারী চশমা। তাঁর মুখ হাসি হাসি, তবে সেই হাসি থেকে কেন জানি [illegible] ভরসা পাওয়া যায় না বরং ভয় লাগে। তিনি নরম গলায় বললেন, তুমি কেমিস্ট্রি [illegible] চাচ্ছ কেন?

আমি উত্তর দিলাম না। কারণ আমার মনে হল না তিনি কোন উত্তর শুনতে [illegible]। প্রশ্ন করতে হয় বলেই করা। প্রশ্ন করেই তিনি পাশে বসা অন্য একজন [illegible]কের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলা শুরু করেছেন।

আমার দিকে না তাকালে আমি প্রশ্নের জবাবই বা কেন দেব? আমার একটু ভয় ভয় লাগছে। কারণ এখন যা হচ্ছে তার নাম ভর্তির ইন্টারভ্যু। ইন্টারভ্যু ভাল হলে [illegible]খাস্তে সই করে দেবেন। ভর্তি হয়ে যাব। ফট করে কেমিস্ট্রির কোন প্রশ্ন করে [illegible]লে সর্বনাশ হয়ে যাবে! ফর্মূলা একটাও মনে নেই। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হয়ে [illegible]বার পর আর বই খুলে দেখি নি।

আমার খানিকটা একা একাও লাগছে। সবার সঙ্গেই বাবা, খালু বা চাচা এসেছেন। [illegible]কি পড়লে ভাল হয়, সাবসিডিয়ারী কি নেয়া যায় আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। আমি একা। ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাবা চিঠি লিখে জানিয়েছেন — "পড়াশোনার ব্যাপারটা তোমার। তুমি যা ভাল মনে কর তাই পড়বে। এখানে আমার বলার কিছু থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না।"

খোন্দকার মোকাররম হোসেন স্যার পাশের মানুষটির সঙ্গে কথা বলা শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমিস্ট্রি পড়তে কি তোমার ভাল লাগে? বলেই আগের মত পাশের মানুষটির সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বেশ মজার ব্যাপার তো!

স্যারের কথা বলা শেষ হল। আমার দিকে একবার তাকিয়ে তৃতীয় কোন প্রশ্ন না করেই দরখাস্তে সই করে দিয়ে বললেন, মন দিয়ে পড়বে।

ভর্তির ব্যাপারটা খুব সহজে হয়ে গেল। আমি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। বিরাট এই বিশ্ববিদ্যালয়টা এখন আমার। আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার নিজের জায়গায়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আর কি সুন্দর জায়গা! কার্জন হল — ফুলের বাগানের ভেতর লাল ইটের দালান। প্রাচীন প্রাচীন ভাব। এত ছাত্র-ছাত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারপরেও যেন সব শান্ত। প্রকাণ্ড দু'টা শিরীষ গাছ কেমিস্ট্রি বিল্ডিংটাকে ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

কার্জন হলের পেছনেই কী বিশাল দু'টা হল। ফজলুল হক হল এবং ঢাকা হল! এই হল দু'টির সামনেও ফুলের বাগান। দুই হলের মাঝখানে সমুদ্রের মত বড় দীঘি। এই হল দু'টির কামরাগুলি আমার পছন্দ হল না। কেমন যেন ছোট ছোট। আলো কম। সেই তুলনায় মহসিন হলকে খুব আকর্ষণীয় মনে হল। নতুন তৈরি হয়েছে। এখনো চালু হয় নি। এ বছরই চালু হবে। ঝকঝক করছে ছ'তলা আকাশছোঁয়া হল। দু'টা লিফট আছে। লিফট আমি আগে কখনো দেখি নি। একবার লিফটে চড়েই মনে হল, এই হলে থাকতে না পারলে মানব জন্ম বৃথা।

মহসিন হলের প্রধান গৃহশিক্ষক তখন পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ এমরান। ইনি কারণে এবং অকারণে অতি দ্রুত রেগে যেতে পারেন। ইনার কাছে ইন্টারভ্যু দিতে যাবার আগ মুহূর্তে একজন আমাকে বলল, স্যারের প্রশ্নের উত্তর খুব সাবধানে দিবে। একজন কি উল্টাপাল্টা কথা বলেছিল, স্যার তাকে চড় মেরেছেন।

কি সর্বনাশের কথা! ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসা ছাত্রের গালে কেউ চড় মারতে পারে? ভয়ে এতটুকু হয়ে স্যারের ঘরে ঢুকলাম। স্যার হুংকার দিয়ে উঠলেন, সায়েন্সের ছাত্র তুমি মহসিন হলে থাকবে কেন? সায়েন্সের ছাত্রদের জন্যে ফজলুল হক হল, ঢাকা হল।

'আমি স্যার এই হলেই থাকব।'

'কেন?'

'এদের লিফট আছে স্যার।'

স্যার হেসে ফেললেন। হেসে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হল হাসা ঠিক হয় নি। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করবে না। স্ট্রেইট লাইন চেন? স্ট্রেইট লাইন বানিয়ে ছেড়ে দেব। বিছানা-বালিশ আছে?

'আছে স্যার।'

'বিছানা-বালিশ নিয়ে পাঁচ তলায় চলে যাও। তোমাকে একটা সিঙ্গেল সীটেড রুম দেয়া হল।'

হলে ভর্তি, হলে সীট পাওয়ার ব্যাপারটা এত সহজ? বিশ্বাস হতে চায় না। আমি নিজের ঘরে ঢুকলাম। আগামী চার বছর এটাই আমার ঘর। রুম নাম্বার পাঁচশ চৌষট্টি। একটা কাগজে বড় বড় করে লিখলাম —

হুমায়ূন আহমেদ
রসায়ন প্রথম বর্ষ সম্মান
রোল ৩২

সেই কাগজ ঘরের দরজায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শুরু হলে যাত্রা শুরু হল। প্রথম রাতেই ইমপ্রুভড ডায়েট। রোস্ট, রেজালা, দৈ। খাওয়া শেষে হলের বাইরের দোকান থেকে জীবনের প্রথম সিগারেটটি কিনে গম্ভীর ভঙ্গিতে টানা শুরু করলাম। ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছি — অনেক বড় হয়ে গেছি। গম্ভীর ভঙ্গিতে সিগারেট টানা যেতে পারে। মাথা ঘুরছে তাতে কি? বমি বমি ভাব আসুক না। আনন্দময় জীবনের এই তো শুরু।

ক্লাশে ভর্তি হবার পরের সপ্তাহ থেকে ক্লাস শুরু হয়ে গেল। সকাল আটটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত একটানা ক্লাস। সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত লাঞ্চ ব্রেক। দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত 'ল্যাব'। ভয়াবহ চাপ। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। সায়েন্স পড়ার একি যন্ত্রণা! আর্টস-এর ছেলেরা দেখি মহাসুখে আছে। সপ্তাহে দুটা ক্লাস করে চলে আসে; দুপুরে ঘুমায়। এদের দেখে ঈর্ষায় গা জ্বলে যায়। ছিঃ! কী বোকামি করেছি। কেন আর্টস পড়লাম না?

আমাদের সময় রসায়ন বিভাগের নিয়ম ছিল সবচে' জাঁদরেল শিক্ষকদের দেয়া হত প্রথম বর্ষের ক্লাস। তাঁরা ছাত্রদের ভিত তৈরি করে দিতেন। শক্ত ভিত তৈরি হলে পরবর্তী সময়ে তেমন সমস্যা হত না।

ক্লাসে যেতে হত তৈরি হয়ে। পাঠশালার মত অবস্থা। স্যাররা প্রশ্ন করে করে অস্থির করে ফেলতেন। ক্লাস থেকে ছাত্র বের করে দেয়া ছিল নিত্যদিনকার ঘটনা। কলেজের স্যারদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যারদের একটা বড় ধরনের প্রভেদ প্রথম দিনেই স্পষ্ট হয়ে গেল। কলেজের স্যাররা যখন পড়াতেন তখন মনে হত, যে বিষয়টা তাঁরা পড়াচ্ছেন সে বিষয়টা তাঁরা নিজেরা খুব ভাল জানেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাররা দেখলাম শুধু যে জানেন তা না, এত ভাল করে জানেন যে ছাত্র হিসেবে ভয় ধরে যায়।

ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি পড়াতেন প্রফেসর আলি নওয়াব। তখন অবশ্যি তিনি রিডার (সহযোগী অধ্যাপক)। ক্লাসে ঢুকেই বললেন, বইগুলিতে যা পড়বে সবই বিশ্বাস করবে না। অনেক মিথ্যা কথা লেখা আছে।

আমরা স্তম্ভিত। বই-এ মিথ্যা কথা মানে?

স্যার বললেন, বইগুলিতে অনেক ভুল তথ্য থাকে। আমি সেগুলি তোমাদের দেখিয়ে দেব। তোমরা নিজেরাও ধরতে চেষ্টা করবে। প্রচুর গোঁজামিল আছে। ভুল থিওরি আছে।

আমরা বিস্মিত, বই-এ লেখা থিওরি ভুল! কি আশ্চর্য কথা। স্যার শুধু মুখেই বললেন না — ভুল দেখিয়ে আমাদের চমকে দিলেন।

চার ঘণ্টার ল্যাব। এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। কাজ শেষ করতে হবে। অসংখ্য কাজ। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত ল্যাব ক্লাসে দু'দিন পর-পর ভাইভা। ভাইভা ভাল না হলে স্যাররা স্কলারশীপের বিলে সই করেন না। গার্ডিয়ানের কাছে চিঠি চলে যায় — "পড়াশোনা সন্তোষজনক নয়।"

আজ যখন কেউ বলে, আপনার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কেমন কেটেছে? আমি নস্টালজিক কারণে বলি, খুব চমৎকার! অসাধারণ।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আসলে কিন্তু খুব চমৎকার বা অসাধারণ জীবন তা ছিল না। কেন ছিল না একটু বলি — চব্বিশ বছর আগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। শিক্ষকরা ছিলেন অন্য গ্রহের মানুষ। তাঁরা অনেকখানি দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। ক্লাস রুমের বাইরে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল না বললেই হয়। ছাত্রদের কোন সমস্যায় তাঁদের কোন সহানুভূতি ছিল বলেও মনে হয় না। না-হওয়াটাই স্বাভাবিক। যোগাযোগ থাকলে তবেই তো সহানুভূতি তৈরি হবে। যোগাযোগই তো নেই।

একটা ঘটনা বলি — রসায়ন বিভাগের বারান্দায় একটি ছেলে এবং মেয়ে মাথা নিচু করে গল্প করছিল। গল্প করার ভঙ্গিটি হয়ত আন্তরিক ছিল। এবং তারা গল্পও করছিল দীর্ঘ সময়। চেয়ারম্যানের ঘরে দু'জনেরই ডাক পড়ল। চেয়ারম্যান সাহেব তাদের কী বললেন জানি না। মেয়েটি বের হয়ে এল কাঁদতে কাঁদতে। ছেলেটিকে ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যেতে হল।

সন্ত্রাস আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান এবং অন্যতম সমস্যা। চব্বিশ বছর আগেও কিন্তু সন্ত্রাস একটি বড় সমস্যাই ছিল। এন এস এফ নামে তখন সরকার সমর্থিত একটি ছাত্র দল ছিল। তারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এক ধরনের ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল। তারা ঘুরতো হকি স্টিক নিয়ে, ছুরি নিয়ে। কারো কারো হাতে থাকতো রিকশার চেইন। রিকশার চেইন না-কি অস্ত্র হিসেবে ভয়াবহ। দু'একজন ভাগ্যবানের কাছে ছিল পিস্তল।

অন্য হলের কথা জানি না। আমাদের মহসিন হলে মাস্তান ছেলেদের জন্যে হলের বাবুর্চি আলাদা করে রান্না করত। তাদের খাবার পৌঁছে যেত তাদের ঘরে। এর জন্যে তাদের আলাদা কোন টাকা-পয়সা দিতে হত না। হলের শিক্ষকরা এইসব ব্যাপার অবশ্যই জানতেন। জেনেও না-জানার ভান করতেন। আমি একটি ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখ করে আমার কথার সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করব।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে, পলিটিক্যাল সায়েন্সের আমার পরিচিত এক ছাত্র মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ছুটে এসে বলল, স্যার নিচতলায় এক কাণ্ড হচ্ছে, দেখে আসুন। গেলাম নিচতলায়। একেবারে সিঁড়ির গোড়ার ঘরটা বন্ধ। ভেতর থেকে একটি মেয়ের চাপা কান্নার শব্দ আসছে। বাইরে তিন/চারজন কৌতূহলী ছেলে ভীত মুখে দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, কি হয়েছে?

তারা চাপা গলায় বলল, একটা মেয়েকে আটকে রেখেছে।

'তার মানে কি?'

তার মানে যা বলল তাতে আমার মাথা খারাপ হবার অবস্থা। ছ' থেকে সাতজন মাস্তান ঐ ঘরে আছে। নারকীয় কাণ্ড হচ্ছে বিকেল থেকে। মেয়েটা এক সময় চিৎকার করছিল — এখন তাও করছে না। আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, স্যারদের বলা হয়েছে?

'বলা হয়েছে। বলে লাভ নেই — স্যাররাও জানেন কারা এসব করছে।'

আমি ছুটে গেলাম আমাদের ব্লকে যে অ্যাসিস্টেন্ট হাউস টিউটর থাকতেন তাঁর কাছে। তিনি বললেন, তুমি তোমার নিজের কাজে যাও, আমরা দেখছি কি করা যায়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] দেখেননি। এই ঘটনার সাক্ষী আমি নিজে। আজকাল কিছু কিছু [illegible] গেলেও তাদের সময়টা ছিল স্বর্ণযুগ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। [illegible] শিক্ষকরা ছিলেন কঠিন। তখন অনেক কষ্টে আমি হাসি চাপি।

[illegible] সময়ই শহীদুল্লাহ হলের (ঢাকা হল) একজন হাউস টিউটরকে অপমান [illegible] এক প্রস্টিটিউটকে নিয়ে আসা হল। সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে হলের বারান্দায় [illegible] দিলে ঐ শিক্ষককে ডাকতে লাগল।

[illegible] সমর্থিত এন এস এফ-এর প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল দেখার মত। কারো [illegible] এন এস এফ-এর বড় চাঁইকে ধরলেই সীট হয়ে যেত।

[illegible] কিছু চরিত্রের মধ্যে খোকা এবং পাঁচপাণ্ডুরের নাম মনে পড়ছে। [illegible] পকেটে জীবন্ত সাপ নিয়ে বেড়াতো বলে শুনেছি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় [illegible] ওরাই করে। আমরা এখন সেই ট্র্যাডিশান বহন করে চলেছি — এর [illegible] নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তখনো ছিলেন অসহায়, এখনো অসহায়। [illegible] তখনো অশক্ত ছিল। এখনো অশক্ত আছে।

[illegible] এসব কথা। হল জীবনের কিছু স্মৃতির কথা বলি। হলে-থাকা ছেলেদের [illegible] বড় অংশই ছিল দরিদ্র। অনেকেই প্রথম এসেছে ঢাকা শহরে। কিছুতেই [illegible] খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। টাকা-পয়সা যা দেশ থেকে আসছে তাতে [illegible] মিটছে না। প্রাইভেট টিউশানি ব্যাপারটি তখনো চালু হয় নি। এদের বাড়তি [illegible] বলতে কিছু নেই। এই ছেলেগুলি কখনো সকালে নাশতা করে না। বিকেলেও [illegible] পায় না। ক্ষিধেয় অস্থির হয়ে এরা অপেক্ষা করে কখন রাতের খাবার দেয়া হবে। [illegible] হতেই এরা ডাইনিং হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন ডাইনিং হল খোলা হবে। [illegible] নিয়ে হলের অন্য ছাত্ররা নানান ধরনের রসিকতা করে। হাসাহাসি করে। হলের [illegible] মনে হলেই আমার এই ছেলেগুলির কথা মনে হয়। হল সম্পর্কে, ঢাকা [illegible] বিদ্যালয় সম্পর্কে এই ছেলেদের সব সুখস্মৃতি নিশ্চয়ই ক্ষুধার নিচে চাপা পড়ে [illegible]। আমি হলে থাকাকালীন সময়েই এদের একজন ইলেকট্রিক হিটারের তার হাতে [illegible] আত্মহত্যার চেষ্টা করে। না, কোন প্রেমঘটিত ব্যাপার না — ঢাকা [illegible] বিদ্যালয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যাবার মত অর্থ জোগাড় করতে পারছে না, আবার [illegible] বিদ্যালয় ছাড়তেও পারছে না। সে এই কষ্ট থেকে মুক্তি চায়।

* * * *

সেই সময়কার খবরের কাগজে আমাদের হলেরই একটি ছেলে বিজ্ঞাপন ছাপাল সে কোন ধনী পিতার কন্যাকে বিবাহ করতে চায়। বিনিময়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার খরচ দিতে হবে। সেই ছেলেকে নিয়ে কত হাসাহাসি। কেউ ভেবেও দেখল না কি গভীর বেদনায় সে পয়সা খরচ করে ঐ বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

চারতলায় থাকতেন এক মৌলানা সাহেব। তাঁর কথা মনে পড়ে। অতি ভদ্রলোক। দেখা হলেই হাসিমুখে নানান খবর জিজ্ঞেস করবেন। ভদ্রলোক ছিলেন মৌলানাযে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মৌলানা সম্ভবত আরবী পড়তেন। তিনি একটা পাখি পুষেছিলেন। খাঁচায় বন্দি সেই পাখির মধু ছিল দেখার মত। পাখিটি অতিরিক্ত যত্নের কারণেই বোধহয় — মারা গেল। মৌলানা দীর্ঘ একটি শের (কবিতা) রচনা করলেন। যার প্রথম চরণ —

"মেরা বুলবুল মর গিয়া।"

যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই ধরে ধরে দীর্ঘ কবিতা শুনিয়ে অশ্রুবর্ষণ করেন।

সপ্তাহখানেক পর তাঁর আত্মীয়স্বজনরা খবর পেয়ে তাঁকে দেশের বাড়ি নিয়ে গেল। কারণ পাখির শোকে তিনি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন। এই মৌলানা আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন নি।

* * * *

মহসিন হলের ছতলার একটা ঘর ছিল ভূতে-পাওয়া। বাইরে থেকে তালাবন্ধ কিন্তু ভেতর থেকে গুনগুন গানের শব্দ পাওয়া যায়। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় কে যেন স্যান্ডেল পায়ে হাঁটে। রহস্য ভেদ হল দীর্ঘদিন পর। হাউস টিউটররা এক রাতে সেই ঘরে ঢুকে কাবার্ড খুলে রূপবতী এক তরুণীকে আবিষ্কার করলেন। স্যাররা হতভম্ব। জানা গেল মেয়েটি এই রুমের বাসিন্দা স্ট্যাটিসটিকস পড়ে জনৈক ছাত্রের স্ত্রী। দু'জনে গোপনে বিয়ে করেছে। দু'জনের বাবা-মা'ই তাদের বের করে দিয়েছে। বেচারা স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যাবে! হলে এনে লুকিয়ে রেখেছে কাবার্ডে। এইখানেই এই অসহায় মেয়েটি ছ'মাস ছিল। দেশের এবং দেশের বাইরের কিছু সংবাদপত্রেও ঘটনাটি প্রকাশিত হয়। যেসব মাস্তানরা মেয়ে নিয়ে এসে জঘন্য কীর্তি-কাহিনী করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কিছুই বলে না। কিন্তু অসহায় এই ছেলেটিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছরের জন্যে বহিষ্কার করা হয়।

* * * *

১৯৬৯ সন। হলের টিভি রুমে আমরা বসে আছি অনেক রাত। রেডিও বাজছে। রানিং কমেন্ট্রি হচ্ছে। অসম্ভব নাটকীয় একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। মানুষ নামছে চাঁদে। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছি — সত্যি কি নামতে পারবে? এই তো, এই তো নামল। আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম। আনন্দে দুটা চেয়ার ভাঙা হল। জানালার সব কটা কাচ ভাঙা হল! একজন উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে অচেতন হয়ে পড়ে গেল। তাকে বাতাস করা হচ্ছে, মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা!

* * * *

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] কর্মকাণ্ড লেগেই থাকতো। কবিতা পাঠের আসর, গল্প পাঠ, রবীন্দ্র জয়ন্তী [illegible] – কিছু না কিছু আছেই। ছাত্রদের গলে উৎসাহ। প্রাণশক্তিতে ছেলেরা যে ঝলমল করছে তা স্পষ্ট বোঝা যেত। উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানে সেই প্রাণশক্তির পূর্ণ প্রকাশ দেখলাম। জীবনকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কত তুচ্ছ মনে করে তা দেখে [illegible] হতবাক হয়ে গেলাম। গুলি হচ্ছে নীলক্ষেতে -- কারফিউ চলছে। সেই [illegible] অগ্রাহ্য করে মহসিন হলের ছেলেরা ছুটে গেল। গুলিবিদ্ধ দু'টি মানুষকে হলে [illegible] এল। তখন গভীর রাত। মানুষ দু'টি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আমরা ভীত চোখে [illegible]।

এদের চিকিৎসা প্রয়োজন — কারফিউর ভেতরই ছেলেরা এদের নিয়ে মেডিক্যাল [illegible] উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। এই স্মৃতি কি করে ভুলি?

আরেকটি কথা না বললে রচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। আমার লেখালেখি জীবনের শুরু [illegible] মহসিন হলে। ৫৬৪ নম্বর রুমেই রাত জেগে জেগে লিখে ফেলি প্রথম ও দ্বিতীয় [illegible] -- নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার। যাত্রা শুরু করি অচেনা এক পথে। [illegible] পথ দুঃখ ও আনন্দময়।

বছর পাঁচেক আগে মহসিন হলে গিয়েছিলাম। রাত দশটার মত বাজে। চুপি চুপি [illegible] ৫৬৪ নম্বর রুমের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা দিলাম। এক ছেলে দরজা খুলে [illegible]কর গলায় বলল, কি চাই?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, রং নাম্বার। ভুল জায়গায় এসেছি।

পুরানো তীর্থক্ষেত্র দেখার শখ ছিল। দেখা হল না।

[illegible]টি জিনিস দেখার জন্যে আমার তীব্র কৌতূহল ছিল।

মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু. পৃথিবীতে আসা এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার দৃশ্য। [illegible]ন্মদৃশ্য দেখা তো একেবারেই অসম্ভব। সামাজিক কারণেই পুরুষের পক্ষে জন্মসময়ে [illegible]পস্থিত থাকা অকল্পনীয় ব্যাপার।

মৃত্যুসময়ে উপস্থিত থাকাটা সেই তুলনায় অত্যন্ত সহজ। এই সহজ ব্যাপারটি [illegible]মার জীবনে ঘটছিল না। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। চূড়ান্ত অসুস্থ [illegible]বস্থায় দেখতে গিয়েছি। কিন্তু মৃত্যুর সময়টিতে কখনো কাউকে দেখি নি।

এক ডাক্তার বন্ধু হাসপাতালে কাজ করে। তাকে আমি আমার গোপন ইচ্ছার কথা [illegible]লাম। সে এমনভাবে আমার দিকে তাকালো যেন আমি একজন মানসিক রুগী। রুক্ষ [illegible]লায় বললো, মানুষের মৃত্যু দেখার কী আছে? এটা তো কোন নাটক না। তুমি কোন [illegible]কটা অপারেশন দেখতে চাও, আমি ব্যবস্থা করে দি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মানুষকে কাটা-ছেঁড়া করার দৃশ্য দেখার ব্যাপারে আমি কোন রকম আগ্রহ বোধ করলাম না। তাকে বলে রাখলাম, হাসপাতালে তো প্রায়ই রুগী মারা যায়। তোমরা ডাক্তার হিসেবে নিশ্চয়ই টের পাও রুগীটি কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবে। এ-রকম দেখলে টেলিফোন করে দিও। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব। আমি শুধু একবারই দেখতে চাই।

ডাক্তার বন্ধু কথা রাখল। আমাকে খবর দিল। আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছুটে গেলাম। বছর চল্লিশের হতদরিদ্র এক রুগী। কনভালশান হচ্ছে — সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট। রুগ্‌ণ এক মহিলা, রুগীটির স্ত্রী হবে — বিছানা ধরে আতংকে ও ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। সাত-আট বছরের দুটি শিশু। একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরে আছে। ভয়াবহ দৃশ্য। রুগীকে দেখেই মনে হল মৃত্যুই তার জন্যে পরম শান্তি। যত তাড়াতাড়ি তার মৃত্যু ঘটবে তত তাড়াতাড়ি সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

আমার বন্ধু বলল, আর বেশিক্ষণ নেই — তাকিয়ে দেখ অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। অথচ রুগী অক্সিজেন নিতে পারছে না। ফুসফুস ফাংশান করছে না।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার — ডাক্তারদের সব ধারণা ভুল প্রমাণ করে রুগী দেখতে দেখতে স্বাভাবিক হয়ে গেল। খিচুনি বন্ধ হল। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিতে শুরু করল। আমি ডাক্তার নই। তবু স্পষ্ট দেখলাম লোকটির মুখ থেকে মৃত্যুর ছায়া সরে যাচ্ছে। মৃত্যু যেন একটা কুৎসিত নোংরা পশু। পশুটা দাঁত দিয়ে লোকটিকে কামড়ে ধরেছিল — এখন ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়ে সে থাবা গুটিয়ে বসেছে বিছানায়। যে কোন মুহূর্তে বিছানা থেকে লাফিয়ে মানুষটার গায়ে পড়তে পারে। পরাজয় মানতে সে প্রস্তুত নয়। কারণ এখন পর্যন্ত কোন প্রাণী তাকে পরাজিত করে নি। মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে সে পরাজয় মানে, লজ্জিত এবং অপমানিত মুখ করে সরে যায় — আবার আসে।

আমি মহিলার দিকে তাকিয়ে বললাম, ভয় নেই, উনি সেরে উঠছেন। এতক্ষণ মহিলা কাঁদেন নি। এইবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন এবং ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন — ডাক্তার সাহেব, আল্লাহ আপনের ভাল করব। আল্লাহপাক আপনের ভল করব।

ভদ্রমহিলা আমাকে ডাক্তার ভেবেছেন।

মৃত্যুদৃশ্য দেখা হল না। তবে কল্পনাতীত আনন্দের মুখোমুখি হলে মানুষ কেমন করে তা দেখা হল। এই অভিজ্ঞতাও তুলনাহীন।

আমি লক্ষ্য করেছি, কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের চোখের সামনে অসংখ্য মৃত্যু ঘটে। আমার মা এমন একজন মানুষ। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি — মাকে নিতে দেশের বাড়ি থেকে লোক এসেছে। মা'র কোন-এক আত্মীয়ের অন্তিম সময় উপস্থিত। মাকে শেষবারের মত না দেখলে তার জীবন বের হচ্ছে না। মা সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন, রুগীকে পানি খাওয়ালেন। জীবন বের হবার প্রক্রিয়া সহজ হল।

আমরা তখন কুমিল্লায় টেকুর পড়াতে থাকি। বাসায় একদিন অপরিচিত এক লোক এসে উপস্থিত। হাতে ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ার। এসেছে ময়মনসিংহের কলমাকান্দা থেকে। লোকটির বাবা না-কি অনেকদিন আগে আমার মা'র হাতে কাঁচা পেঁপের ভাজি খেয়েছিলেন। এখন তিনি মৃত্যুপথযাত্রী, মা'র হাতের কাঁচা পেঁপের ভাজি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাবার খাবে চান। বাজার থেকে কাঁচা পেঁপে আনা হল। মা রাঁধতে বসলেন। অফিস থেকে এসে সব শুনে আমার বাবা বললেন, তোমার এই বিখ্যাত ভাজি কলমাকান্দায় পৌঁছতে পচে গলে যাবে। ভাজি খেয়ে মানুষটার মৃত্যু হবে ফুড পয়জনিং-এ। রান্না কি ঠিক হবে?

মা বললেন, তাই তো।

সন্ধ্যার ট্রেনে মা ঐ মানুষটার সঙ্গে কলমাকান্দা রওনা হয়ে গেলেন। রুগীর খাবারেই পেঁপে ভাজা হবে।

মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের পাশে থাকার আমার তীব্র কৌতূহলের কারণ একটিই — মৃত্যু কিভাবে মানুষকে গ্রাস করে তা দেখা। শেষ মুহূর্তে তার চোখের দৃষ্টি কিভাবে পাল্টে যায়। সেই মুহূর্তে সে কী ভাবে তা জানা সম্ভব নয়। সম্ভবত সে কিছুই ভাবে না, কিছু ভাবার ক্ষমতা তার মস্তিষ্কের থাকে না। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে-আসা পাঁচজন মানুষের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। ১৯৭১ সনে দালালীর অভিযোগে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। একটা কাঁঠাল গাছে তাকে বেঁধে খুব কাছ থেকে পর পর দু'বার গুলি করা হল। কোনবারই গুলি লাগল না। মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার বললেন, এই লোকটার ভাগ্য তো অসম্ভব ভাল। একে ছেড়ে দেন। তাকে ছেড়ে দেয়া হল।

আমি মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে-আসা ভদ্রলোককে বললাম, কাঁঠাল গাছের সঙ্গে যখন বাঁধা হল তখন আপনার চোখ কী খোলা ছিল? চোখ বাঁধা হয় নি?

'জ্বি-না। চোখ বাঁধতে ভুলে গিয়েছিল।'

'তখন কেমন লাগছিল আপনার মনে আছে?'

'জ্বি-না, মনে নাই। তবে কোন রকম লাগতেছিল না। বন্দুকের যে দু'বার গুলির শব্দ হল, একবারও গুলির শব্দ শুনি নাই।'

'গুলির শব্দ শুনেন নি?'

'জ্বি-না। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা — গুলির শব্দ শুনি নাই।'

Near Death experience অর্থাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে-আসা মানুষদের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক বইপত্র লেখা হয়েছে। তার কিছু কিছু আমি পড়েছি। বেশির ভাগ মানুষই বলেন — তাঁরা দেখতে পান অন্ধকারে একটা টানেলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। তীব্র গতিতে যাচ্ছেন, কল্পনাতীত গতিবেগ। টানেলের অন্য প্রান্তে উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো আলো; তাঁরা ছুটে যাচ্ছেন আলোর দিকে; এক ধরনের সংগীত শোনা যাচ্ছে। এইসব কী শুধুই গল্পগাঁথা? উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা? আমি শুনেছি, অনেকেই নাকি মৃত্যুর সময় মৃত আত্মীয়স্বজনদের আশেপাশে দেখতে পান। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এগুলি কী সত্যি ঘটে? না উত্তেজিত মস্তিষ্কের কারণে হারানো স্মৃতি উজ্জীবিত হয়? জানার কোন উপায় নেই!

প্রায় দশ বছর আগে আমি একটি অসাধারণ বই পড়েছিলাম — "Private world of dyeing children." ক্যানসার হাসপাতালের একদল শিশুর নিজস্ব জগৎ নিয়ে জনৈক নার্সের লেখা দু'শ' পাতার বই। বইটি সে লিখেছিল তার নিজের তাগিদে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পরবর্তী সময়ে এই বইটির জন্যে তাকে মনোবিদ্যায় পি-এইচ ডি ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

বইটিতে লেখা হয়েছে একদল শিশুর কথা, যারা জানে তারা মারা যাচ্ছে। খুব অল্প আয়ু তাদের অবশিষ্ট আছে। এই ভয়াবহ সংবাদটি তারা কী করে আত্মস্থ করে — তাঁরা কী ভাবে তাই নিয়ে লেখা অসাধারণ বই। বইটিতে ন' বছর বয়েসী একটি মেয়ের কথা আছে যে তার বাবা-মা'র সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত। তাঁরা যখনই তাকে দেখতে আসতেন সে চিৎকার, গালাগালি করত। নার্স একদিন বাচ্চাটিকে তার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞেস করল, সে বলল — দেখ, আমি যদি খুব ভাল ব্যবহার করি তাহলে আমার মৃত্যুর পর বাবা-মা অনেক বেশি কষ্ট পাবে। সবাইকে বলবে -- আমার মেয়েটা কত ভাল ছিল। বলবে আর কাঁদবে। তাই খারাপ ব্যবহার করছি। যাতে আমার মৃত্যুর পর বাবা-মা'র কষ্ট কম হয় । এই বই পড়তে পড়তে আমি ফুঁপিয়ে কেঁদেছি। মৃত্যুর আগের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আরো ভালভাবে জানার ইচ্ছা হয়েছে। ইচ্ছে হলেও সে সুযোগ কোথায়?

আশ্চর্যের ব্যাপার আমার প্রথম ইচ্ছা শিশুর জন্মদৃশ্য দেখা খুব সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ হল। হোটেল গ্রেভার ইন বইটিতে সেই প্রসঙ্গ লিখেছি — আমার দ্বিতীয় কন্যা শীলার জন্মদৃশ্য আমাকে ডাক্তাররাই দেখালেন। আমি স্ত্রী'র হাত ধরে তখন পাশেই ছিলাম। অবাক হয়ে শিশুর জন্ম দেখলাম। ডাক্তাররা তার পা উঁচু করে ধরে আছেন। প্লাসেন্টার সঙ্গে শিশুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এখনো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া শুরু হয় নি। ডাক্তার শিশুটির পিঠে ছোট্ট করে থাবা দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করল। তার ফুসফুস সচল হল — নতুন একটি জগতে সে প্রবেশ করল। কত-না বিস্ময় তার চোখে!

তাকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে তার মা'র কোলে শুইয়ে দেয়া হল। কী অবাক কাণ্ড! সে চোখ বড় বড় করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার চোখে পলক পড়ছে না। আমি মনে মনে বললাম, মামণি আমি তোমার বাবা। বিপুল আনন্দের এবং অসাধারণ সৌন্দর্যের এই পৃথিবীতে তুমি এসেছ — আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি — **Welcome my little angel.**

আমার দ্বিতীয় ইচ্ছাটি পূর্ণ করার ব্যবস্থাও প্রকৃতি করে দিলো। আমার ছেলের মৃত্যু হল আমার চোখের সামনে। মৃত্যুর সময় সেও আমার মেজো মেয়ের মতই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে —। সেই দৃষ্টি সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি ছুটে পালিয়ে এলাম। আবারও ছুটে গেলাম তার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ মেলে আমাকে দেখল। আমি আবার পালিয়ে গেলাম —।

দুটি দৃশ্য দেখার আমার খুব শখ ছিল। পরম করুণাময় ঈশ্বর (?) আমার দুটি ইচ্ছাই পূর্ণ করলেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঘড়ি নামক বস্তুটির প্রতি আমার আশৈশব দুর্বলতা।

কেউ আবার মনে করে বসবেন না আমি 'হাই থটে'র কিছু বলার চেষ্টা করছি — ঘড়ি বহুতা সময়ের প্রতীক, মহাকালের প্রহরী . . . ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটেই সে রকম কিছু নয়। আমার দুর্বলতার কারণ ঘড়ি সুন্দর একটা জিনিস। সেকেণ্ডের কাঁটা ক্রমাগত ঘুরছে। তাকিয়ে থাকলে মনে হয় বস্তুটির প্রাণ আছে। কানের কাছে ধরলে হৃদপিণ্ডের শব্দের মত টিকটিক শব্দ হয়।

ক্লাস এইটে প্রথম বৃত্তির টাকা পেয়ে মা'কে বললাম, একটা ঘড়ি কিনে দাও।

মা চমকে উঠে বললেন, এই বয়সে ঘড়ি কী রে? আমি তো আমার জন্মে শুনি নি মেট্রিকের আগে কেউ ঘড়ি পরে। না না, এইসব চিন্তা বাদ দে।

লোয়ার কোর্টে মামলা খারিজ হবার পর হাইকোর্টে আপীল করা হয়। আমিও তাই করলাম। এক সন্ধ্যায় বাবার কানে গোপন ইচ্ছার কথা তুললাম। নিজের বলার সাহস নেই। ছোট বোন শেফু আমার হয়ে বলল।

বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, এই বাচ্চা বয়সে ঘড়ি? বাবুয়ানা শেখা হবে। সব কিছুর একটা সময় আছে। প্রথম দাড়ি-গোঁফ কামাতে হয় মেট্রিক পাসের পর। ঘড়ি কিনতে হয় কলেজে উঠে। আমি প্রথম ঘড়ি কিনি বি.এ. ক্লাসে পড়ার সময়। পাঁচ টাকার কেনা ঘড়ি — এখনো পরছি।

হাইকোর্টেও মামলা খারিজ।

আমার ব্যথিত মুখ দেখে হয়ত বাবা খানিকটা নরম হলেন। উদার গলায় বললেন — মেট্রিক পরীক্ষা আসুক, তখন দেখা যাবে।

শেফু বলল, একটা কিনে দিয়ে দিও বাবা। দাদাভাইয়ের খুব বেশি শখ।

'আচ্ছা আচ্ছা দেব। হাতে ঘড়ি পরেই পরীক্ষা দিতে যাবি।'

দু'বছর পার হল। কয়েকবার মনেও করিয়ে দিলাম। বাবা প্রতিবারই হাসিমুখে বললেন, তাঁর মনে আছে। যথাসময়ে পাওয়া যাবে।

বাবার মধ্যে নাটক করার প্রবণতা আছে। আমি নিশ্চিত, প্রথম পরীক্ষা দিতে যাবার সময় তাঁকে সালাম করব, তিনি পকেট থেকে ঝকঝকে ঘড়ি বের করে দেবেন। এবং হাসতে হাসতে বলবেন — কী খুশি?

প্রথমদিন বাংলা পরীক্ষা। বাবাকে সালাম করে উঠে দাঁড়ালাম — তিনি বিব্রত গলায় বললেন, বাবা, তুই আমার হাতঘড়িটা নিয়ে যা। কিছু মনে করিস না। টাকা-পয়সার খুব সমস্যা যাচ্ছে, কিনতে পারি নি। কী মন খারাপ না তো?

'না।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'মন খারাপ না হলে মুখ এমন অন্ধকার কেন? এই সংসারে ঘড়ি কী খুব বড় জিনিস? দেব, আমি কিনে দেব। খুব দামী ঘড়ি কিনে দেব!'

বাবার পাঁচ টাকা দামের ঘড়ি বুক পকেটে নিয়ে পরীক্ষা দিতে রওনা হলাম। হাতে পরার উপায় নেই। বেল্ট বড়, হাতে ঢলঢল করে।

কলেজ জীবনটাও আমার ঘড়ি ছাড়া কাটল। আমার হোস্টেলের খরচ জোগাতেই বাবা তখন হিমশিম খাচ্ছেন। কিছুতেই সামাল দিতে পারছেন না। ঘড়ি আসবে কোত্থেকে!

প্রথম ঘড়ি কিনলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকারও দেড় বছর পর। ইউনিভার্সিটি শীতের বন্ধ হচ্ছে। বন্ধ হবার দু'দিন আগে একসঙ্গে স্কলারশীপের একবছরের টাকা পেয়ে গেলাম। প্রায় হাজারখানিক টাকা! একসঙ্গে এত টাকা? মাথা খারাপ হয়ে যাবার মত অবস্থা। চলে গেলাম ইসলামপুর। সেই সময়কার হিসেবে সবচে' দামী হাত ঘড়িটা কিনলাম। সাড়ে তিনশ' টাকা। খুব সহজ ঘড়ি না। বিশেষ ধরনের জিনিস। একের ভেতর দুই। একটা স্টপ ওয়াচও আছে। স্টপ ওয়াচের উপকারিতা এখনো বুঝতে পারছি না। আপাতত কতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখা যায় সেই পরীক্ষা চলছে। হাতে পরেছি, হাত কেমন ভার ভার লাগে। মনে হয় অন্য মানুষের হাত। দশ মিনিট পরপর সময় দেখতে ইচ্ছে করে। পাশ দিয়ে ঘড়ি-পরা কেউ যাচ্ছে, আমি গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করি, ভাই কটা বাজে?

সে হয়ত বলল, দুটা দশ।

আমি চট করে নিজের ঘড়ি দেখে নেই — হ্যাঁ, আমারটাতেও দুটা দশ বাজে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘড়ি কেনার আনন্দ অনেকখানি কমে গেল। কেবলি মনে হতে লাগল, খুব-একটা ভুল কাজ করেছি। বাবা যখন দেখবেন আমি নিজের টাকায় ঘড়ি কিনেছি তখন তিনি নিশ্চয়ই মন খারাপ করবেন। অক্ষমতার কষ্ট খানিকটা হলেও পাবেন। তাঁকে সেই কষ্ট দেবার কোন অধিকার আমার নেই। ঘড়ি ফিরিয়ে দেয়া যায়। দোকানি বলে দিয়েছে — পছন্দ না হলে ফেরত নেবে। রিসিট সঙ্গে থাকলেই হল। অল্পবয়সের লোভই জয়ী হল। ফেরত দেয়া হল না। আর ফেরত দেবই বা কিভাবে? কী চমৎকার জিনিস! একের ভেতর দুই।

বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হয়ে গেল। রাত দশটার বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে চেপে রওনা হলাম। যাচ্ছি বগুড়া। তখন আমার বাবা-মা থাকতেন বগুড়া।

জানালার পাশে বসেছি। ঘড়ি-পরা হাত বাইরে বের করা — গফর গাঁ রেল স্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়েছে। হঠাৎ তীব্র ব্যথায় আমার বাঁ হাত অবশ হয়ে গেল। কোন-এক হৃদয়হীন মানুষ টান দিয়ে ঘড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে — হাত কেটে গলগল করে রক্ত পড়ছে! হাতের ব্যথায় নয় প্রবল অভিমানে আমার চোখে পানি এসে গেল। অভিমান ভালবাসার মত, কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমার বেলায় হল। আমি আর ঘড়ি কিনলাম না।

বিয়ের পর হাতে ঘড়ি নেই দেখেই হয়ত আমার শ্বশুর সাহেব তাঁর কন্যার হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বললেন আমাকে ঘড়ি কিনে দিতে। আমার সংসারে তখন চরম

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাওয়া। মহা সংকট। আমি গুলতেকিনকে বললাম, ঘড়ি জিনিসটা আমার খুবই অপছন্দ।

সে বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

'দেখছ না সব সময় টিকটিক করে মনে করিয়ে দিচ্ছে — সময় ফুরিয়ে গেল। এই জন্যে ঘড়ি দেখলেই আমার গা জ্বালা করে।'

সেই সময় আমি যা বলতাম গুলতেকিন বিশ্বাস করত। তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর সবচে' জ্ঞানী (!!) মানুষটিকে সে বিয়ে করেছে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে জ্ঞানী (!!) মানুষটির রুচি এবং অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। সে বলল, টাকাটা তাহলে কী করব? বাবাকে ফিরিয়ে দেব?

'পাগল হয়েছ? উনাকে ফেরত দিলে উনি অপমানিত বোধ করবেন না? আমার কাছে দাও, আমি খরচ করি।'

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যখন আমেরিকা যাচ্ছি তখনো আমার হাতে ঘড়ি নেই। অবশ্যি ততদিনে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। সময় বোঝা আমার জন্যে কোন সমস্যাই না।

নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ ডি করছি — আমার এক বন্ধু শ্রীলংকার রত্ন সভাপতি সুরিয়াকুমারণ একদিন হতভম্ব হয়ে বলল, আমেরিকার যত জায়গায় তুমি ঘড়ি ছাড়া চলছ, ব্যাপারটা কী?

আমি বললাম, সময় জানা আমার কোন সমস্যা না। তুমি আমাকে সময় জিজ্ঞেস কর, আমি বলে দেব।

'দশ ডলার বাজি?'

'হ্যাঁ, দশ ডলার। এখন বাজছে একটা কুড়ি।'

সুরিয়াকুমারণ তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। আসলেই একটা কুড়ি। পাঠকদের কাছে ব্যাপারটা যতটা রহস্যময় মনে হচ্ছে আসল ঘটনা তেমন রহস্যময় নয়। কিছুক্ষণ পরপর অন্যের হাতঘড়িতে সময় দেখে নেয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। সুরিয়াকুমারণের হাতঘড়িতে ক'টা বাজে তা তার সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র এক ফাঁকে দেখে নিয়েছিলাম।

আমার ৩২তম জন্মদিনে আমার স্ত্রী তার বেবী সিটিং-এর টাকায় আমাকে অত্যন্ত দামী একটি সিকো ঘড়ি কিনে দিল। হাসতে হাসতে বলল, এটা 'কোয়ার্টজ ঘড়ি'। টিকটিক করে বলবে না — সময় শেষ। নাও, হাতে পর। এই ঘড়ি আমি অনেক কষ্টের টাকায় কিনেছি।

ঘড়ির উপর থেকে অভিমান উঠিয়ে নিয়ে প্রথম হাতঘড়ি পরলাম। নিজেকে কেন জানি অন্যমানুষ, অন্যমানুষ মনে হতে লাগল। প্রথমবারের মত মনে হল, আর আমাকে অন্যের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না।

আমার এই সিকো ঘড়িটির বয়স এখন দশ। এখনো চমৎকার সময় দিচ্ছে। তবে এই ঘড়ির একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে — যখন আমার স্ত্রী কোন কারণে আমার উপর

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রাগ করে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা একবার না, আমি অসংখ্যবার লক্ষ্য করেছি।

গুলতেকিন রাগ করে। ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। একদিন দু'দিন কাটে। ঘড়ি হঠাৎ এক সময় আপনা-আপনি চলতে শুরু করে। আমি হাসিমুখে বাড়ি ফিরি। জানি, গুলতেকিনের রাগ পড়ে গেছে। ঘরে ফেরামাত্রই সে বলবে — চা খাবে? চা বানিয়ে এনে দেব?

সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন একটা ছবি বানাবে — বাংলাদেশের কৃষক পরিবার নিয়ে ছবি। তাদের জীবনচর্যার গল্প।

এই ছবি বানানোর সঙ্গে বেশ ভালমত জড়িয়ে পড়লাম। কাহিনী আমার। পরিচালনা টেলিভিশনের খ্যাতিমান পরিচালক নওয়াজীশ আলি খানের। ক্যামেরার দায়িত্ব নিলেন মিশুক চৌধুরী, শহীদ মুনীর চৌধুরীর ছেলে মিশুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। ছবির ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ। মূল চরিত্র ডলি জহুর, আসাদুজ্জামান নূর এবং আবুল খায়ের করবেন। অয়োময়ের লাঠিয়াল মোজাম্মেল হোসেন সাহেবও রইলেন। মোটামুটি শক্ত টিম। তিনজন শিশুশিল্পীও নেয়া হয়েছে। তারা ডলি জহুরের তিন কন্যার ভূমিকায় অভিনয় করবে। এই তিন শিশুশিল্পীও দেখা গেল অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথম শ্রেণীর।

দলবল নিয়ে আমরা চলে গেলাম ময়মনসিংহ। পুরো শ্যুটিং হবে আউটডোরে। জয় বাংলা বাজারে হতদরিদ্র এক কৃষক পরিবারের বসতবাড়ি আমরা দশ দিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে নিলাম। তারা বাড়ি-ঘর, হাঁস-মুরগি ফেলে অন্যত্র চলে গেল। আমরা সেই সবই একটু এদিক-ওদিক করে নিজেদের পছন্দমত সাজিয়ে নিলাম।

বিপুল উৎসাহে কাজ শুরু হল।

রাতের বেলা থাকি একটা ডাকবাংলোয়। ডাকবাংলোটা শহর থেকে দূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে। ভারী সুন্দর। সকালবেলা চলে যাই শ্যুটিং স্পটে। কখনো রাত একটা দুটোর আগে ফেরা হয় না। এই জাতীয় কাজ বাইরে থেকে দেখতে খুব একঘেঁয়ে এবং বিরক্তিকর মনে হতে পারে কিন্তু যাঁরা কাজটা করেন তাঁদের আগ্রহ এবং আনন্দ থাকে সীমাহীন। একটামাত্র ক্যামেরায় কাজ হচ্ছে। প্রতিটি জিনিস বারবার খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। একটা ট্রাকের জায়গায় দশটা টেক নেয়া হচ্ছে। যেন প্রথম শ্রেণীর ছবি তৈরি হয়। কোন খুঁত যেন না থাকে।

প্রথম দিনের ঘটনা। আমরা সবকিছু এখনো গুছিয়ে উঠতে পারি নি। ক্যামেরা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঘাপটে, লাইট ঢাকা থেকে এখনো পৌঁছে নি। লাইটের জন্য অপেক্ষা। আমরা ডাকবাংলোয় আছি। দুপুরের দিকে স্পটে যাব। সরকারী পাশতা তৈরি হচ্ছে। সময় লাগবে। চায়ের প্রবল তৃষ্ণা বোধ করছি। বাইরের কোন দোকানে চা পাওয়া যায় কি-না সেই খোঁজে বের হয়ে পড়লাম। জায়গাটা শহর থেকে দশ মাইল দূরে। দোকানপাট কিছু নেই। অনেক খুঁজে খুঁজে খুপসি চায়ের দোকান একটা পাওয়া গেল। আমি এত নোংরা চায়ের দোকান দেখি নি। তার সম্বল হচ্ছে তিনটি মাত্র চায়ের কাপ এবং কাচের বয়ামে ভরা গোটা পাঁচেক টোস্ট বিসকিট। দেখেই মনে হচ্ছে মাস তিনেক আগে কিনে বয়ামে ভরা হয়েছে। কাস্টমার জুটে নি। ভবিষ্যতে জুটবে তাও মনে হচ্ছে না। খালি গায়ে একটা ছেঁড়া লুঙ্গি পরে দোকানের মালিক বসে আছে। তার পাশে চার-পাঁচ বছর বয়েসী ফুটফুটে একটা মেয়ে। তারও খালি গা। এই দোকানের আয়ে ওদের সংসার কিছুতেই চলতে পারে না।

আমি বললাম, চা খাওয়াতে পারবেন?

'জ্বী পারব। বসেন। এট্টু দিরং হইব। চুলা নিভা।'

লোকটা একটা টুল এনে দোকানের বাইরে রেখে অতি যত্নে গামছা দিয়ে মুছে দিল। আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। সবরকম প্রতীক্ষাই কষ্টকর কিন্তু চায়ের প্রতীক্ষায় আনন্দ আছে। আমি দেখলাম বাপ-মেয়ে দু'জনই মহা উৎসাহে চুলায় আগুন ধরাবার চেষ্টা করছে। দু'জনই মনে হচ্ছে আনাড়ি। দু'জনই দু'জনকে ধমকাচ্ছে। প্রচুর ফুঁ, খবরের কাগজে প্রচুর বাতাসের পর আগুন ধরল। কেতলি চাপিয়ে দেয়া হল। আমি শুনলাম, মেয়েটি তার বাবাকে ক্ষীণ স্বরে বলছে, আমারে এক কাপ চা দিবা বাজান?

বাবা মেয়েকে চাপা ধমক দিল, এক কাপ চা এক টেকা। চিনি লাগে, দুধ লাগে। চুপ কইরা বইয়া থাক।

আমি লোকটিকে বললাম, ভাই আমাকে দু'কাপ চা দেবেন।

'জ্বি আইচ্ছা স্যার। আর দেরি নাই, হইয়া আসছে।'

দু'কাপ চা ছোট মেয়েটি আমার কাছে নিয়ে এল। আমি এক কাপ হাতে নিয়ে তাকে বললাম, এই চা তোমার জন্য। নাও, খাও।

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে একবার বাবার দিকে তাকাচ্ছে, একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে আমি বললাম, বোস এই টুলটায়। এসো, এক সঙ্গে চা খাই।

মেয়েটা আমার পাশে বসল এবং খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে বড়দের মত চা খেতে লাগল। আমি আড়চোখে মেয়ের বাবার দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখে-মুখে রাজ্যের বিস্ময়। মনে হচ্ছে তার দীর্ঘ জীবনে এমন রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে নি। অথচ আমি যা করেছি অন্য যে-কেউ তাই করত। আমি হয়ত একটু বেশি করেছি; চা খাবার জন্য মেয়েটিকে আমার পাশে বসিয়েছি। কিন্তু তার জন্যে এতটা বিস্মিত কেউ হবে! আমার নিজের খানিকটা অস্বস্তি লাগতে লাগল।

চায়ের দাম দেবার সময় বললাম, আপনার চা ভাল হয়েছে। আমি মাঝে মাঝে আপনার দোকানে এসে চা খেয়ে যাব।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

লোকটা বিড়বিড় করে বলল, আপনের যখন মনে চায়, আসবেন। নিশুতি রাতেও যদি আপনে আমার দোকানের সামনে আইসা মেকু বইল্যা ডাক দেন আমি আপনেরে চা বানায়ে দিমু।

'কি বলে ডাকতে হবে?'

'মেকু। আমার নাম মেকু। আমি এই দোকানেই মেয়েরে নিয়া ঘুমাই।'

'আচ্ছা, আমার জানা রইল। গভীর রাতে যদি চায়ের পিপাসা পায় আমি আপনার দোকানের সামনে এসে মেকু বলে ডাক দেব।'

দুপুরের দিকে স্পটে চলে গেলাম। প্রথমদিনে রাত দুটা পর্যন্ত কাজ হল। কাহিনীর বড় অংশই রাতে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লাইটিং দেখতে হচ্ছে। বৃষ্টির রাত আমাদের যেমন দরকার, চাঁদনি রাতও দরকার।

রাত তিনটায় ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম। নওয়াজীশ ভাইকে বললাম, চা খাবেন না-কি?

তিনি মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, রাত তিনটার সময় কে আপনাকে চা বানিয়ে দেবে? সব সময় রসিকতা ভাল লাগে না।

'আসুন, খুঁজে দেখি কিছু পাওয়া যায় কি-না। গরমও পড়েছে। খোলা হাওয়ায় হাঁটাহাঁটি করলে ভাল লাগবে।'

উনি বের হলেন। মোজাম্মেল সাহেবও এলেন। আমরা চায়ের সন্ধানে যাচ্ছি শুনে আবুল খায়েরও লাফিয়ে উঠলেন। যে কোন ধরনের অ্যাডভেনচারে এই মানুষটির প্রবল উৎসাহ।

আমি তাঁদের দোকানের সামনে নিয়ে গেলাম। দোকান বন্ধ। ঝাঁপ ফেলা। আমি তিনবার ডাকলাম — মেকু, মেকু, মেকু।

ঝাঁপ খুলে মেকু এবং মেকু-কন্যা বের হয়ে এল। কেউ কোন কথা বলল না। সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে প্রবল উৎসাহে চুলা ধরাতে শুরু করল। নওয়াজীশ ভাই বললেন, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

আমি উদাস গলায় বললাম, ব্যাপার কিছু না। ঐ লোকটার নাম মেকু। আমি মেকুর সঙ্গে এক ধরনের সমঝোতায় চলে এসেছি। যখনি চা খেতে ইচ্ছা করে, এই দোকানের সামনে এসে তিনবার মেকু বললেই চা চলে আসবে।

আমি শুরুতেই নিয়েছিলাম ঘটনাটায় সবাই মজা পাবেন। দেখা গেল, যতটা মজা পাবেন বলে আমি ভেবেছিলাম তাঁরা তার চেয়েও দশ গুণ বেশি মজা পেলেন। ডাকবাংলোয় ফিরে শুধু মেকুর গল্প।

মোজাম্মেল সাহেব গল্প বলার ব্যাপারে খুব পরাদর্শী। তিনি চোখ বড় বড় করে হাত নেড়ে বলছেন,

"অদ্ভুত কাণ্ড। জনমানব নেই। নিশুতি রাত। একটা বন্ধ ঘরের সামনে হুমায়ূন ভাই গিয়ে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় তিনবার বললেন — মেকু মেকু মেকু" — ওম্নি চিচিং ফাঁক — দোকানের ঝাঁপ খুলে গেল . . .

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মেকু রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল। পরদিন ভোরেই আসাদুজ্জামান নূর গেলেন মেকুকে দেখতে। এক কাপ চা খেয়ে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিলেন। মেকু লজ্জিত গলায় বলল, অত বড় নোটের ভাঙতি নাই।

নূর বললেন, ভাঙতি দিতে হবে না। এটা আপনি রেখে দিন। আমি হচ্ছি জমিদার মানুষ — ছোট মির্জা। আপনি বোধহয় আমাকে চেনেন না।

'জ্বে-না।'

'টেলিভিশন দেখলে বুঝতেন যে পঞ্চাশ টাকা ছোট মির্জার হাতের ময়লা। টেলিভিশনে কখনো দেখেন নি?'

'জ্বে-না।'

পরদিন রাতের কথা। আমাদের মেকাপম্যান উত্তম খুব বেজার মুখে আমাকে এসে বলল, স্যার আপনের কথা তো ঠিক না।

'কোন্ কথাটা ঠিক না?'

'আমি ঐ দোকানের কাছে গিয়ে অনেকবার মেকু বলে ডাকছিলাম। কেউ ঝাঁপ খুলল না।'

'চলুন তো ভাই যাই — দেখি কি ব্যাপার।'

আবার আমার সঙ্গে একটা দল জুটে গেল। আমি তিনবার 'মেকু' বলতেই ঝাঁপ খুলে গেল। পিতা-কন্যা ঝাঁপিয়ে পড়ল চুলা ঠিক করতে। বোঝা গেল -- মেকু অন্য কারো ডাকে ঘরের ঝাঁপ খুলবে না। ডাকতে হবে আমাকে। এই বিশেষ ব্যবস্থাটা শুধুমাত্র আমার জন্যই। অন্য কারো জন্যে নয়।

ক'দিন মেকু খুব জমজমাট ব্যবসা করল। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সবাই চা খেয়ে আসছে। নওয়াজীশ আলি খান মেকুকে একটা লুঙ্গি কিনে দিলেন।

আমাদের যাত্রার সময় হয়ে এল। শেষ চা খেতে গিয়েছি। প্রথমবারের মত এবারো একা একা গেলাম।

মেকু বলল, শুনলাম আইজ রাইত যাইতেছেন গিয়া।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'আপনে যদি মনে কিছু না নেন, আমি আফনেরে এক কাপ চা খাওয়াইতে চাই। এট্টু ইজ্জত করতে চাই।'

'মনে কিছু করব না। ইজ্জত করুন।'

মেকু চা বানাল। গ্লুকোজ বিসকিটের একটা প্যাকেট ছেঁড়া হল। সম্ভবত ইজ্জত করার উদ্দেশ্যেই প্যাকেটটা কেনা হয়েছে। আমি চা খেলাম, বিসকিট খেলাম।

চলে আসবার সময় লক্ষ্য করলাম মেকু বিষণ্ন মুখে চুপচাপ বসে আছে। বাচ্চা মেয়েটি হঠাৎ উঠে এসে পা ছুঁয়ে আমাকে সালাম করে চোখ মুছতে লাগল। এই মেয়েটির সঙ্গে আমার একবারই কথা হয়েছে। আর কখনো কোন কথা হয় নি। আমি বলেছিলাম, বসো আমার পাশে, এসো একসঙ্গে চা খাই। অথচ আজ তার চোখে পানি এসে গেল। কি এমন করেছি আমি? আমি তো মেয়েটার নামও জানি না। একবার ইচ্ছা হল ফিরে গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করি। পরমুহূর্তেই মনে হল — কি দরকার?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সংসারত্যাগী মানুষদের প্রতি আমি এক ধরনের মুগ্ধতা বোধ করি। এই মুগ্ধতার কারণ সম্ভবত জীবনানন্দ দাশের কবিতা —

অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়
আরো এক বিপন্ন বিস্ময় . . .

কোন্ বিপন্ন বিস্ময়ের কারণে এই সব মানুষ সংসার ত্যাগ করে তা জানতে ইচ্ছে করে। অবশ্যি এক অর্থে এরা আবার পলাতক মানুষ। সংসার থেকে পলাতক, জীবন থেকে পলাতক। দায়িত্ব থেকেও পলাতক। পলাতক মানেই পরাজিত। পরাজিত মানুষদের প্রতি মমতা কেন থাকবে?

ভবঘুরে মানুষকে এই সমাজ ভাল চোখে দেখে না। গালাগালি অর্থে আমরা 'ভবঘুরে' শব্দটা ব্যবহার করি। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সমস্ত ধর্ম প্রচারকরাই ভবঘুরে। জৈনধর্মের প্রচারক মহাবীর, শিখগুরু নানক, গৌতম বুদ্ধ — এঁরা কি জন্ম-ভবঘুরে নন?

'মহাবীর' শুধু যে ভবঘুরে তাই না, সর্বত্যাগী ভবঘুরে। তিনি সমাজ-সংসার সব তো ছেড়েছিলেনই — পরিধেয় বস্ত্রও ছেড়েছিলেন। উলংগ হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

ভবঘুরেদের প্রতিও আমার এক ধরনের মমতা আছে। প্রায়ই মনে হয়, কি সুন্দর তাদের জীবন! পাখির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভবঘুরে বীজ সম্ভবত আমাদের সবার রক্তেই খানিকটা আছে। ঘোর সংসার-আসক্ত মানুষও কোন-এক বিষণ্ন সন্ধ্যায় ক্ষণিকের জন্যে হলেও ভাবে — সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে কোথাও চলে গেলে কেমন হয়? ঐ যে "অন্তর্গত রক্তে বিপন্ন বিস্ময়"।

জননী ছবির কাজে যখন ময়মনসিংহে খুব ব্যস্ততায় সময় কাটাচ্ছি তখন সালেহ ভাই (একজিকিউটিভ ইনজিনীয়ার, পাবলিক হেলথ) খবর আনলেন — রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান, সংসারত্যাগী সাধু মহারাজ সর্বেশ্বরানন্দ আমাদের ফল খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। আমরা গেলে তিনি খুশি হবেন।

কারোর তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। সারাদিন শ্যুটিং করে ডাকবাংলোয় ফিরে। সবাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। কেউ যেতে চান না -- শুধু আমি প্রচণ্ডরকম উৎসাহী। সংসারত্যাগী একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলা যাবে। আশ্রম দেখা যাবে।

আমার উৎসাহেই শেষ পর্যন্ত জননী ছবির পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনাব নওয়াজীশ আলি খান উৎসাহী হলেন। অভিনেতা আবুল খায়েরের সর্ববিষয়ে উৎসাহ। তিনিও রওনা হলেন। মোজাম্মেল হোসেন (অয়োময়ের লাঠিয়াল) কোন-এক

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] কারণে আমাকে কোথাও একা ছাড়তে রাজি নন। আমার ধারণা -- পরকালে যদি আমাকে দোজখে পাঠানো হয়, মোজাম্মেল সাহেব করুণ গলায় বলবেন, আমার আলাদা খাবারের হিসেবের দরকার নেই। হুমায়ূন ভাই যেখানে যাচ্ছেন দয়া করে আমাকেও সেখানে দিন। তিনিও রওনা হলেন।

মহারাজ সর্বেশ্বরানন্দ গেরুয়া বস্ত্র পরে গেটের কাছে আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রথম দর্শনেই খানিকটা চমকালাম — টকটকে গৌর বর্ণ। কাটা কাটা চেহারা। গৌর বর্ণের কাপড়ে তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। সর্বেশ্বরানন্দ হাসিমুখে ভরাট গলায় বললেন, আপনারা এসেছেন। খুব আনন্দ হচ্ছে। সুস্বাগতম।

গেটের ভেতর ঢুকতেই আশ্রমের ছেলেরা উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। আশ্রমের নিয়ম কানুন খুব কড়া। এই সময় তাদের পড়াশোনার সময়। উঁকি-ঝুঁকি দেবার সময় নয়। মহারাজ তাদের দিকে ফিরেও নরম গলায় বললেন, এরা আপনাদের জন্যে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। আপনারা কি ভাগ্যবান! যেখানে যান সেখানেই মানুষের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেন।

সাধু-সন্ন্যাসীরা কথা বলার বিদ্যায় এত ওস্তাদ হয়, জানতাম না। আমি অবাকই হলাম।

আশ্রম ছোট কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন। ছবি-ছবি ভাব। একটা গাছের শুকনো পাতাও কোথাও পড়ে নেই। মেঝেতে এক বিন্দু ধুলা নেই। মনে হয় হাওয়ায় উড়ে ছোট্ট একটা পাখির পালক পড়লেও কেউ ছুটে এসে তা নিয়ে যাবে।

এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আমার কাছে মেকি মনে হয়। মনে হয়, একদল শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষের কাছে এসে পড়েছি। যারা ধুলা সহ্য করে না, গাছের শুকনো পাতা সহ্য করে না। পাখির পালক সহ্য করে না।

আমরা সাধুজীর অফিসে বসলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ফল খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন — কেন বলুন তো?

সাধুজী কিঞ্চিৎ লজ্জিত গলায় বললেন, আশ্রমের ছেলেদের জন্যে একটা টিভি আছে। টিভিতে 'অয়োময়' নাটকটি আমিও ওদের সঙ্গে দেখেছি। আপনারা অয়োময়ের সৃষ্টিকর্তা। আপনাদের দেখতে চাওয়াই কি স্বাভাবিক নয়?

'না, খুব স্বাভাবিক না — আপনি হচ্ছেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এইসব পার্থিব বিষয় আপনার মধ্যে কেন থাকবে?'

কথাগুলি বেশ কঠিন এবং আমি বলেছিও কঠিন ভাবে। ভেবেছিলাম, সাধুজী রেগে যাবেন। তিনি রাগলেন না, হেসে ফেললেন। আশ্রমবাসী এক ছেলেকে বললেন, এঁদের খাবার দাও।

আবুল খায়ের সাহেব বললেন, সাধুজী, আপনার দেশ কোথায়?

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, সেটা তো ভাই বলব না। সন্ন্যাস গ্রহণের পর সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনের কথা বলা নিষিদ্ধ।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাবার চলে এল। নানান ধরনের ফল-মূল। ভাজা মুড়ি। সন্দেশ। বিরাট আয়োজন। প্রতিটি খাবারই অত্যন্ত সুস্বাদু।

সাধুজী বললেন, এই সব খাবার উপহার হিসেবে পাওয়া। ভক্তরা আশ্রমে আসেন। উপহার নিয়ে আসেন। আপনারা তৃপ্তি করে খাচ্ছেন, দেখতে ভাল লাগছে।

আমি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললাম, যদি কিছু মনে না করেন, আমি চা-টা আশ্রমের বাইরে গিয়ে খেতে চাই।

'কেন?'

'সিগারেট ছাড়া আমি চা খেতে পারি না। আশ্রমে নিশ্চয়ই সিগারেট খাওয়ার অনুমতি নেই।'

সাধুজী এই কথার উত্তরে আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন — যে কাজ গোপনে করা যায় সেই কাজ প্রকাশ্যেও করা যায়। আপনি এখানেই সিগারেট খান। কোন বাধা-নিষেধ নেই। একবার আশ্রমের এক অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে কিছু গায়ক-গায়িকা এসেছিলেন। তাঁদের একজন মদ্যপান করতে চাইলেন। আমি ঐ দ্রব্য জোগাড় করে তাঁকে খাইয়েছি।

সিগারেট পানের অনুমতি পাওয়ার পরই সবাই একটা করে সিগারেট ধরিয়ে ঘর অন্ধকার করে ফেললাম। নওয়াজীশ আলি খান, মোজাম্মেল হোসেন দু'জনের কেউই সিগারেট খান না — তারাও দেখি সিগারেট ধরিয়েছেন। সম্ভবত তাঁরা এক ধরনের টেনশান বোধ করছিলেন।

মোজাম্মেল হোসেন সাহেব আশ্রমের কাণ্ডকারখানায় খানিকটা হকচকিয়ে গেছেন বলে মনে হল। তিনি ভাবগদগদ গলায় বললেন — মহারাজ, আমি এক গ্লাস 'জল' খাব।

আমি বললাম, ভাই আপনি সারাজীবন পানি খেয়ে এসেছেন এখন হঠাৎ 'জল' খেতে চাচ্ছেন কেন?

সবাই হা-হা করে হেসে উঠল। আলাপ-আলোচনার প্রাথমিক বাধা এই হাসির তোড়ে কেটে গেল। সাধুজী রামকৃষ্ণের নানান কথা বলতে লাগলেন। সবই খুব উচুদরের কথা। দার্শনিক কথা! তিনি যদি তা না করে রামকৃষ্ণের সহজ স্বাভাবিক রসিকতার গল্পগুলি করতেন, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর অতিসরল উক্তিগুলি করতেন তাহলে সবাই অনেক বেশি উৎসাহিত হত।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের — পরম পুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আমার প্রিয় গ্রন্থের একটি। রামকৃষ্ণের মজার উক্তি, তাঁর হিউমার এবং জটিল বিষয় ব্যাখ্যা করার অসাধারণ ক্ষমতা সব সময়ই আমাকে মুগ্ধ করেছে।

রামকৃষ্ণের আলোচনা যখন উঠল লোভ সামলাতে পারলাম না। আমি কয়েকটা গল্প বললাম।

* * * *

রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, ঈশ্বর কি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রামকৃষ্ণ বললেন, বলছি। তার আগে তুই বল, ঘি কি?

ভক্ত বিস্মিত হয়ে বলল, ঘি হচ্ছে ঘি।

রামকৃষ্ণ বললেন, ঈশ্বর হচ্ছে ঈশ্বর।

* * * *

সাধক ভক্ত রামকৃষ্ণকে বললেন, আমি কুড়ি বছর সাধনা করে মহাবিদ্যা আয়ত্ত করেছি।

'কি সেই মহাবিদ্যা?'

'আমি এখন পায়ে হেঁটে নদী পার হতে পারি।'

'আরে গাধা, একটা পয়সা দিলেই তো খেয়া নৌকার মাঝি তোকে নদী পার করে দেয়। তোর এই সাধনার মূল্য হল এক পয়সা। আসল সাধনা শুরু কর।'

* * * *

রামকৃষ্ণ বলছেন — যত মত তত পথ। নদী নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু পড়ে গিয়ে সেই সমুদ্রে। তেমনি ছাদে নানা উপায়ে উঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁশের সিঁড়ি, ঘোরানো সিঁড়ি। ইচ্ছে করলে শুধু একটা দড়ি দিয়েও উঠতে পারো। তবে যে ভাবেই ওঠো একটা কিছু ধরে উঠতে হবে। সেই একটা কিছু হচ্ছে ধর্ম। যা তুমি ধরবে, তা বাপু একটু শক্ত করে ধরো। পা পিছলে পড়ে না যাও।

এই আশ্রমের একটা জিনিস আমার পছন্দ হল না — মেয়েদের এখানে স্থান নেই। মেয়েরা সাধনার বাধা। এদের সরিয়ে রাখতে হবে দূরে।

আমি সাধুজীকে বললাম, এ-রকম হল কেন? রামকৃষ্ণ নিজে তো বিবাহিত ছিলেন।

তিনি বললেন, আশ্রমের নিয়ম-কানুন স্বামী বিবেকানন্দের করা। তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী।

'আপনি নিজে কি মনে করেন মেয়েরা সাধনার বাধা?'

তিনি জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, শেষ প্রশ্ন — আপনার কি এই দীর্ঘ সন্ন্যাস জীবনে একবারও মন কেমন করে নি? একবারও ইচ্ছে হয় নি গৃহবাসী হতে?

সাধুজী এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, আপনারা কিন্তু আবার আসবেন। চারটা ডাল ভাত আমার সঙ্গে খাবেন। আশ্রমে অতিথিশালা আছে। এর পরের বার এলে উঠতে হবে আমার অতিথিশালায়। মূল প্রশ্ন আবারো এড়িয়ে গেলেন।

আশ্রমের ছেলেরা দল বেঁধে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দ এবং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম তাদের অনেকের কাছেই আমার মত গৃহী মানুষের লেখা বই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে করতে একটা বেজে গেল। আমি নওয়াজীশ ভাইকে বললাম, আজ একটু নিয়মের ব্যতিক্রম করলে কেমন হয়?

'কি রকম?'

'বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। চলুন, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাই। একটা নৌকা ভাড়া করে ব্রহ্মপুত্র নদীতে ঘুরে বেড়াই।'

আমি ভেবেছিলাম তিনি রেগে যাবেন, রাগলেন না। আমাকে অবাক করে দিয়ে সহজ গলায় বললেন — চলুন।

মোজাম্মেল হোসেন শুয়ে পড়েছিলেন। তিনি গলা পর্যন্ত চাদর টেনে দিয়ে বললেন, খবর্দার আমাকে ডাকবেন না। আমি এইসব পাগলামিতে নেই। এটা একটা কথা হল রাত একটায় ব্রহ্মপুত্র?

আমি নওয়াজীশ ভাইকে নিয়ে গেট পর্যন্ত চলে গিয়েছি। দেখি ভিজতে ভিজতে মোজাম্মেল সাহেব আসছেন। তিক্ত গলায় বলছেন — কোন মানে হয়? এই পাগলামির কোন মানে হয়?

সারারাত আমরা নৌকায় কাটালাম। খোলা নৌকায় চিৎ হয়ে শুয়ে বৃষ্টিতে ভিজলাম। মোজাম্মেল সাহেব একটু পরপর বলতে লাগলেন — অপূর্ব!!

ভোরবেলা মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করল। আমি নওয়াজীশ ভাইকে বললাম, সন্ন্যাসী হয়ে গেলে কেমন হয়?

নওয়াজীশ ভাই বললেন, আমি রাজি। চলুন নৌকা ভাসিয়ে দেই।

আমরা নৌকা ভাসালাম না। তবে সবাই শার্ট খুলে নদীর পানিতে ফেলে দিলাম। নৌকার মাঝি অবাক হয়ে বলল, কি হইছে? — আপনারার কি হইছে? সে বৈঠা দিয়ে তিনটা শার্টের মধ্যে দুটা শার্ট উদ্ধার করল।

ভোরবেলা ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর নির্মিত চীন মৈত্রী সেতু দিয়ে হেঁটে হেঁটে তিনজন ফিরছি। কারো গায়ে শার্ট নেই। আমাদের ঘোর কেটে গেছে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছি। এখন আমাদের চেষ্টা কত দ্রুত আস্তানায় ফিরে ভদ্র হওয়া যায়।

মর্নিং ওয়াক করতে বের-হওয়া এক ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। একি সমস্যায় পড়া গেল! আমি অন্যদিকে তাকিয়ে হাঁটছি। ভদ্রলোক আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনি কি হুমায়ূন আহমেদ?

আমি মধুর হেসে বললাম, আপনি ভুল করছেন। আমি অন্য ব্যক্তি।

খুব ছোটবেলার কথা মনে করতে গেলেই দেখি দু'একটা বিচ্ছিন্ন চিত্র ছাড়া আর কিছু মনে নেই। এটা বোধহয় সবার জন্যেই সত্যি। সুদূর শৈশবে কিছু গুরুত্বহীন ঘটনা কোন বিশেষ কারণে কাউকে অভিভূত করে। সেটি মনে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। সেগুলিই মনে থাকে, অন্য কিছু আর মনে থাকে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কিন্তু তার মধ্যেও রহস্য আছে। সেই রহস্য বিষয়ে বলবার আগে আমার খুব ছোটবেলার একটা স্মৃতি সম্পর্কে বলি। চোখ বুজলেই আমি ছেলেবেলার এই ছবিটি দেখি — একটা ফাঁকা জায়গায় প্রকাণ্ড একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটি ঘন কৃষ্ণবর্ণ। আমার মামা আমাকে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়াবার চেষ্টা করছেন। আমি ভয়ে মামার গলা ঝাপ্টে ধরে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছি! হঠাৎ ঘোড়াটি বিরক্ত হয়ে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিল। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম অনেকখানি দূরে। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলো। পরিষ্কার ছবি।

মুশকিল হচ্ছে, এ রকম কোন ঘটনা কি আসলে ঘটেছিল? বাড়ির অন্য কেউ ঘটনাটা মনে করতে পারেন না। এত বড় একটা ব্যাপার কারো মনে থাকবে না? তাছাড়া ঘোড়া আমাদের দেশে এমন কোন সুলভ প্রাণী নয়। তাহলে আমার এই স্মৃতিটি কি মিথ্যা স্মৃতি?

অবশ্যি আমাদের একটা ঘোড়া ছিল। কয়েকদিনের জন্যে প্রকাণ্ড এই প্রাণীটিকে কেনা হয়েছিল। আমার বাবার অনেক ধরনের পাগলামির একটি। সেই ঘোড়ার রঙ লাল। কালো মোটেই নয়। তার চেয়েও বড় কথা — আমার এই স্মৃতি, ঘোড়া কেনারও আগের স্মৃতি।

তবু ধরে নিচ্ছি স্মৃতি প্রতারণা করছে, আগের ঘটনা পরে নিয়ে গেছে। যেহেতু খানিকটা হলেও সন্দেহ আছে। এই ঘটনা বাতিল করে দেয়া যাক।

আরেকটা ঘটনা বলি। নানার বাড়ি গিয়েছি বিয়ে উপলক্ষে। সব ক'টি শিশুকে একটা প্রকাণ্ড বিছানায় শোয়ানো হয়েছে। চার-পাঁচটি লেপ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে আমাদের। প্রচণ্ড শীত। ঘুম আসব আসব করছে — এমন সময় শোনা গেলো — আগুন আগুন। পাশের কয়েকটা ঘর পরেই আগুন লেগেছে। চিৎকার ও ছুটাছুটি। উত্তেজনায় কিছুই খেয়াল নেই। হঠাৎ এক সময় লক্ষ্য করলাম অপরিচিত একটি মেয়ে আমাকে কোলে নিয়ে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির মুখ দেবী প্রতিমার মত। গা ভর্তি গয়না। সে আগুনের দিকে তাকিয়ে খুব হাসছে এবং যতবারই আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকাই ততবারই সে বলে, দেখ দেখ! আগুন দেখ। এই বলে সে আমার মুখ আগুনের দিকে ফিরিয়ে দেয়া। আগুনটা ছিল দেখবার মতই। কিছু সময় পর আগুন আশেপাশের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো। লাল হয়ে গেল চারদিক। দূর-দূর থেকে লোকজন ছুটে এলো। এত অল্প সময়ে এত দ্রুত ঘটনাগুলি ঘটলো যে আমার আর কিছুই খেয়াল নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পরবর্তী সময়ে আমি দেখলাম আগুন লাগার ঘটনাটি কারোর মনে নেই। আমার বড় মামা বললেন — "গ্রামের আগুন লাগা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। সবারই মনে থাকতো। এ জাতীয় কোন ঘটনা ঘটে নি। তুমি স্বপ্নে-টপ্নে দেখেছ। তাছাড়া গ্রাম ঘরে এত গয়না পরে কোন মেয়ে থাকে না।" খুবই যুক্তিসংগত কথা। তাহলে আমাকে কোলে নিয়ে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিলো এবং বারবার আমাকে আগুন দেখাচ্ছিলো সে কে? অথচ সেই রূপবতী মেয়ের লম্বাটে মুখ পর্যন্ত আমার মনে আছে। ছবি আঁকতে জানলে ছবি আঁকতাম।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শৈশবের স্মৃতির মধ্যে কি তাহলে কোন রহস্য আছে। যে সব ঘটনা স্মৃতি বলে ভেবে রাখি তার সবগুলি এ-জীবনে আদৌ ঘটে নি। তা কেমন করে হয়? শৈশবের স্মৃতি কি তাহলে দু'রকমের? সত্যি স্মৃতি ও মিথ্যা স্মৃতি?

এই নিয়ে আমি প্রথম গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করি যখন আমার বয়স তেত্রিশ। সন-তারিখ মনে নেই, আমি তখন আমেরিকাতে। ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি, টমাস বাইহোফার নামের একজন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এসে বললো — যাও বাইরে গিয়ে দেখো, তুষার ঝড় শুরু হয়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিক বরফে ঢেকে গেছে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। তুষার পড়ছে সমানে। দু'হাত দূরের মানুষটিকে পর্যন্ত দেখা যায় না। এই প্রথম তুষারপাত দেখা। অদ্ভুত অনুভূতি। কিন্তু আমার চট করে মনে হলো অবিকল এই দৃশ্য আমি দেখেছি সিলেটের মীরা বাজারে। একদিন দুপুরবেলা আকাশে খুব মেঘ করেছে। আমরা যাতে বাইরে যেতে না পারি সে জন্যে দরজার হুড়কো লাগিয়ে মা পাটি বিছিয়ে ঘুমাচ্ছেন। এমন সময় বৃষ্টি শুরু হলো। আমি বৃষ্টি দেখবার জন্যে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি চারদিক শাদা হয়ে গেছে। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। সেই শৈশবেই বুঝতে পারলাম এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার এবং এটা সবাইকে ডেকে দেখানো উচিত। কিন্তু আমার কাউকে ডাকতে ইচ্ছা হলো না। আমি একাই অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখলাম।

এর মানে তাহলে কি দাঁড়ায় বা আদৌ কোন মানে দাঁড় করানো যায় কি? এগুলি কি শৈশবের ফ্যান্টাসি? শিশু বয়সে কল্পনায় এ-রকম একটি দৃশ্য তৈরি করেছি যা মিলে গেছে বাস্তবের সঙ্গে বা কাছাকাছি একটা মিল পাওয়া গেছে?

"আছাদ" নামের আমাদের একজন কাজের লোক ছিল। সে সব সময় বলত খুব ছোট বয়সে সে একবার "পরী" দেখে। পরীর বর্ণনাটা বইয়ের পরীর আঁকা ছবির সঙ্গে মিলে না। পরীটার গায়ে নাকি কচি ঘাসের মত একটা বাজে গন্ধ ছিল। পায়ের নখগুলি ছিল পাখির নখের মত অস্বাভাবিক লম্বা এবং গায়ের রং ধবধবে শাদা নয় — ছাই বর্ণের। অসংখ্যবার সে এই পরীর গল্প আমাদের করেছে। তখন আমি বেশ বড় এবং বুঝতে শিখেছি যে রূপকথার পরীকে বাস্তবে দেখার কোনই সম্ভাবনা নেই। কাজেই আছাদ যতবারই এ-গল্প বলে ততবারই আমি তাকে ঠাট্টা করি এবং সে কেঁদে-কেটে এক কাণ্ড করে। যেন এ-গল্প বিশ্বাস করতেই হবে।

বছর সাতেক আগে আছাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। এখন রীতিমত একজন বুড়ো মানুষ। আমি সেই পরীটির কথা জিজ্ঞেস করতেই সে ঠিক আগের মত উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করলো। ঘাসের গন্ধের কথা বললো কিন্তু পরীটিকে কোথায় দেখেছে, দিনে দেখেছে না রাতে দেখেছে সে সব কিছুই বলতে পারলো না। তার নাকি মনে নেই। শুধু মনে আছে পাখির নখের মত লম্বা নখ। ছাই বর্ণের গা।

আমি খুব অস্বস্তি নিয়ে বললাম, গায়ে কাপড় ছিল না নগ্ন ছিল? আছাদ জবাব দিল না মাথা নিচু করে রইল। জবাবটা এই থেকে আঁচ করা যায়।

আমি অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি খুব ছেলেবেলার কোন অদ্ভুত স্মৃতি তাদের আছে কি-না। কেউ তেমন অদ্ভুত কিছু আমাকে বলে নি। আমার মেজো মেয়ে শীলার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাবা তাকে আমি বলেছি, মজার মজার কোন জিনিস যদি কখনো দেখ, আমাকে বলবে। সে এটাকে খেলা মনে করে বোজ আমাকে তিন চারটি গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলে। এগুলি বানানো গল্প। তা দু'একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে।

"বাবা, আজকে আমি দেখলাম, জানালা দিয়ে একটা কাক এসে তোমার সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে কপ করে খেয়ে ফেলেছে।"

"বাবা, আজ দেখলাম, একটা ছাগল মটর গাড়ি চালাচ্ছে।"

আমার এক্সপেরিমেন্ট সফল হয় নি। শৈশবের স্মৃতির একটা বড় অংশ মিথ্যা স্মৃতি — এটা প্রমাণ করার মত যুক্তি আমার হাতে নেই। না-থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে, কেউ মনে করেন না তাঁদের স্মৃতির মধ্যে ভেজাল আছে। সারা জীবন সমস্ত স্মৃতিকে সত্যই ভাবেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কোন স্মৃতি যদি থাকে তবে তার তিনি একটি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেন। সহজভাবেই বলেন — "আরে দূর, ছোটবেলায় কি দেখতে কি দেখেছি। কিছু মনে আছে নাকি?"

কিন্তু আমি কোন অস্পষ্ট স্মৃতির কথা বলছি না। আমি বলছি এমন সব স্মৃতির কথা যেগুলি স্বর্ণখণ্ডের মত চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করছে। যেমন আমার দেখা আগুন লাগার দৃশ্যটির কথা। যার প্রতিটি ছবি এখনো পরিষ্কার দেখতে পাই, যে মেয়েটি আমাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আগুনের আঁচে কিংবা ঘটনার উত্তেজনায় তার কপালে যে ঘাম জমেছিল সেগুলি পর্যন্ত আমার চোখে ভাসে।

এটা স্বপ্নদৃশ্য নয় — স্বপ্ন হয় অস্পষ্ট। যেখানে কোন চিত্রই পরিষ্কার ভাবে আসে না। স্বপ্নে একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার কোন মিল থাকে না। সমগ্র স্বপ্নে একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব থাকে। আমার দেখা ঐ আগুন লাগার দৃশ্যে বা ঘোড়ার দৃশ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। ছাড়া-ছাড়া ভাব নেই।

তুষারপাতের দৃশ্যটির কথা আমি না হয় বাদ দিচ্ছি। ধরে নিচ্ছি, ঐদিন এত বেশি বৃষ্টি হচ্ছিল কিংবা শিল পড়ছিল যাতে সব শাদা হয়ে গেছে। কিন্তু আগুন লাগার দৃশ্যটি বা ঘোড়ার দৃশ্যটির ব্যাখ্যা কি?

বড় রহস্যময় একটি জগতে আমরা বাস করি। আমাদের চারপাশে বিপুল অন্ধকার। বড় ইচ্ছা করে এই গাঢ় অন্ধকার অন্তত একবারের জন্য হলেও কাটুক। একবার অন্তত বিপুল রহস্যের একটা অংশকে স্পর্শ করি।

কোনদিন কি তা সম্ভব হবে?

মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় — আপনি কি আস্তিক? আল্লাহ্ বিশ্বাস করেন? এই সব ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলা বিপদ, আবার না বলাও বিপদ। প্রশ্নকর্তা যদি নাস্তিক হন — আমি হ্যাঁ বললে অসংখ্য যুক্তিতর্ক ফাঁদবেন এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন

Nirjoy

www.BanglaBook.org

যে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই। একটাই আমাদের জীবন। এইসব যুক্তি সবই আগে শোনা। নতুন কথা কেউ বলতে পারেন না। পুরানো জিনিস বারবার শুনতে ভাল লাগার কথা না। আমার কখনো ভাল লাগে না। ভাল না লাগলেও এই প্রশ্ন আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়।

উত্তরে আমি সাধারণত বলি, আপনার কি মনে হয়? এই বলে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করি। আলোচনা নিয়ে আসতে চেষ্টা করি ভূত-প্রেতের দিকে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের চেয়ে ভূত-প্রেতের অস্তিত্বের আলোচনা সহজ।

তবে সমস্যা আছে। ভূত-প্রেত নিয়ে আলোচনা শুরু হলে অসংখ্য ভূতের গল্প শুনতে হয়। যিনি ভূতে বিশ্বাস করেন না তাঁর স্টকেও গোটা দশেক ভূতের গল্প জমা থাকে। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন গল্প শোনাতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সব ভূতের গল্পের ফর্মূলা এক। 'অশরীরী আত্মা এসে কিছু বলবে।' ঠিকমত বলতে না পারলে এই জাতীয় গল্পগুলি অত্যন্ত হাস্যকর শোনায়। অধিকাংশ সময়ই গল্পকথক তা জানেন না।

মূল ব্যাপার হচ্ছে পরিবেশ সৃষ্টি। পরিবেশ সৃষ্টি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। হাসির গল্প বলার জন্যে পরিবেশ তৈরি করার কোন প্রয়োজন নেই — গল্পটা বলে ফেললেই হল। দুপুর রোদে হাটের মাঝখানে ভূতের গল্প বলা যায় না। বর্ষার রাত, হারিকেনের আলো, অসম্ভব মনোযোগী কিছু শ্রোতা ছাড়া ভূতের গল্প হয় না।

একবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে রিকশা করে নিউ মার্কেট যাচ্ছি। ভরদুপুর — ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। বন্ধু হঠাৎ কি মনে করে ভূতের গল্প শুরু করলেন। তাঁর বাড়ির ঘটনা। আমার ইচ্ছা করছিল কোন-একটা ট্রাক এলে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ট্রাকের নিচে ফেলে দিতে। এতটা নির্বোধ মানুষ কি করে হয়? সে গল্পটা বলছেও খুব হেলাফেলা ভাবে — তখন মনে হল, আরে, এই লোক তো আসলে ভূতের গল্প বলবে বলে বলছে না। আমাকে ভয় পাওয়ানো তার উদ্দেশ্য নয়। সে তার বাড়ির একটি ঘটনা বর্ণনা করছে। আমি আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলাম — গল্প শেষ হলে আতংকে দম বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা হল। এখান থেকে একটা জিনিস শিখলাম — ভূতের গল্পের জন্যে পরিবেশ কোন অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে গল্পটি বলা। শ্রোতার মনে ধারণা তৈরি করে দেয়া যে গল্পটা সত্যি।

ভূতের গল্পের প্রতি আমার দুর্বলতা সীমাহীন। রহস্যময়তার জন্যেই এই গল্পগুলি আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। খুব ছোটবেলায় মনোজ বসুর একটা গল্প পড়েছিলাম -- লাল চুল। একটি মেয়ের বিয়ে হবে। বর আসবে সন্ধ্যায়। যেহেতু তাকে রাত জাগতে হবে তাকে অবেলায় শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হল। যাতে সে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে সেজন্যে ঘর খালি। মেয়েটি একা একা ঘুমুচ্ছে।

সন্ধ্যা বেলা বর এল। "বর এসেছে, বর এসেছে" খুব হৈচৈ হচ্ছে। মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল। সে একা একা উঠে গেল ছাদে। ছাদ থেকে ঝুঁকে সে বর দেখার চেষ্টা করছে — হঠাৎ পা পিছলে গেল। দু'তলা থেকে পাকা বারান্দায় মেয়েটি পড়েছে, মাথা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পড়ে গেছে, গলগল করে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, তার কালো চুল হয়ে গেল টকটকে লাল। . . .

গল্পের শুরু এখান থেকে — মেয়েটির মৃত্যুর পর। কি অভিভূত যে হয়েছিলাম গল্প পড়ে! গল্প শেষ করবার পর মনে হচ্ছিল মেয়েটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার রেশমী শাড়ির খসখস শব্দ কানে আসছে, গা থেকে চাপা ফুলের ঘ্রাণ আসছে।

আমার জীবনের প্রথম লেখা গল্পটিও ছিল ভৌতিক গল্প। স্কুল ম্যাগাজিনের জন্যে লেখা — ভয়ংকর ভৌতিক কাণ্ডকারখানা আছে। অবশ্যি শেষের দিকে দেখা গেল পুরো ব্যাপারটাই ঘটছে স্বপ্নে।

সচেতনভাবে ভূতের গল্প লিখি ৮৭ সনের দিকে। নাম 'দেবী'। দেবী লেখার ইতিহাসটাও বেশ মজার — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর জাফর মাহমুদের বাসায় এক সন্ধ্যায় গিয়েছি। স্যার বললেন, হুমায়ূন, আমার এক আত্মীয়া তোমাকে দেখতে চায়। ও বোধহয় কিছু বলবে। তোমার বই-টই পড়েছে।

আমি বললাম, নিয়ে আসুন স্যার।

স্যার ১৮/১৯ বছরের এক তরুণীকে নিয়ে ঢুকলেন। মেয়েটা রোগা। অতিরিক্ত রকমের ফর্সা! তাকে রূপবতী বলা যায়, তবে চোখে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা আছে। এই দৃষ্টি মানুষকে কাছে টানে না, দূরে সরিয়ে দেয়।

আমি হাসিমুখে বললাম, তুমি আমাকে কিছু বলবে?

সে কঠিন চোখে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে চলে গেল।

আমি অপ্রস্তুত। জাফর স্যারও অপ্রস্তুত। আমি বললাম, স্যার মেয়েটির বোধহয় লেখক পছন্দ হয় নি। সে হয়তো আরো ভারিক্কি কাউকে আশা করেছিল।

স্যার বললেন, ব্যাপার তা না। ওর কিছু সমস্যা আছে। দাঁড়াও, তোমাকে বলি — মেয়েটার বাড়ি পদ্মা নদীর তীরে। বাড়িতে টিউবওয়েল আছে, তবু বেশির ভাগ সময় নদীতেই এরা গোসল করে। মেয়েটির বয়স তখন বারো কিংবা তেরো। নদীতে গোসল করছে হঠাৎ তার কাছে মনে হল কে যেন তার দুপা জড়িয়ে ধরেছে। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। পা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। পারল না। যতই ছাড়াতে চেষ্টা করে ততই জোরে দুটা মানুষের হাতের মত হাত তাকে চেপে ধরে। মেয়েটির চিৎকারে অনেকেই ছুটে এল। তাকে টেনে পারে তোলা হল! দেখা গেল একটি মৃতদেহ মেয়েটির পা জড়িয়ে ধরে আছে। মৃতদেহটির মাথা নেই। ভয়াবহ ঘটনা। মেয়েটির মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন তার চিকিৎসা চলে। ঢাকায় সে চিকিৎসার জন্যে এসেছে। এখন সে অনেক ভাল। আমরা মেয়েটির বিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।

আমি গভীর আগ্রহে বললাম, স্যার, আমি মেয়েটাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি কি তাকে একটু ডাকবেন?

স্যার উঠে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, ও আসবে না। অনেক বুঝালাম।

'দেবী' উপন্যাসে আমি এই মেয়েটির গল্পই বলেছি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভূত প্রেত বিষয়ক অনেক লেখা লিখলেও আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ভূত দেখি নি। আমার কোন রকম ভৌতিক অভিজ্ঞতাও নেই। বেশ কয়েকবার তীব্র ভয় পেয়েছি। এর বেশি কিছু না। ভয় পাওয়া এক ব্যাপার — ভূত দেখা অন্য ব্যাপার।

একটা ভয় পাওয়ার গল্প বলি — রাতে ঘুম আসছে না। আমি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছি। শহীদুল্লাহ হলের যে-বাসায় আমি থাকি তার বারান্দাটা দেখার মত। তিনশ' ফুটের মত লম্বা। আমি বারান্দার এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যাচ্ছি, আবার ফিরে আসছি। বারান্দার সব বাতি নেভানো। তবু বেশ আলো আছে। বাসার সবাই ঘুমে অচেতন। আমার মেজো মেয়ের ঘুমের মধ্যে খিলখিল করে হাসার রোগ আছে। একবার সে হেসে আবার চুপ করে গেল।

বারান্দায় বুক শেলফের কাছে একটা বেতের চেয়ার আছে। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আমি ক্লান্ত হয়ে চেয়ারটায় বসলাম। বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আতংকে অস্থির হয়ে পড়লাম। এই আতংকের ধরন আলাদা। এর জন্ম আমাদের চেনা-জানা পৃথিবীতে নয়। অন্য কোথাও। আমার মনে হল আমার চেয়ারের ঠিক পেছনে কেউ-একজন দাঁড়িয়ে আছে যে তার বরফশীতল হাত এক্ষুনি আমার দু'চোখের উপর রাখবে।

চিৎকার করে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার চিৎকার এতই ভয়াবহ ছিল যে আমার স্ত্রীর ঘুম ভাঙল। আমার কন্যাদের ঘুম ভাঙল।

এই ভয়াবহ ঘটনার আমি নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। ব্যাখ্যাটা বলি — অনিদ্রায় ক্লান্ত হয়ে আমি চেয়ারে বসামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমুবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

এই ব্যাখ্যা যে কোন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার কথা, আমার কাছে নয় — কারণ অনিদ্রা রোগ আমার দীর্ঘদিনের সাথী। ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ার মত অবস্থা কখনো আমার হয় না। সেদিনও হয় নি।

তাহলে এমন ভয়ংকর ভয় কেন পেলাম? এই ভয় কি আমার অবচেতন মনের কোন অন্ধ গুহায় লুকিয়ে ছিল? শুনেছি, কোন মানুষ পাগল হবার আগে অকারণেই প্রচণ্ড ভয় পায়। তীব্র ভয়ে অভিভূত হবার পরপরই পাগলামি শুরু হয়। সে চলে যায় ভয় এবং আনন্দের ঊর্ধ্বে।

আমি আমার পরিচিত মানুষদের প্রায়ই জিজ্ঞেস করি — আচ্ছা, আপনি কি কখনো অকারণে তীব্র ভয় পেয়েছেন? আমার এই সহজ প্রশ্ন কেউই বুঝতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে বলেন — হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি। অবশ্যই পেয়েছি — একদিন কি হয়েছে শুনুন। রিকশা করে যাচ্ছি হঠাৎ একটা প্রাইভেট কার এসে ধাক্কা দিয়ে রিকশাটা ফেলে দিল। আমি ছিটকে পড়লাম রাস্তার মাঝখানে — তাকিয়ে দেখি দানবের মত একটা ট্রাক ছুটে আসছে — ভয়ে আতংকে . . . .

আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এই ভয় তো অকারণ ভয় নয়। ভয় পাওয়ার আপনার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। আমি জানতে চাচ্ছি, ভয় পাওয়ার মত কিছুই ঘটে নি অথচ আপনি ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেলেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'।ক সব পাগলের মত কথা যে আপনি বলেন — ভয় পাওয়ার মত কিছু না ঘটলে 'ামি শুধু শুধু ভয় পাব কেন?'

অনিবার্য নিয়তির সামনে দাঁড়ালে তীব্র ভয় এক সময় এক ধরনের প্রশান্তিতে পরিণত হয় বলে আমার ধারণা। ১৯৭১ সনে পাক মিলিটারী আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল। তীব্র ভয়ে আমি অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পরপর আমার সব ভয় দূর হয়ে যায়। এক ধরনের প্রশান্তি বোধ করতে থাকি। প্রচণ্ড জ্বরে কাতর থাকার পর হঠাৎ জ্বর সেরে গেলে যেমন ক্লান্ত অথচ শান্তি শান্তি ভাব হয় অনেকটা সে-রকম।

কে জানে ফাঁসির আসামীও গলায় দড়ি পরাবার আগে এ-রকম বোধ করে কি-না। জানবার উপায় নেই। জল্লাদ নিশ্চয়ই দড়ি পরাবার আগে জিজ্ঞেস করে না, ভাই আপনার কেমন লাগছে?

অনিবার্য নিয়তি যে কত বিচিত্র ধরনের হতে পারে তার একটি ঘটনা বলি।

ঘটনাটা ঘটে রামপুরা রেলওয়ে ক্রসিং-এ আজ থেকে দু'শছর আগে। ভোরবেলা মর্নিং ওয়াকের দলের একটি অংশ রেল লাইন ধরে হাঁটেন। তেমনি একজন মর্নিং ওয়াকে বের হয়েছেন। বয়স চল্লিশের মত। পায়ে স্যান্ডেল। রেল ক্রসিং পার হতে গিয়ে পায়ের পাতা কেমন করে জানি লাইনে আটকে গেল। এমন কোন জটিল ব্যাপার না। পা টেনে বের করা যাবে। আশ্চর্য ব্যাপার! ভদ্রলোক পা টেনে বের করতে পারলেন না। আশেপাশে লোক জমে গেল। তারাও চেষ্টা করল -- লাভ হল না। কিছুতেই পা বের হচ্ছে না।

ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল — চিটাগাংগামী আন্তঃনগর ট্রেন প্রভাতী ছুটে আসছে। ভদ্রলোক প্রাণপণ চেষ্টা করলেন এবং এক সময় বুঝলেন চেষ্টা করে লাভ নেই। — ছুটে আসছে অনিবার্য নিয়তি। তিনি পা পেতে দিয়ে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এই ভদ্রলোকের মত আমরাও সবাই কি অনিবার্য নিয়তির জন্যে অপেক্ষা করছি না?

ইংরেজিতে লেখা একটি চিঠি পেয়েছি। হাতের লেখা যেমন চমৎকার, ইংরেজিও খুব সুন্দর। চিঠির শেষে নাম নেই, শুরুতেই তার জন্যে পত্র লেখিকা ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন — আমি মোটামুটি সম্মানজনক একটি চাকরি করছি। আমার বয়স ৪০। আমার আদি নিবাস বিহার প্রদেশে। মোহাজের হয়ে বাবা-মা-ভাইবোন সহ ১৯৫০ সনে তদানীন্তন পাকিস্তানের সৈয়দপুরে চলে আসি . . . !

একটি দীর্ঘ চিঠি। ভদ্রমহিলা জানাচ্ছেন, তিনি সাপ্তাহিক বিচিত্রায় আমার এক

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সাক্ষাৎকারে পড়েছেন যে, আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দীর্ঘ একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা নিয়েছি। তিনি চাচ্ছেন যেন সেই উপন্যাস একপেশে না হয়। যেন বিহারী মোহাজেরদের কথা লেখা হয় — যারা একটি দেশ ছেড়ে অন্য একটি দেশে এসেছিল, সেই দেশও তাদের রইল না। পাকিস্তানও তাদের দেশ নয়। এখন তারা এমন এক মানবগোষ্ঠী যাদের কোন দেশ নেই।

এই পত্রলেখিকা জেনেভা ক্যাম্পে তিন মাস ছিলেন। তিনি সেই তিন মাসের অভিজ্ঞতা এবং জেনেভা ক্যাম্পে আসার আগের অভিজ্ঞতা, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর এবং তাঁর পরিবারের অভিজ্ঞতা খোলাখুলি বর্ণনা করেছেন। যেই অভিজ্ঞতার কিছু কিছু অংশ ভয়াবহ। বর্ণনাতীত।

চিঠির শেষ পর্যায়ে তিনি লিখছেন -- প্রিয় লেখক, আমি কিছুই আপনার কাছে গোপন করি নি। সব লিখলাম এই আশায়, যখন আপনি লিখবেন তখন আমাদের কথাও মনে রাখবেন। আপনারা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছেন — আমরা কি পেলাম?

চিঠিতে কোন ঠিকানা নেই বলে আমি চিঠির জবাব দিতে পারি নি। এই লেখায় জবাব দিচ্ছি। জানি না তিনি পড়বেন কি-না। না পড়লেও আমার মনের শান্তির জন্যে চিঠিটার জবাব দেয়া দরকার।

আমি ভদ্রমহিলাকে জানচ্ছি যে, তাঁর চিঠি আমি গভীর মমতা এবং গভীর বেদনার সঙ্গে পড়েছি। যে অন্যায় তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবারের উপর করা হয়েছে তার জন্যে আমি এ-দেশের মানুষের হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সেই সঙ্গে তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, সমগ্র জাতির উপর যখন পাকিস্তানী মিলিটারী নির্মম অত্যাচার শুরু করেছে তখন মোহাজের বিহারীদের আমরা পাশে পাই নি। তাঁরা যোগ দিয়েছেন হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। অথচ তাঁরা বাংলাদেশের জল-হাওয়ায় বড় হচ্ছেন। মাটি আমাদের মা। তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন মায়ের সঙ্গে। এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি তো পেতেই হবে। ভয়াবহ দুঃসময়ে সব এলোমেলো হয়ে যায়। একজনের অপরাধে দশজন নিরপরাধী শাস্তি পায়। আমরা বাঙালিরা কোন অপরাধ না করেই কঠিন শাস্তি পেলাম। তাঁরাও খানিকটা পেয়েছেন। আমাদের চরম দুঃসময়ের কথা মনে করে তাঁরা তাদের পুরানো ব্যথা ভোলার চেষ্টা করবেন — এই কামনাই করছি।

দেশ স্বাধীন হয়েছে অনেক দিন হল। পদ্মা, মেঘনায় অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে -- ১৯৭১-এর স্মৃতি সেই বিপুল জলরাশি মুছে ফেলতে পারে নি। পত্রলেখিকা তাঁর জীবনের ভয়ংকর কিছু সময়ের কথা লিখেছেন -- আমিও খানিকটা লিখলাম। এই লেখাটায় ঈশপের গল্পের মত শেষের দিকে একটু চমক আছে। আশা করি পত্র-লেখিকা সেই চমকটি ধরতে পারবেন এবং আমার দুঃখের তীব্রতা খানিকটা হলেও বুঝবেন।

জায়গাটার নাম 'গোয়ারেখা'।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পিরোজপুর শহর থেকে পনেরো ষোলো মাইল দূরের অজ পাড়া গাঁ। নদীর পাশে ছোট গ্রাম। নদীর নাম মনে নেই বলেশ্বর বা রূপসা হতে পারে। নদী যেমন সুন্দর গ্রামটা তার চেয়েও সুন্দর। নারিকেল আর সুপারি গাছ দিয়ে অতি যত্নে কেউ যেন এই গ্রাম সাজিয়ে দিয়েছে। ভরা বর্ষা — থৈ থৈ করছে নদী। জ্যোৎস্না রাতে আলোর ফুল ঝরে ঝরে পড়ে। কিছু ফুল আটকে যায় গাছের পাতায়। সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নদৃশ্যের মত। এই স্বপ্নদৃশ্যে আমি আমার মা এবং ভাইবোনদের নিয়ে বাস করছি। আমাদের মধ্যে কোন স্বপ্ন নেই।

মা ক্রমাগত কাঁদছেন। কারণ খবর পাওয়া গেছে, পাক মিলিটারী আমার বাবাকে হত্যা করেছে। শুধু তাই না, তারা এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে এবং আমার ছোট ভাই জাফর ইকবালকে। দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দু'জনই রাইফেল নিয়ে প্রচুর ছোটাছুটি করেছি। ভেবেছি, পয়েন্ট টু টু বোরের রাইফেলে মিলিটারীদের আটকে দেয়া যাবে। বাস্তবে তা হয় নি। পাক আর্মির গানবোট বিনাবাধায় পিরোজপুরের হুলার হাটে ভিড়েছে। তাদের একটি দল মার্চ করে ঢুকেছে পিরোজপুর শহরে। শুরু হয়েছে ধ্বংস এবং হত্যার উৎসব।

আমরা তখন পলাতক। প্রথমে যেখানে ছিলাম সেখান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। বিপদজনক মানুষ হিসেবে আমাদের কোথাও জায়গা হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিলেন গোয়ারেখার জনৈক মৌলানা। তিনি সর্ষিনার পীর সাহেবের ভক্ত খাদেম। মনেপ্রাণে পাকিস্তানী। পাকিস্তান যাতে টিকে যায় সেই দোয়া তিনি প্রতি নামাজেই করছেন। তারপরেও আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মাকে বারবার আশ্বাস দিচ্ছেন — জোর গলায় বলছেন, কোন ভয় নাই। মিলিটারী আপনার ছেলেদের ধরতে পারবে না। উপরে আছেন আল্লাহ পাক, নিচে আমি। আমাকে গুলি না করে তারা আপনার ছেলেদের গুলি করতে পারবে না।

মা তাঁর কথায় খুব ভরসা পাচ্ছেন না। কারণ আশেপাশে মিলিটারী অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। এইসব হত্যাকাণ্ডের খবর আবার মৌলানা সাহেব নিজেই নিয়ে আসছেন এবং আমাদের সবাইকে একত্র করে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছেন।

'আজ কাউখালিতে বিশটা মানুষ লাইন করে দাঁড়া করেছে। ব্রাশ ফায়ার। সব শেষ।'

'আজ দুইটা মানুষরে খেজুর গাছে তুলে বলল — "জয় বাংলা বোল।" তার পরেই ডিম ডিম গুলি।'

'আজ কুড়াল দিয়ে এক কোপ দিয়ে হিন্দু কম্পাউন্ডারের কল্লা আলাদা করে ফেলেছে।'

হত্যাকাণ্ডের বর্ণনার সময় মৌলানা সাহেবের মুখে এক ধরনের আনন্দময় আভাও দেখতে পাই। আমি কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারি না। ভদ্রলোক নিতান্তই ভালমানুষ। তিনি শুধু যে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন তাই না, কয়েকজন হিন্দু যুবককেও আশ্রয় দিয়েছেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

হিন্দুদের জন্যে তখন সব পথ বন্ধ। হিন্দু জানলেই দ্বিতীয় কোন কথা বলার সুযোগ নেই — গুলি। হিন্দু পরিবারগুলি বাড়ি-ঘর ছেড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলে। বর্ষাকালের সাপ-খোপ ভর্তি জঙ্গল। দিন-রাত বৃষ্টি পড়ছে। বর্ণনার অতীত সব দৃশ্য। এরা পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতেও পারছে না। যেতে হবে সুন্দরবন হয়ে। নদীতে ঘুরছে মিলিটারী গানবোট। সাহায্য করবার জন্য মুক্তিবাহিনী তখনো শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি।

আমরা আমার নিজের দেশের অপূর্ব সুন্দর একটি গ্রামে আটকা পড়ে গেছি। পালিয়ে যেতে চাচ্ছি অন্য একটি দেশে। চারপাশে মৃত্যু ঘোরাফেরা করছে। তীব্র আতংকে কাটছে আমাদের দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী।

এই রকম সময়ে গোয়ারেখার মৌলানা সাহেব চিন্তিত মুখে মা'কে বললেন, আপনার ছেলে দু'টাকে সরিয়ে দেয়া দরকার। আর দেরি করা যায় না।

মা চমকে উঠে বললেন, কেন?

'অবস্থা ভাল দেখতেছি না।'

'ভাল দেখতেছেন না কেন ?'

'জোয়ান ছেলেপুলে সব ধরে ধরে মেরে ফেলতেছে।'

'ওদের কোথায় সরিয়ে দিতে চান?'

'এমন জায়গায় সরাব যে মিলিটারী কোন সন্ধান পাবে না।'

'এমন জায়গা কি আছে?'

'অবশ্যই আছে। ওদের রেখে আসব সর্ষিনা পীর সাহেবের মাদ্রাসায়। ওরা মাদ্রাসার হোস্টেলে থাকবে। দরকার হলে ওদের মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেব — জামাতে ছওম ক্লাসে।'

মা বললেন, আপনার হাতে আমি ছেলে দুটাকে তুলে দিলাম। আপনি যা ভাল মনে করেন . . .।

আমরা দু'ভাই লুঙ্গি-পাঞ্জাবী পরলাম। মাথায় দিলাম গোল বেতের টুপি। রওনা হলাম সর্ষিনা। যেতে হবে নৌকায়। পথ মোটেই নিরাপদ না। মিলিটারীর গানবোট চলাচল করছে। আতংকে অস্থির হয়ে যাত্রা। এই নৌকা ভ্রমণ মনে হচ্ছে কোনদিন শেষ হবে না। ইঞ্জিনের বিজবিজ শব্দ হতেই অতি দ্রুত নৌকা কোন খাড়িতে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে মাঝে মৌলানা সাহেব বলেন, বাবারা ডাইনে তাকাবা না। আমরা ডাইনে তাকাই না, কারণ তখন ডানে গলিত মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে।

সর্ষিনার পীর সাহেবের আস্তানা চমৎকার। জায়গাটা নদীর তীরে, পরিষ্কার-পরিচ্ছিন্ন পরিবেশ। মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকার জন্যে বিশাল হোস্টেল। পাড়া গাঁ মত জায়গায় বিরাট কর্মযজ্ঞ। আর হবে নাই বা কেন। পাকিস্তানের সব রাষ্ট্রপ্রধানই এখানে এসেছেন। কিছু সময় কাটিয়েছেন।

আমরা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে সর্ষিনা পৌঁছলাম বিকেলে। মাদ্রাসার ছাত্ররা দুধে রুটি ছিঁড়ে চিনি মাখিয়ে খেতে দিল। গপাগপ করে খেলাম। তাদেরকে যে মিলিটারীরা কিছুই বলছে না এ জন্যে তাদের মধ্যে আনন্দ ও উল্লাসের সীমা নেই। তাদের কাছেই

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible], শিবোজপুরের সঙ্গে সর্ষিনার পীর সাহেবের সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। ক্যাপ্টেন সাহেব দিনের মধ্যে তিন চার বার টেলিফোন করেন। [illegible] যাবার আগে পীর সাহেবের দোয়া নিয়ে যান। আমরা দু'ভাই মাদ্রাসায় ভর্তি [illegible] শুনে তারা যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করল। আমরা আমাদের পরিচয় প্রকাশ [illegible]।

[illegible] মৌলানা সাহেব সন্ধ্যার আগে আগে আমাদের দু'জনকে পীর সাহেবের [illegible] উপস্থিত করলেন। পীর সাহেব চারদিকে কিছু লোকজন নিয়ে গল্প করছেন। [illegible] যাওয়ার সাহস হল না। শুনলাম, মৌলানা পীর সাহেবকে নিচু গলায় কিছু বলছেন [illegible] পীর সাহেব রেগে যাচ্ছেন। সব কথা বুঝতে পারছি না। পীর সাহেব বেশির ভাগ কথার জবাবই দিচ্ছেন উর্দুতে। আমার বাবার প্রসঙ্গে কি কথা যেন বলা হল। পীর সাহেব বললেন, আমি এই লোকের কথা জানি। বিরাট দেশদ্রোহী। ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। যাও যাও, তুমি চলে যাও।

মৌলানা সাহেব আরো নিচু গলায় সম্ভবত আমাদের দু'ভাই সম্পর্কে কিছু বললেন। পীর সাহেব ভয়ংকর রেগে বললেন — না, না। এদের কেন এখানে এনেছ?

মৌলানা সাহেব আমাদের নিয়ে ফিরে চললেন। কি কথাবার্তা তাঁর হয়েছে তিনি কিছুই ভেঙে বললেন না। নৌকায় করে ফিরছি এবং প্রার্থনা করছি খুব তাড়াতাড়ি যেন চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারে মিলিটারীরা গানবোট নিয়ে বের হয় না। খোলা নৌকার পাটাতনে বসে আছি। ভরা জোয়ার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ মাঝি বলল — দেহেন দেহেন। তাকালাম। দুটি মৃতদেহ ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। এমন কোন দৃশ্য নয় যে অবাক বিস্ময়ে দেখতে হবে। খুবই সাধারণ দৃশ্য। রোজই অসংখ্য দেহ নদীতে ভাসতে ভাসতে যায়। শকুনের পাল দেহগুলির উপর বসে বসে ঝিমোয়। নরমাংসে তাদের এখন আর রুচি নেই। কিন্তু আজকের মৃতদেহ দুটির উপর শকুন বসে নেই। আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। চোখ ফেরাতে পারছি না। সবুজ শার্ট গায়ে দেয়া ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একজন যুবকের মৃতদেহ। তার গলা জড়িয়ে ধরে আছে সাত-আট বছরের একটি বালিকা। বালিকার হাত ভর্তি লাল কাচের চুড়ি। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে হয়ত পরম নির্ভরতায় এই বালিকা তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছিল।

এখন আমরা বাস করছি স্বাধীন দেশে। স্বাধীন বাংলাদেশ। এই দেশের সবচে' সম্মানিত, সবচে' বড় পদকটির নাম — স্বাধীনতা পদক। বঙ্গবীর আতাউল গণি ওসমানী, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মুনীর চৌধুরী, রনদা প্রসাদ সাহা, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এই পদক পেয়েছেন।

১৯৮০ সনে, মুক্তিযুদ্ধের ন' বছর পর মহান বিজয় দিবসে রেডিও ও টেলিভিশনের খবরে শুনলাম — স্বাধীনতা পদক দেয়া হয়েছে — সর্ষিনার পীর মৌলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহকে।

হায়, এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাঙালি মাত্রই প্রবল উৎসাহের সঙ্গে একটি কাজ করে — বিয়ের 'ঘটকালী। যে মানুষটির কোন কাজে উৎসাহ নেই, সাপ্তাহিক বাজারে যান না, ঈদের জামা কেনার জন্যে বাচ্চাদের হাত ধরে বের হল না, তিনিও বিয়ের ঘটকালীতে প্রবল উৎসাহ বোধ করেন। সম্ভবত ঘটকালী করতে গিয়ে নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে, প্রথম জীবনের সুখস্মৃতিতে নস্টালজিক হবার সুযোগ ঘটে বলেই এত উৎসাহ ।

আমি নিজে খুব আগ্রহ করে এ-রকম একটি বিয়ে দেই। গ্রামের একটি কলেজে পরীক্ষা নিতে গিয়ে একটি রূপবতী তরুণীকে আমার খুব পছন্দ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ শিক্ষক তখন পি-এইচ.ডি. করতে কেমব্রীজ যাচ্ছে। বউ সঙ্গে নিয়ে যাবার সুযোগ আছে। সে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে ডেকে বললাম, একটা ভাল মেয়ে দেখেছি। ঠিকানা দিচ্ছি, তুমি মেয়েটিকে দেখে এসো।

সে অবাক হয়ে বলল, আপনি যেখানে ভাল বলছেন সেখানে আমার দেখার কি দরকার? আপনি ব্যবস্থা করে দিন। আপনি যাকে বিয়ে করতে বলবেন আমি তাকেই বিয়ে করব।

আমার প্রতি তার আস্থা দেখে শংকিত বোধ করলাম। চিঠি লিখলাম মেয়ের বাবাকে। মেয়ের বাবা রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠির জবাব পাঠালেন। চিঠির ভাষা এরকম —

পরম পূজনীয় স্যার,

ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য পাত্র দেখিয়াছেন — আপনার পছন্দের পাত্রকে আমার দেখার কোনই কারণ নেই। আপনি যদি রাস্তার কোন অন্ধ ভিক্ষুককে আমার কন্যার জন্য স্থির করেন — ভগবানের শপথ, আমি তাহার হাতেই কন্যা তুলিয়া দেব। আমার কন্যাও তাহাতে কোন অমত করিবে না।

শুধু শ্রীচরণে একটি অনুরোধ — বিবাহ অনুষ্ঠানে আপনাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং কন্যা আপনাকে সম্প্রদান করিতে হইবে।

এ কি সমস্যায় পড়া গেল! কেউ কাউকে দেখল না — এক চিঠিতে বিয়ে? তারপর যদি দেখা যায় তেলে-জলে মিশ খাচ্ছে না তখন কি হবে? স্বামী-স্ত্রীর অশান্তির দায়ভাগের সবটাই কি আমাকে নিতে হবে না?

বিবাহ অনুষ্ঠান গ্রামে হবে। অনেক দূরের পথ — লঞ্চে করে যেতে হয়। আমি তিন কন্যা এবং কন্যাদের মাকে নিয়ে উপস্থিত হলাম। নিজে বিয়ে দিচ্ছি সেই বিয়েতে উপস্থিত থাকব না তা হয় না। তাছাড়া হিন্দু বিয়ের অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হয়। বাচ্চারা দেখে আনন্দ পাবে। আগে কখনো দেখে নি —।

শেষরাতের দিকে লগ্ন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

লগ্ন পর্যন্ত পৌঁছার আগেই ভয়াবহ সব ঝামেলা হতে শুরু করল। ঝামেলার প্রকৃতি ঠিক স্পষ্ট হল না। — রাত বারোটার সময় বর এসে আমাকে কানে কানে বলল, স্যার, বিয়ে করব না।

'সে কি?

'পালিয়ে যাব! বন্ধু-বান্ধবরা তা-ই বুদ্ধি দিচ্ছে। এরা অবশ্যি পাহারা বসিয়ে দিয়েছে। ধরতে পারলে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলবে।'

'সত্যি পালাবে না-কি?'

'না পালিয়ে উপায় নেই। আপনি ভাবী এবং বাচ্চাদের প্রিন্সিপাল স্যারের বাসায় পাঠিয়ে দিন। ওদের প্রটেকশনে তারা থাকুক। চলুন, আমরা পালিয়ে যাই। পরে পুলিশ দিয়ে ভাবী এবং বাচ্চাদের উদ্ধার করব।'

'বলছ কি তুমি?'

'সত্যি কথা বলছি। দু'টার সময় লগ্ন। হাতে সময় বেশি নেই। পালিয়ে যেতে হবে একটার দিকে। এদের কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না। তবে আমার মনে হয় আঁচ করে ফেলেছে — লাঠি-সোটা নিয়ে তাগড়া তাগড়া ছেলেপুলে ঘুরঘুর করছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আসলেই তাই। আমার গা হিম হয়ে গেল। এ কি যন্ত্রণা! কে আমাকে বলেছিল বিয়ের ঘটকালিতে যেতে?

গুলতেকিন হতাশ গলায় বলল, জুতা খুলে ফেল। খালি পায়ে ভাল দৌড়াতে পারবে! অকারণে কী ভয়ংকর সব যন্ত্রণা যে তুমি তৈরি কর। মাঝে মাঝে আমার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে।

বর যে সত্যি সত্যি পালিয়ে যেতে চাচ্ছে তা তখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। বরের বাবা অতি বৃদ্ধ এক স্কুল শিক্ষক যখন আমাকে বললেন, বাবা আমার ছেলে যে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে এই কাজটা কি ঠিক হবে? হিন্দুমতে লগ্ন পেরিয়ে গেলে দুপড়া হয়ে যায়। সেই মেয়ের তো আর বিয়ে হবে না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথায় আমার কাল ঘাম বের হয়ে গেল। হায় হায় আমি তো একশ' হাত পানির নিচে! বৃদ্ধকে বললাম, আপনি একটা ব্যবস্থা করুন। এটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।

রাত দু'টার লগ্ন পার হয়ে গেল। ভোর সাড়ে তিনটায় শেষ লগ্ন। বিয়ে হলে ঐ লগ্নে হবে, নয়তো না। মেয়ের বাবা এসে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন — আমি এই ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিব না। আমার মেয়ের কপালে ভগবান যা রেখেছেন তাই হবে। এই বলেই তিনি শার্ট গায়ে বের হয়ে গেলেন। আমরা খবর পেলাম, মেয়েটি বিয়ের কারণে সারাদিন উপোস ছিল। এই খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। তার জ্ঞান আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাড়ির মেয়েরা সব চিৎকার করে কাঁদছে।

ইউনুস নবী মাছের পেটে যখন চলে যান তখন সেই মহাবিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে একমনে একটা দোয়া পড়েন, যে দোয়ার নাম দোয়ায়ে ইউনুস। আমি অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একমনে সেই দোয়া পড়ছি — লা-ইলাহা ইল্লা অন্‌তা সোবহানাকা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ইন্নি কুনতু মিনাজজুয়ালেমিন। এমন ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন আগে হই নি। এই বিপদ থেকে বের হবার কোনও পথও আমি জানি না। আমার পাশে আছে একদল বাজনাদার। তারা তাদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সন্ধ্যা থেকে বসে আছে। হিন্দু বিয়ে বাজনা ছাড়া হয় না। খানিকক্ষণ মন্ত্রপাঠের পরপর বাজনা বাজাতে হয়। এই বাজনাদারের ক্ষুদ্র দল বাজনা বাজানোর কোন সুযোগ পায় নি। মনে হচ্ছে পাবেও না। পুরো দলটি অসম্ভব বিষণ্ন। মাথা নিচু করে বসে আছে।

শুধু পুরোহিত তাঁর পোশাক-আশাক পরে মোটামুটি নিশ্চিন্ত মুখে বিয়ের আসরে বসে আছেন। তাঁর সামনে পেতলের নানান ধরনের কাশি-কুশি। তিনিও ঐ জায়গায় সন্ধ্যা থেকে বসে আছেন। নড়েন নি। লগ্ন শেষ না হওয়া পর্যন্ত হয়ত নড়বেন না। আমি ঐ ভদ্রলোকের অসীম ধৈর্য দেখে মুগ্ধ হলাম। ভদ্রলোক যেন মানুষ নন। পাথরের মূর্তি।

লগ্ন শেষ হবার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে বর বলল, আচ্ছা ঠিক আছে বিয়ে করব। টোপর কোথায়?

মেয়ের বাবা বললেন — না। অসম্ভব! আমি ঐ বদ ছেলের হাতে আমার আদরের মেয়েকে দেব না। মেয়ে কেটে রূপশা নদীতে ভাসিয়ে দেব।

লোকজন ধরাধরি করে মেয়ের বাবাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল — মাঠের দিকে। সেখান থেকেই ভদ্রলোক চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

তাঁর কান্নার শব্দ চাপা পড়ে গেল বাজনায়।

বাজনাদাররা বাজনা বাজাতে শুরু করেছেন।

ক্রমাগত উলু পড়ছে।

বাজনার শব্দ, উলুর শব্দ, মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা কন্যার বাবার কান্নার শব্দ — সব মিলিয়ে পরিবেশ কেমন যেন হয়ে গেল।

খোলা উঠোনে বিয়ে হচ্ছে। আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে হ্যাজাক লাইট। আমি দূর থেকে দেখছি। কনেকে এনে বসিয়ে দেয়া হল বরের সামনে। মেয়েটিকে আজ আর মানবী বলে ভ্রম হচ্ছে না। আমার কাছে মনে হল ঈশ্বর তাঁর ভাণ্ডারের সমস্ত রূপ অন্তত আজ রাতের জন্যে হলেও মেয়েটির সারা শরীরে ঢেলে দিয়েছেন। হোমের আগুনের পাশে মেয়েটি যেন পদ্মফুল হয়ে ফুটে আছে। শুভ দৃষ্টির আগে স্বামীর দিকে তাকানোর নিয়ম নেই — তবু সে একবার চোখ বড় বড় করে তাকালো স্বামীর দিকে — সেই দৃষ্টিতে ছিল গভীর বেদনা, অনুযোগ এবং তার সতেরো বছরের জীবনের অভিমান!

মেয়ের বাবাকে হাত ধরে ছেলের বাবা নিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। গাঢ় স্বরে বললেন, স্যার, আমি দরিদ্র মানুষ। আজ আপনার জন্যে কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেয়েছি। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। বলেই এই বৃদ্ধ মানুষ নিচু হলেন আমার পা স্পর্শ করার জন্যে — আমি তাঁকে ধরে ফেললাম। কোমল গলায় বললাম — যান, মেয়ের কাছে গিয়ে বসুন।

সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন — আচ্ছা, এই বাজনাদারগুলি কোত্থেকে জোগাড় করেছে? — এরা এখনো বাজনা বাজাচ্ছে! মন্ত্রপাঠের সময় থামবে না? এরা কি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] কিছু জানে না?

[illegible]কিয়ে দেখি, বাজনাদারের পুরো দলটির যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নেচে [illegible] গাচ্ছে। তাদের মধ্যে সবচে' বয়স্ক মানুষটির হাতে করতাল। সে রীতিমত [illegible]। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না তারা এই জীবনে বাজনা থামাবে।

আমি এই জীবনে অনেক মধুর সংগীত শুনেছি। কনেগী হলে শুনেছি পৃথিবী শ্রেষ্ঠ [illegible]র কনসার্ট — মোজার্টের ফিফথ সিম্ফোনী। লাসভেগাসে লেবোরেটরীর [illegible] শুনেছি বিথোভেন — কিন্তু সেদিনের কিছু অখ্যাত গ্রাম্য বাজনাদারদের [illegible] মত মধুর সংগীত এখনো শুনি নি — আর যে শুনব সে আশাও কম।

আমার এক বন্ধু আছেন — পশু-প্রেমিক। রাস্তায় কুকুর কাঁদছে কুঁ-কুঁ করে, তিনি [illegible] যাচ্ছেন রিকশায়; রিকশা থামিয়ে ছুটে যাবেন। চোখ কপালে তুলে বলবেন, হল [illegible]? এই আয়, তু তু তু। তাঁর পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা বিড়ালের গায়ে গরম [illegible] ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি সেই বিড়াল নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছুটে [illegible]। ইন্টার্নী ডাক্তার বললেন, এখানে কেন এনেছেন? পশু হাসপাতালে নিয়ে যান।

তিনি বললেন, পশু হাসপাতাল কোথায় আমি চিনি না। প্লীজ ফার্স্ট এইড দিন, [illegible] পরে পশু হাসপাতাল খুঁজে বের করব।

ডাক্তার ফার্স্ট এইড দিতে রাজি নন।

আমার বন্ধু ফার্স্ট এইড না নিয়ে যাবেন না। চিৎকার, চেঁচামেচি, হৈচৈ। চারদিকে [illegible]ক জমে গেল। আমার বন্ধু শার্টের হাতা গুটিয়ে ডাক্তারকে মারতে গেলেন। [illegible]লেঙ্কারি অবস্থা।

মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতি আমার এই বন্ধু চরম উদাসীন। একবার এক পকেটমার [illegible] পড়েছে। কিল-ঘুসি-লাথি মেরে তার অবস্থা এমন যে এখন যায় তখন যায় অবস্থা। [illegible] ক্ষীণ স্বরে বলছে — আমারে একটু পানি দেন। এক ফোঁটা পানি।

আমার বন্ধু কঠিন গলায় বললেন, হারামজাদার মুখে কেউ প্রস্রাব করে দিন তো।

তাঁর বাসায় ভিক্ষা চাইতে এসে ভিখিরি প্রচণ্ড লাথি খেয়েছিল। তাঁর ক্লাস টেনে [illegible]ড়া মেয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির ছেলের সঙ্গে গল্প করছিল। এটা জানার পর [illegible]নি মেয়েকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। আধ ঘণ্টা পর মেয়ে যখন [illegible]দতে কাঁদতে বের হল তখন দেখা গেল তার মাথার সব চুল কেটে ফেলা হয়েছে। [illegible]ল্প কিছু চুল কোটি ব্রাশের মত খাড়া হয়ে আছে। আমার এই বন্ধুর ভালবাসা পশু [illegible]মাজের জন্য।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি আমার বন্ধুর মত নই। কুকুরের প্রভুভক্তির অসংখ্য গল্প জানা থাকা সত্ত্বেও কুকুর দেখলে ভয় ছাড়া অন্য কোন মানবিক আবেগ আমি বোধ করি না। বিড়াল প্রাণী হিসেবে খুব সুন্দর। সেই বিড়ালকে একবার দেখলাম রক্তাক্ত ইঁদুর মুখে নিয়ে ঘুরছে। বিড়ালের ধবধবে শাদা মুখে লাল রক্তের ধারা। আমি সেই থেকে বিড়াল পছন্দ করি না।

আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে বিড়ালের কোন মাথাব্যথা থাকার কথা না। তারা যখন-তখন আমার শহীদুল্লাহ হলের বাসায় আসে। খাবার টেবিল থেকে মাছ নিয়ে পালিয়ে যায়। আদর্শ বিড়ালের মত মাছের কাঁটায় তারা সন্তুষ্ট নয়। আমি বিড়াল দেখলেই দূর-দূর করি। ওরা নানান ভাবে আমার সঙ্গে খাতির করার চেষ্টা করে। হয়ত বই পড়ছি — চুপি চুপি এসে পায়ের সঙ্গে গা ঘসে গেল। লাথি মারবার আগেই পালিয়ে গেল।

স্ত্রীরা স্বামীদের অধিকাংশ অত্যাস গ্রহণ করে ফেলে (যদিও তারা কখনো তা স্বীকার করে না)। গুলতেকিনও সেই ফর্মূলায় বিড়াল অপছন্দ করে। আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায় বিড়ালের জন্য এই বাড়ি মোটামুটি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এরা তবু আশা ছাড়ে না। মাঝে-মধ্যে আসে। দুঃখিত চোখে আমাদের দেখে চলে যায়।

এক রাতের ঘটনা। বসে বসে লিখছি। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হওয়ায় শীত শীত লাগছে। আমি গুলতেকিনকে বললাম একটা চাদর দিতে। সে চাদরের জন্যে কাবার্ড খুলে চেঁচিয়ে উঠল। এক অতি রুগ্‌ণ বিড়াল কাবার্ডের ভেতর বাচ্চা দিয়ে বসে আছে। এতটুকু টুকুন চার বাচ্চা কুঁ কুঁ শব্দ করছে। কাবার্ডের সমস্ত কাপড় নোংরা। বিশ্রী অবস্থা :

গুলতেকিন বলল, এখন কি করব? আমি বললাম, রাতটা কাটুক। ভোরে ফেলে দেয়া যাবে। খুব পাষাণহৃদয় মানুষের পক্ষেও বাচ্চাসহ একটা বিড়াল ফেলা দেয়া কঠিন। আমাদের এই অপ্রিয় দায়িত্ব পালন করতে হল না।

আমার ছোট মেয়ের বান্ধবী পাশের ফ্ল্যাটের জেনিফার ভোর বেলাতেই একটা জুতার বাক্স নিয়ে উপস্থিত। সে গম্ভীর গলায় আমাকে বলল, চাচা, আমাদের বিড়ালটা না-কি আপনাদের বাসায় বাচ্চা দিয়েছে?

'একটা বিড়াল বাচ্চা দিয়েছে জানি। তোমাদের বিড়াল কি-না তাতো জানি না। তোমাদের বিড়াল চেনার উপায় কি?'

'ওর নাম লুসিয়া।'

'নামে তো মা ঠিক চিনতে পারছি না।'

'ওর খুব স্লীম ফিগার।'

'স্লীম ফিগার হলে তোমাদেরই বিড়াল । তুমি পরীক্ষা করে দেখ। কাবার্ডের ভেতর আছে।'

কাবার্ড খোলা হল। লুসিয়াকে পাওয়া গেল না। বাচ্চা চারটা আছে। এখনো চোখ ফুটে নি।

জেনিফার বলল, চাচা, আমি এদের আমাদের বাসায় নিয়ে যাব।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললাম, অবশ্যই নিয়ে যাবে মা, অবশ্যই নিয়ে যাবে। তোমাদের বিড়াল অন্যের বাসায় বাচ্চা মানুষ করবে এটা কোন কাজের কথা না। পাপ হানি হবার মত কথা।

জেনিফার জুতার বাক্সে বিড়ালের বাচ্চা তুলে নিয়ে গেল। আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম, বাঁচা গেল।

সে রাতের ঘটনা। বারান্দায় বাতি জ্বালিয়ে আমি পরীক্ষার খাতা দেখছি। অনেক খাতা জমে আছে। প্রতিজ্ঞা করে বসেছি ত্রিশটা খাতা না দেখে ঘুমুতে যাব না। খাতাগুলি দেখতে খুব সময় লাগছে। রাত একটার মত বেজে গেল। পুরো বাড়ি ঘুমে আচ্ছন্ন। আমি জেগে আছি। ফ্লাস্ক ভর্তি চা আমার সামনে রেখে দেয়া।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে লুসিয়া লাফিয়ে আমার টেবিলে উঠে এল। আমার দিকে তাকিয়ে রাগী ভঙ্গিতে ম্যাঁ ম্যাঁ করে কি-সব বলল। বিড়ালের ভাষা আমার বোঝার কোনই কারণ নেই। তবু তার ভঙ্গি, তার চিৎকার শুনে মনে হল, সে বলতে চাচ্ছে — আমি আমার অবোধ শিশুগুলিকে তোমাদের ঘরে রেখে খাবারের সন্ধানে গিয়েছিলাম। তোমরা এদের সরিয়ে দিয়েছ। যে কাজটা করেছ, তা অন্যায়। আমি তোমার কাছে কৈফিয়ত দাবী করছি। তোমাকে জবাবদিহি করতেই হবে।

আমার কি যে হল — বিড়ালকে বললাম, যা, তুই তোর বাচ্চাগুলিকে নিয়ে আয়। আমি আর কিছু বলব না। বিড়াল খানিকক্ষণ চুপ থেকে নরম স্বরে বলল,

'ম্যাঁও ম্যাঁও ম্যাঁও (সত্যি কি আনতে বলছেন?)'

'হ্যাঁ।'

'ম্যাঁয়াও মি ম্যাঁয়াও (আনলে তাড়িয়ে দেবেন না তো?)'

'না।'

বিড়াল নেমে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা বাচ্চা মুখে নিয়ে টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠল। সে যে আমার কথা বুঝে এই কাণ্ড করেছে এটা মনে করার কোনই কারণ নেই। তবু আমার কেন জানি মনে হল বিড়াল বাচ্চাটা মুখে করে এনে লাফিয়ে আমার টেবিলে উঠেছে একটি কারণে। আমার চূড়ান্ত অনুমতি চাচ্ছে।

'ম্যাঁও ম্যাঁও। [কি, রাখব আমার সোনামণিদের?]'

'হ্যাঁ, রাখ।'

'ম্যাঁয়াও ম্যাঁয়াও [তোমার স্ত্রী আবার আপত্তি করবে না তো?]'

'না। তাকে আমি বুঝিয়ে বলব।'

'ম্যাঁয়াও [ধন্যবাদ স্যার।]'

বিড়াল বাচ্চা নিয়ে কার্বার্ডের ভেতর ঢুকে গেল। অন্য বাচ্চাগুলিকেও একে একে নিয়ে এল। আমি তাকে বললাম, একটা শর্ত মনে রাখবে। এরা একটু বড় হলেই তুমি আমার বাসা ছেড়ে চলে যাবে। আমি বিড়াল পছন্দ করি না।

'ম্যাঁয়াও (আচ্ছা।)'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভোরবেলা আমি গুলতেকিনকে ঘটনাটা বললাম। তার ধারণা হল পুরো ব্যাপারটা আমার বানানো। ধারণা করাই স্বাভাবিক। তার সঙ্গে আমার কথাবার্তার সত্তর ভাগই থাকে বানানো। আমি খুব গুছিয়ে সত্যের মত করে মিথ্যা বলতে পারি।

আমি গুলতেকিনকে বললাম, বিড়ালটা কথা দিয়েছে তার বাচ্চাগুলি একটু বড় হলেই সে চলে যাবে।

'তোমাকে সে কথা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। মানুষ কথা দিয়ে কথা রাখে না কিন্তু পশুরা একবার কথা দিলে কথা রাখে।'

'তুমি তো মনে হচ্ছে অবতারের পর্যায়ে পৌঁছে গেছ। পশুদের ভাষা বুঝতে পার।'

'তোমার সঙ্গে এক হাজার টাকা বাজি -- বাচ্চাগুলি একটু বড় হলেই সে চলে যাবে।'

'বেশ যাও, হাজার টাকা বাজি।'

গুলতেকিন বিড়ালটার জন্য দৈনিক এক পোয়া দুধ বরাদ্দ করে দিল। উচ্ছিষ্ট মাছ মাংস তাকে প্লেটে করে দেয়া হতে লাগল। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। যে রাজকীয় হালে তাকে রাখা হচ্ছে সে তো আর এই বাড়ি ছেড়ে যাবে না। আমাকে বাজিতে হারতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্যম! বাচ্চা চারটি একটু বড় হতেই বিড়াল এদের নিয়ে চলে গেল।

আমি অবশ্যি বাজির টাকা পেলাম না। কারণ গুলতেকিন তখন যুক্তি দেখাল, তোমাকে কথা দিয়েছে বলে তো আর সে যায় নি। বাচ্চারা বড় হয়েছে — পৃথিবীতে বাস করার ট্রেনিং দেবার জন্যে সে এদের নিয়ে চলে গেছে। তার কথা যে সত্যি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এর পর মজার ঘটনা ঘটতে লাগল। আশেপাশের যত বিড়াল আছে তারা গর্ভবতী হলেই আমাদের বাসায় চলে আসে। বাচ্চা দেয়। বাচ্চাগুলি একটু বড় হলে এদের নিয়ে চলে যায়। কালো বিড়াল, ধলা বিড়াল, হলুদ বিড়াল। এর মধ্যে একটা ছিল ডাকাতের মত দেখতে।

আমার ধারণা লুসিয়া সমস্ত বিড়াল সমাজের কাছে প্রচার করেছে — হুমায়ূন স্যারের বাসা মেটারনিটি ক্লিনিক হিসেবে অতি উত্তম। এরা যত্ন-আত্তি করে। দুধ খেতে দেয়। শুধু একটা শর্ত, বাচ্চারা বড় হলে বাসা ছেড়ে দিতে হবে।

আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। একবার তিনটা বিড়াল এক সঙ্গে বাচ্চা দিল। বাচ্চা দিয়েই এরা চুপ করে থাকে না। প্রতিদিন বাচ্চাগুলিকে জায়গা বদল করায়। এই দেখলাম খাটের নিচে, খানিকক্ষণ পরই ট্রাংকের কোণায়। ক্ষিধে পেলে এরা গুলতেকিনের শাড়ির আঁচল কামড়ে ধরে টেনে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আমি পশু-প্রেমিক নই বলেই একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। দেড় হাজার টাকায় নেট কিনে মিস্ত্রি লাগিয়ে দরজা-জানালা, ফাঁক-ফোকর সব নেট দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে দীর্ঘ ছ' বছর পর প্রথম "বিড়াল মুক্ত দিবস" পালন করলাম।

আমার নিয়ম হচ্ছে গভীর রাতে যখন হলের ছেলেরা বেশির ভাগ ঘুমিয়ে পড়ে তখন গুলতেকিনকে নিয়ে হলের সামনের মাঠে হাঁটাহাঁটি করা। সে রাতেও তাকে নিয়ে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

। ন গ্রোছি। চাঁদনি পহর যাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় হাটতে অপূর্ব লাগছে। সাধারণত বাসিহাটির সময় আমি প্রচুর বকবক করি। সে রাতে কেন জানি চুপ করে আছি — গুলতেকিন বলল, তুমি চুপ করে আছ কেন? ঘর নেট দিয়ে বন্ধ করে দেয়ায় তোমার কি মন খারাপ লাগছে?'

আমি বললাম, হ্যাঁ, লাগছে।

'নেট খুলে দিতে চাও?'

'না।'

'না কেন?'

আমি শান্ত গলায় বললাম, আমি পশু-প্রেমিক নই গুলতেকিন। সামান্য মন খারাপকে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না।

মন খারাপটা অবশ্য খুব সামান্য ছিল না। সে রাতে কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

রাত তিনটা পর্যন্ত চুপচাপ জেগে রইলাম; কিছুতেই ঘুম আসে না। ঘুম এল ফজরের আজানের পর। ঘুম ভাঙল সকাল দশটায়। বিছানা থেকে নেমে দেখি সব নেট খুলে ফেলা হয়েছে। কে খুলল, কার নির্দেশে খুলে ফেলা হল কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। আমি এবং গুলতেকিন দুজনই এমন ভাব করতে লাগলাম যেন এই প্রসঙ্গ আলোচনার যোগ্য কোন প্রসঙ্গ না। রাতে টিভি দেখছি। আমার মেজো মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, আব্বু গেস্ট রুমে আরেকটা বিড়াল এসে বাচ্চা দিয়েছে। এইবারের বাচ্চাগুলি কালো রঙের। কুচকুচে কালো।

আমি মহা বিরক্ত হয়ে বললাম, এ তো বড় যন্ত্রণা হল! এরা পেয়েছেটা কি? অসহ্য। এই বাড়িতে আর থাকা যাবে না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি গুলতেকিন জানালা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করছে। *

আজকালকার ছেলেমেয়েরা আত্মকাহিনীমূলক রচনা শেখে কি-না জানি না তবে আমাদের সময় এ জাতীয় রচনা প্রচুর শিখতে হত! নদীর আত্মকাহিনী, একটি বটগাছের আত্মকাহিনী, চোরের আত্মকাহিনী ইত্যাদি। "একের ভেতর তিন" নামক একটি গ্রন্থ থেকে আমি বেশ কয়েকটি আত্মকাহিনী মুখস্থ করে ফেলি। এর মধ্যে 'একটি চোরের আত্মকাহিনী'টি খুব করুণ করে লেখা। চোর বলছে, সবাই তাকে

---

* আমাদের এই বিড়াল পরিবার নিয়ে আমি 'বিপদ' নামে একটি উপন্যাস লিখেছি। উদ্ভট জাতীয় গল্প যারা ভালবাসেন তারা অন্যের কাছ থেকে বই ধার করে পড়ে দেখতে পারেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মারছে। লোকজন ভিড় করে আছে। সে হঠাৎ শুনল একটি বাচ্চা মেয়ে বলছে, বাবা আমি চোর দেখব। তাকে চোর দেখানো হল। মেয়েটি বলল, আরে এ চোর কোথায়? এ তো মানুষ! এই শুনে চোর আত্মগ্লানিতে জরজর . . .

এই রচনার মোর‍্যাল হচ্ছে — চোরও মানুষ। অন্য দশজনের থেকে আলাদা কিছু নয়। এই তথ্য জানার পরও 'চোর' শুনলেই আমাদের গলা বাড়িয়ে দেখার আগ্রহ হয়। আমরা কি দেখতে চাই? আগ্রহের কারণটা কি? আমরা কি দেখতে চাই -- লোকটা কোন-না-কোন ভাবে একটু আলাদা কি-না?

বরিশাল থেকে স্টীমারে ঢাকা আসছি। হঠাৎ শুনলাম এই স্টীমারে করেই একজন ভয়ংকর খুনীকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভয়ংকর খুনী দেখতে একজন ভাল মানুষের চেয়ে খুব-একটা আলাদা হবে না জেনেও দেখতে গেলাম। ২১/২২ বছরের একটি যুবক। তিনজন পুলিশ তাকে ঢাকা নিয়ে যাচ্ছে। যুবকটির কোমরে দড়ি বাঁধা, লুঙ্গি পরা, সবুজ রঙের শার্ট। হাসিমুখে চা খাচ্ছে।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে গভীর দৃষ্টিতে যুবকটিকে দেখছি। কোন রকম অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে আছে কি-না তা ধরার চেষ্টা। সে শব্দ করে হাসছে। পা নাচাচ্ছে। পুলিশ তিনজনের সঙ্গে রসিকতা করছে — তার চরিত্রে বা চেহারায় কোন রকম অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলাম না। এই মানুষটা চারটা খুন কিভাবে করল সেও এক রহস্য। খুন করতে মানসিক শক্তি যেমন প্রয়োজন শারীরিক শক্তিও প্রয়োজন। এই যুবকটি নিতান্তই দুবলা পাতলা।

সে এখন সিগারেট ধরিয়ে টানছে। পুলিশ তিনজন তার সঙ্গে সিগারেট টানছে। সে হাসিমুখে বলল, ওস্তাদজী একটু হাঁটব। পায়ে ঝিঁঝি ধরছে। পুলিশ কোনরকম আপত্তি করল না। একজন তার কোমরের দড়ি ধরে পেছনে পেছনে যাচ্ছে। অন্য দু'জন বসে আছে উদাসদৃষ্টিতে।

পুলিশ তিনজনের সঙ্গে যুবকটির মনে হচ্ছে বেশ সুসম্পর্ক। সে যা বলছে, পুলিশ তাই করছে।

আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত যুবকটির পেছনে পেছনে যাচ্ছি। সে কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়াচ্ছে না। সারা স্টীমার ঘুরে আবার আগের জায়গায় ফিরে এসে বলল, ওস্তাদজী সিগারেট।

বসে-থাকা পুলিশ তার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট দিল, এবং নিজেই ধরিয়ে দিল। চমৎকৃত হবার মত দৃশ্য। পরে বুঝলাম, এই দামী সিগারেট যুবকটিরই কেনা। পুলিশ তার সিগারেটের জিম্মাদার।

আমি যুবকটির চোখ দেখতে চাচ্ছি। সরাসরি তাকাতে চাচ্ছি তার চোখের দিকে। একজন মানুষের ভেতরটা নাকি চোখের মাধ্যমেই দেখা যায়। একটা মানুষ ভাল কি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নাম, সৎ অসৎ, তা না কি তার চোখ বলে দেয়। কিন্তু যুবকটির চোখ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তার দৃষ্টি কোথাও স্থির হয়ে পড়ছে না। এক সময় সে তাকাল আমার দিকে। আমার মনে হল তার চোখে অন্য এক ধরনের আলো। সাপের দৃষ্টির মত দৃষ্টি। পরক্ষণেই এই ধারণা মন থেকে মুছে ফেললাম। লোকটি খুনী, আগেভাগে তা জানি বলেই আমি তার চোখের দৃষ্টি সাপের দৃষ্টি বলে ভাবছি। সাপের দৃষ্টি কেমন তাও তো জানি না। সাপের চোখের দিকে তো আমি কখনো তাকাই নি।

খুনীদের সম্পর্কে আমার খানিকটা কৌতূহল আছে। এই কৌতূহলের কারণ হল, খুব ছোটবেলায় আমাদের বাসায় একজন জ্যোতিষী এসেছিলেন। তিনি আমার সব ভাইবোনের হাত দেখে অনেক ভাল ভাল কথা বললেন। আমার হাত দেখে বললেন, এই ছেলে "তিনটি বিবাহ করবে।" আমার মা'র মুখ শুকিয়ে গেল। আমি অবশ্যি যথেষ্ট পুলক অনুভব করলাম। অতঃপর জ্যোতিষী বললেন, চন্দ্রের ক্ষেত্রে যব চিহ্ন — এই ছেলে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারবে। আমার মা নিশ্চিত হলেন যে জ্যোতিষী কিছুই জানে না। সে যদি বলতো — আমি দেশের রাজা হব। মা ধরে নিতেন ঐ জ্যোতিষী খুবই বড় জ্যোতিষী। শৈশবে জ্যোতিষীর কথা আমাকে খানিকটা হলেও পীড়িত করেছে। আমি মানুষ খুন করব -- এই ধারণা আমার কাছে খুব রুচিকর মনে হয় নি। এক সময় নিজেই এ জাতীয় অধিভৌতিক বইপত্র পড়তে শুরু করলাম। আমার উৎসাহ ছিল খুনীদের লক্ষণ বিচারে। একটা বই-এ দেখলাম, খুনীদের বৃদ্ধাঙ্গুল হবে খাটো এবং মোটা। এর পর থেকে কারো সঙ্গে দেখা হলেই তার বুড়ো আঙ্গুলের দিকে তাকাতাম। কারো আঙ্গুল একটু মোটা দেখলেই মনে মনে ভাবতাম, পাওয়া গেছে। এইবার ধরেছি। ব্যাটা খুনী।

লক্ষণ বিচারে মারাত্মক খুনী যাকে পাওয়া গেল সে আমাদের বাসায় কাঠের কাজ করতে এসেছিল। মানুষটা এতই মধুর স্বভাবের যে তাকে খুনী ভাবতেও খারাপ লাগে। উপায় নেই। খুনী তো বটেই। এই মোটা বুড়ো আঙ্গুল।

মেট্রিক পরীক্ষার পর তিন মাস সময় পাওয়া যায়। এই তিন মাস রেজাল্টের জন্যে অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই — আমি তিন মাস নষ্ট করলাম জ্যোতিষী এবং এস্ট্রনমির বই পড়ে পড়ে। বাসায় এ-জাতীয় বই-এর কোন অভাব ছিল না। এক সময় হাত দেখাও শুরু হল —। হাত দেখা, সেই সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিবেচনা করা। দ্বিতীয়টি বেশ কঠিন। কিছুদিন চেষ্টা করে বাদ দিয়ে দিলাম। হাত দেখা বজায় রইল। অল্পদিনেই বুঝে গেলাম — বড় পামিস্ট হিসেবে নাম করা অত্যন্ত সহজ কাজ। হাত দেখাতে যে আসে সে নিজের সম্পর্কে কিছু কিছু জিনিস শুনতে চায়। কি শুনতে চায় তা নিজের অজান্তেই প্রকাশ করে ফেলে। যে সব জিনিস শুনতে চায় সে সব শুনিয়ে দিলেই সে পামিস্ট সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

হস্টেল হলে থাকাকালীন সময়ে আমার হাত দেখা বিদ্যার (!!) পূর্ণ বিকাশ ঘটল। দূর-দূর থেকে অচেনা মানুষজনও আসতেন এবং বিনীত গলায় বলতেন, আপনার নাম শুনে এসেছি — একটু যদি কাইন্ডলি . . . । এঁদের কঠিন মুখে ফিরিয়ে দিতাম। তাই নিয়ম। কয়েকবার ফিরিয়ে দিতে হবে। তারপরেও আসবে তখন একদিন হাত দেখা হবে। যে সব কথা ভদ্রলোক শুনতে চাচ্ছেন তার সবই আমি তাঁকে শুনিয়ে দেই এবং অভিভূত করে বিদায় দেই, কাজটা খুব কঠিন না। নমুনা দিচ্ছি —

আমি ঃ আপনাকে সবাই ভুল বুঝে। আপনি আসলে কি কেউ জানে না।

ভদ্রলোক ঃ ঠিক বলেছেন। সবাই ভুল বুঝে [উদাস হয়ে গেলেন। একই সঙ্গে খুশি। সব মানুষই চায় — তার মধ্যে রহস্য থাকুক।]

আমি ঃ সবচে' বেশি ভুল বুঝে আপনার অতি প্রিয়জনরা।

ভদ্রলোক ঃ খুব কারেক্ট অবজারভেশন। [আরো উদাস, এবং দুঃখি। তবে এই দুঃখে কিছুটা আনন্দ মেশানো।]

আমি ঃ আপনি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত উদার যদিও ভাব করেন যে আপনি উদার নন।

ভদ্রলোক ঃ এটা ভাই আপনি দারুণ সত্যি কথা বললেন। ভেতরের কথা বলে ফেলেছেন।

[দারুণ খুশি, সবাই চায় নিজেকে উদাব ভাবতে।]

আমি ঃ মানুষের প্রতি আপনার মমতা অপরিসীম। শুধু মানুষ না— পশু-পাখি এদের প্রতিও আপনার অসীম মমতা। . . .

ভদ্রলোক ঃ এটা যখন বললেনই তখন আপনাকে একটা গল্প বলি। বৎসর খানিক আগের কথা। নিউ মার্কেটে গিয়েছি . . . [লম্বা গল্প ফেঁদে বসলেন যেখানে পশুপ্রেমের ব্যাপার আছে।]

আমি ঃ আপনার ভেতর অনুশোচনার ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রবল। কোন একটা অন্যায় করবার পর তীব্র অনুশোচনায় আপনি আক্রান্ত হন। এমনও হয়েছে যে অতি সামান্য অন্যায় কিন্তু সারারাত আপনার ঘুম হল না।

ভদ্রলোক ঃ [অভিভূত। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। ধরা গলায় বললেন —] আমার ফ্যামিলি লাইফ সম্পর্কে বলুন।

বলার ভঙ্গি থেকে ধরতে হবে লোকটি পারিবারিক জীবনে সুখী কি সুখী নয়। শতকরা আশি ভাগ সম্ভাবনা — অসুখী। সুখী মানুষ জ্যোতিষী খুঁজে বেড়ায় না। অসুখী হলে অসুখের কারণটা অর্থনৈতিক কি–না তা লোকটির কাপড়–চোপড় দেখে ধরতে হবে। যদি দেখা যায় কারণ অর্থনৈতিক নয় তাহলে বুঝতে হবে সমস্যা অন্য জায়গায়।

আমি ঃ ভাই কিছু মনে করবেন না। আপনার হাত দেখে মনে হচ্ছে পারিবারিক জীবনে আপনি অত্যন্ত অসুখী, যদিও বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। কেন অসুখী

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভাগ্য আপনার হাতে আছে। বেশ পরিষ্কার ভাবেই আছে, কিন্তু সাবি। আমি বলতে চাচ্ছি না। এই বিষয়ে আমি কিছু বলব না। দয়া করে আমাকে জোর করবেন না।

আমাকে তখন আর কিছু বলতে হয় না। ভদ্রলোক নিজেই তখন হড়বড় করে তার জীবন ইতিহাস বলতে থাকেন। এই ব্যাপার আমি একবার না, অসংখ্যবার লক্ষ্য করেছি। মানুষগুলি জেনেশুনে প্রতারিত হবার জন্যে আসে। প্রতারিত হয় এবং হাসিমুখে ফিরে যায়। তার জন্যে আমি তেমন কোন গ্লানিবোধ করি না। তার প্রধান কারণ, এর মধ্যে কোন অর্থ জড়িত নয়। হাত দেখার জন্যে আমি কোন টাকা নেই না। এতটা নামা আমার পক্ষে সম্ভব না। দ্বিতীয় কারণ, পুরো ব্যাপারটায় আমি খুব মজা পাই। মানব চরিত্রের বিচিত্র সব দিক ধরা পড়ে।

অনেকেই হয়ত বলবেন — আপনি হাত দেখতে জানেন না বলেই আজেবাজে কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দেন। যারা জানে তারা দেয় না। হাতে যা আছে তাই বলে। তাঁদের জন্যে আমার একটা গল্প আছে — বছর ছয়েক আগের কথা। সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকার অফিসে গিয়েছি। গল্প করছি রোববার পত্রিকার সম্পাদক কবি রফিক আজাদের সঙ্গে। তখন বাংলাদেশের একজন নামী হস্তরেখাবিশারদ পত্রিকা অফিসে ঢুকলেন। তাঁর নাম করছি না। তাতে তাঁর রমরমা ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে।

রফিক আজাদ আমাকে দেখিয়ে বললেন, উনার হাতটা দেখুন তো।

হস্তরেখাবিশারদ আমাকে চিনলেন না। চেনার কথাও না। তখন পত্র-পত্রিকায় আমার কোন ছবি ছাপা হত না। তিনি গভীর মনোযোগে হাত দেখলেন — এবং বললেন,

'আপনি লেখালেখি করেন।'

সবাই চমৎকৃত হল। আমি হলাম না। পত্রিকার অফিসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। সঙ্গত কারণেই ধরে নেয়া যায় আমি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। আমি তাঁকে কনফিউজ করবার জন্যে খুব শংকিত গলায় বললাম — আমার পড়াশোনা কতদূর হবে একটু দেখুন।

হস্তরেখাবিশারদ আমার টোপ গিললেন এবং আমার করুণভাবে বলার ভঙ্গি থেকে ধরে নিলেন — পড়াশোনার অবস্থা শোচনীয়।

'আপনার রবির ক্ষেত্র বেশ দুর্বল। তাছাড়া বৃহস্পতির ক্ষেত্রও তেমন ডেভেলপড নয়। ব্রেক অব স্টাডি আছে।'

তখন আমি সদ্য পি-এইচ.ডি করে দেশে ফিরেছি। কিন্তু এমন ভাব করলাম যেন তাঁর কথায় অভিভূত হয়ে গেছি। আমার আশেপাশে যারা ছিল তারা আমার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। আমি গলার স্বর আরো করুণ করে বললাম,

'পড়াশোনা বাদ দিন। যা হবার হয়েছে। এর বেশি কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। চাকরি বাকরি দেখুন।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভদ্রলোক আবার আমার টেপ গিললেন এবং বললেন — এখন চাকরির কোন যোগ দেখছি না। তবে বছর দু'একের মাথায় বড় ধরনের একটা সুযোগ আছে। সেই সুযোগ গ্রহণ করলে ভাল হবে।

তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছি। আমি ভদ্রলোকের কথায় এমন আন্তরিক ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলাম যে তিনি চলে এলেন পুরো আমার হাতের মুঠোয়! আমি বললাম, আমার খুব দেশ-বিদেশ দেখার শখ। দেখুন না বিদেশযাত্রা আছে কি-না।

'শেষ বয়সে সম্ভাবনা আছে।'

এই হচ্ছে পামিস্ট্রি। এই হচ্ছে দেশবিখ্যাত (!!!) হস্তরেখাবিশারদের নমুনা। বিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়াশোনা জানা মানুষদেরও আমি দেখেছি এই সব ব্যাপারে অন্ধ ভক্তি। কেউ কেউ পামিস্ট্রি বিশ্বাস করেন না কিন্তু এস্ট্রনমি বিশ্বাস করেন। তাঁদের ধারণা এস্ট্রনমি নাকি সায়েন্স! বৃশ্চিক রাশির সব জাতকের স্বভাব চরিত্র না-কি এক রকম হবে। আমি এবং আমার দুই ভাইবোন বৃশ্চিক রাশির। আমাদের কারোর সঙ্গে কারো স্বভাবের কোন মিল নেই। তার চেয়েও বড় কথা, এইসব রাশির ব্যাপারগুলি হাজার বছর আগের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র দেখে ঠিক করা। হাজার বছরে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। আজ যদি কুষ্ঠি তৈরি করা হয় এবং কুষ্ঠি বিচার করে লেখা হয় —

'জাতক জন্মলগ্নে বৃশ্চিক রাশি'

তখন উচ্চস্বরে হাসা ছাড়া পথ নেই। হাজার বছর আগে জন্মালে এই জাতক বৃশ্চিক রাশি হত। আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলি যোগ করলে বৃশ্চিকের মত হয়ত দেখাতো। আজ দেখাবে না। নক্ষত্ররা সরে গেছে।

বাংলাদেশে হস্তরেখাবিশারদের মত অনেক এস্ট্রলজারও আছেন। তাঁদের সমিতি-টমিতি আছে। তাঁরা মহা সম্মেলন করেন: গ্রহ-নক্ষত্র বিচারে দেশের ভবিষ্যৎ কি তা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দেন। পত্রিকাওয়ালারা সেই সব বিবৃতি খুব আগ্রহ করে ছাপেন: বিস্মিত হয়ে ভাবি, কোন যুগে বাস করছি? জাদুটোনার যুগে না চন্দ্র জয়ের যুগে?

এস্ট্রলজারদের মহা সম্মেলনে একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি আমি আগেও এক লেখায় উল্লেখ করেছি। আবারো করছি। যে মহা সম্মেলনটির কথা বলছি সেই মহা সম্মেলনে এরশাদ সাহেবের এক মন্ত্রী ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি তাঁর বক্তৃতায় মহা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করলেন। এস্ট্রলজারবা গ্রহ-নক্ষত্র গুণে দেশ ও জাতির জন্যে যে মঙ্গল করে যাচ্ছেন তার ভূয়সি প্রশংসা করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে এস্ট্রলজির একটি বিভাগ খোলা উচিত সেই সম্পর্কেও বললেন। ঘন ঘন হাততালি পড়তে লাগল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তখন তিনি একটি মোক্ষম কথা বললেন। তিনি বললেন, এস্ট্রলজারদের জন্যে তিনি একটি মানমন্দির স্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

এস্ট্রলজাররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এ কি সমস্যায় পড়া গেল! মানমন্দির দিয়ে তাঁরা কি করবেন? কোন্ গ্রহ ভাল কোন্ গ্রহ মন্দ এটা তো মানমন্দির দিয়ে বোঝা যাবে না। মানমন্দির হচ্ছে এস্ট্রোনমারদের জন্যে, এস্ট্রো ফিজিসিস্টদের জন্যে। তাঁদের প্রয়োজন হাজার বছরের পুরানো পুঁথি — এবং একদল বোকা পাঁঠা শিষ্যগুষ্টী।

ভাল কথা, শৈশবে যে জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিলেন আমি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারব, তাঁর গণনা কিন্তু এক অর্থে মিলে গেছে। এইসব দিনরাত্রি নামক ধারাবাহিক নাটকে আমি 'টুনী'কে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছি। শুধু টুনী না — আমার উপন্যাসের অনেক চরিত্রকেও অকালে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। আমি কি করব? আমার হাতে লেখা।

রাত একটার পর আমি সাধারণত ঘড়ির দিকে তাকাই না। ঘড়ির দিকে তাকালেই এক ধরনের অপরাধবোধে আক্রান্ত হই। ঘুমুতে যাওয়া উচিত — যাচ্ছি না। দুষ্ট ছেলের মত জেগে আছি। একে একে ঘরের সব বাতি নিভে যাচ্ছে। রান্নাঘরের বাতি নিভিয়ে কাজের মেয়েটি ঘুমুতে গেল। চারদিক চুপচাপ। এর আগের রাতও জেগে কাটিয়েছি। আরো কয়েক রাত এমন করে কাটলে পুরোপুরি অনিদ্রায় ধরবে। শরীরের নিজস্ব ঘড়ি যাবে উল্টে। দিনে ঘুমুব, রাতে জেগে থাকব।

গত রাত জেগে কাটিয়েছি বিশেষ কারণে। মন বিক্ষিপ্ত ছিল। তুচ্ছ কারণে মন বিগড়ে গেল। অতি তুচ্ছ বিষয় যা তৎক্ষণাৎ মন থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত ছিল, অথচ ঝাড়তে পারি না। বড় বড় ব্যাপারগুলি সহজেই ঝেড়ে ফেলা যায় কিন্তু তুচ্ছ ব্যাপারগুলি চোরকাঁটার মত। কিছুতেই তাড়ানো যায় না। ঘটনাটা বলি — ছোট্ট একটা ইলেকট্রিক্যাল পার্টস কিনতে গিয়েছি। একটা মাল্টি প্ল্যাগ টিভির পেছনে লাগানো থাকবে। একসঙ্গে এন্টেনা এবং ভিসিআর-এর ইনপুট আসবে। । দোকানে ঢোকামাত্র দোকানি আনন্দে হেসে ফেলে বলল, আরে আপনি! কি সৌভাগ্য!

আমি বললাম, আপনি কি আমাকে চেনেন?

দোকানি চোখ কপালে তুলে বলল, আপনাকে চিনব না? আপনার বহুব্রীহি ...

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি যথেষ্টই আনন্দিত হলাম। জিনিসটা কিনলাম। দাম জিজ্ঞেস করলাম। দোকানি বলল, পৃথিবীর সব মানুষের কাছ থেকে লাভ করা যায়, আপনার কাছ থেকে করা যায় না। আপনার সঙ্গে ব্যবসা করলে অধর্ম হয়। আমি যে দামে কিনেছি সেই দাম দিন। একটা পাই পয়সা বেশি রাখব না। একশ' চল্লিশ টাকা।

আমি একশ' চল্লিশ টাকা দিলাম।

'স্যার চা খান।'

'না, চা খাব না।'

'আপনি আমার দোকান থেকে চা না খেয়ে যাবেন, তা তো হয় না।'

চা এল। আমি চা খেয়ে খুশি মনে রওনা হলাম। মানুষকে অবিশ্বাস করলে ঠকতে হয়। যে সবাইকে বিশ্বাস করে সে কখনো ঠকে না।

আমার কি যে হল — অবিশ্বাসের সামান্য কণা মনে জন্মাল। অন্য একটা দোকানে এই জিনিসটির দাম জানতে চাইলাম। তারা বলল, একশ' টাকা। আরো একটা দোকানে গেলাম। তারাও বলল, একশ'। আমি হতভম্ব। তখন মনে হল — লোকটাকে অবিশ্বাস করেছি বলে ঠকেছি। অন্য কোথাও দাম জিজ্ঞেস না করলে তো ঠকতাম না। চল্লিশ টাকা এমন বড় কিছু নয়!

একবার ভাবলাম, প্রথম দোকানে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি — ভাই, এই কাজটা আপনি কেন করলেন? সামান্য চল্লিশটা টাকার জন্যে করলেন, না-কি আমাকে বোকা বানানোর জন্যে করলেন?

আমি লোকটির কাছে গেলাম না। প্রচণ্ড রাগ বুকে পুষে ঘরে ফিরে এলাম। রাতে বিছানায় ঘুমুতে গিয়ে মনে হল, ঐ লোক তার স্ত্রীর সঙ্গে নিশ্চয় হাসতে হাসতে গল্প করছে — "আজ আমাদের দোকানে এসেছিল এক বোকা লেখক। ব্যাটাকে মাথা মুড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছি। হা-হা-হা!"

যে মানুষ ঈশ্বরের অংশ তার ভেতর এত ক্ষুদ্রতা কেন? আমি আরো অনেকের মত মানুষকে নিখুঁত প্রাণী হিসেবে ভাবতে ভালবাসি। যদিও খুব ভাল করেই জানি আমার ভেতর অসংখ্য খুঁত আছে। রাগ, লোভ, ঘৃণা, অহংকার সব শুধু যে আছে তাই না — অনেক বেশি পরিমাণে আছে, তবু কেন অন্যের ভেতর এইসব দেখলে এত কষ্ট পাই?

লেখালেখির সময়ও একই ব্যাপার — যে সব চরিত্র তৈরি করি তাদের মানবিক গুণই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তাদের চরিত্রের অন্ধকার অংশের কথা ভাবতে বা লিখতে ভাল লাগে না। লিখতে গেলে মনের উপর চাপ পড়ে।

মানুষকে বড় করে দেখার এই প্রবণতা কি দোষণীয়?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এ যেমন তাকে ঠিক তেমন করেই কি দেখা উচিত নয়? আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় মানব চরিত্রে এমন সব বড় দিক আছে যার স্পর্শে তার যাবতীয় দোষ, গ্লানি ঢাকা পড়ে যায়।

প্রাণী হিসেবে মানুষ অসম্ভব বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, সে কখনো নিজের জীবন বিপন্ন করবে না। সে তার জীবনের মূল্য জানে। এই জীবনকে সে রক্ষা করবে। অথচ কি মজার ব্যাপার, অসম্ভব বুদ্ধিমান প্রাণী হয়েও মানুষ প্রায়শঃই প্রকাণ্ড সব বোকামি করে। দাউদাউ করে একটা বাড়িতে আগুন জ্বলছে। বাড়ির ভেতর থেকে ছোট্ট একটা শিশুর কান্না শোনা যাচ্ছে। নিতান্তই অপরিচিত একজন মানুষ শিশুর কান্না শুনে দৌড়ে আগুনের ভেতর ঢুকে পড়বে। ভয়াবহ বোকামি করে প্রমাণ করবে যে মানুষ শ্রেষ্ঠতম প্রাণী।

আমাদের নানার বাড়িতে নসু বলে একটা লোককে ছোটবেলায় দেখেছিলাম। তার সমস্ত শরীর ঝলসানো। সে আগুনে আটকা-পড়া একটা বিড়াল ছানাকে বাঁচাতে গিয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছিল। সবাই তাকে ডাকতো বোকা নসু। কিন্তু সেই 'বোকা' ডাকের সঙ্গে কি গভীর মমতাই না মেশানো থাকতো!

ছোটবেলায় আমি ভেবেছিলাম, নসু মামা বোধ করি খুব বিড়াল পছন্দ করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি দাঁত-মুখ কুঁচকে বললেন, "দূর ভাগ্না। বিলাই আমার দুই চক্ষুর বিষ।"

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই "দু'চোখের বিষের বাচ্চা" বাঁচানোর জন্যেও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। মানুষ বলেই সে পারে। মানুষকে চেষ্টা করে মহৎ হতে হয় না, মহত্ত্ব নিয়েই সে জন্মেছে।

আমার মন যখন বিক্ষিপ্ত থাকে তখন কিছু কিছু লেখকের রচনা পাঠ করি যা আমাকে শান্ত হতে সাহায্য করে। মার্কিন ঔপন্যাসিক জন স্টেইনবেক তেমনি একজন লেখক। মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি তাঁর আস্থা, মানুষের প্রতি তাঁর সীমাহীন মমতা আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

১৯৫২ সনে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার নিতে গিয়ে জন স্টেইনবেক যে ভাষণ দিয়েছিলেন আমার কাছে সে ভাষণ দেববাণীর মত মনে হয়। স্টেইনবেক বলছেন -- "আমি মনে করি যে লেখক মানুষের নিখুঁত ও ত্রুটিহীন হয়ে উঠবার সম্ভাবনায় আস্থা স্থাপন করেন না -- সাহিত্যের প্রতি তাঁর কোন অনুগত্য নেই। সাহিত্য সদস্য হবার কোন যোগ্যতা তাঁর নেই।"

এই মহান লেখক মানুষের ত্রুটিগুলি এত মমতায় এঁকেছেন যে পড়তে পড়তে বারবার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠে। মনে হয়, বিশ্বাস হারানোর সময় এখনো আসে নি। কখনো আসবেও না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার যখন রাতজাগা রোগ হয় তখন এই লেখকের দু'টি বই খুব আগ্রহ করে পড়ি — একটি হল "ক্যানারী রো"। কয়েকজন ভবঘুরে অলস যুবকের গল্প। অন্যটি "টরটিল' ফ্ল্যাট"। বড়ই মজার, বড়ই রহস্যময় উপন্যাস। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, যে গ্রন্থের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পান —"গ্রেপস অব র‍্যাথ" তা আমার পড়তে একেবারেই ভাল লাগে নি। একবার শুধু পড়েছি। তাও কষ্ট করে।

এই মহান লেখক তাঁর আত্মজীবনীতে খুব মজা করে একটা ঘটনা লিখেছেন। হাতের কাছে বইটি নেই। কাজেই হুবহু অনুবাদ করতে পারছি না — ঘটনাটা বলি। যুবক বয়সে স্টেইনবেকের খুব ইচ্ছে হল আমেরিকার এক মাথা থেকে পায়ে হেঁটে অন্য মাথায় যাবেন। কাঁধে 'হেভার স্যাক' নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় যাত্রা শুরু করলেন। সারাদিন হাঁটেন। রাতে কোন-না-কোন বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। গৃহকর্তা জিজ্ঞেস করেন, তোমার উদ্দেশ্য কি? যাচ্ছ কোথায়?

'আমি পায়ে হেঁটে আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'এম্নি, কোন কারণে না।'

'না, তোমার মতলব সুবিধার মনে হচ্ছে না। থাকতে দেয়া হবে না। অন্য কোথাও যাও।'

অন্য বাড়িতে গিয়েও দেখেন একই অবস্থা। একটা যুবক ছেলে শুধুমাত্র শখের কারণে ছ'হাজার মাইল পায়ে হাঁটবে — এটা কেউ বিশ্বাস করছে না। স্টেইনবেক বলছেন, আমি যখন দেখলাম, মানুষ সত্যটাকে গ্রহণ করতে পারছে না তখন মিথ্যার আশ্রয় নিলাম — আমি বলা শুরু করলাম, বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরেছি। পায়ে হেঁটে আমেরিকার এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যাব। তখন সবাই যে শুধু আমার কথা বিশ্বাস করল তাই না, আমাকে নানানভাবে উৎসাহও দিল যাতে আমি বাজি জিততে পারি। স্টেইনবেক বলছেন, "মানব চরিত্রের একটি মজার দিক হচ্ছে মানুষ সত্যের চেয়ে মিথ্যাকে সহজে গ্রহণ করে।"

প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি। প্রসঙ্গে ফিরে যাই — নিশি যাপন বিষয়ে বলছিলাম। আজ রাত জেগে আছি মন খারাপের জন্যে ঘুম আসছে না বলে। কিন্তু আমার মন যখন বেশ ভাল থাকে তখনো আমি মাঝে মাঝে নিশি যাপন করি।

এই পৃথিবীতে সবচে' মহৎ এবং সবচে' ভয়ংকর পরিকল্পনাগুলি না-কি রাতে করা হয়। সাধুরা ঈশ্বর চিন্তা করেন রাতে। কুৎসিততম অপরাধগুলি করতে অপরাধীরা রাতে বের হয়। সাধারণ মানুষদের জন্যে রাত হচ্ছে বিশ্রামের কাল। আর যারা অসাধারণ, রাত তাদের জেগে থাকার সময়। আমি খুবই সাধারণ তবু মাঝে মাঝে অসাধারণ হতে ইচ্ছা করে। রাত জাগতে ভাল লাগে। আমার এই রাতজাগা অভ্যেস ধরিয়ে দেন আনিস সাবেত। মেট্রিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া তুখোড় ছাত্র। মহসিন হলে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পাশের ঘরে থাকতেন। পদাতিকদের ডাক। তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা একটাই — 'ছবি বানাবেন'। পাঠ্যবই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ছবি বানানোর কিছু কোর্স নিলেন। কোন-এক ক্যামেরাম্যানের অ্যাসিসটেন্ট হয়ে ক্যামেরার কাজ শিখতে লাগলেন। তাঁর ছিল রাতজাগা নেশা। এই নেশা তিনি আমাকে ধরিয়ে দিলেন। মাঝ রাতে নিভিয়ে শুয়ে পড়েছি। ভোর আটটা থেকে ক্লাস — সকালে উঠতে হবে। আনিস ভাই এসে দরজায় টোকা দিলেন, এই ঘুমুচ্ছ না-কি?

'আমি মটকা মেরে পড়ে থাকি, জবাব দেই না।

আনিস ভাই আরো কয়েকবার দরজায় টোকা দিয়ে শেষটায় বলেন — এখন কিন্তু দরজা ভাঙব। ওয়ান-টু-থ্রী . . .

আমি কাতর গলায় বলি, আমার ভোর বেলায় ক্লাস আনিস ভাই ।

'ভোরবেলায় তো আমারো ক্লাস। হু কেয়ার্স?'

'যাবেন কোথায় এত রাতে?'

'প্রথমে নীলখেতে গিয়ে চা খাব, তারপর শহরে হাঁটব।'

শার্ট গায়ে দিয়ে বের হই। নীলখেতে চা খাই তারপর হাঁটতে শুরু করি। সেই সময় রাতের ঢাকা ছিল অসম্ভব নিরাপদ। শহর কখনো ঘুমুতো না। রাস্তা-ঘাটে কিছু-না-কিছু মানুষ থাকতোই। এমনও হয়েছে আমরা সারারাত হেঁটে ভোরবেলা হলে উপস্থিত হয়েছি। চা-নাশতা খেয়ে চলে গিয়েছি ক্লাসে।

দেশের প্রতি প্রচণ্ড মমতা ছিল আনিস ভাইয়ের। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের জন্যে কি করা যায় — কি করে এ দেশের শিল্প-সাহিত্যকে এগিয়ে নেয়া যায় — রাতদিন এই পরিকল্পনা। আহমেদ ছফা'র সঙ্গে যোগ দিয়ে তখন পত্রিকা বের করছেন। দারুণ উৎসাহ। ছবির একটা স্ক্রীপ্ট লিখে ফিললেন । যখন টাকা হবে এই ছবি বানানো হবে। দেশে বিদেশে ছবি যাবে সবাই মুগ্ধ হয়ে বলবে — বাংলাদেশের ছবি। যে দেশের প্রতি এত মমতা সেই দেশের উপর প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে তিনি ১৯৭৫ সনে চিরদিনের জন্যে চলে গেলেন কানাডা। আমার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখলেন না। চিঠি লিখি, জবাব দেন না।

আমেরিকা গিয়ে অনেক চেষ্টা করে টেলিফোনে তাঁকে পেলাম। মনে হল, কথা বলায় কোন আগ্রহ বোধ করছেন না। রাগ করে টেলিফোন রেখে দিলাম। সেও অনেক কাল আগের কথা।

তার পরের ঘটনা ভয়ংকর ধরনের। গভীর রাতে টেলিফোন এসেছে। লং ডিসটেন্স কল। আনিস ভাই আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে আমাকে খুঁজে বের করেছেন। টেলিফোন করেছেন রাত তিনটায়, রাগ ভুলে গিয়ে আমি হাসিমুখে বললাম, আপনার পুরানো অভ্যাস এখনো যায় নি। টেলিফোন করেছেন, রাত তিনটায়;

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আনিস ভাই হাসতে হাসতে বললেন, ইচ্ছে করে করেছি। তোমার ঘুম নষ্ট করবার জন্যে করেছি। কেমন আছ?

'ভাল। আপনি কেমন?'

'আমি কেমন আছি বলছি, তবে শান্ত হয়ে শুনবে, মন খারাপ করবে না। আমার ক্যানসার হয়েছে। থ্রোট ক্যানসার। কাউকেই বলি নি। তোমাকে বললাম। সময় হাতে বেশি নেই। দু'মাস।'

আমি টেলিফোন হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

শেষ দু'মাসে আনিস ভাই প্রতি সপ্তাহে টেলিফোন করতেন। রাত দু'টা বা তিনটায় টেলিফোন বেজে উঠতো। কথা বলতে তখন তাঁর কষ্ট হত। সব কথা বোঝাও যেত না।

'হুমায়ূন, তোমার কি মনে আছে আমরা কেমন সারারাত শহরে হাঁটতাম?'

'মনে আছে।'

'তুমি কি এখনো হাঁট?'

'না।'

'মৃত্যুর আগে আর একবার শুধু ঢাকা শহরে হাঁটতে ইচ্ছে করে। আমাদের দেশটাকে আল্লাহ এত সুন্দর করে কেন বানালেন বলতো? খুব দেখতে ইচ্ছা করছে।'

'চলে আসুন।'

'চলে আসা সম্ভব নয়। আমার শেষ অবস্থা। তুমি কি কাঁদছ না-কি?'

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, না। আপনি দয়া করে আর আমাকে টেলিফোন করবেন না। আমি সহ্য করতে পারছি না।

আনিস ভাই আমাকে টেলিফোন করেন নি। তাঁর নির্দেশমত হাসপাতাল থেকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ আমাকে দেয়া হয়।

আমি এখনো নিশিযাপন করি। মাঝে মাঝে কেমন জানি লাগে। মনে হয় হারিয়ে যাওয়া মানুষরা যেন হারিয়ে যায় নি — আছে, আমার পাশেই আছে। এই তো ভালবাসা এবং মমতায় তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এমন অনুভূতি কখনো দিনে হবার নয় — তার জন্যে প্রয়োজন চিররহস্যময়ী — রাত্রি। অনন্ত অম্বর।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



হোটেল গ্রেভার ইন

এলেম নতুন দেশে। লরা ইঙ্গেল্‌স্ ওয়াইল্ডারের প্রেইরী ভূমি, ডাকোটা রাজ্য। ভোর চারটায় পৌঁছলাম, বাইরে অন্ধকার, সূর্য এখনো ওঠেনি, হেক্টর এয়ারপোর্টের খোলা মাঠে হু-হু করে হাওয়া বইছে। শীতে গা কাঁপছে। যদিও শীত লাগার কথা নয়। এখন হচ্ছে—ফল, শীত আসতে দেরি আছে।

আমার মন খুব খারাপ।

দেশ ছেড়ে দীর্ঘদিনের জন্যে বাইরে যাবার উৎসাহ আমি কখনো বোধ করিনি। বর্ষাকালে বৃষ্টির শব্দ শুনবো না, ব্যাঙের ডাক শুনবো না, চৈত্র মাসের রাতে খোলা ছাদে পাটি পেতে বসবো না, শীতের দিনে গ্রামের বাড়িতে আগুনের কাছে হাত মেলে ধরবো না, এটা হতে পারে না।

অনেকের পায়ের নিচে সর্ষে থাকে। তাঁরা বেড়াতে ভালোবাসেন। বিদেশের নামে তাঁদের রক্তে বাজনা বেজে ওঠে। আমার কাছে ভ্রমণের চেয়ে ভ্রমণকাহিনী ভালো লাগে। একটা বই হাতে, নিজের ঘরে নিজের চেনা জায়গাটায় বসে থাকবো, পাশে থাকবে চায়ের পেয়ালা, অথচ আমি লেখকের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লেখক হয়তো সুন্দর একটা হ্রদের বর্ণনা দিচ্ছেন, আমি কল্পনায় সেই হ্রদ দেখছি। সেই হ্রদের জল নীল। জলে মেঘের ছায়া পড়েছে। আমার কল্পনাশক্তি ভালো। লেখক তাঁর চোখে যা দেখছেন আমি আমার কল্পনার চোখে তাঁর চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছি। কাজেই কষ্ট করে যাযাবরের মতো দেশ-বিদেশ দেখার প্রয়োজন কি?

প্রেইরী ভূমি সম্পর্কে আমি ভালো জানি। লরা ইঙ্গেলস-এর প্রতিটি বই আমার অনেকবার করে পড়া। নিজের চোখে এই দেশ দেখার কোন আগ্রহ আমার নেই। আমি এসেছি পড়াশোনা করতে। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রির মতো রসকষহীন একটি বিষয়ে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী নিতে হবে। কতো দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী কেটে যাবে। ল্যাবরেটরিতে, পাঠ্য বইয়ের গোলকধাঁধায়। মনে হলেই হৃৎপিণ্ডের টিক্‌টিক্ খানিকটা হলেও শ্লথ হয়ে যায়। হেক্টর এয়ারপোর্টের ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া হাওয়ার মতো বুকের ভেতরটাও হু-হু করে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মন খারাপ হবার আমার আরেকটি বড় কারণও আছে। দেশে সতেরো বছর বয়সী আমার স্ত্রীকে ফেলে এসেছি। তার শরীরে আমাদের প্রথম সন্তান। ভালোবাসাবাসির প্রথম পুষ্প। ঢাকা এয়ারপোর্টে আরো অনেকের সঙ্গে সে-ও এসেছিলো। সারাক্ষণই সে একটু দূরে-দূরে সরে রইলো। এই বয়সেই সন্তান ধারণের লজ্জায় সে ম্রিয়মাণ। কালো একটা চাদরে শরীরটা ঢেকেঢুকে রাখার চেষ্টাতেই তার সময় কেটে যাচ্ছে। বিদায়ের আগ মুহূর্তে সে বললো, আমাদের প্রথম বাচ্চার জন্মের সময় তুমি পাশে থাকবে না?

আমার চোখে প্রায় পানি এসে যাবার মতো অবস্থা হলো। ইচ্ছে করলো টিকিট এবং পাসপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে তার হাত ধরে বলি—চলো, বাসায় যাই।

অল্প কিছুদিন আমাদের আয়ু। এই অল্পদিনের জন্যে আমাদের কতো আয়োজন—পাস, ডিগ্রী, চাকরি, প্রমোশন, টাকা-পয়সা, বাড়িঘর—কোনো মানে হয়? কোনোই মানে হয় না।

আমার মনের অবস্থা সে টের পেলো। মুহূর্তের মধ্যে কথা ঘুরিয়ে বললো, যদি ছেলে হয় নাম রাখবো আমি। আর যদি মেয়ে হয় নাম রাখবে তুমি। কেমন?

প্লেনে আসতে-আসতে সারাক্ষণ আমি আমার মেয়ের নাম ভেবেছি। কতো লক্ষ লক্ষ নাম পৃথিবীতে, কিন্তু কোনোটিই আমার মনে ধরছে না। কোনোটিই যেন মায়ের গর্ভে ঘুমিয়ে-থাকা রাজকন্যার উপযুক্ত নাম নয়। এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নামটি আমাকে আমার মেয়ের জন্য খুঁজে বের করতে হবে। আজ থেকে আঠারো, উনিশ বা কুড়ি বছর পর কোনো-এক প্রেমিক পুরুষ এই নামে আমার মেয়েকে ডাকবে। ভালোবাসার কতো না গল্প সে করবে। হেক্টর এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে এইসব ভাবছি। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। পৃথিবীটা এমন যে বেশির ভাগ ইচ্ছাই কাজে খাটানো যায় না। আমি বসে বসে ভোর হবার জন্যে অপেক্ষা করছি। এতো ভোরে কেউ আমাকে নিতে আসবে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রতিবছর হাজার খানিক বিদেশী ছাত্র নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে আসে। কার এতো গরজ পড়েছে এদের এয়ারপোর্ট থেকে খাতির করে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়ার?

তুমি কি বাংলাদেশের ছাত্র—আহামাদ? আমি চমকে তাকালাম। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যে মহিলা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। চোখ ঝলসে যায়। অপূর্ব রূপবতী। যে পোশাক তাঁর গায়ে তার উদ্দেশ্য সম্ভবত শরীরের সুন্দর অংশগুলোর দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমি জবাব না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা আবার বললেন—তুমি কি বাংলাদেশের ছাত্র আহামাদ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

ঃ আমার নাম টয়লা ক্লেইন। আমি হচ্ছি নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার। আমি খুবই লজ্জিত যে দেরি করে ফেলেছি। চলো, রওনা হওয়া যাক। তোমার সঙ্গের সব জিনিসপত্র কি এই?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

: ইয়েস।

আমার সব জবাব এক শব্দে, ইয়েস এবং নো র মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইংরেজিতে একটা পুরো বাক্য বলার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে একটা পুরো বাক্য বললেই এই ভদ্রমহিলা হা হা করে হেসে উঠবেন।

: আহামাদ, তুমি কি রওনা হবার আগে এক কাপ কফি খাবে? বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। হঠাৎ কেন জানি ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। কফি আনবো?

: না।

: আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি পূর্বদেশীয় ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো কিছু খাবার কথা বললেই তারা প্রথমে বলে 'না'। অথচ তাদের খাবার ইচ্ছা আছে। আমি শুনেছি 'না' বলাটা তাদের ভদ্রতার একটা অংশ। কাজেই আমি আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছি—তুমি কি কফি খেতে চাও?

ঃ চাই।

ভদ্রমহিলা কাগজের গ্লাসে দু'কাপ কফি নিয়ে এলেন। এর চেয়ে কুৎসিত কোনো পানীয় আমি এই জীবনে খাইনি। কষা তিতকুটে একটা জিনিস। নাড়ীভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। ভদ্রমহিলা বললেন, হট কফি ভালো লাগছে না? আমি মুখ বিকৃত করে বললাম, খুব ভালো।

টয়লা ক্লেইন হেসে ফেলে বললেন, আহামাদ তোমাকে আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি। আমেরিকায় পূর্বদেশীয় ভদ্রতা অচল। এদেশে সব কিছু তুমি সরাসরি বলবে। কফি ভালো লাগলে বলবে—ভালো। খারাপ লাগলে কফির কাপ 'ইয়াক' বলে ছুঁড়ে ফেলবে ডাস্টবিনে।

আমি ইয়াক্ বলে একটা শব্দ করে ডাস্টবিনে কফির কাপ ছুঁড়ে ফেললাম। এই হচ্ছে অমেরিকায় আমেরিকানদের মতো আমার প্রথম আচরণ।

টয়লা ক্লেইনের গাঢ় লাল রঙের গাড়ি ডাউনটাউন ফারগোর দিকে যাচ্ছে। আমি ঝিম ধরে পেছনের সীটে বসে আছি। আশেপাশের দৃশ্য আমাকে মোটেই টানছে না। টয়লা ক্লেইন একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। প্রতিটি শব্দ খুব স্পষ্ট করে বললেন। তাতে বুঝতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। আমেরিকানদের ইংরেজি বোঝা যায়। ব্রিটিশদেরটা বোঝা যায় না। ব্রিটিশরা অর্ধেক কথা বলে, অর্ধেক পেটে রেখে দেয়। যা বলে তা-ও বলার আগে মুখে খানিকক্ষণ রেখে গার্গল করে বলে আমার ধারণা।

ঃ আহামাদ, তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি 'হোটেল গ্রেভার ইনে।' হোটেল গ্রেভার ইন পুরোদস্তুর একটা হোটেল। তবে হোটেলের মালিক গত বছর এই হোটেল স্টেট ইউনিভার্সিটিকে দান করে দিয়েছেন। বর্তমানে ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা হোটেলটা চালাচ্ছে। অনেক গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এই হোটেলে থেকেই পড়াশোনা করে। তুমিও ইচ্ছা করলে তা করতে পারো। হোটেলের সব সুযোগ-সুবিধা এখানে আছে। বার আছে, বল

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গাড়ি আছে, সাওয়ানা আছে। একটাই অসুবিধা, হোটেলটা ইউনিভার্সিটি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। তোমাকে বাসে যাতায়াত করতে হবে। এটা কোনো সমস্যা হবে না, হোটেল থেকে দু'ঘণ্টা পর পর ইউনিভার্সিটির বাস যায়। আমি কি বলছি বুঝতে পারছো তো?

ঃ পারছি।

ঃ তুমি এসেছো একটা অড টাইমে, স্প্রীং কোয়ার্টার শুরু হতে এখনো এগারো দিনের মতো বাকি। সামারের ছুটি চলছে। এই ক'দিন বিশ্রাম নাও। নতুন দেশের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতেও কিছু সময় লাগে। তাই না?

ঃ ইয়েস।

টয়লা ক্লেইন হেসে বললেন—ইয়েস এবং নো—এই দুটি শব্দ ছাড়াও তোমাকে আরো কিছু শব্দ শিখতে হবে। দুটি শব্দ সম্বল করে কথাবার্তা চালানো বেশ কঠিন।

তিনি আমাকে হোটেলের রিসিপশনে নিয়ে অতিক্রত কি সব বলতে লাগলেন ডেস্কে বসে থাকা পাথরের মতো মুখের মেয়েটিকে। সেইসব কথার এক বর্ণও আমি বুঝলাম না। বোঝার চেষ্টাও করলাম না। আমি তখন একটা দীর্ঘ বাক্য ইংরেজিতে তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। বাক্যটা বাংলায় এ রকম—মিসেস টয়লা ক্লেইন, আপনি যে এই ভোরবাতে আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে আনার জন্য নিজে গিয়েছেন এবং নিজে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

বাক্যটা মনে মনে যখন প্রায় গুছিয়ে এনেছি তখন টয়লা ক্লেইন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাই। বলেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আমার আর ধন্যবাদ দেয়া হলো না। এই মহিলার আচার-ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিলো উনি একজন অত্যন্ত কর্মঠ, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হাসিখুশি ধরনের মহিলা। পরে জানলাম ইনি একজন খুবই ইনএফিসিয়েন্ট মহিলা। তাঁর অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার জন্যে পরের বছরই তাঁর চাকরি চলে যায়।

হোটেল গ্রেভার ইনে আমার জীবন শুরু হলো।

তিনতলা একটা হোটেল। পুরোনো ধরনের বিল্ডিং। এর সবই পুরোনো, কার্পেট পুরোনো, ঘরের বাতাসে পর্যন্ত একশ' বছর আগের গন্ধ। আমেরিকানরা ট্রাডিশনের খুব ভক্ত এটা বলা ঠিক হবে না। তবে ডাকোটা কান্ট্রির অনেক জায়গাতেই দেখেছি ওয়াইল্ড ওয়েস্ট ধরে রাখার একটা চেষ্টা। পুরোনো হোটেলগুলোকে পুরোনো করেই রাখা হয়েছে। দেয়ালে বাইসনের বড় বড় শিং। যত্ন করে ঝুলানো আগের আমলের পাইপ গান, বারুদের থলে। মেঝেতে বিছানো ভারি কার্পেটের রঙ বিবর্ণ। আমেরিকানরা হয়তো বা এসব দেখে নষ্টালজিক হয়। আমি হলাম বিরক্ত। কোথায় এরা আমাকে এনে তুললো?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার ঘরটা দোতলায়। বিশাল ঘর। দুটো খাট পাশাপাশি বিছানো। ঘরের আসবাবপত্র কোনোটাই আমার মন কাড়লো না। তবে দেয়ালজোড়া পুরোনো কালের আয়নাটা অপূর্ব! যেন বাংলাদেশের দিঘির কালো জলকে ছানিয়ে আয়না বানিয়ে দেয়ালে সাজিয়ে রেখেছে। এ রকম চমৎকার আয়না এ যুগে তৈরি হয় কিনা আমি জানি না।

আমার পাশের ঘরে থাকেন নব্বুই বা এক শ' বছরের একজন বুড়ি। এই হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়াও বাইরের গেস্টরা ভাড়া দিয়ে থাকতে পারেন। লক্ষ্য করলাম গেস্টদের প্রায় সবাই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা শ্রেণীর। পরে জেনেছি, এদের অনেকেই জীবনের শেষের দিকে বছরের পর বছর হোটেলে কাটিয়ে দেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যে নির্মিত ওল্ডহোমগুলো তাঁদের পছন্দ নয়। ওল্ড হোমগুলোতে তাঁরা হসপিটাল হসপিটাল গন্ধ পান। লোকজনও ওল্ড হাউসগুলোকে দেখে করুণার চোখে, এর চেয়ে হোটেলই ভালো।

পাশের ঘরের বৃদ্ধার নাম মনে পড়ছে না—সুসিন বা সুজি জাতীয় কিছু হবে। দেখতে অবিকল পথের পাঁচালির সত্যজিতের ছবির ইন্দিরা ঠাকরুণের মতো। মাথার চুল সেই রকম ছোটছোট করে কাটা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শরীর। শুধু পরনে শতছিন্ন শাড়ির বদলে স্কার্ট, ঠোঁটে লিপস্টিক। এই বৃদ্ধা, হোটেলে ঢোকার এক ঘন্টার মধ্যে আমার দরজায় নক করলেন। দরজা খোলামাত্র বললেন, সুপ্রভাত! তোমার কাছে কি ভারতীয় মুদ্রা আছে?

ঃ না।

ঃ স্ট্যাম্প আছে?

ঃ না, তা-ও নেই।

ঃ ও আচ্ছা। আমি মুদ্রা এবং স্ট্যাম্প দুটোই জমাই। এটা আমার হবি।

বৃদ্ধা বিমর্ষ মুখে চলে গেলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই মহিলা জীবনের শেষ ক'টি দিন স্ট্যাম্প বা মুদ্রা জমিয়ে যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারলাম না। অন্য কোনো সঞ্চয় কি তাঁর জীবনে নেই? বৃদ্ধা চলে যাবার পর পরই হোটেলের লন্ড্রীর লোক ঢুকলো। কালো আমেরিকান। এর নাম জর্জ ওয়াশিংটন। নিগ্রোদের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের নাম অনুসারে নাম রাখার একটা প্রবণতা আছে। এই জর্জ ওয়াশিংটন সম্ভবত আমার গায়ের কৃষ্ণবর্ণের কারণে আমার প্রতি শুরুতেই গভীর মমতা দেখাতে শুরু করলো। গম্ভীর মুখে বললো, প্রথম এসেছো আমেরিকায়?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ পড়াশোনার জন্যে?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ নিজেদের দেশে পড়াশোনা হয় না যে এই পচা জায়গায় আসতে হয়?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি নিশ্চুপ। সে গলা নামিয়ে বলল, বুড়িগুলোর কাছ থেকে সাবধানে থাকবে, এরা বড় বিরক্ত করে। মোটেই পাত্তা দেবে না।

ঃ ঠিক আছে।

ঃ মদ্যপান করো?

ঃ না।

ঃ মাঝে-মধ্যে করতে পারো, এতে দোষের কিছু নেই। তবে মেয়েদের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। হুকার (বেশ্যা)-দের নিয়ে বিছানায় যাবে না— অসুখ-বিসুখ হবে। তাছাড়া হুকারদের বেশিরভাগই হচ্ছে চোর, টাকা-পয়সা, ঘড়ি এইসব নিয়ে পালিয়ে যাবে। হুকার কি করে চিনতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো।

ঃ আচ্ছা।

ঃ খাওয়া-দাওয়া কোথায় করবে? হোটেলে?

ঃ হুঁ।

ঃ খবরদার, এই হোটেলের রেস্টুরেন্টে খাবে না। রান্না কুৎসিত, দামও বেশি। দুই ব্লক পরে একটা হোটেল আছে, নাম—বীফ এন্ড বান।

ঃ বীফ এন্ড বান?

ঃ হ্যাঁ। ঐখানে খাবার ভালো, দামেও সস্তা।

ঃ তোমাকে ধন্যবাদ।

ঃ ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। বিয়ে করেছো?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বউয়ের ছবি আছে?

ঃ আছে।

ঃ দেখাও।

আমি ছবি বের করে দেখালাম। জর্জ ওয়াশিংটন নানা ভঙ্গিতে ছবি দেখে বলল— অপূর্ব সুন্দরী। তুমি অতি ভাগ্যবান।

আমেরিকানদের অনেক কুৎসিত অভ্যাসের পাশে-পাশে অনেক সুন্দর অভ্যাসও আছে। যার একটি হচ্ছে, ছবি দেখে মুগ্ধ হবার ভান করা। আমি লক্ষ্য করেছি, অতিসামান্য পরিচয়েও এরা বলে—ফ্যামিলি ছবি সঙ্গে আছে? দেখি কেমন?

ছবিতে যদি তারকা রাক্ষসীর মতো কোনো দাঁত বের করা মহিলাও থাকে, এরা বলবে, অপূর্ব! তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, লাকি ডগ।

এরা মানিব্যাগে ক্রেডিট কার্ডের পাশে নিজের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ছবি রাখে। এর কোন ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না বলেই আমার ধারণা। অবশ্যি স্ত্রী বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ছবিও বদলায়। নতুন স্ত্রীকে দিনের মধ্যে একশবার মধুর কণ্ঠে হানি ডাকে। সেই হানি এক সময় হেমলক হয়ে যায়, তখন খোঁজ পড়ে নতুন কোনো হানির। মানিব্যাগে আবার ছবি বদল হয়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সব ওয়াশিংটন চলে গেলো। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত একা একা নিজের ঘরে বসে রইলাম। কিছুই ভালো লাগে না। ঘরে চিঠি লেখার কাগজপত্র আছে। চিঠি লিখতে ইচ্ছে করলো না। সঙ্গে একটিমাত্র বাংলা বই—রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। ভেবেছিলাম কাবুলীওয়ালার জীবন গল্পগুলো পড়তে ভালো লাগবে। আমার প্রিয় গল্পের একটি পড়তে চেষ্টা করলাম—

. . . সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি এবং বউ বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড় যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা আপনি বলাবলি করিতেন, আহা দুটিতে বেশ মানায় . . .

আমার এতো প্রিয় গল্প অথচ পড়তে ভালো লাগলো না, ইচ্ছে হলো হোটেলের জানালা খুলে নিচে লাফিয়ে পড়ি।

রাতে খেতে গেলাম 'বীফ এন্ড বান' রেস্টুরেন্টে। আলো ঝলমল ছোটখাট একটা রেস্টুরেন্ট। বিমানবালাদের মতো পোশাকের তিনটি ফুটফুটে তরুণী খাবার দিচ্ছে। অর্ডার নিচ্ছে। মাঝে-মাঝে রসিকতা করছে। এদের চেহারা যেমন সুন্দর কথাবার্তাও তেমনি মিষ্টি। আমেরিকান সুন্দরীরা কেমন তা দেখতে হলে এদের বার রেস্টুরেন্টে উঁকি দিয়ে ওয়েট্রেসদের দেখতে হয়।

আমি কোণার দিকের একটা টেবিলে বসলাম। আমার পকেটে আছে মাত্র পনেরো ডলার। উনিশশো সাতাত্তর সালের কথা, তখন দেশের বাইরে কুড়ি ডলারের বেশি নেয়া যেতো না। আমি কুড়ি ডলার নিয়েই বের হয়েছিলাম। পথে লোভে পড়ে এক কার্টুন মার্লবোরো সিগারেট কিনে ফেলায় ডলারের সঞ্চয় কমে গেছে। মেনু দেখে আঁতকে উঠলাম। সব খাবারের দাম আট ডলার নয় ডলার। স্টেক জাতীয় খাবারগুলোর দাম আরো বেশি। বেছে-বেছে সবচে কমদামী একটা খাবারের অর্ডার দিলাম—ফ্রেঞ্চ টোস্ট। দামে সস্তা, তাছাড়া চেনা খাবার। ওয়েট্রেস অবাক হয়ে বললো, এটাই কি তোমার ডিনার? আমি বললাম, ইয়েস।

ঃ সঙ্গে আর কিছু নেবে না? কোল্ড ড্রিংক কিংবা কফি?

ঃ নো।

রাতের খাবার শেষ করে একা-একা হোটেলের লাউঞ্জে বসে রইলাম। লাউঞ্জ প্রায় ফাঁকা। এক কোণায় দুইজন বুড়োবুড়ি ঝিম মেরে বসে আছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে জীবনের বাকি দিনগুলো কী করে কাটাবে এরা এই নিয়েই চিন্তিত। ওদের চেয়ে আমি নিজেকে আলাদা করতে পারলাম না।

পাশের ঘরেই হোটেলের বার। সেখানে উদ্দাম গান হচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নারী-পুরুষ জড়াজড়ি করে নাচছে। গানের কথাগুলো পরিষ্কার নয়। একটি চরণ

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পাশ পাশ ফিরে ফিরে আসছে—**Whom do you want to love yea ? Yea** শব্দটির মানে কি কে জানে?

রাতে ঘুম এলো না ভয়ে—ভূতের ভয়।

এই ভূতের ভয়ের মূল কারণ, আমার ঘরে রাখা হোটেল গ্রেভার ইন সম্পর্কিত একটি তথ্য-পুস্তিকা। সেখানে আছে, এই পাথরের হোটেলটি কে প্রথম বানিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে তথ্য। বিখ্যাত ব্যক্তি কারা-কারা এই হোটেলে ছিলেন তাঁদের নাম-ধাম। সেই সব বিখ্যাত ব্যক্তির কাউকেই চিনতে পারলাম না, তবে এই হোটেলে একটি ভৌতিক কক্ষ আছে জেনে আঁতকে উঠলাম। রুম নম্বর ৩০৯-এ একজন অশরীরী মানুষ থাকেন বলে একশ বছরের জনশ্রুতি আছে। যিনি এখানে বাস করেন তাঁর নাম জন পাউল। পেশায় আইনজীবী ছিলেন। এই হোটেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরও হোটেলের মায়া কাটাতে পারেননি। পুস্তিকায় লেখা -- এই বিদেহী আত্মা অত্যন্ত শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের; কাউকে কিছুই বলেন না। গভীর রাতে পাইপ হাতে হোটেলের বারান্দা দিয়ে হেঁটে বেড়ান।

হোটেলের তিনশ নয় নম্বর কক্ষটিতে কোনো অতিথি রাখা হয় না। বছরের পর বছর এটা খালি থাকে, তবে রোজ পরিস্কার করা হয়। বিছানার চাদর বদলে দেয়া হয়। বাথরুমে নতুন সাবান, টুথপেস্ট দেয়া হয়। ঘরের সামনে একটা সাইনবোর্ড আছে, সেখানে লেখা—'মিঃ জন পাউলের ঘর। নীরবতা পালন করুন। জন পাউল নীরবতা পছন্দ করেন।'

পুরো ব্যাপারটা এক ধরনের রসিকতা কিংবা আমেরিকানদের ব্যবসা-কৌশলের একটা অংশ, তবু রাত যতোই বাড়তে লাগলো মনে হতে লাগলো এই বুঝি জন পাউল এসে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে বলবেন—তোমার কাছে কি আগুন আছে? আমার পাইপের আগুন নিভে গেছে।

এমনিতেই ভয়ে কাঠ হয়ে আছি, তার উপর পাশের ঘরের বৃদ্ধা বিচিত্র সব শব্দ করছেন—এই খকখক করে কাশছেন, এই চেয়ার ধরে টানাটানি করছেন, গানের সিকি অংশ শুনছেন, দরজা খুলে বেরুচ্ছেন আবার ঢুকছেন। শেষ রাতের দিকে মনে হলো দেশ-গাঁয়ের মেয়েদের মতো সুর করে বিলাপ শুরু করেছেন।

নিঃসঙ্গ মানুষদের অনেক ধরনের কষ্ট থাকে।

পুরোপুরি না ঘুমিয়ে কেউ রাত কাটাতে পারে না। শেষ রাতের দিকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ঘুম আসে। কিন্তু আমার এলো না। পুরো রাত চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলাম। ভোরবেলা আমার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল টেলিফোন করলো ওয়াশিংটন সিয়াটল থেকে। সে আমার আগে এদেশে এসেছে। পি-এইচ.ডি. করছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে। পরিস্কার লজিকের ঠাণ্ডা মাথার একটা ছেলে। ভাবালুতা কিংবা অস্থিরতার কিছুই তার মধ্যে নেই। জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণার ফাঁকে-ফাঁকে সে অসম্ভব সুন্দর কিছু লেখা লিখে ফেলেছে—কপোট্রনিক সুখ-দুঃখ, দীপু নাম্বার টু, হাত

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কাটা বর্ণন। প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছি, তবু বলার লোভ সামলাতে পারছি না। জাফর ইকবালের লেখা পড়লে ঈর্ষার সূক্ষ্ম খোঁচা অনুভব করি। এই ক্ষমতাবান প্রবাসী লেখক দেশে তাঁর যোগ্য সম্মান পেলেন না, এই দুঃখ আমার কোনোদিন যাবে না।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ইকবাল টেলিফোন করে খাস ময়মনসিংহের উচ্চারণে বললো—দাদাভাই কেমন আছো?

আমি বললাম, তুই আমার টেলিফোন নাম্বার কোথায় পেলি?

ঃ আমেরিকায় টেলিফোন নাম্বার পাওয়া কোন সমস্যা না। তুমি কেমন আছো বল?

ঃ তোর কাছে ডলার আছে?

ঃ তোমাকে একশ ডলারের একটা ড্রাফট পাঠিয়ে দিয়েছি। আজই পাবে।

ঃ একশ ডলারে হবে না। তুই আমাকে একটা টিকিট কেটে দে আমি দেশে চলে যাবো।

আমার কথায় সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। সহজ গলায় বললো, যেতে চাও কোনো অসুবিধা নেই টিকিট কেটে দেবো। কয়েকটা দিন যাক। একটু ঘুরে-ফিরে দেখো। এখানে বাংলাদেশী ছেলে নেই?

ঃ বাংলাদেশী ছেলের আমার কোনো দরকার নেই। তুই টিকিট কেটে পাঠা।

ঃ আচ্ছা পাঠাবো। তুমি কি পৌঁছার সংবাদ দেশে দিয়েছো? ভাবীকে চিঠি লিখেছো?

ঃ চিঠি লেখার দরকার কি আমি নিজেই তো যাচ্ছি।

ঃ তা ঠিক। তবু লিখে দাও। যেতে-যেতেও তো সময় লাগবে। আজই লিখে ফ্যালো। আর শোনো, তোমার যে খুব খারাপ লাগছে দেশে চলে যেতে চাচ্ছো এইসব না লিখলেই ভালো হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। ইকবাল বললো, রাতে তোমাকে আবার টেলিফোন করবো। আর আমি তোমাদের ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারকেও ফোন করে বলে দিচ্ছি যাতে তিনি বাংলাদেশী ছেলেদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করিয়ে দেন।

সেই সময় ফার্গো শহরে আর একজন মাত্র বাঙালী ছিলেন—সুফী সাহেব। তিনি এসেছেন এগ্রোনমিতে পি-এইচ-ডি করতে। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো রকম যোগাযোগ হলো না। দিনের বেলাটা ইউনিভার্সিটিতে খানিকক্ষণ ঘুরলাম। চারদিকে বড় বেশি ঝকঝকে, তকতকে। বড় বেশি গোছানো। বিশ্ববিদ্যালয় সামারের বন্ধ থাকলেও কিছু কিছু ক্লাস হচ্ছে। একটা ক্লাস রুমে উঁকি দিয়ে দেখি অনেক ছেলেমেয়ের হাতে কফির কাপ কিংবা কোল্ড ডিংকের বোতল। আরাম করে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনছে। পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ আছে। এক ধরনের কাছে বিদেশের সব কিছুই ভালো লাগে, অন্যদের কিছুই ভালো লাগে না। আমি দ্বিতীয় দলের। আমার কাছে কিছুই ভালো লাগে না। যা দেখি তাতেই বিরক্ত হই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রাতে আবার খেতে গেলাম বীফ এণ্ড বানে। সেই পুরাতন খাবার। ফ্রেঞ্চ টোস্ট। রুটিনটি হলো এ-রকম ঃ সকালবেলা ইউনিভার্সিটি এলাকায় যাই। একা একা হাঁটাহাঁটি করি—যা দেখি তাই খারাপ লাগে। সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরত আসি। রাতে খেতে যাই বীফ এন্ড বানে। ফ্রেঞ্চ টোস্টের অর্ডার দেই। অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। ডলারের অভাব এখন আর আমার নেই। ইউনিভার্সিটি আমাকে চারশ ডলার অগ্রিম দিয়েছে। সিয়াটল থেকে পাঠানো ছোট ভাইয়ের চেকটাও ভাঙিয়েছি। টাকার অভাব নেই। বীফ এন্ড বানে খাবারেরও অভাব নেই। কিন্তু কোনো খাবারই খেতে ইচ্ছা করে না। খেতে গেলেই চোখের সামনে ভাসে এক প্লেট ধবধবে সাদা ভাত—একটা বাটিতে সর্ষেবাটা দিয়ে রাঁধা ইলিশ। ছোট্ট পিরিচে কাঁচা লংকা, আধখান কাগজী লেবু। আমার প্রাণ হু-হু করে। ওয়েট্রেস যখন অর্ডার নিতে আসে, আমি বলি ফ্রেঞ্চ টোস্ট। সে অবাক হয়ে তাকায় । হয়তো ইতিমধ্যে এই রেস্টুরেন্টে আমার নামই হয়ে গেছে 'ফ্রেঞ্চ টোস্ট'। আমি লক্ষ্য করছি—আমাকে দেখলেই ওয়েট্রেসরা নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে এবং এক সময় এসে কোমল গলায় বলে, সে-ই খাবার?

আমি বলি, ইয়েস।

ছ'টি দীর্ঘ রজনী কেটে গেলো। তারপর চমৎকার একটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটলো। ঘটনাটা বিশদভাবে বলা দরকার। এই ঘটনা না ঘটলে হয়তো আমি আমেরিকায় থাকতে পারতাম না। সব ছেড়েছুঁড়ে চলে আসতাম।

যথারীতি রাতে খাবার খেতে গিয়েছি। ওয়েট্রেস অর্ডার নিতে আমার কাছে আর আসছে না। আমার কেন জানি মনে হলো দূর থেকে সবাই কৌতূহলী ভঙ্গিতে আমাকে দেখছে। ফিসফাস করছে। তাদের দোষ দিচ্ছি না। দিনের পর দিন ফ্রেঞ্চ টোস্ট খেয়ে-খেয়ে আমিই এই অবস্থাটা তৈরি করেছি। একা অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর অর্ডার নিতে একটি মেয়ে এলো। আমাকে অবাক করে দিয়ে বসলো আমার সামনের চেয়ারে। যে কথাগুলো সে আমাকে বললো তা শোনার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েটি নিচু গলায় বললো,

ঃ দ্যাখো আহামাদ, আমরা জানি তোমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। দিনের পর দিন তুমি একটা কুৎসিত খাবার মুখ বুঁজে খেয়ে যাচ্ছো। টাকা-পয়সার কষ্টের মতো কষ্ট তো আর কিছুই হতে পারে না। তবু বলছি, নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। দুঃসময় একদিন অবশ্যই কাটবে!

আমি একবার ভাবলাম বলি, তোমরা যা ভাবছো ব্যাপারটা সে রকম নয়। পরমুহূর্তেই মনে হলো—এটা বলার দরকার নেই। এটা বলা মানেই এদের ভালোবাসার অপমান করা। আমি তা হতে দিতে পারি না।

মেয়েটি বললো, আজ তোমার জন্যে আমরা ভালো একটা ডিনারের ব্যবস্থা করেছি। এর জন্যে তোমাকে কোনো পয়সা দিতে হবে না। তুমি আরাম করে খাও এবং মনে সাহস রাখো।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সে উঠে গিয়ে বিশাল ট্রে তে করে টি পোট স্টেক নিয়ে এলো। সঙ্গে নানান রকমের টুকিটাকি। কফি এলো, আইসক্রীম এলো। ওয়েট্রেসরা সবাই একবার করে দেখে গেলো আমি ঠিকমতো খাচ্ছি কিনা। আমি খুব আবেগপ্রবণ ছেলে, আমার চোখে পানি এসে গেলো। এরা এতো মমতা একজন অচেনা-অজানা ছেলের জন্যে রেখে দিয়েছিলো? মেয়েগুলো আমার চোখের জল দেখতে পেলেও ভান করলো যেন দেখতে পায়নি।

গভীর আনন্দ নিয়ে হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরে এলাম। রিসিপশনে বসে থাকা গোমরা মুখের মেয়েটাকে আজ অনেক ভালো লাগলো। আমি হাসিমুখে বললাম, হ্যালো।

সে-ও হাসিমুখে বললো, হ্যালো।

গ্রেভার ইন বার-এর উদ্দাম গান আজ শুনতে ভালো লাগলো। ইচ্ছে করলো ভেতরে ঢুকে খানিকক্ষণ শুনি।

আমার পাশের বৃদ্ধার ঘরে নক করে তাঁকে বললাম—আমার কাছে দুটো বাংলাদেশী মুদ্রা আছে তুমি কি নেবে?

অনেক রাতে স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসলাম! সেই চিঠিটা খুব অদ্ভুত ছিলো। কারণ চিঠিতে তুষারপাতের একটা বানানো বর্ণনা ছিলো। তুষারপাত না দেখেই আমি লিখলাম—আজ বাইরে খুব তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তাঘাট ঢেকে গেছে সাদা বরফে। সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি হোটেলের জানালার কাছে বসে-বসে লিখছি। তুমি পাশে থাকলে দুজন হাত ধরাধরি করে তুষারের মধ্যে দাঁড়াতাম।

যে তিনজন তরুণী আমেরিকা প্রসঙ্গে আমার ধারণাই বদলে দিলো আজ তাঁদের কথা গভীর মমতা ও গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করছি। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খন্ডে আজ আমরা বিভক্ত। কতো দেশ, কতো নাম—কিন্তু মানুষ একই আছে। আসছে লক্ষ বছরেও তা-ই থাকবে।



ডানবার হলের জীবন

নর্থ ডাকোটা ইউনিভার্সিটির ক্লাসগুলো যেখানে হয় তার নাম ডানবার হল। ডানবার হলের তেত্রিশ নম্বর কক্ষে ক্লাস শুরু হল। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্লাস। কোর্স নাম্বার ৫২৯।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কোর্স নাম্বারগুলি সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিয়ে নেই। টু হানড্রেড লেভেলের কোর্স হচ্ছে আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের নিচের দিকের ছাত্রদের জন্যে। থ্রী হানড্রেড লেভেল হচ্ছে আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের উপরের দিকের ছাত্রদের জন্যে। ফোর হানড্রেড এবং ফাইভ হানড্রেড লেভেল হচ্ছে গ্রাজুয়েট লেভেল।

ফাইভ হানড্রেড লেভেলের যে কোর্সটি আমি নিলাম সে সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প কিছু কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়েছি। একেবারে কিছুই যে জানি না তাও না। তবে এই বিষয়ে আমার বিদ্যা খুবই ভাসাভাসা। জলের উপর ওড়াউড়ি, জল স্পর্শ করা নয়।

একাডেমিক বিষয়ে নিজের মেধা এবং বুদ্ধির উপর আমার আস্থাও ছিল সীমাহীন। রসায়নের একটি বিষয় আমি পড়ে বুঝতে পারব না, তা হতেই পারে না।

আমাদের কোর্স কো-অর্ডিনেটর আমাকে বললেন, ফাইভ হানড্রেড লেভেলের এই কোর্সটি যে তুমি নিচ্ছ, ভুল করছ না তো? পারবে?

আমি বললাম, ইয়েস।

তখনো ইয়েস এবং নো-র বাইরে তেমন কিছু বলা রপ্ত হয়নি। কোর্স কো-অর্ডিনেটর বললেন, এই কোর্সে ঢুকবার আগে কিন্তু ফোর হানড্রেড লেভেলের কোর্স শেষ করনি। ভাল করে ভেবে দেখ, পারবে?

ঃ ইয়েস।

কোর্স কো-অর্ডিনেটরের মুখ দেখে মনে হল তিনি আমার ইয়েস শুনেও বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন না।

ক্লাস শুরু হল। ছাত্র সংখ্যা পনেরো। বিদেশী বলতে আমি এবং ইণ্ডিয়ান এক মেয়ে—কান্তা। ছাত্রদের মধ্যে একজন অন্ধ ছাত্রকে দেখে চমকে উঠলাম। সে তার ব্রেইলি টাইপ রাইটার নিয়ে এসেছে। ক্লাসে ঢুকেই সে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আমি বক্তৃতা টাইপ করব। খটখট শব্দ হবে, এ জন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমি হতভম্ব। অন্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে এটা আমি জানি। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু অন্ধ ছাত্র-ছাত্রী আছে, তবে তাদের বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা বা দর্শন। কিন্তু থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রিও যে কেউ পড়তে আসে আমার জানা ছিল না।

আমাদের কোর্স টিচারের নাম, মার্ক গর্ডন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মস্তান লোক। থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রির লোকজন তাঁর নাম শুনলে চোখ কপালে তুলে ফেলে। তাঁর খ্যাতি প্রবাদের পর্যায়ে চলে গেছে।

লোকটি অসম্ভব রোগা এবং তালগাছের মত লম্বা। মুখ ভর্তি প্রকাণ্ড গোঁফ। ইউনিভার্সিটিতে আসেন ভালুকের মত বড় একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি যখন ক্লাসে যান কুকুরটা তাঁর চেয়ারে পা তুলে বসে থাকে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] ক্লাসে ঢুকলেন একগাদা টি শার্ট গায়ে দিয়ে। সেই টি শার্টে যা লেখা, তার বঙ্গানুবাদ হল, সুন্দরী মেয়েরা আমাকে ভালবাসা দাও।

ক্লাসে ঢুকেই সবার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। সবাই বসে বসে উত্তর দিল। একমাত্র আমি দাঁড়িয়ে জবাব দিলাম। মার্ক গর্ডন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন? বসে কথা বলতে কি তোমার অসুবিধা হয়?

আমি জবাব দেবার আগেই কান্তা বলল, এটা হচ্ছে ভারতীয় ভদ্রতা।

মার্ক গর্ডন বললেন, হুমায়ূন তুমি কি ভারতীয়?

ঃ না। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি।

ঃ ও আচ্ছা, আচ্ছা। বাংলাদেশ। বস। এর পর থেকে বসে বসে কথা বলবে।

আমি বসলাম। মানুষটাকে ভাল লাগল এই কারণে যে সে শুদ্ধভাবে আমার নাম উচ্চারণ করেছে। অধিকাংশ আমেরিকান যা পারে না কিংবা শুদ্ধ উচ্চারণের চেষ্টা করে না। আমাকে যে সব নামে ডাকা হয় তার কয়েকটি হচ্ছে ঃ হামায়ান, হিউমেন, হেমীন।

মার্ক গর্ডন টেবিলে পা তুলে বসলেন এবং বললেন, ক্লাস শুরু করার আগে একটা জোক বলা যাক। আমি আবার ডার্টি জোক ছাড়া অন্য কিছু জানি না। যারা ডার্টি জোক শুনতে চাও না, তারা দয়া করে কান বন্ধ করে ফেল।

গল্পটি হচ্ছে এক ফরাসী তরুণীকে নিয়ে যার একটি স্তন বড় অন্যটি ছোট। বিয়ের রাতে তার স্বামী . . .

গল্পটি চমৎকার, তবে এ দেশে তা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব না বলে শুধু শুরুটা বললাম। গল্প শেষ হবার পর হাসি থামতে পাঁচ মিনিটের মত লাগল। শুধু কান্তা হাসল না, মুখ লাল করে বসে রইল। যেন পুরো রসিকতাটা তাকে নিয়েই করা হয়েছে।

মার্ক গর্ডন লেকচার শুরু করলেন। ক্লাসের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। বক্তৃতার শেষে তিনি বললেন, সহজ ব্যাপারগুলি নিয়ে আজ কথা বললাম, প্রথম ক্লাস তো তাই।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কিছু বুঝতে পারিনি। তিনি ব্যবহার করছেন গ্রুপ থিওরী, যে গ্রুপ থিওরীর আমি কিছুই জানি না!

আমি আমার পাশে বসে থাকা আমেরিকান ছাত্রটিকে বললাম, তুমি কি কিছু বুঝতে পারলে?

সে বিস্মিত হয়ে বলল, কেন বুঝব না, এসব তো খুবই এলিমেন্টারি ব্যাপার। এক সপ্তাহ চলে গেল। ক্লাসে যাই, মার্ক গর্ডনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিছু বুঝতে পারি না। নিজের মেধা এবং বুদ্ধির উপর যে আস্থা ছিল তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল! কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর প্রচুর বই জোগাড় করলাম। রাতদিন পড়ি। কোন লাভ হয় না। এই জিনিস বোঝার জন্য ক্যালকুলাসের যে জ্ঞান দরকার তা আমার নেই। আমার ইনসমনিয়ার মত হয়ে গেল। ঘুমুতে পারি না। গ্রেভার ইনের লবিতে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি। মনে মনে বলি—কী সর্বনাশ!

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার পাশের ঘরের বৃদ্ধা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, তোমার কি হয়েছে বল তো? তুমি কি অসুস্থ? স্ত্রীর চিঠি পাচ্ছ না?

দেখতে দেখতে মিড-টার্ম পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার পর পর যে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে তা ভেবে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাবার জোগাড় হল। মার্ক গর্ডন যখন দেখবে বাংলাদেশের এই ছেলে পরীক্ষার খাতায় কিছুই লেখেনি তখন তিনি কি ভাববেন? ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানই বা কী ভাববেন?

এই চেয়ারম্যানকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সভাপতি প্রফেসর আলি নওয়াব আমার প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে লিখেছেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ যে অল্প সংখ্যক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র তৈরি করেছে, হুমায়ূন আহমেদ তাদের অন্যতম।

অসাধারণ মেধাবী ছাত্রটি যখন শূন্য পাবে তখন কী হবে? রাতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

মিড-টার্ম পরীক্ষায় বসলাম। সব মিলিয়ে দশটি প্রশ্ন।

এক ঘন্টা সময়ে প্রতিটির উত্তর করতে হবে। আমি দেখলাম একটি প্রশ্নের অংশবিশেষের উত্তর আমি জানি, আর কিছুই জানি না। অংশবিশেষের উত্তর লেখার কোন মানে হয় না। আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। এক ঘন্টা পর সাদা খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে এলাম।

পরদিনই রেজাল্ট হল। এ-তো আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় যে পনেরোটি খাতা দেখতে পনেরো মাস লাগবে।

তিনজন এ পেয়েছে। ছ'জন বি। বাকি সব সি। বাংলাদেশের হুমায়ূন আহমেদ পেয়েছে শূন্য। সবচে বেশি নম্বর পেয়েছে অঙ্ক ছাত্রটি। [এ ছেলেটির নাম আমার মনে পড়ছে না। তার নামটা মনে রাখা উচিত ছিল।]

মার্ক গর্ডন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বিস্মিত গলায় বললেন, ব্যাপারটা কী বল তো?

আমি বললাম, কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আমার কোন ব্যাকগ্রাউণ্ড ছিল না। এই হায়ার লেভেলের কোর্স আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঃ বুঝতে পারছ না তাহলে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? ঝুলে থাকার মানে কি?

ঃ আমি ছাড়তে চাই না।

ঃ তুমি বোকামি করছ। তোমার গ্রেড যদি খারাপ হয়, যদি গড় গ্রেড সি চলে আসে তাহলে তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হবে। গ্রাজুয়েট কোর্সের এ-ই নিয়ম।

ঃ এই নিয়ম আমি জানি।

ঃ তেমনও তুমি এই কোর্সটা চালিয়ে যাবে?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তুমি খুবই নির্বোধের মত কথা বলছ।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

: হয়ত বলছি। কিন্তু আমি কোর্সটা ছাড়ব না।

: কারণটা বল।

: একজন অন্ধ ছাত্র যদি এই কোর্সে সবচে বেশি নম্বর পেতে পারে আমি পারব না কেন? আমার তো চোখ আছে।

তুমি আবারো নির্বোধের মত কথা বলছ। সে অন্ধ হতে পারে কিন্তু তার এই বিষয়ে আগের ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে। সে আগের কোর্স সবগুলি করেছে। তুমি করনি। তুমি আমার উপদেশ শোন। এই কোর্স ছেড়ে দাও।

ঃ না।

আমি ছাড়লাম না। নিজে নিজে অংক শিখলাম। গ্রুপ থিওরী শিখলাম, অপারেটর এলজেব্রা শিখলাম। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই এই প্রবাদটি সম্ভবত ভুল নয়। এক সময় অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স বুঝতে শুরু করেছি।

ফাইন্যাল পরীক্ষায় যখন বসলাম তখন আমি জানি আমাকে আটকানোর কোন পথ নেই। পরীক্ষা হয়ে গেল। পরদিন মার্ক গর্ডন একটি চিঠি লিখে আমার মেইল বক্সে রেখে দিলেন। টাইপ করা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ

—তুমি যদি আমার সঙ্গে থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে কাজ কর তাহলে আমি আনন্দিত হব এবং তোমার জন্যে আমি একটি ফেলোশীপ ব্যবস্থা করে দেব। তোমাকে আর কষ্ট করে টিচিং অ্যাসিসটেন্টশীপ করতে হবে না।

একটি পরীক্ষা দিয়েই আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত হয়ে গেলাম। বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিজের উদ্যোগে ব্যবস্থা করে দিলেন যেন আমি আমার স্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে আসতে পারি।

পরীক্ষায় কত পেয়েছিলাম তা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। পাঠক-পাঠিকারা আমার এই লোভ ক্ষমার চোখে দেখবেন বলে আশা করি! আমি পেয়েছিলাম ১০০তে ১০০।

বর্তমানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি পড়াই। ক্লাসের শুরুতে ছাত্রদের এই গল্পটি বলি। শ্রদ্ধা নিবেদন করি ঐ অন্ধ ছাত্রটির প্রতি, যার কারণে আমার পক্ষে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।

আরেকটি কথা, আমি কিন্তু মার্ক গর্ডনের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হইনি। এই বিষয়টি নিয়ে আর কষ্ট করতে ইচ্ছা করছিল না, তাছাড়া আমার খানিকটা কুকুর-ভীতি আছে। মার্ক গর্ডনের ভালুকের মত কুকুরটিকে পাশে নিয়ে কাজ করার প্রশ্নই উঠে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



ভোর চারটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল, অসময়ে টেলিফোন মানেই রিসিভার না নেয়া পর্যন্ত বুক ধড়ফর। নির্ঘাৎ বাংলাদেশের কল। একগাদা টাকা খরচ করে কেউ যখন বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় কল করে তখন ঘটনা খারাপ ধরেই নিতে হবে। নিশ্চয়ই কেউ মারা-টারা গেছে।

তিনবার রিং হবার পর আমি রিসিভার তুলে ভয়ে ভয়ে বললাম, হ্যালো।

ওপার থেকে ভারী গলা শোনা গেল, হুমায়ূন ভাই, খিচুড়ি কি করে রান্না করতে হয় জানেন?

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। টেলিফোন করেছে মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির মিজানুল হক। সেখানকার একমাত্র বাঙালি ছাত্র। অ্যাকাউন্টিং-এ আণ্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স করছে।

ঃ হ্যালো হুমায়ূন ভাই, কথা বলছেন না কেন? খিচুড়ি কী করে রান্না করতে হয় জানেন?

ঃ না।

ঃ তাহলে তো বিগ প্রবলেম হয়ে গেল।

আমি চুপ করে রইলাম। মিজানুল হক হড়বড় করে বলল, কাচ্চি বিরিয়ানির প্রিপারেশন জানা আছে?

আমি শীতল গলায় বললাম, ক'টা বাজে জান?

ঃ ক'টা?

ঃ রাত চারটা।

ঃ বলেন কি? এত রাত হয়ে গেছে? সর্বনাশ!

ঃ করছিলে কি তুমি?

ঃ বাংলাদেশের ম্যাপ বানাচ্ছি। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন হুমায়ূন ভাই। সকালে টেলিফোন করব, বিরাট সমস্যায় পড়েছি।

মিজানুল হক খট করে টেলিফোন রেখে দিল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। পার্কোলেটরে কফি বসিয়ে দিলাম। আমার ঘুমাবার চেষ্টা করা বৃথা। মিজানুল হকের মাথার ঠিক নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার টেলিফোন করবে। অন্য কোন খাবারের রেসিপি জানতে চাইবে।

এ ব্যাপারটা গত তিনদিন ধরে চলছে। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে অন্যান্য দেশের সঙ্গে উদযাপিত হবে 'বাংলাদেশ নাইট'। এই অঞ্চলে বাংলাদেশের একমাত্র ছাত্র হচ্ছে মিজান, আর আমি আছি নং

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ফ্লাকাটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে মিজানের একমাত্র পরামর্শদাতা। আশপাশে সাতশ মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় বাঙালি নেই।

কফির পেয়ালা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মিজানের টেলিফোন

ঃ হ্যালো, হুমায়ূন ভাই?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ প্ল্যান-প্রোগ্রাম নিয়ে আপনার সঙ্গে আরেকবার বসা দরকার।

ঃ এখনো তো দেরি আছে।

ঃ দেরি আপনি কোথায় দেখলেন? এক সপ্তাহ মাত্র। শালাদের একটা ভেলকি দেখিয়ে দেব বাংলাদেশ বললে চিনতে পারে না, হা-করে তাকিয়ে থাকে। ইচ্ছা করে চড় মেরে মুখ বন্ধ করে দেই। এইবার শালারা বুঝবে বাংলাদেশ কি জিনিস। ঠিক না হুমায়ূন ভাই?

ঃ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

ঃ শালাদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে দেখবেন। আমি আপনার এখানে চলে আসছি।

মিজান টেলিফোন নামিয়ে রাখলো। আমি আরেকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। এই ছেলেটিকে আমি খুবই পছন্দ করি। তার সমস্যা একটাই, সারাক্ষণ মুখে— বাংলাদেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন একটা খোলার চেষ্টা করেছিল। একজন ছাত্র থাকলে এসোসিয়েশন হয় না বলে সেই চেষ্টা সফল হয়নি। অন্য স্টেট থেকে বাংলাদেশী ছাত্র আনার চেষ্টাও করেছে, লাভ হয়নি। এই প্রচণ্ড শীতের দেশে কেউ আসতে চায় না। শীতের সময় এখানকার তাপমাত্রা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রী নিচে নেমে যায়, কে আসবে এই রকম ভয়াবহ ঠাণ্ডা একটা জায়গায়?

মিজান এই ব্যাপারে বেশ মনমরা হয়েছিল। বাংলাদেশ নাইট-এর ব্যাপারটা এসে পড়ায় সেই দুঃখ খানিকটা কমেছে। এই বাংলাদেশ নাইট নিয়েও বিরাট কাণ্ড। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার মিজানকে বলল, তুমি এক কাজ কর—তুমি বাংলাদেশ নাইট পাকিস্তানীদের সঙ্গে কর।

মিজান হুংকার দিয়ে বলল, কেন?

ঃ এতে তোমার সুবিধা হবে। ডবল ডেকোরেশন হবে না। এক খরচায় হয়ে যাবে। তুমি একা মানুষ।

ঃ তোমার এত বড় সাহস, তুমি পাকিস্তানীদের সঙ্গে আমাকে বাংলাদেশ নাইট করতে বলছ? তুমি কি জান, ওরা কী করেছে? তুমি কি জান ওরা আমাদের কতজনকে মেরেছে? তুমি কি জান ...?

ঃ কী মুশকিল—তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?

ঃ তুমি আজেবাজে কথা বলবে, তুমি আমার দেশকে অপমান করবে, আর আমি তোমার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলব?

মিজান, ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারের সামনের টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল। টেবিলে রাখা কফির পেয়ালা উল্টে পড়ল। লোকজন ছুটে এল। প্রচণ্ড হৈচৈ।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এরকম মাথা গরম একটা ছেলেকে সব সময় সামলে-সুমলে রাখা মুশকিল। তবে ভরসা একটাই—সে আমাকে প্রায় দেবতার পর্যায়ে ফেলে রেখেছে। তার ধারণা আমার মতো জ্ঞানী-গুণী মানুষ শতাব্দীতে এক-আধটা জন্মায়। আমি যা বলি, শোনে।

মিজান তার ভাঙা মরিস মাইনর নিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে এল। সঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাপ নিয়ে এসেছে। সেই ম্যাপ দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। যে ক'টা রঙ পাওয়া গেছে সব ক'টাই সে লাগিয়েছে।

ঃ জিনিসটা দাঁড়িয়েছে কেমন বলুন তো?

ঃ রঙ একটু বেশি হয়ে গেল না?

ঃ ওরা রঙ-চঙ একটু বেশি পছন্দ করে হুমায়ূন ভাই।

ঃ তাহলে ঠিকই আছে।

ঃ এখন আসুন প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলা যাক। বাংলাদেশী খাবারের নমুনা হিসাবে খিচুড়ি খাওয়ানো হবে। খিচুড়ির শেষে দেওয়া হবে পান-সুপারি।

ঃ পান-সুপারি পাবে কোথায়?

ঃ শিকাগো থেকে আসবে। ইণ্ডিয়ান সপ আছে—ওরা পাঠাবে। ডলার পাঠিয়ে চিঠি দিয়ে দিয়েছি।

ঃ খুব ভালো।

ঃ দেশ সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেয়া হবে। বক্তৃতার শেষে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। সবার শেষে জাতীয় সঙ্গীত।

ঃ জাতীয় সঙ্গীত গাইবে কে?

ঃ কেন, আমি আর আপনি।

ঃ তুমি পাগল হয়েছ? জীবনে আমি কোনদিন গান গাইনি।

ঃ আর আমি বুঝি হেমন্ত? এইসব চলবে না, হুমায়ূন ভাই। আসুন, গানটা একবার প্র্যাকটিস করি।

ঃ মিজান, মরে গেলেও তুমি আমাকে দিয়ে গান গাওয়াতে পারবে না। তাছাড়া এই গানটার আমি কথা জানি না, সুর জানি না।

ঃ কথা সুর তো আমিও জানি না হুমায়ূন ভাই। চিন্তা নেই, একটা ব্যবস্থা হবেই।

উৎসবের দিন ভোর বেলাতে আমরা প্রকাণ্ড সসপ্যানে খিচুড়ি বসিয়ে দিলাম। চাল, ডাল, আনাজপাতি সেদ্ধ হচ্ছে। দুটো মুরগি কুচি কুচি করে ছেড়ে দেয়া হল। এক পাউণ্ডের মত কিমা ছিল তাও ঢেলে দিলাম। যত ধরনের গরম মসলা ছিল সবই দিয়ে দিলাম। জ্বাল হতে থাকল।

মিজান বলল, খিচুড়ির আসল রহস্য হল মিক্সিং-এ। আপনি ভয় করবেন না। জিনিস ভালই দাঁড়াবে।

সে একটা খুন্তি দিয়ে প্রবল বেগে নাড়াতে শুরু করল। ঘন্টা দুয়েক পর যা দাঁড়াল তা দেখে বুকে কাঁপন লাগে। ঘন সিরাপের মত একটা তরল পদার্থ। উপরে আবার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মুখের পানের মত হয়ে পড়েছে। জিনিসটার রঙ দাঁড়িয়েছে ঘন কৃষ্ণ। মিজান শুকনো গলায় বলল, কালো হল কেন বলুন তো হুমায়ূন ভাই। কালো রঙের কিছুই তো দেইনি।

আমি সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। মিজান বলল টমেটো পেস্ট দিয়ে দেখব নাকি?

X দাও।

টমেটো পেস্ট দেয়ায় রঙ আরো কালচে মেরে গেল। মিজান বলল, লাল রঙের ফুড কালার কিনে এনে ছেড়ে দেব?

X দাও।

তাও দেয়া হল। এতে কালো রঙের কোন হেরফের হলো না। তবে মাঝে মাঝে লাল রঙ ঝিলিক দিতে লাগলো। দুজনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। জাতীয় সঙ্গীতেরও কোন ব্যবস্থা হল না। মিজানের গানের গলা আমার চেয়েও খারাপ। যখন গান ধরে মনে হয় গলায় সর্দি নিয়ে পাতিহাঁস ডাকছে। শিকাগো থেকে পানও এসে পৌঁছল না।

অনুষ্ঠান সন্ধ্যায়। বিকেলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হলো। অবাক হয়ে দেখি দূর দূর থেকে গাড়ি নিয়ে বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করেছে। শুনলাম মিজান নাকি আশপাশের যত ইউনিভার্সিটি আছে সব ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশ নাইটের খবর দিয়ে চিঠি দিয়েছিল। দেড় হাজার মাইল দূরে মন্টানো স্টেট ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে একটি মেয়ে গ্রে হাউণ্ড বাসে করে একা একা চলে এসেছে। মিনেসোটা থেকে এসেছে দশজনের একটা বিরাট দল। তারা সঙ্গে নানান রকম পিঠা নিয়ে এসেছে। গ্রাণ্ড ফোর্কস্ থেকে এসেছেন করিম সাহেব, তাঁর ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী। এই অসম্ভব কর্মঠ মহিলাটি এসেই আমাদের খিচুড়ি ফেলে দিয়ে নতুন খিচুড়ি বসালেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে সাউথ ডাকোটার ফল্‌স্ স্প্রিং থেকে একদল ছেলেমেয়ে এসে উপস্থিত হল।

মিজান আনন্দে লাফাবে না চেঁচাবে কিছুই বুঝতে পারছে না। চুপচাপ বসে আছে, মাঝে মাঝে গম্ভীর গলায় বলছে —দেখ শালা বাংলাদেশ কী জিনিস। শালা দেখে যা।

অনুষ্ঠান শুরু হল দেশাত্মবোধক গান দিয়ে।

—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি . . .।

অন্যান্য স্টেট থেকে মেয়েরা যারা এসেছে তারাই শুধু গাইছে। এত সুন্দর গাইছে। এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে গান শুনে দেশের জন্যে আমার বুক হু-হু করতে লাগল। চোখে জল এসে গেল। কেউ যেন তা দেখতে না পায় সে জন্যে মাথা নিচু করে বসে রইলাম।

পরদিন ফার্গো ফোরম পত্রিকায় 'বাংলাদেশ নাইট' সম্পর্কে একটা খবর ছাপা হল। খবরের অংশবিশেষ এ রকম—একটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ জাতির অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় দেশের গান দিয়ে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, গান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশী ছেলেমেয়েরা সব কাঁদতে শুরু করল। আমি আমার দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতা-জীবনে এমন মধুর দৃশ্য দেখিনি . . .।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কিসিং বুথ

আমেরিকানদের বিচিত্র কাণ্ডকারখানার গল্প বলার সময় কিসিং বুথের গল্পটা আমি খুব আগ্রহ করে বলি। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শোনে। যুবক বয়েসীরা গল্প শেষ হবার পর মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হয়ত-বা ভাবে, আহা তারা কী সুখেই না আছে!

গল্পটা বলা যাক।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে "হোম কামিং" বলে একটি উৎসব হয়। এই উৎসবে আনন্দ মিছিল হয়, হৈচৈ গান-বাজনা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচে সুন্দরী ছাত্রীটিকে হোম কামিং কুইন নির্বাচিত করা হয়। এই হোম কামিং রানীকে ঘিরে সারাদিন ধরে চলে আনন্দ-উল্লাস।

আমার আমেরিকাবাসের প্রথম বর্ষে হোম কামিং কুইন হল আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ক্লাসের এক ছাত্রী। স্পেনীশ আমেরিকান, রূপ ফেটে পড়ছে। কিছুক্ষণ এই মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলে বুকের মধ্যে এক ধরনের হাহাকার জমে উঠতে থাকে, জগৎ-সংসার তুচ্ছ বোধ হয়। সম্ভবত এই শ্রেণীর রূপবতীদের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে, মুনীগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।

মেয়েটিকে নিয়ে ভোর এগারোটার দিকে একটা মিছিল বের হল। আমার ইচ্ছা করল মিছিলে ভীড়ে যাই। শেষ পর্যন্ত লজ্জা লংগল ল্যাবরেটরিতে চলে এলাম। অনেকগুলি স্যাম্পল জমা হয়েছে। এদের এক্স-রে ডিফ্রেকশান প্যাটার্ন জানাতে হবে। ডিফ্রেকশান মেশিনটা ভাল কাজ করছে না। ছবি পরিষ্কার আসছে না। দুপুর একটা পর্যন্ত কাজ করলাম। ঠিক করে রাখলাম লাঞ্চ সারার জন্যে আধ ঘন্টার বিরতি দেব।

মেমোরিয়াল ইউনিয়নে লাঞ্চ খেতে গিয়েছি। লক্ষ্য করলাম, মেমোরিয়াল ইউনিয়নের দোতলায় অস্বাভাবিক ভীড়। কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলাম।

জটলা আমাদের হোম কামিং কুইনকে ঘিরেই। এই রূপবতী বড় বড় পোস্টার সাজাচ্ছে। পোস্টারগুলিতে লেখা ঃ নীল তিমিরা আজ বিপন্ন। নীল তিমিদের বাঁচান।

জানা গেল এই হোম কামিং কুইন—নীল তিমিদের বাঁচাও—সংঘের একজন কর্মী। সে আজ নীল তিমিদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবে।

নীল তিমিদের ব্যাপারে আমি তেমন কোন আগ্রহ বোধ করলাম না। মানুষই যেখানে বিপন্ন সেখানে নীল তিমি নিয়ে লাফালাফি করার কোন অর্থ হয় না। তবু দাঁড়িয়ে আছি। রূপবতী মেয়েটির আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি দেখতে ভাল লাগছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খানে লেখা কলেজ, ওয়েবসাইট এ ধরনের লেখা তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে লাল কালিতে ঠোঁটের ছবি এঁকে নিচে লেখা হল "কিসিং বুথ" চুম্বন কক্ষ। তার নিচে লেখা চুমু খাবার নিয়মকানুন।

(১) জড়িয়ে ধরবেন না, মুখ বাড়িয়ে চুমু খান।

(২) চুমু খাবার সময় খুবই সংক্ষিপ্ত।

(৩) প্রতিটি চুমু এক ডলার।

(৪) চেক গ্রহণ করা হবে না। ক্যাশ দিতে হবে।

(৫) বড় নোট গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যাপারটা কী কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার পাশে দাঁড়ানো আমেরিকান ছাত্র বুঝিয়ে দিল।

হোম কামিং কুইন কিসিং বুথে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্যরা তাকে চুমু খাবে এবং প্রতিটি চুমুতে এক ডলার করে দেবে। সেই ডলার চলে যাবে 'নীল তিমি বাঁচাও' ফাণ্ডে।

আমি হতভম্ব।

প্রথমে মনে হল পুরো ব্যাপারটাই হয়ত এক ধরনের রসিকতা। আমেরিকানরা রসিকতা পছন্দ করে। এটাও বোধ হয় মজার রসিকতা।

দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই রসিকতা নয়। মেয়েটি কিসিং বুথে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে লাইন। এক একজন এগিয়ে আসছে, ডলার দিচ্ছে, মেয়েটিকে চুমু খেয়ে সরে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় জন। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি।

মেয়েটির মুখ হাসি হাসি। তার নীল চোখ ঝকমক করছে। যেন পুরো ব্যাপারটায় সে খুবই আনন্দ পাচ্ছে। আনন্দ ছেলেরাও পাচ্ছে। একজনকে দেখলাম দশ ডলারের একটা নোট দিয়ে পর পর দশবার চুমু খেল। এতেও তার স্বাদ মিটল না। মানি ব্যাগ খুলে বিশ ডলারের আরেকটি নোট বের করে উঁচু করে সবাইকে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাত তালি, যার মানে – চালিয়ে যাও।

ইউনিভার্সিটির শেখর, ঝাড়ুদার এরাও ডলার নিয়ে এগিয়ে এল। এরা বেশ গম্ভীর। যেন কোন পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে। চুমু খেল খুবই শালীন ভঙ্গিতে— মন্দিরের দেবীমূর্তিকে চুমু খাবার ব্যবস্থা থাকলে হয়ত এভাবেই খাওয়া হত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতীয় ছাত্ররা চলে এল। এরা চুমু খাবার লাইনে দাঁড়াল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকাতে লাগল। এ ওকে ঠেলাঠেলি করছে। কেউ যেতে চাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত একজন এগিয়ে এল, এর নাম উমেশ। বোম্বের ছেলে। মানুষ যে বানর থেকে এসেছে এটা উমেশকে দেখলেই বোঝা যায়। তার জন্যে ডারউইনের বই পড়তে হয় না। উমেশ চুমু খাবার পর পরই অন্য ভারতীয়দের লজ্জা ভেঙে গেল। তারাও লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ল্যাবরেটরিতে চলে এলাম। আমার প্রফেসর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই এক্স-রের কাজ কী হচ্ছে তার খোঁজ নিতে এলেন। ডিফ্রেকশান প্যাটার্ন দেখতে দেখতে বললেন, তুমি কি ঐ মেয়েটিকে চুমু খেয়েছ?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, না।

ঃ না কেন? মাত্র এক ডলারে এমন রূপবতী একটি মেয়েকে চুমু খাবার সুযোগ নষ্ট করা কি উচিত?

আমি বললাম, এভাবে চুমু খাওয়াটা আমাদের দেশের নীতিমালায় বাধা আছে।

ঃ বাধা কেন? চুমু হচ্ছে ভালবাসার প্রকাশ। তুমি যদি তোমার শিশুকন্যাকে প্রকাশ্যে চুমু খেতে পার তাহলে একটি তরুণীকে চুমু খেতে পারবে না কেন? মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ভালবাসা।

আমি বললাম, এই মেয়েটির ব্যাপারে তো ভালবাসার প্রশ্ন আসছে না।

তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, আসবে না কেন? এই মেয়েটিকে তুমি হয়ত ভালবাসছ না, কিন্তু তার রূপকে তুমি ভালবাসছ। বিউটি ইজ ট্রুথ। তাই নয় কি?

আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, একটি নির্জন দ্বীপে যদি তোমাকে ঐ মেয়েটির সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হত তাহলে তুমি কী করতে? চুপ করে বসে থাকতে?

আমি নিচু গলায় বললাম, মুনীগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।

অধ্যাপক বিরক্ত গলায় বললেন, এর মানে কি?

আমি ইংরেজীতে তাঁকে ব্যাখ্যা করে দিলাম। অধ্যাপক পরম প্রীত হলেন।

আমি বললাম, তুমি কি চুমু খেয়ে এসেছ?

ঃ না। এখন ভীড় বেশি। ভীড়টা কমলেই যাব।

বিকেল চারটায় এক্স-রে টেকনিশিয়ান ছুটে এসে বলল, বসে আছো কেন? এক্ষুনি মেমোরিয়েল ইউনিয়নে চলে যাও কুইক। কুইক।

ঃ কেন?

ঃ চারটা থেকে চারটা ত্রিশ, এই আধঘন্টার জন্যে চুমুর দাম কমানো হয়েছে। এই আধঘন্টার জন্যে ডলারে দুটো করে চুমু।

টেকনিশিয়ান যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিল তেমনি ঝড়ের গতিতেই চলে গেল। আমি গেলাম দেখতে। লাইন এখনও আছে। লাইনের শুরুতেই উমেশকে দেখা গেল। সে মনে হয় লাইনে লাইনেই আজকের দিনটা কাটিয়ে দিচ্ছে। আমার প্রফেসরকেও দেখলাম। এক ডলারের একটা নোট হাতে দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে দেখে হাত ইশারা করে ডাকলেন।

গল্পটা আমি এই জায়গাতে শেষ করে দেই। শ্রোতারা ব্যাকুল হয়ে জানতে চায়, আপনি কি করলেন? দাঁড়ালেন লাইনে?

আমি তাদের বলি, আমি লাইনে দাঁড়ালাম কি দাঁড়ালাম না, তা মূল গল্পের জন্যে অনাবশ্যক।

ঃ অনাবশ্যক হোক আর না হোক, আপনি দাঁড়ালেন কি না বলুন?

আমি কিছুই বলি না। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসি। যে হাসির দু'রকম অর্থই হতে পারে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



প্রথম তুষারপাত

ভিসকোমিটারটা ঠিকমত কাজ করছিল না। একেক সময় একেক রকম রিডিং দিচ্ছে। আমার সঙ্গে কাজ করে পাল রেইমেন। ভিসকোমিটার কাজ করছে না শুনে সে কোত্থেকে লম্বা একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে এল এবং পটপট করে ভিসকোমিটারের সব অংশ খুলে ফেলল। আমি মনে মনে বললাম, বাহ্ বেশ ওস্তাদ ছেলে তো। এত জটিল যন্ত্র অথচ কী অবলীলায় খুলে ফেলল।

আমি বললাম, পল! তুমি কি এই যন্ত্র সম্পর্কে কিছু জান?

পল বলল, না!

আমি অবাক হয়ে বললাম, জান না তাহলে এটা খুলে ফেললে যে?

ঃ দেখি ব্যাপারটা কী?

পল ভিসকোমিটারের স্প্রীং খুলে বের করে আনল এবং দু'হাতে কিছুক্ষণ টানাটানি করে বলল—এটা গেছে, বলেই স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে উঠে চলে গেল। আমি টেবিলের উপর একগাদা যন্ত্রপাতির অংশ ছড়িয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। কী করব কিছু বুঝতে পারলাম না।

আমেরিকানদের এই বিচিত্র অভ্যাসটি সম্পর্কে বলা দরকার। আমি এর নাম দিয়েছি স্ক্রু ড্রাইভার প্রেম। সব আমেরিকানদের পকেটে কয়েক সাইজের স্ক্রু ড্রাইভার থাকে বলে আমার ধারণা। প্রথম সুযোগেই এরা সমস্ত স্ক্রু খুলে ফেলবে।

যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের ভীতি আছে। ভীতির কারণ আমাদের শৈশব। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি—বাড়িতে হয়ত একটা রেডিও আছে। ছোট ছেলে রেডিও ধরতে গেল। বাবা চেঁচিয়ে উঠবেন, খবরদার হাত দিবি না! মা চেঁচাবেন, খোকন হাত দিও না, ব্যথা পাবে। ছোট্ট খোকনের মনের ভেতর ঢুকে গেল যন্ত্রপাতিতে হাত দেয়া যাবে না। হাত দিলেই খারাপ কিছু ঘটে যাবে। বড় হবার পরেও শৈশবের স্মৃতি থেকেই যায়। ঘরের ফিউজ কেটে গেলেও আমরা একজন মিস্ত্রি ডেকে আনি।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি—টেবিলে যন্ত্রপাতির অংশ ছড়িয়ে বসে আছি। মনটা খারাপ, এইসব খুঁটিনাটি জোড়া লাগাব কীভাবে তাই ভাবছি। তখন পল আবার ঘরে ঢুকল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, তাড়াতাড়ি বাইরে যাও, তুষারপাত হচ্ছে।

আমাদের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে বর্ষা। মেঘমেদুর আকাশ। শ্রাবণের ধারা। আষাঢ়ের পূর্ণিমা। তেমনি ইংরেজী সাহিত্যে আছে তুষারপাত। বিশেষ করে বছরের প্রথম তুষারপাতের বর্ণনা। বছরের প্রথম বৃষ্টি বলে আমাদের কিছু নেই। সারা বছরই বৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষাকালে বেশি, অন্য সময় কম।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এদেশে তুষারপাতের নির্দিষ্ট সময় আছে। সামারে তুষারপাত হবে না। স্প্রীং বা ফল্-এও হবে না। তুষারপাত হবে শীতের শুরুতে। এবং প্রথম তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে দীর্ঘ শীতের প্রস্তুতি। ফায়ারিং প্লেস ঠিক করতে হবে। হিটিং সিস্টেম ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। শীতের দিনের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা দেখতে হবে। দিনের পর দিন ঘর বন্দী হয়ে থাকতে হবে, তার জন্যও প্রস্তুতি দরকার। ব্লিজার্ড হতে পারে। ব্লিজার্ড হলে ছ'সাত দিন একনাগাড়ে গৃহবন্দী থাকতে হবে। তারও প্রস্তুতি আছে। দেখতে হবে সেলারে প্রচুর মদের বোতল আছে কি না। পছন্দসই বিয়ারের পেটি ক'টা আছে। শীতেব সিজনে স্কীইং করার পরিকল্পনা থাকলে তার জন্যও প্রস্তুতি দরকার। অনেক কাজ। সব কাজের শুরুর ঘটা হচ্ছে বছরেব প্রথম তুষার।

তুষারপাত দেখবার জন্যে ডানবার হলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। আকাশ ঘোলাটে। বইপত্রে পড়েছি পেঁজা তুলার মত তুষার পড়ে। এখন সে রকম দেখলাম না, পাউডারের কণার মত গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার পড়ছে। গায়ে পড়া মাত্রই তা গলে যাচ্ছে। খুব যে একটা অপরূপ দৃশ্য তা নয়। তবুও মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি।

দেখতে দেখতে পট পরিবর্তন হলো। শিমুল তুলার মত তুষার পড়ছে। মনে হচ্ছে মেঘের টুকরো। এই টুকরোগুলি গায়ে পড়া মাত্র গলে যাচ্ছে না। গায়ের সঙ্গে লেগে থাকছে। চেনা এই জায়গা মুহূর্তের মধ্যে অচেনা হয়ে গেল। যেন এটা ডানবার হলের সামনের জায়গা নয়। এটা ইন্দ্রলোকের কোন-এক মেঘপুরী।

মাত্র দু'ঘন্টা সময়ে সমস্ত ফার্গো শহর তুষারে ঢাকা পড়ে গেল। চারদিক সাদা। এই সাদা রঙের কী বর্ণনা দেব? তুষারের সাদা রঙ অন্য সাদার মত নয়। এই সাদা রঙে একটা হিম ভাব থাকে যা ঠিক কাছে টানে না, একটু যেন দূরে সরিয়ে দেয়। তুষারের শুভ্রতার সঙ্গে অন্য কোন শুভ্রতার তুলনা চলে না। এই শুভ্রতা অপার্থিব।

ল্যাবরেটরি বন্ধ করে সকাল সকাল হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরছি। বাস নিলাম না। তুষারের রূপ দেখতে দেখতে যাবো। মাইল দু'এক পথ। কতক্ষণ আর লাগবে?

পথে নেমেই বুঝলাম খুব বড় বোকামি করেছি। রাস্তা অসম্ভব পিছল। পা ফেলা যায় না, তার উপর ঠাণ্ডা। টেম্পারেচার দ্রুত নেমে যাচ্ছে। গায়ে সেই অনুপাতে গরম কাপড় নেই। ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাচ্ছি। তবু ভাল লাগছে: মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী বরফের চাদরে ঢাকা। নিজেকে মনে হচ্ছে ক্যাপটেন স্কট—এগুচ্ছি মেরুবিন্দুর খোঁজে। চারদিকের কী অপরূপ দৃশ্য। সুন্দর! সুন্দর!! সুন্দর!!! আবেগে ও আনন্দে আমার চোখ ভিজে উঠল।

"Winter for a moment takes the mind ; the snow
Falls past the archlight ; icicles guard a wall ;
The wind moans through a crack in the window
A keen sparkle of frost is no the sill"

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ছোট বেলায় আমার ঘর-পালানো রোগ হয়েছিল।

তখন ক্লাস থ্রীতে পড়ি। স্কুলের নাম কিশোরীমোহন পাঠশালা। থাকি সিলেটের মীরাবাজারে। বাসার কাছেই স্কুল। দুপুর বারোটায় স্কুল ছুটি হয়ে যায়। বাকি দীর্ঘ সময় কিছুতেই আর কাটে না। আমার বোনেরা তখন রান্নাবাটি খেলে। ওদের কাছে পাত্তা পাই না। মাঝে মাঝে অবশ্যি খেলায় নেয়, তখন আমার ভূমিকা হয় চাকরের। আমি হই পুতুল খেলা সংসারের চাকর। ওদের ফাইফরমায়েশ খাটি। ওরা আমার সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলে। কাজেই ওদের পুতুল খেলায় খুব উৎসাহ বোধ করি না।

ঘর-পালানো রোগ তখন হলো। এক ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। চমৎকার অভিজ্ঞতা। হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত সব কল্পনা করা যায়। মজার মজার দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ানো যায়। কারো কিছু বলার থাকে না।

আমি রোজই তা-ই করি। সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় ফিরে আসি। আমার মা নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর ছেলে যে সারা দুপুর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তা-ও তিনি জানেন না। আর জানলেও যে ভয়ংকর কিছু করতেন তা-ও মনে হয় না। তাঁর দিবানিদ্রায় আমি ব্যাঘাত করছি না—এই আনন্দটাই তাঁর জন্য অনেকখানি ছিল বলে আমার ধারণা।

যাই হোক, একদিনের ঘটনা বলি। হাঁটতে হাঁটতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম নেয়ার জন্য একটা বাড়ির বারান্দায় এসে বসলাম। কালো সিমেন্টের বারান্দা। দেখলেই ইচ্ছে করে খালি গায়ে শুয়ে পড়তে। চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ বাড়ির দরজা খুলে গেল। ঘুমঘুম চোখে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। নরম গলায় বললেন, কী চাও খোকা?

আমি বললাম, কিছু চাই না।

ঃ বাসা কোথায়?

আমি জবাব দিলাম না। বাসা কোথায় তা এই মহিলাকে বলার কোন অর্থ হয় না। তিনি চলে গেলেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখে গভীর বিস্ময় এবং কৌতূহল। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তিনি বললেন, তুমি চলে যেও না, আমি আসছি।

তিনি ঘরের ভিতরে চলে গেলেন এবং মিনিট তিনেক পর আবার উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে কী-একটা খাবার। তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন—নাও, খাও।

অপরিচিত কেউ কিছু খেতে দিলে বলতে হয়—খাব না। ক্ষিধে নেই। আমি তা বলতে পারলাম না। জিনিসটা হাতে নিলাম। খেতে গিয়ে বুঝতে পারলাম ঐ খাদ্য এই

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পৃথিবীর খাদ্য নয়। স্বর্গীয় কোন অমৃত।

জিনিসটা হচ্ছে জেলী মাখানো এক টুকরো পাউরুটি। এরকম সুখাদ্য পৃথিবীতে আছে এবং তা অপরিচিত কাউকে দেয়া যায় তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, আরেকটা দেব?

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম, তবে তা করতে বড় কষ্ট হল। ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন এবং আরো এক টুকরা পাউরুটি নিয়ে ফিরে এলেন।

আমি দ্বিতীয়টিও নিঃশব্দে খেয়ে ফেললাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, তোমার নাম কী, খোকা?

আমি নাম বললাম না। এক দৌড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম। তিনি নিশ্চয়ই আমার এই অদ্ভুত ব্যবহারে খুবই অবাক হয়েছিলেন, তবে তিনি হয়ত-বা তার চেয়েও অবাক হলেন যখন দেখলেন পরের দিন আমি আবার উপস্থিত হয়েছি।

তিনি আমাকে দেখে খুব হাসলেন। তারপরই খাবার নিয়ে এলেন। ব্যাপারটা রুটিনের মত হয়ে গেল—আমি রোজ যাই, ভদ্রমহিলা খাবার দেন, আমি খাই এবং চলে আসি।

তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করেন বলে মনে হয়। বারান্দায় এসে বসা মাত্র দরজা খুলে বের হয়ে আসেন।

একদিনের কথা বলি। মেঘলা দুপুর। চারদিকে কেমন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভদ্রমহিলার বারান্দায় পা দেয়া মাত্র বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল।

তিনি দরজা খুলে বললেন, বারান্দায় বৃষ্টির ছাঁট আসবে, ভেতরে এসো খোকা।

আমি ভয়ে ভয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালাম। কী চমৎকার সাজানো বাড়ি। যেন ছবি আঁকা। মানুষের বাড়ির ভেতরটা এত সুন্দর হয় আমার জানা ছিল না।

ঃ খোকা, বস।

আমি ভয়ে ভয়ে সোফায় বসলাম। তিনি বললেন, আজ থেকে তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে, কেমন? তুমি মা ডাকবে, আমি তোমাকে খুব মজার মজার খাবার খাওয়াব। আচ্ছা?

আমি কিছু বললাম না।

তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে মা ডাকছ এটা কাউকে বলার দরকার নেই। এটা তোমার এবং আমার গোপন খেলা।

আমি ভদ্রমহিলার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তিনি নাশপাতি কিংবা নাশপাতির মত দেখতে কোন একটা ফল কেটে দিলেন। বললেন, এসো, তুমি আমার কোলে বসে খাও। তার আগে মিষ্টি করে আমাকে মা ডাক তো।

আমি মা ডাকতে পারলাম না। বিচিত্র এক ধরনের ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠল। শিশুদের মনের গভীরে অনেক ধরনের ভয় লুকানো থাকে। তারই কোন একটা বের হয়ে এসে আমাকে অভিভূত করে ফেলল। আমি ছুটে বের হয়ে গেলাম। বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বাসায় পৌঁছলাম।

ঐ রহস্যময় বাড়িতে আর কোনদিন যাইনি। মানুষের জীবনে কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। রহস্যময় প্রকৃতি মানুষকে একই পরিস্থিতিতে বার বার ফেলে মজা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] আমার বাবা। [illegible] [illegible] [illegible]

www.BanglaBook.org

ঃ শুকনো ধন্যবাদের আমার দরকার নেই। আমি পনেরো বছরে এই প্রথম একজনকে সিগারেট খাবার অনুমতি দিলাম।

ঃ থ্যাংক ইউ।

লেভারেল উঠে চলে গেল। তবে যাবার আগে হঠাৎ বলল, তোমার অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই। তুমি আমার এখানেই থাকবে। আমি তোমার সিগারেটের অভ্যাস ছাড়িয়ে দেব।

ভদ্রমহিলা এর পর আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। আমার সিগারেটের প্যাকেট তাঁর কাছে জমা রাখতে হল। তিনি গুনে গুনে আমাকে সিগারেট দেন। তাঁর সামনে বসে খেতে হয়। তিনি নানান উপদেশ দেন, ধোঁয়া বুকের ভিতর নিও না। পাফ করে ছেড়ে দাও।

সিগারেট খাবার সময় একজন অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, এটা অসহ্য।

এছাড়াও তিনি আরো সব সমস্যা করতে লাগলেন—আমার ওজন খুব কম, কাজেই তিনি ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। বলতে গেলে রোজ রাতে তার সঙ্গে ডিনার খেতে হয়। তিনি আমার কাপড় ধুয়ে দেন। ঘর ঝাঁট দিয়ে দেন। একদিন তুষার ঝড় হচ্ছিল। ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ঠিকমত ফিরতে পারব না ভেবে নিজেই ইউনিভার্সিটিতে হাজির হলেন। আমি বরফের উপর দিয়ে ঠিকমতই হাঁটতে পারছি তবু তিনি হাত ধরে আমাকে নিয়ে এলেন।

বরফের উপর দিয়ে দুজন আসছি। হঠাৎ উনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, হুমায়ূন [ইনিই একমাত্র আমেরিকান যিনি শুদ্ধভাবে আমার নাম উচ্চারণ করতেন] তুমি কি দয়া করে এখন থেকে আমাকে মা ডাকবে?

আমি স্তম্ভিত।

বলেন কী এই মহিলা!

আমি চুপ করে রইলাম। লেভারেল শান্ত গলায় বললেন, তুমি আমাকে মা ডাকলে আমার খুব ভাল লাগবে। সব সময় ডাকতে হবে না। এই হঠাৎ হঠাৎ।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। আমাদের মধ্যে আর কোন কথা হল না

আমি বিরাট সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলাম।

ভদ্রমহিলার আদরযত্নে খুব অস্বস্তি বোধ করি। কেউ আমার প্রতিটি ব্যাপার লক্ষ্য রাখছে তাও আমার ভাল লাগে না।

আমি পড়াশুনা করি, তিনি চুপচাপ পাশে বসে থাকেন। বারবার জিজ্ঞেস করেন, আমি পাশে বসে থাকায় কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে? আমি ভদ্রতা করে বলি — "না"।

ঠাণ্ডা লেগে একবার খানিকটা জ্বরের মত হল, তিনি তাঁর নিজের ইলেকট্রিক ব্ল্যাংকেট আমাকে দিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে একটা কার্ড, সেখানে লেখা ঃ তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ। তোমার মা--লেভারেল।

ভদ্রমহিলার এখানে বেশিদিন থাকতে হলো না। ইউনিভার্সিটি আমাকে বাড়ি দিল। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বিদায়ের সময় তিনি শিশুদের মত চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ভদ্রমহিলার স্বামী বিরক্ত হয়ে বারবার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ধরেছেন, এসব কী হচ্ছে? ব্যাপারটা কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। লেভাকেল, তুমি এত আপসেট কেন?

আমার হৃদয় খুব সম্ভব পাথরের তৈরি। এই দুজনের কাউকেই আমি মুখ ফুটে মা ডাকতে পারিনি।



এই পরবাসে

অকর্মা লোক খুব ভাল চিঠি লিখতে পারে বলে একটা প্রবচন আছে। অকর্মাদের কাজকর্ম নেই—ইনিয়ে-বিনিয়ে দীর্ঘ চিঠি তাদের পক্ষেই লেখা সম্ভব।

আমি নিজেও এইসব অকর্মাদের দলে। গুছিয়ে চিঠি লিখবার ব্যাপারে আমার জুড়ি নেই। পাঠকরা হয়ত ভুরু কুঁচকে ভাবছেন—এই লোকটা দেখি খুব অহংকারী।

তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমি আসলেই অহংকারী, তবে লিখিতভাবে সেই অহংকার কখনো প্রকাশ করিনি। আজ করলাম। আমি যে চমৎকার চিঠি লিখতে পারি তার এখন একটি প্রমাণ দেব। আমার ধারণা, যে-সব পাঠক এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে ছিলেন—প্রমাণ দাখিলের পর তাঁদের মুখের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

প্রবাস জীবনের সাত মাস পার হয়েছে। আমার স্ত্রী গুলতেকিন আমার সঙ্গে নেই। সে আছে দেশে। হলিক্রস কলেজ থেকে আই.এস-সি. পরীক্ষা দেবে। কোমর বেঁধে পড়াশোনা করছে। পরীক্ষার আর মাত্র মাস খানেক দেরি। এই অবস্থায় আমি আমার বিখ্যাত চিঠিটি লিখলাম। চার পাতার চিঠিতে একা থাকতে যে কী পরিমাণ খারাপ লাগছে, তার প্রতি যে কী পরিমাণ ভালবাসা জমা করে রেখেছি এইসব লিখলাম। চিঠির শেষ লাইনে ছিল—আমি এনে দেব তোমার উঠোনো সাতটি অমরাবতী।

এই চিঠি পড়ে সে খানিকক্ষণ কাঁদল। পরীক্ষা-টরীক্ষার কথা সব ভুলে গিয়ে সাত মাস বয়েসী শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে চলে এল আমেরিকায়। আমি আমার চিঠি লেখার ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত। পরীক্ষা-টরীক্ষা সব ফেলে দিয়ে চলে আসায় আমি খানিকটা বিরক্ত। দু মাস অপেক্ষা করে পরীক্ষা দিয়ে এলেই হত।

গুলতেকিন চলে আসায় আমার জীবনযাত্রা বদলে গেল। দেখা গেল সে একা আসেনি, আমার জন্যে কিছু সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে, সে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি আমাকে একটা বাড়ি দিল।

দু'তলা বাড়ি। এক তলায় রান্নাঘর, বসার ঘর এবং স্টাডি রুম। দুতলায় দুটি শোবার ঘর। এত বড় বাড়ির আমার প্রয়োজন ছিল না। ওয়ান বেডরুমই যথেষ্ট ছিল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তবে নর্থ ডাকোটা স্টেটের নিয়ম হচ্ছে বাচ্চার জন্যে আলাদা শোবার ঘর থাকতে হবে। বাচ্চাদের মধ্যে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে হলে তাদের জন্যে আলাদা আলাদা শোবার ঘর থাকতে হবে। তবে দু'জনই ছেলে বা মেয়ে হলে একটি শোবার ঘরেই চলবে।

আমরা নতুন বাড়িতে উঠে এলাম। বলতে গেলে প্রথমবারের মত আমার সংসার শুরু করলাম। এর আগে থেকেছি মা'র সংসারে। আলাদা সংসারের আনন্দ-বেদনার কিছুই জানি না। প্রবল উৎসাহে আমরা ঘর সাজাবার কাজে লেগে পড়লাম। রোজই দোকানে যাই। যা দেখি তাই কিনে ফেলি। এমন অনেক জিনিস আমরা দুজনে মিলে কিনেছি যা বাকি জীবনে একবারও ব্যবহার হয়নি। এই মুহূর্তে দুটি জিনিসের নাম মনে পড়ছে—টুল বক্স, যেখানে করাত-ফরাত সবই আছে। এবং ফুট বাথ নেবার জন্যে প্লাস্টিকের গামলা জাতীয় জিনিস।

গুলতেকিন প্রবল উৎসাহে রান্নাবান্না নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাত মাছ ছাড়াও নানান পরীক্ষামূলক রান্না হতে লাগল। অতি অখাদ্য সেই সব খাদ্যদ্রব্য মুখে নিয়ে আমি বলতে লাগলাম, অপূর্ব।

খুব সুখের জীবন ছিল আমাদের। সাত মাস বয়সের পুতুলের মত একটি মেয়ে যে কাউকে বিরক্ত করে না, আপন মনে খেলে। মাঝে মাঝে তার মনে গভীর ভাবের উদয় হয় সে তার নিজস্ব ভাষায় গান গায়—

গিবিজি গিবিজি, গিবিজি গিবিজি
গিবি॥
গিবিজি গিবিজি গিবিজি গিবিজি
গিবি॥

আহা, সে বড় সুখের সময়।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই দেশে প্রবাসী ছাত্রদের স্ত্রীরা ভয়াবহ জীবন যাপন করেন। এদের কিছুই করার থাকে না। স্বামী কাজে চলে যায়, ফেরে গভীর রাতে। এই দীর্ঘ সময় বেচারীকে কাটাতে হয় একা একা। এরা সময় কাটায় টিভির সামনে বসে থেকে কিংবা শপিং মলে ঘুরে ঘুরে।

রাতে স্বামী যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে তখন অতি অল্পতেই খিটিমিটি লেগে যায়। স্ত্রী বেচারীর ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম যিনি রাত একটায় তাঁর স্ত্রীকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। একবারও ভাবেননি এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে আত্মীয়-পরিজনহীন শহরে মেয়েটি কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে।

যাক ওসব, নিজের গল্পে ফিরে আসি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলাম, প্রবাসী জীবনে আমি কখনো আমার স্ত্রীর উপর রাগ করব না। কখনো তাকে একাকীত্বের কষ্ট পেতে দেব না।

আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আঠারো বছরের এই মেয়ে আমেরিকান জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে খুব সহজেই মানিয়ে নিচ্ছে। অতি অল্প সময়ে সে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] ইংরেজী বলা শিখল। সুন্দর একসেন্ট। আমি অবাক হয়ে বললাম, এত চমৎকার ইংরেজী কোথায় শিখলে?

সে বলল, টিভি থেকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ ঘণ্টা টিভি খোলা থাকে। ইংরেজী শিখব না তো করব কি?

একদিন বাসায় এসে দেখি ফুটফুটে চেহারার দু'টি আমেরিকান বাচ্চা আমার মেয়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করছে। অবাক হয়ে বললাম, এরা কারা?

গুলতেকিন হাসিমুখে বলল, বেবী সিটিং শুরু করেছি।

ঃ সে কি!

ঃ অসুবিধা তো কিছু নেই। আমার নিজের বাচ্চাটিকে তো আমি দেখছি, এই সঙ্গে এই দু'জনকেও দেখছি। আমার তো সময় কাটাতে হবে!

গুলতেকিন খুবই অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে। ওদের ধানমণ্ডির বাসায় আমি প্রথম কাপড় ধোয়া এবং কাপড় শুকানোর যন্ত্র দেখি। ওদের পরিবারে ম্যানেজার জাতীয় একজন কর্মচারী আছে, তিনজন আছে কাজের মানুষ। ড্রাইভার আছে, মালী আছে। এদের প্রত্যেকের আলাদা শোবার ঘর আছে। এরা যেন নিজেরা রান্না বান্না করে খেতে পারে সে জন্যে আলাদা রান্নাঘর এবং বাবুর্চি আছে।

সেই পরিবারের অতি আদরের একটি মেয়ে বেবী সিটিং করছে। ভাবতেও অবাক লাগে। কাজটা হচ্ছে আয়ার। এই জাতীয় কাজের মানসিক প্রস্তুতি নিশ্চয়ই তার ছিল না। বিদেশের মাটিতে সবই বোধহয় সম্ভব। বেবী সিটিং-এর কাজটি সে চমৎকারভাবে করতে লাগল। বাসা ভরতি হয়ে গেল বাচ্চায়। সবাই গুলতেকিনকে বেবী সিটার হিসেবে পেতে চায়।

মাঝে মাঝে দুপুরে বাসায় খেতে এসে দেখি পুরোপুরি স্কুল বসে গেছে। বাড়ি ভর্তি বাচ্চা। তারা আমার মেয়ের দেখাদেখি গুলতেকিনকে ডাকে আম্মা, আমাকে ডাকে আব্বা।

মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে আমেরিকান দম্পতি দুপুর রাতে তাদের বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত। লজ্জিত গলায় বলছে, আমার বাচ্চাটা চেঁচামেচি করছে রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুবে। কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। আমরা খুবই লজ্জিত। কী করব বুঝতে পারছি না।

গুলতেকিন হাসিমুখে বলল— বাচ্চাকে রেখে যান।

ঃ এর জন্যে আমি তোমাকে পে করব।

ঃ পে করতে হবে না। রাতের বেলা তোমার বাচ্চা আমার গেস্ট।

গুলতেকিন শুয়েছে, একদিকে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে আমাদের নিজের মেয়ে নোভা। অন্যদিকে আমেরিকান বাচ্চা। চমৎকার দৃশ্য।

টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে আমি যত টাকা পেতাম সে তারচে অনেক বেশি পেতে লাগল। আমরা চমৎকার একটা গাড়ি কিনলাম—ডজ কোম্পানির পোলারা।

ছুটির দিনগুলিতে গাড়ি করে ঘুরে বেড়াই। প্রায়ই মনে হয় আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়টা কাটাচ্ছি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

টাকা পয়সা নিয়ে আমরা যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করি, সুখের উপকরণগুলির মধ্যে টাকা পয়সার ভূমিকাটা বেশ বড়। যতই দিন যাচ্ছে ততই তা বুঝতে পারছি। কিংবা কে জানে ধনবাদী এই সমাজ আমার চিন্তা-ভাবনাকে পাল্টে দিতে শুরু করেছে কিনা।

পরবাসে আমার রুটিনটা হল এরকম ঃ ভোরবেলা ল্যাবরেটরিতে চলে যাই। সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি। ঘরে পা দেবার পর ক্লাসের বইপত্র ছুঁয়েও দেখি না। টিভি চালিয়ে দেই, গান শুনি, লাইব্রেরী থেকে নিয়ে আসা গাদা গাদা গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাই। নোভাকে বাংলা শেখাতে চেষ্টা করি। গ্লাসের পানি দেখিয়ে বলি— এর নাম পানি। বল, পানি।

সে বলে, গিবিজি।

ঃ গিবিজি নয়। বল পানি প-া-ন-ি..

ঃ গিবিজি, গিবিজি।

মেয়েটিকে নিয়ে তার মা খুব দুশ্চিন্তায় ভোগে। শুধুমাত্র গিবিজি শব্দ সম্বল করে সে এই পৃথিবীতে এসেছে কিনা কে জানে। তার দেড় বছর বয়স হয়ে গেছে, এই বয়সে বাচ্চারা চমৎকার কথা বলে। অথচ সে শুধু বলে—গিবিজি। আমি নিজেও খানিকটা চিন্তিত বোধ করলাম।

দু'বছর বয়সে হঠাৎ করে সে কথা বলতে শুরু করল। ব্যাপারটা বেশ মজার, কারণ সে কথা বলা শুরু করল ইংরেজীতে। একটা দুটা শব্দ নয়, প্রথম থেকে বাক্য। এবং বেশ দীর্ঘ বাক্য। বাসায় দুটো ভাষা চালু ছিল—ইংরেজী ও বাংলা। আমরা নিজেরা বাংলা বলতাম। যে সব বাচ্চারা সারাদিন বাসায় থাকত তারা বলত ইংরেজি। সে দুটি ভাষাই দীর্ঘদিন লক্ষ্য করেছে। বেছে নিয়েছে একটি। ভাষা বিজ্ঞানীদের জন্যে এই তথ্যটি সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ।

আমার দীর্ঘ সাত বছরের প্রবাস জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের গল্প আছে। সবই ব্যক্তিগত গল্প। তার থেকে দু একটি বলা যেতে পারে।

একদিনের কথা বলি। সন্ধ্যা মিলিয়েছে [বলে রাখা ভাল সামারে সন্ধ্যা হয় রাত ন টার দিকে]। আমি পোর্চে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম নয়দশ বছরের একটি বালিকা আমার বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। মেয়েটির চেহারা ডল পুতুলের মত। ফ্রকের হাতায় সে চোখ মুছছে। আমি বললাম, কী হয়েছে খুকী?

সে বলল, কিছু হয়নি। আমি কি তোমার বাসার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি?

ঃ অবশ্যই পারো। ভেতরে এসেও বসতে পার।

ঃ না। আমার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে।

রাত সাড়ে দশটায় খাবার শেষ করে বাইরে এসে দেখি মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, এখনো দাড়িয়ে আছো?

সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি তো তোমাকে বিরক্ত করছি না। শুধু দাঁড়িয়ে আছি।

ঃ ব্যাপারটা কি তুমি আমাকে বলবে?

মেয়েটি ঘটনাটা বলল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আর মা একজন ডিভোর্সি মহিলা। মেয়েকে নিয়ে থাকে। সম্প্রতি একটি ছেলের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ছেলেটিকে নিয়ে সে ডেটিং এ যায়। মেয়েটিকে একা বাড়িতে রেখে যায়। সন্ধ্যা নেলাবার পর মেয়েটির একা একা ভয় করতে থাকে। সে তখন ঘর বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়ায়। মায়ের জন্য অপেক্ষা করে। আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ানোর কারণ হচ্ছে আমার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত বাতি জ্বলে। সে ধারণা করেছে আমি খুব রাত জাগি।

মেয়েটির কষ্টে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি বললাম, খুকী তুমি আমার ঘরে এসে মার জন্য অপেক্ষা কর।

সে কঠিন গলায় বলল, না।

সেবারের পুরো সামারটা আমার নষ্ট হয়ে গেল। মেয়েটি রোজ গভীর রাত পর্যন্ত আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার মার জন্যে অপেক্ষা করে। ভদ্রমহিলা মধ্যরাতে মাতাল অবস্থায় ফেরেন। আমার ইচ্ছা করে চড় দিয়ে এই মহিলার সব কটি দাঁত ফেলে দেই। তা করতে পারি না। কান পেতে শুনি মহিলা তার মেয়েকে বলছেন—আর কখনো দেরি হবে না। তুমি কি খুব বেশি ভয় পাচ্ছিলে?

ঃ না।

ঃ আমি তোমাকে ভালবাসি, মা।

ঃ আমিও তোমাকে ভালবাসি।

আই লাভ ইউ—কথাটি একজন আমেরিকান তাঁর সমগ্র জীবনে কত লক্ষ বার ব্যবহার করেন আমার জানতে ইচ্ছে করে। এই বাক্যটির আদৌ কি কোন অর্থ তাদের কাছে আছে?

আরেকটা ঘটনা বলি।

আমার স্ত্রী জেনি লী নামের একটি মেয়ের বেবী সিটিং করতো। মেয়েটির বয়স সাত-আট বছর; মেয়েটির মা একজন ডিভোর্সি মহিলা, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সমাজবিদ্যার ছাত্রী। সে ইউনিভার্সিটিতে যাবার পথে মেয়েটিকে রেখে যায়। ফেরার পথে নিয়ে যায়। একদিন ব্যতিক্রম হল, সে মেয়েকে নিতে এল না। রাত পার হয়ে গেল। পরদিন ভোরে তার বাসায় গিয়ে দেখি বিরাট তালা ঝুলছে। খুব সমস্যায় পড়লাম। মহিলা গেলেন কোথায়? তিন দিন কেটে গেল কোন খোঁজ নেই। আমরা পুলিশে খবর দিলাম। মহিলার মার ঠিকানা বের করে তাঁকে লং ডিসটেন্স টেলিফোন করলাম। ভদ্রমহিলা কঠিন গলায় বললেন, এই সব ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হব। আমার মেয়ের সঙ্গে গত সাত বছর ধরে কোন যোগাযোগ নেই। নতুন করে যোগাযোগ হোক তা আমার কাম্য নয়। জীবনের শেষ সময়টা আমি সমস্যা ছাড়া বাঁচতে চাই।

আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তবে জেনি লী নির্বিকার। সে বেশ সহজ ভঙ্গিতে বলল, আমার মা আমাকে তোমাদের ঘাড়ে ডাম্প করে পালিয়ে গেছে। সে আর আসবে না।

আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, অবশ্যই আসবে।

ঃ না আসবে না। আমি না থাকলেই তার সুবিধা। বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সেখানে যেতে পারবে। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব।

কথাগুলি বলবার সময় মেয়েটির গলা একবারও ধরে এল না। চোখের কোণে অশ্রু চকচক করল না। একমাত্র শিশুরাই পারে নির্মোহ হয়ে সত্যকে গ্রহণ করতে।

জেনি লীর মা চারদিন পর ফিরে আসে। সে তার বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে লং ডিসটেন্স ড্রাইভে দশ হাজার মাইল দূরে মন্টানার এক পাহাড়ে চলে গিয়েছিল।

আমেরিকা কী ভাবে বিদেশী ছাত্রদের জীবনে প্রভাব ফেলতে থাকে তার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েই এই গল্প শেষ করব।

শীতের সময়কার ঘটনা।

এখানকার শীত মানে ভয়াবহ ব্যাপার। ঘর থেকে বেরুনো বন্ধ। আমি ইউনিভার্সিটিতে যাই। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসি। জীবন এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

আমেরিকানদের মতে এই সময়টা স্বামী-স্ত্রীদের জন্যে খুব খারাপ। সবার মধ্যেই তখন থাকে—কেবিন ফিবার। দিনের পর দিন ঘরে বন্দী থেকে মেজাজ হয় রুক্ষ। ঝগড়াঝাটি হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ডিভোর্সের শতকরা ৭৬ ভাগ হয় শীতের সময়টায়।

আমেরিকানদের কেবিন ফিবারের ব্যাপারটা যে কত সত্যি তার প্রমাণ হাতে হাতে পেলাম। অতি সামান্য ব্যাপার নিয়ে কুৎসিত একটা ঝগড়া করলাম গুলতেকিনের সঙ্গে। সে বিস্মিত গলায় বারবার বলতে লাগল, তুমি এ রকম করে কথা বলছ কেন? এসব কী? কেন এরকম করছ?

আমি চেঁচিয়ে বললাম, ভাল করছি।

ঃ তুমি খুবই বাজে ব্যবহার করছ। কেউ এরকম ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলে না।

ঃ কেউ না বলুক, আমি বলি।

ঃ আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।

ঃ চলে যেতে চাইলে যাও। মাই ডোর ইজ ওপেন। দক্ষিণ দোয়ার খোলা।

সে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো তারপর নোভাকে চুমু খেয়ে এক বস্ত্রে বের হয়ে গেল। আমি মোটেই পাত্তা দিলাম না। যাবে কোথায়? তাকে ফিরে আসতেই হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার—সে ফিরে এল না। একদিন এবং একরাত কেটে গেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। নোভা ক্রমাগত কাঁদছে, কিছুই খাচ্ছে না। আমি কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছি না। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ করলাম। কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিশে খবর দিলাম।

ফার্গো শহরে অসহায় মহিলাদের রক্ষা সমিতি বলে একটি সমিতি আছে। সেখানেও খোঁজ নিলাম। আমার প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়।

দ্বিতীয় দিন পার হল। রাত এল। আমি ঠিক করলাম রাতের মধ্যে যদি কোন খোঁজ না পাই তাহলে দেশে খবর দেব।

রাত আটটায় একটা টেলিফোন এল। একজন মহিলা এটর্নি আমাকে জানালেন যে আমার স্ত্রী গুলতেকিন আহমেদ আমার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়েছেন। তিনি ডিভোর্সের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible]।

আমি বললাম, খুবই উত্তম কথা। সে আছে কোথায়?

ঃ সে তার এক বান্ধবীর বাড়িতে আছে। সেই ঠিকানা তোমাকে দেয়া যাবে না। আমি কি মামলার বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব?

ঃ মামলার বিষয়ে কথা বলার কিছুই নেই। আমাদের বিয়ের নিয়ম কানুন খুব সহজ। এই নিয়মে আমার স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করার অধিকার দেয়া আছে। এই অধিকার বলে সে যে কোন মুহূর্তে আমাকে ত্যাগ করতে পারে। তার জন্যে কোর্টে যাবার প্রয়োজন নেই।

ঃ তোমাদের দেশের নিয়ম-কানুন তোমাদের দেশের জন্যে। আমেরিকায় এই নিয়ম চলবে না।

ঃ তোমার বকবকানি শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না। তুমি কি দয়া করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেবে?

ঃ আমি তোমার অনুরোধের কথা তাকে বলতে পারি। যোগাযোগ করবার দায়িত্ব তার।

ঃ বেশ, তাই কর।

আমি টেলিফোন নামিয়ে সারা রাত জেগে রইলাম—যদি গুলতেকিন টেলিফোন করে। সে টেলিফোন করল না। বিভীষিকাময় একটা রাত কাটল। ভোরবেলা সে এসে হাজির।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে সে রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের কেতলি বসিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি: কিছুই বলছি না। সে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দু'কাপ চা বানিয়ে এক কাপ আমার সামনে রেখে বলল, তোমাকে আমি একটা শিক্ষা দিলাম। যাতে ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে আর খারাপ ব্যবহার না কর। যদি কর আমি কিন্তু ফিরে আসব না।

আমি বললাম, আমেরিকা তোমাকে বদলে দিয়েছে।

ঃ হ্যাঁ দিয়েছে। এই বদলানোটা কি খারাপ?

ঃ না।

ঃ না-বলার সৎ সাহস যে তোমার হয়েছে সে জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তবে যে বিদ্রোহ এখানে আমি করতে পারলাম দেশে থাকলে তা কখনো করতে পারতাম না। দিনের পর দিন অপমান সহ্য করে পশু-শ্রেণীর স্বামীর পায়ের কাছে পড়ে থাকতে হত।

ঃ আমি কি পশু-শ্রেণীর কেউ?

ঃ হ্যাঁ। নাও চা খাও। তোমার চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন? এই দুদিন কিছুই খাওনি বোধ হয়?

বলতে বলতে পশু-শ্রেণীর একজন মানুষের প্রতি গাঢ় মমতায় তার চোখে জল এসে গেল।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি জানি এর পরেও তুমি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে, তবুও আমি বারবার তোমার কাছেই ফিরে আসব। এই দুদিন আমি একবারও আমার মেয়ের কথা ভাবিনি। শুধু তোমার কথাই ভেবেছি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি মনে মনে বললাম, ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন মিছে এ ভালবাসা।

ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। না জন্মালে ভাব প্রকাশে আমাদের বড় অসুবিধা হত।



ম্যারাথন কিস

চুমু প্রসঙ্গে আরেকটি গল্প বলি। গল্পের নায়ক আমার ছাত্র—বেন ওয়ালি। টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে আমি এদের প্রবলেম ক্লাস নেই। সপ্তাহে একদিন এক ঘন্টা থার্মোডিনামিক্সের অংক করাই এবং ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেই।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আণ্ডার-গ্রাজুয়েটে যে সব আমেরিকান পড়তে আসে, তাদের প্রায় সবাই গাধা টাইপের। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে হা করে তাকিয়ে থাকে। প্রবল বেগে মাথা চুলকায়। অংক করতে দিলে শুকনো গলায় বলে, আমার ক্যালকুলেটরে ব্যাটারী ডাউন হয়ে গেছে।

আণ্ডার-গ্রাজুয়েট পড়াশোনা এদের তেমন জরুরি নয়। খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য হাইস্কুলের শিক্ষাই যথেষ্ট। এদের কাছে ইউনিভার্সিটির ফুটবল টিম, বেসবল টিম পড়াশোনার চেয়ে অনেক জরুরি। মেয়েদের লক্ষ্য থাকে ভাল একজন স্বামী জোগাড় করার দিকে। এই কাজটি তাদের নিজেদেরই করতে হয় এবং এর জন্যে যে পরিমাণ কষ্ট এক একজন করে তা দেখলে চোখে পানি এসে যায়।

আমার সঙ্গে রুথ কোয়াণ্ডাল বলে এক আমেরিকান ছাত্রী পি-এইচ.ডি. করত। এই মেয়েটি কোন স্বামী জোগাড় করতে পারেনি. ভবিষ্যতেও যে পারবে এমন সম্ভাবনাও নেই। মেয়েটি মৈনাক পর্বতের মত। সে আমাকে দুঃখ করে বলেছিল, আমার যখন সতেরো-আঠারো বছর বয়স ছিল তখন আমি এত মোটা ছিলাম না। চেহারাও ভালই ছিল। তখন থেকে চেষ্টা করছি একজন ভাল ছেলে জোগাড় করতে। পারিনি; কত জনের সঙ্গে যে মিশেছি। ওদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখার জন্যে কত কিছু করতে হয়েছে। আগেকার অবস্থা তো নেই, এখন ছেলেরা ডেটিং-এর প্রথম রাতেই বিছানায় নিয়ে যেতে চায়। না করি না। না করলে যদি বিরক্ত হয়। আমাকে ছেড়ে অন্য কোন মেয়ের কাছে চলে যায়। এত কিছু করেও ছেলে জুটাতে পারলাম না।

ঃ কেন পারলে না ?

ঃ পারলাম না, কারণ আমি অতিরিক্ত স্মার্ট। সারা জীবন 'A' পেয়ে এসেছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রীদের একজন। ছেলেরা এ রকম স্মার্ট মেয়ে পছন্দ করে না। তারা চায় পুতুপুতু ধরনের ভ্যাদা টাইপের মেয়ে। তুমি বিদেশী, আমাদের জটিল

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সমস্যা বুঝতে পারবে না।

আমি আসলেই বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় এদের কোথায় যেন কী একটা হয়েছে। সবার মাথার স্ক্রু-র একটা প্যাঁচ কেটে গেছে। উদাহরণ দেই। এটি আমার নিজের চোখে দেখা।

পুরোদমে ক্লাস হচ্ছে। দেখা গেল ক্লাস থেকে দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে বের হয়ে গেল। সবার চোখের সামনে এরা সমস্ত কাপড় খুলে ফেলল। এই ভাবেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটা চক্কর দিয়ে ফেলল। এর নাম হচ্ছে স্ট্রিকিং। এরকম করল কেন? এরকম করল কারণ এরা পৃথিবী জুড়ে যে আণবিক বোমা তৈরি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল।

এদের এইসব পাগলামি সাধারণত ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে আগে দেখা দেয়। আমার ছাত্র বেন ওয়ালির মাথাতে এ রকম পাগলামি ভর করল। স্প্রীং-কোয়ার্টারের শেষে ফাইন্যালের ঠিক আগে আগে আমাকে এসে বলল সে একটা বিশেষ কারণে টার্ম ফাইন্যাল পেপারটা জমা দিতে পারছে না।

আমি বললাম, বিশেষ কারণটা কী?

ঃ চুমুর দীর্ঘতম রেকর্ডটা ভাঙতে চাই। গিনিস বুকে নামটা যেন ওঠে।

আমি বেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বলে কি এই ছেলে?

আমি বললাম, টার্ম ফাইন্যালের পরে চেষ্টা করলে কেমন হয়? তখন নিশ্চিন্ত মনে চালিয়ে যেতে পারবে। টার্ম ফাইন্যাল পেপার জমা না দিলে তো এই কোর্সটায় কোন নম্বর পাবে না।

বেন বিরস মুখে চলে গেল। দু'দিন পর পেপার জমা দিয়ে দিল। আমি ভাবলাম মাথা থেকে ভূত নেমে গেছে। কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ নেই।

ভূত কিন্তু নামল না। আমেরিকানদের ঘাড়ের ভূত খুব সহজে নামে না। ভূতগুলিও আমেরিকানদের মতই পাগলা। কাজেই এক বৃহস্পতিবার রাতে অর্থাৎ উইক-এণ্ড শুরু হবার আগে আগে বেন রেকর্ড ভাঙার জন্য নেমে পড়ল। সঙ্গে স্বাস্থ্যবতী এক তরুণী—যার পোশাক খুবই উগ্র ধরনের। এই পোশাক না থাকলেই বরং উগ্রতাটা কম মনে হত।

চুমুর ব্যাপারটা হচ্ছে মেমোরিয়াল ইউনিয়নের তিন তলায়। যথারীতি পোস্টার পড়েছে ম্যারাথন চুমু। দীর্ঘতম চুম্বনের বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হতে যাচ্ছে . . . ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখলাম ব্যাপারটায় আয়োজনও প্রচুর। দুজন আছে রেকর্ড-কীপার, স্টপ ওয়াচ হাতে সময়ের হিসাব রাখছে। একজন আছেন নোটারী পাবলিক। যিনি সার্টিফিকেট দেবেন যে, দীর্ঘতম চুম্বনে কোন কারচুপি হয়নি। এই নোটারী পাবলিক সারাক্ষণই থাকবেন কিনা বুঝতে পারলাম না। এদের মত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এরকম একটা ফালতু জিনিস নিয়ে কী করে সময় নষ্ট করে বুঝতে পারলাম না।

বেন এবং মেয়েটিকে নাইলনের দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। কেউ সে বেষ্টনীর ভেতর যেতে পারছে না। বাজনা বাজছে। সবই নাচের বাজনা— ওয়াল্টজ। বাজনার তালে তালে এরা দুজন নাচছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি মিনিট দশেক এই দৃশ্য দেখে চলে এলাম। এই জাতীয় পাগলামির কোন মানে হয়?

পরদিন ভোরে আবার গেলাম। ম্যারাথন চুমু তখনো চলছে। তবে পাত্র-পাত্রী দুজন এখন সোফায় শুয়ে আছে। ঠোঁটে ঠোঁট লাগানো। বাজনা বাজছে। সেই বাজনার তালে তালে সমবেত দর্শকদের অনেকেই সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নিয়ে খানিকক্ষণ নাচছে। রীতিমত উৎসব।

আমি আমার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটিকে বললাম, ক্ষিধে পেলে ওরা করবে কী? ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে খাওয়া-দাওয়া তো করা যাবে না।

ঃ তরল খাবার খাবে স্ট্র দিয়ে। কিছুক্ষণ আগেই স্যুপ খেয়েছে।

আমি ইতস্তত করে বললাম, বাথরুমে যাবার প্রয়োজন যখন হয় তখন কী করবে?

ঃ জানি না। বাথরুমের জন্যে কিছু সময় বোধ হয় অফ পাওয়া যায়। কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। ওদের জিজ্ঞেস কর।

আমার আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করল না। ততক্ষণে ফ্লোরে উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। এক জোড়া বুড়োবুড়ি উদ্দাম নৃত্যে মেতেছে। ভয়াবহ লাফ-ঝাঁপ। তালে তালে হাত তালি পড়ছে। জমজমাট অবস্থা।

জানতে পারলাম এই বুড়োবুড়ি হচ্ছে বেন ওয়ালির বাবা এবং মা। তারা সুদূর মিনেসোটা থেকে ছুটে এসেছেন ছেলেকে উৎসাহ দেবার জন্যে। ছেলের গর্বে তাঁদের চোখমুখ উজ্জ্বল।

* বেন ওয়ালি দীর্ঘতম চুম্বনের বিশ্ব-রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। তবে সে খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।

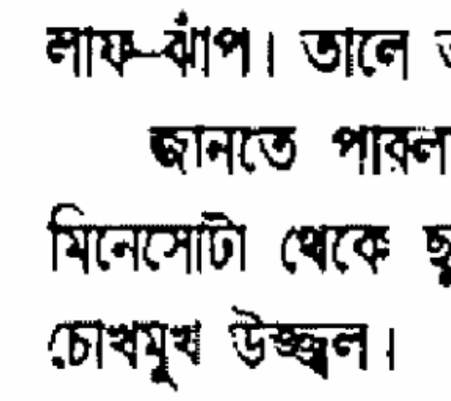

লাস ভেগাস

দিনটা ছিল বুধবার। জুন মাসের ষোলো বা সতেরো তারিখ। ডনবার হলের এক্স-রে রুমে বসে আছি। আমার সামনে গাদা খানিক রিপোর্ট। আমি রির্পোট দেখছি এবং ঠাণ্ডা ঘরে বসেও রীতিমত ঘামছি। কারণ গা দিয়ে গাম বের হবার মত একটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। পলিমার ক্লে ইন্টারেকশনের এমন একটা ব্যাপার পাওয়া গেছে যা আগে কখনো লক্ষ্য করা হয়নি। আবিষ্কারটি গুরুত্বপূর্ণ হবার সম্ভাবনা শতকরা ৮০ ভাগ।

আমি দেখিয়েছি যে, পলিমারের মত বিশাল অণু ক্লে-র লেয়ারের ভেতর ঢুকে তার স্ট্রাকচার বদলে দিতে পারে। সব পলিমার পারে না, কিছু কিছু পারে। কোন কোন

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পলিমার ক্লে লেয়ারের ফাঁক বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। কেউ আবার কমিয়ে দেয়। অত্যন্ত অবাক হবার মত ব্যাপার।

সন্ধ্যাবেলা আমি আমার প্রফেসরকে ব্যাপারটা জানালাম। তিনি খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। ঝিম ভাঙবার পর বললেন, গোল্ড মাইন।

অর্থাৎ তিনি একটি স্বর্ণ-খনির সন্ধান পেয়েছেন। রাত দশটার দিকে তিনি বাসায় টেলিফোন করে বললেন, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির ৫০তম অধিবেশন হবে নাভাদার লাস ভেগাসে। সেই অধিবেশনে আমরা আমাদের এই আবিষ্কারের কথা বলব।

আমি বললাম, খুবই ভাল কথা। কিন্তু এখনো ব্যাপারটা আমরা ভালমত জানি না। আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির মত অধিবেশনে তাড়াহুড়া করে কিছু . . .

প্রফেসর আমার কথা শেষ করতে দিলেন না, ঘট করে টেলিফোন রেখে দিলেন।

পরদিন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খুব চেষ্টা করলাম প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলতে। তিনি সেই সুযোগ দিলেন না। লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত। যতবার কথা বলতে চাই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলেন—দেখছ একটা কাজ করছি, কেন বিরক্ত করছ। আমার কাজ নয়। এটা তোমারই কাজ।

সন্ধ্যাবেলা প্রফেসরের সেই কাজ শেষ হল। তিনি তাঁর সমস্ত ছাত্রদের ডেকে গম্ভীর গলায় বললেন, আমার ছাত্র আহামাদ নাভাদার লাস ভেগাসে তার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করবে। সে একটা পেপার দেবে। পেপারের খসড়া আমি তৈরি করে ফেলেছি।

আমার মাথা ঘুরে গেল। ব্যাটা বলে কী? পৃথিবীর সব বড় বড় রসায়নবিদরা জড়ো হবে সেখানে। এইসব জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে আমি কেন? এক অক্ষর ইংরেজী আমার মুখ দিয়ে বের হয় না। যা বের হয় তার অর্থ কেউ বুঝে না। আমি এ-কী বিপদে পড়লাম।

প্রফেসর বললেন, আহামাদ, তোমার মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঃ কেন, জানতে পারি?

ঃ আমি বক্তৃতা দিতে পারি না।

ঃ এটা খুবই সত্যি কথা।।

ঃ আমি ইংরেজী বললে কেউ তা বুঝতে পারে না।

ঃ কারেক্ট। আমি এত দিন তোমার সঙ্গে আছি, আমি নিজেই বুঝি না। অন্যরা কী বুঝবে।

ঃ আমি খুবই নার্ভাস ধরনের ছেলে। কী বলতে কী বলব।

ঃ দেখ আহামাদ, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে কথা বলতে পারার সৌভাগ্য সবার হয় না। তোমার হচ্ছে।

ঃ এই সৌভাগ্য আমার চাই না।

ঃ বাজে কথা বলবে না। কাজটা তুমি করেছ। আমি চাই সম্মানের বড় অংশ তুমি পাও। কেন ভয় পাচ্ছ। আমি তোমার পাশেই থাকব।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি মনে মনে বললাম—ব্যাটা তুই আমাকে এ-কী বিপদে ফেললি।

পনেরো দিনের মধ্যে চিন্তায় চিন্তায় আমার দুপাউণ্ড ওজন কমে গেল। আমার দুশ্চিন্তার মূল কারণ হচ্ছে কাজটা আধাখেচড়াভাবে হয়েছে। কেউ যদি কাজের উপর জটিল কোন প্রশ্ন করে বসে জবাব দিতে পারব না। এ রকম অপ্রস্তুত অবস্থায় এত বড় বিজ্ঞান অধিবেশনে যাওয়া যায় না। ব্যাটা প্রফেসর তা বুঝবে না।

প্রফেসর তার গাড়িতে করে আমাকে লাস ভেগাসে নিয়ে গেলেন। মরুভূমির ভেতর আলো ঝলমল একটি শহর। জুয়ার তীর্থভূমি। নাইট ক্লাব এবং ক্যাসিনোতে ভরা। দিনের বেলা এই শহর ঝিম মেরে থাকে। সন্ধ্যার পর জেগে ওঠে। সেই জেগে ওঠাটা ভয়াবহ।

আমার প্রফেসরেরও এই প্রথম লাস ভেগাসে আগমন। তিনিও আমার মতই ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছেন। হা হয়ে দেখছেন রাস্তার অপূর্ব সুন্দরীদের ভীড়। প্রফেসর আমার কানে কানে বললেন, এই একটি জায়গাতেই প্রসটিটিউশন নিষিদ্ধ নয়। যাদের দেখছ, তাদের প্রায় সবাই ঐ জিনিস। দেখবে পৃথিবীর সব সুন্দরী মেয়েরা এসে টাকার লোভে এখানে জড় হয়েছে।

কিছুদূর এগুতেই এক সুন্দরী এগিয়ে এসে বলল, সান্ধ্যকালীন কোন বান্ধবীর কি প্রয়োজন আছে?

আমি কিছু বলবার আগেই প্রফেসর বললেন, না ওর কোন বান্ধবীর প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি নীল চোখ তুলে শান্ত গলায় বললেন, তোমাকে তো জিগ্‌গেস করিনি। তুমি কথা বলছ কেন?

আমি বললাম, তোমায় ধন্যবাদ, আমার বান্ধবীর প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি বলল, সুন্দর সন্ধ্যাটা একা একা কাটাবে। এক গ্লাস বিয়ারের বদলে আমি তোমার পাশে বসতে পারি।

আমরা কথা না বলে এগিয়ে গেলাম। পথে আরো দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা হল। এদের একজন মধুর ভঙ্গিতে বলল, তোমাদের কি ডেট লাগবে? লাগলে লজ্জা করবে না।

আমার প্রফেসর মুখ গম্ভীর করে আমাকে বুঝালেন,—এরা ভয়াবহ ধরনের প্রস্টিটিউট। তোমার কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত গায়ে হাত পর্যন্ত দিতে দেবে না। পত্রপত্রিকায় এদের সম্পর্কে অনেক লেখালেখি হয়েছে।

প্রফেসরের ভাব এরকম যে গায়ে হাত দিতে দিলে তিনি রাজি হয়ে যেতেন।

রাতের খাবার খেতে আমরা যে রেস্টুরেন্টে গেলাম তা হচ্ছে টপলেস রেস্টুরেন্ট। অর্থাৎ ওয়েট্রেসদের বুকে কোন কাপড় থাকবে না। বইপত্রে এইসব রেস্টুরেন্টের কথা পড়েছি। রাস্তায় এই প্রথম দেখলাম। আমার লজ্জায় প্রায় মাথা কাটা যাবার মত অবস্থা। মেয়েগুলিকে মনে হল আড়ষ্ট ও প্রাণহীন। এদের মুখের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না, সবাই তাকাচ্ছে বুকের দিকে। কাজেই তারা খানিকটা প্রাণহীন হবেই। চোখের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। চোখের উপর চোখ রেখে আমরা সেই ভাষায় কথা বলি। এই সব মেয়ে চোখের ভাষা কখনো ব্যবহার করতে পারে না। এরা বড় দুঃখী।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

প্রফেসর বিরক্ত মুখে আমাকে বললেন, আমাদের এই টেবিলে বসাটাই ভুল হয়েছে। এই টেবিলের ওয়েট্রেসদের বুকের দিকে তাকিয়ে দেখ। ছেলেদের বুক এরচে অনেক ডেভেলপড্ হয়। এর বুক দেখে মনে হচ্ছে প্রেইরীর সমতল ভূমি।

রাতের খাবারের পর আমরা একটা শো দেখলাম। প্রায় নগ্ন কিছু নারীপুরুষ মিলে গান বাজনা নাচ করল। একটি জাপানি মেয়ে সারা শরীর পালকে ঢেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দর্শকদের কাছে আসছে দর্শকরা একটা করে পালক তুলে নিচ্ছে। তার গা ক্রমশ খালি হয়ে আসছে। সর্বশেষ পালকটি তার গা থেকে খুলে নেবার পর সে স্টেজে চলে গেল এবং চমৎকার একটি নাচ দেখাল। যে মেয়ে এত সুন্দর নাচ জানে তার খালি গা হবার প্রয়োজন পড়ে না।

রাত বারোটায় শো শেষ হবার পর আমার প্রফেসর বললেন, লাস ভেগাসে রাত শুরু হয় বারোটার পর। এখন হোটেলে গিয়ে ঘুমুবার কোন মানে হয় না।

আমি বললাম, তুমি কি করতে চাও?

ঃ জুয়া খেলবে নাকি?

ঃ জুয়া কী করে খেলতে হয়, আমি জানি না।

ঃ আমিও জানি না। তবে স্লট মেশিন জিনিসটা বেশ মজার। নিকেল, ডাইম কিংবা কোয়ার্টার (বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা) মেশিনের ফোকরে ফেলে একটা হাতল ধরে টানতে হয়। ভাগ্য ভালো হলে কম্বিনেশন মিলে যায়, ঝুনঝুন শব্দে প্রচুর মুদ্রা বেরিয়ে আসে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দুজনের নেশা ধরে গেল। মুদ্রা ফেলি আর স্লট মেশিনের হাতল ধরে টানি। দেখা গেল প্রফেসরের ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। জ্যাক পট পেয়ে গেলেন। এক কোয়ার্টারে প্রায় একশ ডলার। তার সামনে মুদ্রার পাহাড়।

ক্যাসিনো থেকে কিছুক্ষণ পরপর বিনামূল্যে শ্যাম্পেন খাওয়ানো হচ্ছে। ক্যাসিনো যেন বিরাট এক উৎসবের ক্ষেত্র। আমি মুগ্ধ চোখে ঘুরে ঘুরে দেখলাম-- ক্যাসিনোর এক একটা টেবিলে কত লক্ষ টাকারই না লেনদেন হচ্ছে। কত টাকাই না মানুষের আছে।

রাত তিনটার দিকে আমরা হোটেলে ফিরলাম। এর মধ্যে আমার প্রফেসর দুশ ডলার হেরেছেন। আমার কাছে ছিল সত্তর ডলার, তার সবটাই চলে গেছে। আমাকে প্রফেসরের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হবে এবং তা করতে হবে আজ রাতের মধ্যেই। কারণ আমার ধারণা এই লোক আবার ক্যাসিনোতে যাবে এবং তাঁর শেষ কপর্দকও স্লট মেশিনে চলে যাবে।

রাতে এক ফোঁটা ঘুম হল না। সমস্ত দিনের উত্তেজনার সঙ্গে যোগ হয়েছে আগামী দিনের সেশনের দুশ্চিন্তা।

হোটেলের যে ঘরে আমি আছি তা আহামরি কিছু নয়' দুটি বিছানা। একটিতে আমি অন্যটিতে থাকবে আমাদের ইউনিভার্সিটিরই এক ছাত্র, জিম। সে এখনো ফেরেনি। সম্ভবত কোন ক্যাসিনোতে আটকা পড়ে গেছে। রাতে আর ফিরবে না।

আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরল' চোখের সামনে পুরো দিগম্বর হয়ে সটান পশমের বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমেরিকানদের এই ব্যাপারটা আমাকে সব সময় পীড়া দেয়। একজন পুরুষের সামনে অন্য একজন পুরুষ কাপড় খুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ডরমিটরী গোসলখানায় এক সঙ্গে অনেকে নগ্ন হয়ে স্নান পর্ব সারে। ব্যবস্থাই এরকম। হয়ত এটাকেই এরা অগ্রসর সভ্যতার একটা ধাপ বলে ভাবছে। এই প্রসঙ্গে ওদের সঙ্গে আমি কোন কথা বলিনি। বলতে ইচ্ছা করেনি।

কেমিক্যাল সোসাইটির মিটিং-এ গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। যা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। উৎসব ভাল। পেপারের চেয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাই প্রধান। আলাপের বিষয় একটাই — কেমিস্ট্রি।

এই বিষয়ের বড় বড় সব ব্যক্তিত্বকেই দেখলাম। রসায়নে দুই বছর আগে নোবেল পুরস্কার পাওয়া এক বিজ্ঞানীকে দেখলাম লালরঙের একটা গেঞ্জি পরে এসেছেন— সেখানে লেখা 'আমি রসায়নকে ঘৃণা করি।'

অধিবেশনটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এক সঙ্গে অনেক অধিবেশন চলছে। যার যেটি পছন্দ সে সেখানে যাচ্ছে।

আমাদের অধিবেশনে পঞ্চাশজনের মতো বিজ্ঞানীকে দেখা গেল। আমার আগে বেলজিয়ামের লিয়েগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী পেপার পড়লেন। তাঁকে এমনভাবে চেপে ধরা হলো যে ভদ্রলোক শুধু কেঁদে ফেলতে বাকি রাখলেন। আমি ঘামতে ঘামতে এই জীবনে যতগুলি সূরা শিখেছিলাম সব মনে মনে পড়ে ফেললাম। আমার মনে হচ্ছিল বক্তৃতার মাঝখানেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এম্বুলেন্স করে আমাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আমার বক্তৃতার ঠিক আগে আগে প্রফেসর উঠে বাইরে চলে গেলেন। এই প্রথম বুঝলাম চোখে সর্ষে ফুল দেখার উপমাটি কত খাঁটি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার কোনরকম বাধা ছাড়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শুরু হল। প্রথম প্রশ্ন শুনে আমার পিলে চমকে গেল। আমি যখন বলতে যাচ্ছি—এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, ঠিক তখনই আমার প্রফেসর উদয় হলেন এবং প্রশ্নের জবাব দিলেন। ঝড়ের মত প্রশ্ন এল, ঝড়ের মতই উত্তর দিলেন প্রফেসর গ্লাস। আমি মনে মনে বললাম, ব্যাটা বাঘের বাচ্চা, পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছে।

সেশন শেষে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার আমার বক্তৃতা কেমন হয়েছে?

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, এত চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে এত বাজে বক্তৃতা আমি এই জীবনে শুনিনি।

বলেই হেসে ফেললেন এবং হাসতে হাসতে যোগ করলেন, তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ কাজটাই প্রধান, বক্তৃতা নয়।

ঃ কিভাবে সেলিব্রেট করবো?

ঃ শ্যাম্পেন দিয়ে।

ঃ আর কিভাবে?

এক বোতল শ্যাম্পেন কেনা হল। ব্যাটা পুরোটা গলায় ঢেলে দিয়ে গুনগুন করে গান ধরল—

"Pretty girls are everywhere
If you call me I will be there..."

Nirjoy

www.BanglaBook.org



শীলার জন্ম

আমার দ্বিতীয় মেয়ে শীলার জন্ম আমেরিকায়। জন্ম এবং মৃত্যুর সব গল্পই নাটকীয়, তবে শীলার জন্ম-মুহূর্তে যে নাটক হয়, তাতে আমার বড় ভূমিকা আছে বলে গল্পটি বলতে ইচ্ছা করছে।

তারিখটা হচ্ছে ১৫ই জানুয়ারি।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। বরফে বরফে সমস্ত ফাগো শহর ঢাকা পড়ে গেছে। শেষরাত থেকে নতুন করে তুষারপাত শুরু হল। আবহাওয়া দপ্তর জানাল —

'নিতান্ত প্রয়োজন না হলে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হবে না।' আমার ঘরের হিটিং ঠিকমত কাজ করছিল না। ঘর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। দু'তিনটি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছি। এ-রকম দুর্যোগের দিনে ইউনিভার্সিটিতে কী করে যাব তাই ভাবছি। দেশে যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টি-বাদলার দিনে 'রেইনি ডে'র ছুটি হয়ে যেত, এখানে স্নো ডে বলে তেমন কিছু নেই। চার ফুট বরফে শহর ঢাকা পড়ে গেছে, অথচ তারপরও ইউনিভার্সিটির কাজকর্ম ঠিকমত চলছে।

সকালবেলার ঘুমের মত আরামের ব্যাপার এই জগতে খুব বেশি নেই। সেই আরাম ভোগ করছি, ঠিক তখন গুলতেকিন আমাকে ডেকে তুলে ফ্যাকাশে মুখে বলল, আমার যেন কেমন লাগছে।

আমি বললাম, ঠিক হয়ে যাবে।

বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। সে ভয়-পাওয়া গলায় বলল, তুমি বুঝতে পারছ না, এটা মনে হচ্ছে ঐ ব্যাপার।

ঃ ঐ ব্যাপার মানে?

ঃ মনে হচ্ছে ...

মেয়েরা ধাঁধা খুব পছন্দ করে। আমি লক্ষ্য করেছি, যে-কথা সরাসরি বললেও কোন ক্ষতি নেই সেই কথাও তারা ধাঁধার মত বলতে চেষ্টা করে। তার ব্যথা উঠেছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এটা বুঝতে আমার দশ মিনিটের মত লাগল। যখন বুঝলাম তখন স্পাইন্যাল কর্ড দিয়ে হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। কী সর্বনাশ!

আমি শুকনো গলায় বললাম, ব্যথা কি খুব বেশি?

ঃ না, বেশি না। কম। তবে ব্যথাটা ঢেউয়ের মত আসে, চলে যায়, আবার আসে। এখন ব্যথা নেই।

ঃ তাহলে তুমি রান্নাঘরে চলে যাও, চা বানাও। চা খেতে খেতে চিন্তা করি — প্ল্যান

Nirjoy

www.BanglaBook.org

অব অ্যাকশন।

ঃ চিন্তা করার কী আছে? তুমি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে—ব্যস্।

ঃ কথা না-বাড়িয়ে চা বানাও। আবার ব্যথা শুরু হলে মুশকিল হবে।

সে রান্নাঘরে চলে গেল। আমি প্ল্যান অব অ্যাকশন ভাবতে বসলাম। গুলতেকিন পুরো ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছে, এটা মোটেই তত সহজ না। প্রধান সমস্যা এই প্রচণ্ড দুর্যোগে তাকে হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছানো। এ ছাড়াও ছোটখাট সমস্যা আছে, যেমন নোভাকে কোথায় রেখে যাব? কে তার দেখাশোনা করবে? হাসপাতালে গুলতেকিনকে কতদিন থাকতে হবে? এই দিনগুলিতে নোভাকে সামলাব কিভাবে?

ঃ নাও, চা খাও। চা খেয়ে দয়া করে কাপড় পর!

ঃ নোভাকে কী করব?

ঃ কিছু করতে হবে না। আমি ফরিদকে টেলিফোন করে দিয়েছি, সে এসে পড়বে।

ঃ ডাক্তারকেও তো খবর দেয়া দরকার।

ঃ খবর দিয়েছি।

ঃ কাজ তো দেখি অনেক এগিয়ে রেখেছ।

ঃ হ্যাঁ, রেখেছি। প্লীজ, চা-টা তাড়াতাড়ি শেষ কর।

চা শেষ করবার আগেই ফরিদ এসে পড়ল। সে কানাডা থেকে এম-এস করে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ.ডি. করতে এসেছে। এই ছেলেটি পাকিস্তানী। পাকিস্তানী কারো সঙ্গে নীতিগতভাবেই আমি কোন যোগাযোগ রাখি না। একমাত্র ব্যতিক্রম ফরিদ। পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষ জন্মায় যাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে পরের উপকার করা। পরের উপকার করবার সময়টাতেই তারা খানিকটা হাসিখুশি থাকে, অন্য সময় বিমর্ষ হয়ে থাকে। আমি আমার চল্লিশ বছরের জীবনে ফরিদের মত ভাল ছেলে দ্বিতীয়টি দেখিনি, ভবিষ্যতে দেখব সেই আশাও করি না।

নোভাকে ফরিদের কাছে রেখে আমি হাসপাতালের দিকে রওনা হলাম। বরফ-ঢাকা রাস্তায় আমার ডজ পোলারা গাড়ি চলছে। পেছনের সীটে গুলতেকিন কাত হয়ে শুয়ে আছে, মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে কাতরাচ্ছে। আমি বললাম, ব্যথা কি খুব বেড়েছে?

ঃ তুমি গাড়ি চালাও। কথা বলবে না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাও। আমার মনে হচ্ছে বেশি দেরি নেই।

ঃ কী সর্বনাশ! আগে বলবে তো!

আমি একসিলেটরে পা পুরোপুরি দাবিয়ে দিলাম। গাড়ি চলল উল্কার গতিতে। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলেই অ্যাকসিডেন্ট না করে সেইন্ট লিউক হাসপাতালে পৌঁছতে পারলাম।

নার্স এসে দেখেশুনে বলল, এক্ষুনি ডেলিভারী হবে, চল ও-টিতে যাই।

গুলতেকিনের চিকিৎসকের নাম ডাঃ মেলয়। ডেলিভারী তিনিই করাবেন। আমেরিকান ডাক্তারদের সবার কাছেই ওয়াকি টকি জাতীয় একটি যন্ত্র থাকে। তিনি যেখানেই থাকেন তাঁর সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করা যায়। হাসপাতাল থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। তিনি বললেন, এক মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যখন সিগারেট ধরিয়েছি তখন হাসপাতালের মেট্রন বলল, তুমি চল আমার সঙ্গে।

ঃ কোথায়?

ঃ অপারেশন থিয়েটারে।

ঃ কেন?

ঃ তুমি তোমার স্ত্রীর পাশে থাকবে। তাকে সাহস দেবে।

ঃ ও খুবই সাহসী মেয়ে। ওকে সাহস দেবার কোন দরকার নেই।

ঃ বাজে কথা বলবে না। তুমি এসো আমার সঙ্গে। ডেলিভারীর সময় আমরা কাউকে ঢুকতে দেই না। শুধু স্বামীকে থাকতে বলি। এর প্রয়োজন আছে।

ঃ আমি তেমন কোন প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি না।

ঃ যা ঘটতে যাচ্ছে তার অর্ধেক দায়ভাগ তোমার! তুমি এরকম করছ কেন?

আমি মেট্রনের সঙ্গে রওনা হলাম। ও-টি'তে ঢোকার প্রস্তুতি হিসেবে আমাকে মাস্ক পড়িয়ে দিল। অ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে দিল। এক ধরনের বিশাল মোজায় পা ঢেকে দেয়া হল। আমি ও-টি'তে ঢুকলাম। অপারেশন থিয়েটারটি তেমন আলোকিত নয়। আমার কাছে অন্ধকার অন্ধকার লাগল। ঘরটা ছোট এবং যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। ফিনাইলের যে কটু গন্ধ হাসপাতালে পাওয়া যায় তেমন গন্ধও পেলাম না, তবে নেশা ধরানোর মত মিষ্টি সৌরভ ঘরময় ছড়ানো!

গুলতেকিনকে বিশেষ ধরনের একটা টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার দু'পাশে দুজন নার্স। ডাঃ মেলয় এসে পড়েছেন, তিনি ছুরি-কাঁচি গুছিয়ে রাখছেন। তাদের প্রত্যেকের মুখে মাস্ক থাকার জন্যে তাদের দেখাচ্ছিল ক্লু ক্লাক্স ক্লান-এর সদস্যদের মত। তাদের ঠিক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল তারা যেন একদল রোবট। আমি গুলতেকিনের হাত ধরে দাঁড়ালাম।

ডেলিভারী পেইনের কথাই শুধু শুনেছি, এই ব্যথা যে কত তীব্র, কত তীক্ষ্ণ এবং কত ভয়াবহ সেই সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। এই প্রথম ধারণা হল। ঘামে আমার সমস্ত শরীর ভিজে গেল। থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। গলা কাটা কোরবানীর পশুর মত গুলতেকিন ছটফট করছে। এক সময় আমি ডাক্তারকে বললাম, আপনি দয়া করে পেইন কিলার দিয়ে ব্যথা কমিয়ে দিন। ডাক্তার নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, পেইন কিলার দেয়া যাবে না। পেইন কিলার দেয়া মাত্র কন্ট্রাকশনের সমস্যা হবে। আর মাত্র কিছুক্ষণ।

সেই কিছুক্ষণ আমার কাছে অনন্তকাল বলে মনে হল। মনে হল আমি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমার স্ত্রীর হাত ধরে প্রতীক্ষা করছি।

একসময় প্রতীক্ষার অবসান হল, জন্ম হল আমার দ্বিতীয় কন্যা শীলার। হাত পা ছুঁড়ে সে কাঁদছে, সরবে এই পৃথিবীতে তার অধিকার ঘোষণা করছে। যেন সে বলছে, এই পৃথিবী আমার, এই গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য আমার, এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি আমার।

গুলতেকিন ক্লান্ত গলায় বলল, তুমি চুপ করে আছো কেন, আজান দাও। বাচ্চার কানে আল্লাহর নাম শোনাতে হয়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি আমার ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললাম, আল্লাহু আক্‌বর...

নার্সের হাতে একটা ট্রে ছিল। ভয় পেয়ে সে ট্রে ফেলে দিল। ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, What is happening?

তাদের কোন কথাই আমার কানে ঢুকছে না। আমি অবাক হয়ে দেখছি আমার শিশু কন্যাকে। সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। পৃথিবীর রূপরসগন্ধ হয়তো-বা ইতিমধ্যেই তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। আমি প্রার্থনা করলাম, যেন পৃথিবী তার মঙ্গলময় হাত প্রসারিত করে আমার কন্যার দিকে। দুঃখ-বেদনার সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রগাঢ় আনন্দ বারবার আন্দোলিত করে আমার মা-মণিকে।



পাখি

উইন্টার কোয়ার্টার শুরু হয়েছে। শীত এখনো তেমন পড়েনি। ওয়েদার ফোরকাস্ট হচ্ছে দু'একদিনের মধ্যে প্রথম তুষারপাত হবে। এ বছর অন্য সব বছরের চেয়ে প্রচণ্ড শীত পড়বে,—এরকম কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। প্রাচীন মানুষেরা আকাশের রঙ দেখে শীতের খবর বলতে পারতেন। স্যাটেলাইটের যুগেও তাদের কথা কেমন করে জানি মিলে যায়।

ভোরবেলা ক্লাসে রওনা হয়েছি। ঘর থেকে বের হয়ে মনে হল আজ ঠাণ্ডাটা অনেক বেশি। বাতাসের প্রথম ঝাপটায় মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি ফিরে এসে পার্কা গায়ে দিয়ে রওনা হলাম। পার্কা হচ্ছে এমন এক শীতবস্ত্র যা পরে শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রী নিচেও দিব্যি ঘোরাফেরা করা যায়।

হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি পায়ের সামনে চড়ুই পাখির মতো কালো রঙয়ের একটা পাখি 'চিক্‌ চিক্‌' ধরনের শব্দ করছে। মনে হল শীতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আমি পাখিটিকে হাতে উঠিয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার আঙুলে ঠোঁট ঘষতে লাগলো। আমার মনে হলো পাখিদের কায়দায় সে বলল—তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তাকে নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। উদ্দেশ্য, আমার কন্যাকে পাখিটা দেব। সে জীবন্ত খেলনা পেয়ে উল্লসিত হবে। শিশুদের উল্লাস দেখতে বড় ভালো লাগে।

আমার কন্যা পাখি দেখে মোটেই উল্লসিত হলো না। ভয় পেয়ে চেঁচাতে লাগলো। খুশি হল মেয়ের মা। সে বারবার বলতে লাগল—ও মা কী সুন্দর পাখি! ঠোঁটগুলো দেখ, মনে হচ্ছে চমৎকার করেই গোল্ডের তৈরি। সে পাখিকে পানি খেতে দিল, ময়দা গুলে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পাখি কিছুই স্পর্শ করল না। একটু পরপর বলতে লাগল 'চিকু চিকু'। ক্লাসের সময় হয়ে যাচ্ছিল, আমি ক্লাসে চলে গেলাম। পাখির কথা আর মনে রইল না।

বিকেল তিনটার দিকে আমার কাছে একটা টেলিফোন এল। এক আমেরিকান মহিলা খুবই পলিশড গলায় বলল, মিঃ আমেদ, তুমি কি কোন পাখি কুড়িয়ে পেয়েছ?

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এই খবর জানলে কোত্থেকে?

আমার বস আমাকে বললেন, আমি ফারগো পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির অফিস থেকে বলছি।

আমি আতংকিত গলায় বললাম, পাখিকে বাসায় নিয়ে যাওয়া কি বেআইনি?

ঃ ন, বেআইনি নয়। আমরা তোমার পাখিকে পরীক্ষা করতে চাই। মনে হচ্ছে ওর ডানা ভেঙে গেছে।

ঃ আমি কি পাখিকে নিয়ে আসবো?

ঃ তোমাকে আসতে হবে না, আমাদের লোক গিয়ে নিয়ে আসবে। তোমার অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বার বল।

আমি নাম্বার বললাম। এবং মনে মনে ভাবলাম, এ কী যন্ত্রণায় পড়া গেল।

বাসায় এসে দেখি পাখিটির জন্য আমার স্ত্রী কার্ডবোর্ডের একটা বাসা বানিয়েছে। নানান খাদ্যদ্রব্য তাকে দেওয়া হচ্ছে। সে কিছু কিছু খাচ্ছেও। তবে আমার কন্যার ভয় ভাঙেনি। সে মার কোল থেকে নামছে না। পাখির কাছে নিয়ে গেলেই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে।

আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম পাশের অ্যাপার্টমেন্টের এক মহিলা এসেছিলেন বেড়াতে, পাখি দেখে তিনিই টেলিফোন করেন।

পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির লোক এসে সন্ধ্যার আগে পাখি নিয়ে গেল। রাত আটটায় টেলিফোন করে জানাল যে পাখিটার ডানা ভাঙা। এক্সরেতে ধরা পড়েছে। তাকে পশু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ডানা জোড়া লাগানো যায়। যদিও এসব ক্ষেত্রে চেষ্টা সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ তো দেখি ভালো যন্ত্রণা হল। মুখে বললাম, আমি খুবই আনন্দিত যে পাখিটার একটা গতি হচ্ছে। পাখি নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

সাতদিন কেটে গেল। পাখির কথা প্রায় ভুলতে বসেছি, তখন টেলিফোন এল হাসপাতাল থেকে। ডাক্তার সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, ডানা জোড়া লেগেছে।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

ঃ পাখিটি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঃ তার কোন প্রয়োজন দেখছি না। আমার মেয়ে এই পাখি ঠিক পছন্দ করছে না। সে উলের কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে পাখিটাকে মেরে ফেলতে পারে বলে আমার ধারণা।

ঃ তাহলে তো বিরাট সমস্যা হল।

ঃ কী সমস্যা?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঃ দেখ, এটা হচ্ছে মাইগ্রেটরী বার্ড। শীতের সময়ে গরমের দেশে উড়ে চলে যায়। সমস্যাটা হল ফারগোতে শীত পড়ে গেছে। এই গোত্রের পাখি সব উড়ে চলে গেছে। একমাত্র তোমার পাখিটিই যেতে পারেনি।

ঃ এখন করণীয় কী?

ঃ ছমাস পাখিটাকে পালতে হবে। গোটা শীতকালটা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ঃ আমি তোমাকে আগেই বলেছি আমার পক্ষে সম্ভব না।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, কোন কুক্ষণে না জানি এই পাখি ঘরে এনেছিলাম।

একদিন পর আবার পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির বড়-কর্তার টেলিফোন, আমেদ, তুমি নাকি তোমার পাখি নিতে রাজি হচ্ছ না?

ঃ এটা আমার পাখি না; বনের পাখি; খানিকক্ষণের জন্যে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম।

ঃ পাখিটির এই দুঃসময়ে তুমি তার পাশে দাঁড়াবে না? এই মাইগ্রেটরী পাখি যাবে কোথায়?

ঃ আমি খাঁটি বাংলা ভাষায় বললাম, জাহান্নামে যাক।

ঃ তুমি কী বললে?

ঃ বললাম যে তোমরা একটা ব্যবস্থা কর। আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার মেয়ে পাখি পছন্দ করে না। আমি বরং এই ছমাস পাখিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে যা খরচ হয় তা দিতে রাজি আছি।

ভদ্রলোক বললেন, দেখি কী করা যায়। বাকি দিনগুলি আতংকের মধ্যে কাটতে লাগলো। টেলিফোন বাজলেই চমকে উঠি, ভাবি এই বুঝি পশুপাখিওয়ালারা নতুন ঝামেলা করছে।

দিন দশেক পার হল। আমি হাঁফ ছেড়ে ভাবলাম, যাক আপদ চুকেছে। তখন আবার টেলিফোন। সেই পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতি। তবে এবার তাদের গলায় আনন্দ ঝরে পড়ছে

ঃ আমেদ, সুসংবাদ আছে।

ঃ কী সুসংবাদ?

ঃ তোমার পাখির একটা গতি করা গেছে।

ঃ তাই নাকি? বাহ, কী চমৎকার!

ঃ আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সিয়াটল ওয়াশিংটনে এই পাখি এখনো আছে। সিয়াটলে শীত এখনো তেমন পড়েনি। কাজেই পাখিরা মাইগ্রেট করেনি।

ঃ বল কী!

ঃ আমরা তোমার পাখিটি সিয়াটল পাঠিয়ে দিচ্ছি। সিয়াটলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। সে অন্য পাখিদের সঙ্গে মিশে মাইগ্রেট করবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঃ অসাধারণ।

ঃ আপনী মঙ্গলবার পাখিটি সিয়াটল যাচ্ছে। তুমি বেলা তিনটায় গ্রেহাউণ্ড বাস স্টেশনে চলে আসবে। শেষবারের মত তোমার পাখিটাকে হ্যালো বলবে।

ঃ অবশ্যই বলব।

সিয়াটল ফার্গো থেকে তিন হাজার মাইল দূরে। পাখিটাকে খাঁচায় করে গ্রেহাউণ্ড গাড়ির ড্রাইভারের হাতে তুলে দেয়া হল। আমি হাত নেড়ে পাখিটাকে বাই জানালাম।

মনে মনে বললাম, এই আমেরিকানরাই মাই লাই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বোমা ফেলে জাপানিদের নাগাসিকিতে। কী করে তা সম্ভব হয় কে জানে!

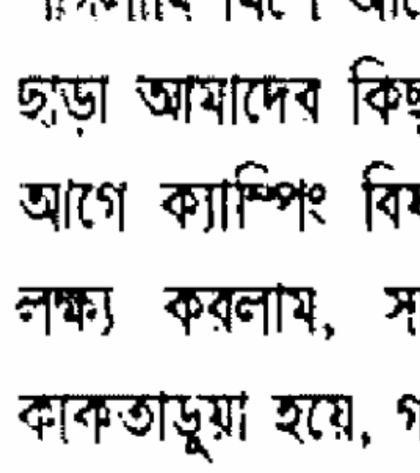

ক্যাম্পে

আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল আমেরিকানরা জাতি হিসাবে আধাপাগল। এদের রক্তে পাগলামি মিশে আছে। এমন সব কাণ্ডকারখানা করে যা বিদেশী হিসেবে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আমাদের কিছু করার থাকে না। যেমন ওদের ক্যাম্পিং এর ব্যাপারটা ধরা যাক। আগে ক্যাম্পিং বিষয়ে কিছুই জানতাম না। কেউ আমাকে কিছু বলেও নি। নিজেই লক্ষ্য করলাম, সামারের ছুটিতে দলবল নিয়ে এরা কোথায় যায়। ফিরে আসে কাকতাড়ুয়া হয়ে, গায়ের চামড়া খসখসে, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, চুল উস্কুখুস্কু। ওজনও অনেক কমে গেছে। সেই কারণেই হয়ত সবাইকে খানিকটা লম্বা দেখায়। কোথায় গিয়েছিলে জিজ্ঞেস করলে বলে,--ক্যাম্পে।

ঃ সেটা কি?

ঃ ক্যাম্পিং কি তুমি জান না?

ঃ না।

আমার 'না' শুনে তারা এমন একটি ভঙ্গি করে—যেন আমার মত জংলি এ দেশে কেন এল তা তারা বুঝতে পারছে না।

খোঁজ নিয়ে জানলাম প্রতিটি আমেরিকান পরিবার বছরে খানিকটা জংগলে কাটায়। তাঁবুটাবু নিয়ে কোন-এক বিজন বনে চলে যায়। একে তারা বলে প্রকৃতির কাছাকাছি চলে যাওয়া।

ল্যাবরেটরীতে আমার সঙ্গে কাজ করে কোয়াণ্ডাল। সে তার ছেলে বন্ধুকে নিয়ে ক্যাম্পিং-এ গেল। ফিরে এল হাতে এবং পায়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন নিয়ে! গিজলি বিয়ার (প্রকাণ্ড ভালুক) নাকি তাদের তাঁবু আক্রমণ করেছিল। ভয়াবহ ব্যাপার! অথচ রুথ

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কোয়াণ্ডাল এমন ভাব করছে যেন জীবনে এরকম ফান হয়নি। আমি মনে মনে বললাম, বদ্ধ উন্মাদ।

উন্মাদ রোগ সম্ভবত ছোঁয়াচে, কারণ পরের বছর আমি নিজেও ক্যাম্পিং-এ যাব বলে ঠিক করে ফেললাম। দেখাই যাক ব্যাপারটা কি। আমার দ্বিতীয় মেয়েটির বয়স তখন তিন মাস। ফার্গো শহরে যে ক'টি বাঙালি পরিবার সে সময় ছিল সবাই আমাকে আটকাবার চেষ্টা করল। তাদের যুক্তি—এত বাচ্চা একটা মেয়ে নিয়ে এরকম পাগলামির কোন মানে হয় না। মানুষের উপদেশ আমি খুব মন দিয়ে শুনি, তবে উপদেশ মত কখনো কিছু করি না। কাজেই চল্লিশ ডলার দিয়ে ইউনিভারসিটি থেকে একটা তাঁবু ভাড়া করলাম, একটা এলুমিনিয়ামের নৌকা ভাড়া করলাম, আর ভাড়া করলাম ক্যাম্পিং-এর জিনিসপত্র। সেই সব জিনিসপত্রের মধ্যে আছে কুড়াল, ফার্স্ট এড বক্স, সাপে কাটার অষুধ এবং কী আশ্চর্য একটা হ্যারিকেন। খোদ আমেরিকাতেও যে কেরোসিনের হ্যারিকেন পাওয়া যায় কে জানত।

যথাসময়ে গাড়ির ছাদে নৌকা বেঁধে রওয়ানা হয়ে গেলাম। গায়ে ক্যাম্পিং-এর পোশাক—হাফ প্যান্ট এবং বস্তার মত মোটা কাপড়ের ফ্ল্যাপ দেয়া শার্ট, মাথায় ক্রিকেট আম্পায়ারদের টুপির মত ধবধবে সাদা টুপি। গাড়ি চলছে ঝড়ের গতিতে। বনে যাবার এই হচ্ছে নিয়ম। স্পীডিং-এর জন্য পুলিশ অবশ্যই গাড়ি থামাবে, তবে যখন বুঝবে এই দল ক্যাম্পিং-এ যাচ্ছে তখন কিছু বলবে না। ক্যাম্পিং-এর প্রতি সব্বারই কিছুটা দুর্বলতা আছে।

ফার্গো শহর থেকে দুশ দশ কিলোমিটার দূরে একটা ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে গাড়ি থামালাম। সমস্ত আমেরিকা জুড়ে অসংখ্য ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড আছে। ব্যক্তি মালিকানায় এইসব পরিচালিত হয়। টাকার বিনিময়ে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে ঢোকা যায়। সেখানে ছোটখাটো একটা অফিস থাকে। বিজন জংলি জায়গা হলেও অফিসটা খুব আধুনিক হয়। টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকে, ছোটখাটো বার থাকে, গ্রোসারী শপ এবং বেশ কিছু ভেণ্ডিং মেশিন থাকে। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী মিলে অফিস এবং দোকানপাট দেখাশোনা করেন।

আমার গাড়ি ঢোকা মাত্রই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের ওয়ার্ডেন বিশালদেহী এক আমেরিকান বের হয়ে এল এবং অনেকটা মুখস্থ বক্তৃতার মত বলল, তুমি চমৎকার একটি জায়গায় এসেছ। এর চেয়ে ভাল ক্যাম্পিং গাউণ্ড নর্থ আমেরিকায় আর নেই। আমরা তুলনামূলকভাবে টাকা বেশি নিই, তবে এক রাত কাটালেই বুঝতে পারবে কেন নিই। এমন অপূর্ব দৃশ্য তুমি কোথায়ও পাবে না। তোমার সামনে সল্ট হ্রদের নীল জলরাশি, পেছনে গভীর বন। এ ছাড়াও তুমি পাচ্ছ আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ, যেমন খবরের কাগজ এবং ফ্ল্যাস টয়লেট. . .

ভদ্রলোকের বক্তৃতার মাঝখানেই আমি বললাম, কত দিতে হবে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দেখা গেল টাকার পাকনাগ আসলেই অনেক বেশি। হ্রদে নৌকা ভাসানোর জন্য ফী দিতে হল, মাছ ধরার জন্য পারমিট কিনতে হল . . . নানান ফ্যাকড়া।

ঝামেলা মিটিয়ে রওয়ানা হলাম জায়গা বাছতে। কোথায় তাঁবু ফেলব সেই জায়গা। ওয়ার্ডেনের স্ত্রী (উনার সাইজও কিংকং-এর মত) আমাকে সাহায্য করতে নিজেই এগিয়ে এলেন। হ্রদের পাশে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল। কাঁচের মত স্বচ্ছ জল। দশ ফুট নিচের পাথরের খণ্ডটিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হ্রদ যত না সুন্দর পেছনের অরণ্য তার চেয়েও সুন্দর। যে কোন সুন্দর জিনিসের সঙ্গে খানিকটা বিষণ্ণতা মেশানো থাকে। আমার মন বিষণ্ন হয়ে গেল। গুলতেকিন বলছে— এত সুন্দর! এত সুন্দর!

হ্রদের কাছাকাছি তাঁবু খাটাবার জায়গা ঠিক করে কিংকং ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানালাম। ভদ্রমহিলা যাবার আগে বলে গেলেন, ক্যাম্পিং-এর যাবতীয় জিনিসপত্র নামমাত্র মূল্যে তাঁদের কাছে ভাড়া পাওয়া যাবে। তবে তারা চেক গ্রহণ করেন না। পেমেন্ট হবে ক্যাশে।

সকাল এগারটার মত বাজে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে, বাতাসে ঘাসের বিচিত্র গন্ধ, চারদিক নিঝুম। ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা এনেছিলাম। চা শেষ করে প্রবল উৎসাহে তাঁবু খাটাতে লেগে গেলাম। তাঁবুর সঙ্গে একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়েল আছে—কোন খুঁটি কিভাবে পুঁততে হয়, তাঁবুর কোন অংটা কোন খুঁটিতে যাবে সব পরিষ্কার করে লেখা। কাজটা খুবই সহজ মনে হল। ঘণ্টা খানেক পার হবার পর বুঝলাম কাগজপত্রে কাজটা যত সহজ মনে হচ্ছিল আসলে তত সহজ নয়। তাঁবুর একটা দিক যখন কোন মতে দাঁড়ায় তখন অন্য দিক ঝুলে পড়ে। সেইটা ঠিক করতে যখন যাই তখন গোটা তাঁবু মাটিতে শুয়ে পড়ে। আমার স্ত্রী এই দু ঘণ্টায় পঞ্চাশবারের মত ঘোষণা করল যে, আমার মত অকর্মণ্য মানুষ সে আর দেখেনি। সে হলে দশ মিনিটের মাথায় নাকি তাঁবু ঠিক করে ফেলত। আমি তাকে তার প্রতিভা প্রমাণ করার সুযোগ দিলাম। এবং আরো এক ঘণ্টা নষ্ট হল। দেখা গেল তাঁবু খাটানোয় তার প্রতিভা আমার মতই।

আমাদের তাঁবু কেমন খাটানো হয়েছে দেখার জন্য ওয়ার্ডেনের স্ত্রী বিকেলের দিকে এলেন এবং বললেন, সামান্য ফিসের বিনিময়ে তাঁবু খাটানোর কাজটা তাঁরা করে দেন।

ফী দেওয়া হল এবং চমৎকার তাঁবু তারা খাটিয়ে দিল। দুপুরে আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি। খিদেয় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে! বন থেকে কুড়াল দিয়ে কাঠ কেটে এনে আগুনে মাংস ঝলসে খাওয়াই হচ্ছে নিয়ম।

কাঠ যোগাড় হল, কিন্তু কিছুতেই আগুন ধরানো গেল না। কেরোসিন ঢেলে দিলে আগুন জ্বলে ওঠে, খানিকক্ষণ জ্বলে তারপর আর নেই। আমি ওয়ার্ডেনের স্ত্রীকে (মিসেস সিমসন) গিয়ে বললাম, আপনি কি সামান্য ফিসের বিনিময়ে আমাদের চুলাটি ধরিয়ে দিবেন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভদ্রমহিলা আমার রসিকতায় খুবই বিরক্ত হলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, কেরোসিন কুকার পাওয়া যায়। তার একটি নিতে পার।

দশ ডলার দিয়ে কেরোসিন কুকার ভাড়া করলাম। দুপুরের লাঞ্চ শেষ হল সন্ধ্যের আগে আগে। আমাদের মত প্রচুর ক্যাম্পযাত্রী এখানে এসেছে, তবে তারা সবাই চলে গেছে বনের দিকে। জলের দেশের মানুষ বলে আমরাই একমাত্র জলের কাছাকাছি আছি। বনের চেয়ে জল আমাকে বেশি আকর্ষণ করে।

সন্ধ্যায় নৌকায় খানিকক্ষণ বেড়ালাম। আমেরিকান নিয়ম অনুযায়ী সবার জন্য লাইফ জ্যাকেট ভাড়া করতে হল—আরো কিছু টাকা পেলেন মিসেস সিমসন। নৌকায় থাকতে থাকতে চাঁদ উঠে গেল। বিশাল চাঁদ। পঞ্জিকা দেখে রওয়ানা হই নি। পাকে চক্রে পূর্ণিমার মধ্যে পড়ে গেছি। হ্রদের নিস্তরঙ্গ জলে চাঁদের ছায়া, দূরে বনরাজি, পাখপাখালির ডাক, অদ্ভুত পরিবেশ। আমি চিরকাল শহরবাসী, কাজেই পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। বারবার মনে হচ্ছে স্বর্গের যে সব বর্ণনা ধর্মগ্রন্থগুলিতে আছে সেই স্বর্গ কি এর চেয়েও সুন্দর?

তাঁবুতে ফিরলাম সন্ধ্যা মিলাবার অনেক পরে। গুলতেকিন রাতের খাবার বাঁধতে বসল। আমি বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বের হলাম। সে বলল, এই বনে কি বাঘ আছে?

আমি বললাম, আছে।

সে বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, বাঘ আমাদের কখন খেয়ে ফেলবে বাবা?

জগতের সত্যগুলি শিশুরা খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। কখনই তেমন বিচলিত হয় না। শিশুদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে।

দুর্বাঘাসের চাদরে আদিগন্ত ঢাকা। বড় গাছগুলির অধিকাংশের নাম আমি জানি না। উইলী, ওক এবং ইউক্লিপটাস চিনতে পারছি। চাঁদের আলোয় চেনা গাছগুলিকেও অচেনা লাগছে।

এক সময় আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার জন্য আমার প্রাচ্যদেশীয় চোখ প্রস্তুত ছিল না। একদল তরুণ-তরুণী বনের ভেতর ছোটাছুটি করছে। তাদের গায়ে কাপড়ের কোন বালাই নেই।

আমি শুনেছি আমেরিকানরা গভীর বনে প্রবেশ করার পর সভ্যতার শিকল—কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে। ফিরে যায় আদম এবং হাওয়ার যুগে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা যার নাম, এই দৃশ্য নিজের চোখে কখনও দেখব তা ভাবিনি।

দৃশ্যটি আমার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক বা অশ্লীল মনে হল না। বরং মনে হল এটাই স্বাভাবিক, এটাই হওয়া উচিত।

আমার মেয়ে বলল, বাবা ওদের কি খুব গরম লাগছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, চল আমরা ফিরে যাই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম। কত রাত তা জানা হল না, ঘড়ি দেখতে হচ্ছে করল না। মেয়ে দুটি তাঁবুতে ঘুমাচ্ছে। আমি এবং গুলতেকিন তাবুর বাইরে বসে আছি। স্বামী-স্ত্রীরা প্রেমিক-প্রেমিকার মত ভালবাসাবাসির কথা কখনো বলে না। সেই রাতে আমরা বিশ্বের আগের সময়ে কেমন করে যেন ফিরে গেলাম। পাশে বসা তরুণীটিকে অচেনা মনে হতে লাগল। বারবার মনে হচ্ছিল এত আনন্দ আছে পৃথিবীতে।

ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখা আমার কখনো হয়ে ওঠে না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার অনেক রাতে ঘুমুতে যাবার পরেও জেগে উঠলাম সূর্য ওঠার আগে।

সূর্যোদয়ের দৃশ্যটি এত সুন্দর কখনো ভাবিনি। আগে জানতাম না, সূর্যটাকে ডিমের কুসুমের মত দেখায়, জানতাম না ভোরবেলায় সূর্য এত বড় থাকে। এই সূর্য আকাশে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, তাও জানা ছিল না।

সকালে নাশতা হল দুধ এবং শিরিয়েলের। নাশতার পর দলবল নিয়ে মাছ ধরতে বের হলাম। আমেরিকায় বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে চাইলে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে লাইসেন্স করতে হয়। লাইসেন্সের ফী পনের ডলার। লাইসেন্স করা ছিল, তারপরও বুড়ি সিমসনকে পাঁচ ডলার দিতে হল। এটা নাকি লেক রক্ষণাবেক্ষণের ফী। বড়শি ফেলে মূর্তির মত বসে থাকার কাজটি খুব আনন্দদায়ক হবে মনে করার কোন কারণ নেই—তবু যেহেতু লাইসেন্স করেছি কাজেই বসে রইলাম। শুনেছিলাম আমেরিকান লেকভর্তি মাছ, টোপ ফেলতে হয় না, সুতা ফেললেই হয়, সুতা কামড়ে মাছ উঠে আসে। বাস্তবে সে রকম কিছু ঘটলো না। আমি পুরো পরিবার নিয়ে মাছ ধরার আশায় ঝাঁ-ঝাঁ রোদে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। মাছের দেখা নেই। এক সময় বুড়ি সিমসন এসে উদয় হলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, লেকের কোন জায়গায় মাছ টোপ খায় এবং কখন কিভাবে বড়শি ফেলতে হয় সেই বিষয়ে তাদের একটি বুকলেট আছে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে তা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়? কিনলাম বুকলেট এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ। বিশাল এক নরদারর্ণ পাইক ধরে ফেললাম। এই আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ মৎস্য শিকার। আমার বড় মেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, বাবা এটা কি তিমি মাছ? বাবা, আমরা কি একটা তিমি মাছ ধরে ফেলেছি?

দুপুরে লাঞ্চ হল সেই মাছ। ওয়েস্টার্ন ছবির কায়দায় আগুনে ঝলসিয়ে লবণ ছিটিয়ে খাওয়া। অন্য সময় এই মাছ আমি মুখেও দিতে পারতাম না। কিন্তু পরিবেশের কারণে সেই আগুনে ঝলসানো অখাদ্যকেও মনে হল স্বর্গের কোন খাবার।

লাঞ্চ শেষ হবার আগেই একটা দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। জানা গেল নবছর বয়সী একটা ছেলে দলছুট হয়ে বনে হারিয়ে গেছে। ছেলেটির বাবা-মা ভাইবোন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। বনে হারিয়ে যাবার ঘটনা নতুন কিছু না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

টিভি এবং খবরের কাগজে প্রায়ই এরকম খবর আসে। গত বছর উনিশ বছর বয়সী একটা মেয়ে মন্টানার এক বনে হারিয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করা হয় তের দিন পরে। সে এই তের দিন ব্যাঙ, সাপ-খোপ লতাপাতা খেয়ে বেঁচে ছিল। কেউ কেউ ইচ্ছে করেই বনে থেকে যায়। তেত্রিশ দিন পর হারিয়ে যাওয়া এক দম্পতিকে খুঁজে বের করার পর তারা বলেন—নাগরিক সভ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা বনে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা ভালই আছেন শহরে ফিরতে চান না।

ন বছর বয়সী শিশুটির নিশ্চয়ই এরকম কোন সমস্যা নেই। সে নিশ্চয়ই আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে। ক্যাম্পে সাজসাজ রব পড়ে গেল। স্টেট পুলিশকে খবর দেওয়া হল। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে দুটি হেলিকপ্টার বনের উপর দিয়ে চক্রাকারে উড়তে লাগল। হেলিকপ্টার থেকে জানানো হল বাচ্চাটিকে দেখা যাচ্ছে। একটা ফাঁকা জায়গায় আছে, নিজের মনে খেলছে। ভয়ের কিছু নেই।

বাচ্চাটিকে যখন উদ্ধার করা হল, সে গম্ভীর গলায় বলল, আমি হারাব কেন? আমার পকেটে তো কম্পাস আছে।

দু'দিন থাকবার পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েছিলাম, এক সপ্তাহ থেকে গেলাম। মিসেস সিমসন একদিন এসে বললেন, তোমরা আর থেকো না। বেশিদিন থাকলে নেশা ধরে যাবে। আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না। এই আমাদেরকে দেখ, বছরের পর বছর এই জায়গায় পড়ে আছি। ঘণ্টা খানিকের জন্যও শহরে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মিসেস সিমসন বললেন, সতেরো বছর আগে আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে ক্যাম্পিং-এ এই জায়গায় এসেছিলাম। এতই ভাল লাগল যে, লীজ নিয়ে ক্যাম্পিং স্পট বানালাম। তারপর থেকে এখানেই আছি। বছরে তিনটা মাস লোকজনের দেখা পাই, তারপর দুজনে একা একা কাটাই।

ঃ কষ্ট হয় না?

ঃ না। বনের অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে। তোমরা যারা দু'একদিনের জন্য আস, তারা তা ধরতে পার না। আমরা পারি। পারি বলেই . . .

মিসেস সিমসন তাঁর কথা শেষ করলেন না। আমি বললাম, রহস্যময় ব্যাপারগুলি কি?

ঃ ঐ সব তোমরা বিশ্বাস করবে না। ঐ প্রসঙ্গ বাদ থাক।

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বনের দিকে তাকালেন। রহস্যময় বন হয়ত কানে কানে তাঁকে কিছু বলল। দেখলাম তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মিসেস সিমসন বললেন, একটা মজার ব্যাপার কি জান? সমুদ্র মানুষকে আকর্ষণ করে। এত যে সুন্দর সমুদ্র তার পাশেও তিন চার দিনের বেশি মানুষ থাকতে পারে না। আর বন মানুষকে আকর্ষণ করে; মানুষকে সে চলে যেতে দেয় না। পুরোপুরি গ্রাস করতে চেষ্টা করে। কাজেই তোমরা চলে যাও।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমরা চলে গেলাম।

সব মিলিয়ে সাত দিন ছিলাম। মিসেস সিমসন তিন দিনের ভাড়া রাখলেন। শান্ত গলায় বললেন, তোমরা তিন দিন থাকতে এসেছিলে সেই তিন দিনের রেন্ট ই আমি নেখেছি। বাকি দিনগুলি কাটিয়েছ অতিথি হিসাবে। বনের অতিথি। বন তোমাদের থাকতে রেখেছে। কাজেই সেই চার দিনের ভাড়া রাখার কোন প্রশ্ন ওঠে না।



নামে কিবা আসে যায়

'সামার হলিডে' শুরু হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সবার মনই এই সময় খানিকটা তরল অবস্থায় থাকে। অত্যন্ত কঠিন অধ্যাপককেও এই সময় নরম এবং আদুরে গলায় কথা বলতে দেখা যায়।

আমার অধ্যাপকের নাম জোসেফ এডওয়ার্ড গ্লাস। গ্লাস নামের সার্থকতা বুঝানোর জন্যই হয়তো ভদ্রলোক কাঁচের মত কঠিন এবং ধারালো। সামার হলিডের তারল্য তাঁকে স্পর্শ করেনি। ভোর নটায় ল্যাবে এসে দেখি সে একটা বিকারে কপার সালফেটের সল্যুশান বানিয়ে খুব ঝাঁকাচ্ছে। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে, ভোরবেলা গ্লাসের সঙ্গে দেখা হলে সারাটা দিন খারাপ যাবে।

গ্লাসকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রবাদের কারণে নয়। মন খারাপ হলো কারণ ব্যাটার আজ থেকে ছুটিতে যাবার কথা। যায়নি যখন তখন বুঝতে হবে সে এই সামারে ছুটিতে যাবে না। ছুটির তিন মাস আমাকে জ্বালাবে। কারণ জ্বালানোর জন্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ল্যাবে নেই। সবাই ছুটি নিয়ে কেটে পড়েছে।

আমি প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ গলায় বললাম,—হাই।

গ্লাস আনন্দে সব ক'টা দাঁত বের করে বলল, তুমি আছো তাহলে? থ্যাংকস। এসো দু'জনে মিলে এই সল্যুশানটার ডিফারেনসিয়েল রিফ্রেকটিভ ইনডেক্স বের করে ফেলি।

আমি বললাম, এটা সম্ভব না। আমি আমার নিজের কাজ করবো। এর মধ্যে তুমি আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হবো।

বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকারা আমার জবাব শুনে হয়তো আঁতকে উঠেছেন। আমার পি-এইচ.ডি. গাইড এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রায় ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাবান একজন অধ্যাপকের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলা যায় কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ

Nirjoy

www.BanglaBook.org

থাকতে পারে না, তবে আমেরিকান চরিত্র সম্পর্কে যাদের কিছুটা ধারণা আছে, তারাই বুঝবেন আমার জবাব হচ্ছে যথাযথ জবাব।

প্রফেসর গ্লাস খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখে বলল, হামাদ, এটা সামান্য কাজ। এক ঘণ্টাও লাগবে না।

আমি বললাম, আমাকে হামাদ ডাকছ কেন? আমার নাম হুমায়ূন আহমেদ। হামাদটা তুমি পেলে কোথায়?

'নাম নিয়ে তুমি এত যন্ত্রণা করো কেন হামাদ? নামে কিবা যায় আসে? আমি একজন ওল্ডম্যান। তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি কাজটা করে দিতে। আর তুমি নাম নিয়ে যন্ত্রণা শুরু করে দিলে।'

আমি ডিফারেনসিয়েল রিফ্লেকটিভ ইনডেক্স বের করে দিলাম। ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা লাগলো। কোনো কিছুই হাতের কাছে নেই। সবাই ছুটিতে। নিজেকে ছুটাছুটি করে প্রত্যেকটি জিনিস জোগাড় করতে হয়েছে।

প্রফেসর গ্লাস আমার পাশেই চুরুট হাতে বসে খুব সম্ভব আমাকে খুশি রাখবার জন্যই একের পর এক রসিকতা করছে। রসিকতাগুলোর সাধারণ নাম হচ্ছে ডার্টি জোকস। ভয়াবহ ধরনের অশ্লীল।

বিকেল পাঁচটায় ল্যাব বন্ধ করে বাসায় ফিরবার আগে আগে গ্লাসের কামরায় উঁকি দিলাম। গ্লাস হাসি মুখে বলল, কিছু বলবে হামাদ?

ঃ হ্যাঁ, বলবো। আগেও কয়েকবার বলেছি। আজও বলবো।

ঃ তোমার নামের উচ্চারণের ব্যাপার তো?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ উচ্চারণ করতে পারি না বলেই তো একটু এলোমেলো হয়ে যায়। এতে এতো রাগ করবার কী আছে? আমেরিকানদের জিহ্বা শক্ত।

ঃ আমেরিকানদের জিহ্বা মোটেই শক্ত নয়। অনেক কঠিন উচ্চারণ এরা অতি সহজেই করে। তোমরা যখন কোনো ফরাসী রেস্টুরেন্টে যাও তখন খাবারের ফরাসী নামগুলো খুব আগ্রহ করে উচ্চারণ করো না?

গ্লাস গম্ভীর চোখে তাকিয়ে রইলো। কিছু বললো না।

আমি বললাম, এসো আমার সঙ্গে। চেষ্টা করো, বলো হুমায়ূন।

গ্লাস বললো, হেমেন।

আমি বললাম, হলো না, আবার বলো হুমায়ূন। হু-মা-যূ-ন।

গ্লাস বললো, ময়ান।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। আমেরিকায় পা দেবার পর থেকে যে জিনিসটি আমাকে পীড়া দিচ্ছে সেটা হচ্ছে শুদ্ধভাবে এরা বিদেশীদের নাম বলতে চায় না। ভেঙে-চুরে এমন করে যে রাগে গা জ্বলে যায়। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির মিজানুল

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ককে বলে থাকে। হাকু পাবলে হক বলতে অসুবিধা কোথায়? অন্য বিদেশীরা এই ব্যাপারটি কিভাবে নেয় আমি জানি না। আমার অসুবিধা বোধ হয়।

হংকংয়ের চাইনীজ ছাত্রদের দেখেছি এ ব্যাপারে খুবই উদার। তারা আমেরিকানদের উচ্চারণে সাহায্য করার জন্য নিজেদের চাইনীজ নাম পাল্টে পড়াশোনার সময়টার জন্যে একটা আমেরিকান নাম নিয়ে নেয়। যার নাম চান ইয়েন সে হয়তো খণ্ডকালীন একটা নাম নিলো, মিঃ ব্রাউন। দীর্ঘ চার বছরের ভার্সিটিতে সবাই ডাকবে মিঃ ব্রাউন। যদিও তার আসল নাম চ্যান ইয়েন। হংকংয়ের চাইনীজগুলো এই কাজটি কেন করে কে জানে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে দার্শনিকের মতো বলল,—ভুল উচ্চারণে আসল নাম বলার চেয়ে শুদ্ধ উচ্চারণে নকল নাম বলা ভালো। তাছাড়া নাম আমেরিকানদের কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা হচ্ছে ফাজিলের দেশ। নামের মধ্যেও এরা ফাজলামি করে। তাই না?

নাম নিয়ে যে এরা যথেষ্ট ফাজলামি করে সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণ নেই। এরা পশুর নামে নাম রাখে যেমন, Mr.Fox, Mr. Lion, Mr. Lamb. এরা কীট-পতঙ্গের নামে নাম রাখে যেমন, Mr. Beetle (গুবরে পোকা)। একটা নাম পেয়েছিলাম যার বাংলা মানে—ষাঁড়ের গোবর (Mr. Bull dung Junior)। অবশ্যি বাংলা ভাষাতেও খেদা, গেদা নাম রাখা হয়। তবে সেসব নাম নিয়ে আমরা বড়াই করি না। আমেরিকানরা করে। আমি একজন আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ছাত্র পেয়েছিলাম সে খুব বড়াই করে বললো—আমার নাম Back Bison (বাইসনের পাছা)।

দুনিয়াকে সরা জ্ঞান করার একটা প্রবণতা আমেরিকানদের আছে। ঢাকা শহরে একবার এক আমেরিকানকে খালি গায়ে হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছি। গাড়িতে একজন বাঙালি তরুণী এবং দুইজন বাঙালি যুবক। আমি জানি না, তবে আমার বিশ্বাস আমেরিকানটির খালি গায়ে গাড়ি চালানোর যুক্তি বোধহয় এদেশে গরম। আমাদের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতায় এই আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়, এটা তারা জেনেও এই কাজ করবে। ভাবটা এরকম, আমরা কোন কিছুই পরোয়া করি না। এরা যখন আমাদের দেশে আসবে তখন আমাদের আচার-আচরণকে সম্মান করবে এটা আমার বিশ্বাস আশা করবো। তারা যখন তা করবে না তখন মনে করিয়ে দেবো যে তারা যা করছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা প্রায় কখনোই তা করি না। সাদা চামড়া দেখলে এখনো আমাদের হুঁশ থাকে না। যাক পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

আমি খুব যে একজন বিপ্লবী ধরনের ছেলে তা নয়। বড় বড় অন্যায় দেখি কিন্তু তেমন কোনো সাড়াশব্দ করি না। সব সময় মনে হয় প্রতিবাদ অন্যেরা করবে আমার ঝামেলায় যাবার দরকার নেই। তবু বিকৃত উচ্চারণে বিদেশীদের নাম বলাটা কেন জানি শুরু থেকেই সহ্য হলো না। একটা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম যাতে আমেরিকানরা শুদ্ধ নামে ডাকার একটা চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরের কাগজে চিঠি লিখলাম, আমার যুক্তি আমেরিকানরা ইচ্ছে করে বিদেশীদের ভুল উচ্চারণে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ডাকে। উদাহরণ হচ্ছে, শীলা নামটা সঠিক উচ্চারণ না করতে পারার কোনোই কারণ নেই। এর কাছাকাছি নাম তাদের আছে। কিন্তু যেই তারা দেখবে এই নামটা একজন বিদেশীর, অমনি উচ্চারণ করবে—শেইল (Sheila), এর মানে কী?

সাত বছর ছিলাম আমেরিকায়। এই সাত বছরে অনেক চেষ্টা করলাম ওদের দিয়ে শুদ্ধভাবে আমার নামটা বলাতে। পারলাম না। ফল এই হল যে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রটে গেল 'হামাম' নামের এই ছেলের মাথায় খানিকটা গণ্ডগোল আছে। তবে ছেলে ভালো।

বিদেশের পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে আসছি। আমার দেশে ফিরে যাওয়া উপলক্ষে প্রফেসর গ্লাস তার বাড়িতে একটা পার্টি দিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, এই পার্টিতে প্রথমবারের মতো সে শুদ্ধ উচ্চারণ করলো। আমার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের সুন্দর পরিণতি। আমার ভালো লাগার কথা। আনন্দিত হবার কথা। কেন জানি ভালো লাগলো না।

গ্লাস গাড়িতে করে আমাকে পৌঁছে দিচ্ছে।

আমি বললাম, এই তো সুন্দর করে তুমি আমার নাম বলতে পারছো। আগে কেন বলতে পারতে না?

গ্লাস খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললো, বিদেশীদের আমরা একটু আলাদা করে দেখি। আমরা তাদের রহস্যময়তা ভাঙতে চাই না। তাদের অন্য রকম করে ডাকি। অন্য কিছু না।

অধ্যাপক গ্লাসের কথা কতোটুকু সত্যি আমি জানি না। সে যেভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছে অন্যরাও সেভাবে দেখেছে কিনা তাও জানি না। গ্লাসের কথা আমার ভালই লাগলো। আমি হাসিমুখে বললাম, তুমি আমাকে তোমার মত করেই ডাকো।

বিদায় নিয়ে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্লাস বললো, হামন, ভালো থেকো এবং আগলি আমেরিকানদের কথা মনে রেখো।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



সমুদ্র দর্শন

তেত্রিশ বছর আগের কথা।

ক্লাস সিক্সে পড়ি। স্কুলের নাম চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুল। ক্লাস টিচারের নাম মুখলেসুর রহমান, যদিও সবাই তাঁকে চেনে দেড়-ব্যাটারী নামে। দেড়-ব্যাটারী নামকরণের উৎস জানি না। সম্ভবত শারীরিক উচ্চতার সঙ্গে এই নাম সম্পর্কিত। স্যার হলেন বেঁটেখাট মানুষ, ভারিক্কি গড়ন, মিলিটারীর প্যারেডের ভঙ্গিতে হাঁটেন। তাঁর শারীরিক কোন সমস্যা আছে, খানিকক্ষণ পরপর মাথা দুলিয়ে বিচিত্র এক ঝাঁকি দেন। আমরা হাসতে গিয়েও হাসি না। হাসি গিলে ফেলি, কারণ দেড়-ব্যাটারী স্যারের ধমক স্কুল-বিখ্যাত। তাঁর ধমকে প্রতি বছরই নিচের ক্লাসের ভীতু টাইপের কিছু ছাত্র প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলে। স্যার নিজেই এদের স্কুলের বারান্দায় নিয়ে গোসল করিয়ে দেন। বিরক্ত গলায় বলেন, এত ভয় পাস কেন রে গাধা? আমি তো শুধু ধমকই দেই। কখনো কি মারি? আমার হাতে কখনো বেত দেখেছিস?

মজার ব্যাপার হচ্ছে স্যারের মারও স্কুল-বিখ্যাত। কিল-চড়, কানে মলা, পেনসিলের ডলা, ডাস্টারের বাড়ি — শাস্তির প্রতিটি শাখাতেই তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে, তবে বেত না। স্যারের হাতে বেত আমরা আসলেই দেখিনি।

তেত্রিশ বছর আগে শারীরিক শাস্তি শিক্ষা-ব্যবস্থার অংগ হিসেবে ধরা হত। বছরের শুরুতে স্কুলের জন্যে চক ডাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে নানান ধরনের বেত কেনা হত। স্যাররা ক্লাসে ঢুকতেন ডাস্টার এবং বেত নিয়ে। পড়া শুরু করার আগে শরীর গরম করে নেয়ার কায়দায় শাস্তি চলত। বাবা-মা'রা এতে কিছু মনে করতেন না। বরং খুশি হতেন, ছেলে ঠিক জায়গায় আছে। শরীরের যেসব জায়গায় বেতের দাগ পড়বে সেইসব জায়গা বেহেশতে যাবে, এমন কথাও শোনা যেত।

দেড়-ব্যাটারী স্যার প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম ছিলেন না, তবে একটি বিষয়ে অন্য স্যারদের সঙ্গে তাঁর ঘোরতর অমিল ছিল। ছাত্রকে শাস্তি দেয়ার পর তাঁর মন খারাপ হত। তীব্র অনুশোচনায় কাতর হতেন। প্রায়ই এমন হয়েছে যে শাস্তি প্রদানের পর তাঁর রাগ পড়ে গেছে, ছাত্র ব্যথায় কাঁদছে, তিনিও অনুশোচনায় কাঁদছেন। বড়ই মজার দৃশ্য। এর মধ্যেই নানান কাণ্ড ঘটে যেত।

অস্বস্তির সঙ্গে বলছি — ছাত্র পড়ানো ছাড়া অন্য সব কাজ তিনি খুব চমৎকার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পারতেন। সম্ভবত এই কারণে তাঁকে জটিল কোন ক্লাস দেয়া হত না। তিনি ড্রয়িং ক্লাস নিতেন, লাইব্রেরী ক্লাস নিতেন। ড্রীল করাতেন, অন্য স্যারদের অনুপস্থিতিতে হঠাৎ যদি তাঁকে অংক বা ভূগোল ক্লাসে আসতে হত — তিনি খুব বিমর্ষ বোধ করতেন। অংক ক্লাসে তিনি আমাদের নামতা ধরতেন। "বল দেখি তিন সাতে কত? না পারলে আজ কিন্তু কিয়ামত। অংক কিছু না, আসল জিনিস নামতা।" ভূগোল ক্লাসে ঢুকতেন একটা গ্লোব নিয়ে। করুণ চোখে গ্লোবটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি সময় পার করে দিতেন।

আমরা এই স্যারকে নানাবিধ কারণে খুব পছন্দ করতাম। প্রথম কারণ, তিনি ক্লাসে কিছু পড়াতেন না এবং পড়া ধরতেন না। বাড়ির কাজ দিতেন, তবে দেখতেন না। দ্বিতীয় কারণ, তিনি আমাদের প্রত্যেকের নামে দু' লাইন থেকে চার লাইনের ছড়া বলতেন। উদাহরণ দিয়ে বলি — আমার নাম হুমায়ূন। আমাকে দেখলেই বলতেন,

হুমায়ূন
তোমার নেই কোন গুণ।

আমাদের ক্লাসের ছাত্র হামিদ রেজা খানকে দেখলেই বলতেন —

হামিদ রেজা খান
রাখবে দেশের মান।

আমাদের স্কুলের দপ্তরী রাসমোহন। তাকে দেখলেও বলতেন —

রাসমোহন
তুমি আছ কেমন?

স্যারকে পছন্দ করার তৃতীয় কারণ হল — তিনি ছিলেন আমাদের সংগীত শিক্ষক। আমরা সব ছাত্র তাঁর লেখা এবং তাঁর সুর দেয়া গান সমবেতভাবে গাইতাম, স্যার বিমলানন্দ উপভোগ করতেন। এইসব সংগীতের সবই গণসংগীত। একটা ছিল ছাদ পিটানো গান। আমরা বেঞ্চিতে দু'হাতে ছাদ পিটাবার মত করে থাবা দিতে দিতে গাইতাম —

ঘড়িতে দশটা বাজে
পাঁচটা কেন বাজে না বাবুজী॥

[বেঞ্চিতে হাত দিয়ে পরপর তিনবার শব্দ -- ধপ, ধপ, ধপ]

ঘড়িতে ১১টা বাজে
পাঁচটা কেন বাজে না বাবুজী॥

[ধপ, ধপ, ধপ]

ঘড়িতে ১২টা বাজে
পাঁচটা কেন বাজে না বাবুজী॥

[ধপ, ধপ, ধপ]

এইভাবে ঘড়িতে পাঁচটা বাজলে গান শেষ হত।

স্যারের নিয়ম ছিল ক্লাসে একজন অপরাধ করলে সবার শাস্তি পেতে হত। গণসংগীতের মতই গণশাস্তি। সে শাস্তিও খুব মজার। সবাইকে বেঞ্চির উপর উঠে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] বলা হত। আমরা উঠে দাঁড়াতাম। স্যার বলতেন ওয়ান-টু-থ্রী . . .

আমরা এক সঙ্গে গানের সুরে বলতাম,

"অপরাধ করেছি।"

স্যার বলতেন থ্রী-টু-ওয়ান। আমরা বলতাম,

"ক্ষমা চাই॥"

স্যার বলতেন — যা, ক্ষমা করলাম!

এমন একজন বিচিত্র মানুষকে পছন্দ না-করার কোন কারণ নেই। সবচে' বড় কথা [illegible] — তিনিই ছিলেন একমাত্র শিক্ষক যিনি বলতেন পড়াশোনার কোন বড় ব্যাপার [illegible] রে গাধা। ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়াটা কিছু না। যে কেউ নিয়মমত পড়লে ফার্স্ট সেকেন্ড হবে। বড় ব্যাপার হল . . . ।

বড় ব্যাপার কি তা স্যার বলতেন না। চিন্তিত মুখে আমাদের দিকে তাকাতেন। নিজের মাথা চুলকাতেন, ভুরু কুঁচকাতেন। সম্ভবতঃ কোনটা বড় ব্যাপার তা তাঁর নিজের কাছেও স্পষ্ট ছিল না।

সেবার আমাদের ক্লাসের সবাই ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাস করে সেভেনে উঠেছি। শুধু ফেল করেছে জামাল-কামাল দুই ভাই। দু'জনেই মহাবিচ্ছু। একবার পকেটে করে দুই সাপ নিয়ে এসেছিল। আমরা সবাই ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে উঠলাম — জামাল কামাল দুই ভাই পুরোনো ক্লাসে পড়ে রইল এবং চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন মুখলেস স্যার। স্যারের কান্নায় দ্রবীভূত হয়েই আমাদের হেড স্যার জামাল কামালকে প্রমোশন দিয়ে দিলেন। আনন্দে সবচে' বেশি লাফালাফি করতে লাগলেন আমাদের স্যার। সেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হল স্যারের ঘোষণায়। স্যার আমাদের ডেকে বললেন — তিনি আমাদের রেজাল্টে অত্যন্ত খুশি। সেন্ট পারসেন্ট পাস, এরকম কখনো হয় না। কাজেই উপহারস্বরূপ তিনি আমাদের সমুদ্র দেখিয়ে আনবেন। কক্সবাজার নিয়ে যাবেন, দু' টাকা করে চাঁদা।

কক্সবাজার কোন হাতের কাছের ব্যাপার নয়, একশ মাইল দূরের পথ। দু' টাকায় এত দূর যাওয়া, এক রাত থেকে ফিরে আসা কি করে সম্ভব আমি জানি না — স্যার যখন বলেছিলেন কোন একটা ব্যবস্থা হবেই। আমরা চাঁদার টাকা জোগাড় করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে লাগলাম। আমাদের সময় বাবা-মা'র কাছ থেকে টাকা বের করা কঠিন ব্যাপার ছিল।

একদিন সত্যি সত্যি পঁয়ত্রিশ জন ছেলেকে নিয়ে স্যার কক্সবাজার রওনা হলেন। মুড়ির টিন জাতীয় বাস। সেই বাস দুলতে দুলতে চলেছে। কিছু দূর গিয়ে অনেকক্ষণ থেমে থাকে। যাত্রী জোগাড় করে আবার হেলতে দুলতে চলে। আজকাল তিন ঘণ্টায় কক্সবাজার পৌঁছা যায়। তখন সময়ের কোন হিসাব ছিল না। আমরা সকাল ন'টায় রওনা হয়ে রাত দশটায় পৌঁছলাম। স্যার আমাদের সমুদ্রে নিয়ে গেলেন না — এক স্কুল ঘরে নিয়ে তুললেন। মেঝেতে চাটাই পেতে দেয়া আছে। চাটাইয়ের উপর খড় বিছানো। সেই খড়ের উপর চাদর। আমরা খিচুড়ি খেয়ে ঘুমুতে গেলাম। স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব আমাদের জন্যে খিচুড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন স্যার বলে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দিলেন খুব ভোরে উঠতে হবে। ভোরে আমাদের সমুদ্র দেখাতে নিয়ে যাবেন, তবে কেউ সমুদ্রে নামতে পারবে না। কেউ যদি সমুদ্রে নামে — মেরে তক্তা বানিয়ে দেবেন। এতগুলি ছেলের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। তিনি একা মানুষ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভোরবেলায় সমুদ্র দেখতে গেলাম। সমুদ্র দেখে হকচকিয়ে গেলাম। আকাশের মত বিশাল কিন্তু নিঃস্তব্ধ নয় — প্রাণময়। এমন বিশাল এবং প্রায় জীবন্ত কিছু যে পৃথিবীতে থাকতে পারে ভ' ছেলেমানুষী কল্পনায় এর আগে কখনো আসেনি। সমুদ্রের তীব্র আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। সে সারাক্ষণ ডাকে, আয় আয় — কাছে আয়। সেই আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা সম্ভব হল না। স্যারের কঠিন নিষেধ ভুলে গিয়ে জুতা পায়ে ছুটে গেলাম — প্রায় হাঁটু পানিতে। স্যার এসে ঘাড় ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে এলেন। তারপর শুরু হল মার। কঠিন মার। সমগ্র স্কুল জীবনে আমি প্রচুর শাস্তি পেয়েছি — এমন কঠিন শাস্তি কখনো পাইনি। শারীরিক দুঃখের চেয়েও গভীর অপমানবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করল। স্যার বললেন, এইখানে বসে থাকবি। সমুদ্রের দিকে তাকাবি না — উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে বোস। এখান থেকে এক পা নড়লে টান দিয়ে মাথা ছিঁড়ে ফেলব।

আমি সমুদ্রের কাছে এসে, সমুদ্রের উল্টোদিকে মুখ হয়ে বসে রইলাম, আমার বন্ধুরা মহানন্দে সমুদ্র দেখতে লাগল। দুপুর দশটায় বাসে করে চিটাগাং রওনা হব। সবাই বাসে উঠেছি। বাস ছাড়ার আগে আগে স্যার গিয়ে বসে ড্রাইভারের কানে কানে কি বললেন। তারপর এলেন আমার কাছে। আগের মতই হুংকার দিয়ে বললেন, নাম বাস থেকে। নাম বলছি।

আমি নামলাম। মনে হল শাস্তিপর্ব শেষ হয়নি। স্যার আমাকে সমুদ্রের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, খোল জুতা। জুতা খুললাম। স্যার আমার হাত ধরে হঠাৎ অসম্ভব কোমল গলায় বললেন — চল যাই সমুদ্রে। একবার ভাবলাম অভিমান দেখিয়ে বলি — 'না'। কিন্তু ইচ্ছা করল না। স্যারের হাত ধরে সমুদ্রে নামলাম। তিনি বললেন — ব্যাটা আমার উপর রাগ করিস না। একদল ছেলেকে নিয়ে এসেছি। এদের কেউ সমুদ্রে ভেসে গেলে সমস্যা না? তোকে শাস্তি দেয়া অন্যায় হয়েছে। ভুল হয়েছে। আমি মানুষ। আমি তো ভুল করবই। আমি কি ফেরেশতা যে আমার ভুল হবে না? তোর যতক্ষণ ইচ্ছা সমুদ্রে হাঁটাহাঁটি কর। আর আমার উপর রাগ খুব বেশি হলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দে। দেখি তোর কেমন শক্তি।

আমি স্যারের দিকে তাকিয়ে দেখি, স্যার তাঁর পুরোনো অভ্যাসমত কাঁদতে শুরু করেছেন।

আমরা টাকা-পয়সা খরচ করে দূরের সমুদ্র দেখতে যাই, অথচ আমাদের আশেপাশের মানুষরাই বুকে সমুদ্র ধারণ করে ঘুরে বেড়ান। সেই সমুদ্র আমাদের চোখে পড়ে না।

পঁচিশ বছর পর স্যারের সঙ্গে আবার দেখা। তিনি আজিমপুর কবরস্থানের পাশের রাস্তা দিয়ে হনহন করে যাচ্ছেন। আগের মতই আছেন, শুধু আকাশের শাদা মেঘ ভর

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গালে তার মাথার চুলে। তিনিই প্রথম আমাকে দেখলেন — চেঁচিয়ে ডাকলেন, হুমায়ূন না? হুমায়ূন, তোর নেই কো কেন গুণ। আরে গাধা, তুই কেমন আছিস?

সমুদ্র দেখলে সমুদ্রের জল স্পর্শ করতে হয়। আমি কদমবুসি করবার জন্যে নিচু হলাম। স্যার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। লক্ষ্য করলাম বয়সজনিত কারণে স্যারের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আগে আমাদের শাস্তি দিয়ে কাঁদতেন। এখন কাঁদছেন কোন শাস্তি না দিয়েই।

আমি বললাম, কেমন আছেন স্যার?

স্যার চোখ মুছতে মুছতে বললেন, ভাল আছি রে ব্যাটা। ভাল আছি। প্রেসিডেন্ট মেডেল পেয়েছি, বুঝলি? বেস্ট টিচার হিসেবে প্রেসিডেন্ট মেডেল! কি হাস্যকর কথা! আমি না-কি বেস্ট টিচার! হা হা হা।

তিনি হাসছেন। কিন্তু তাঁর চোখ ভেজা।

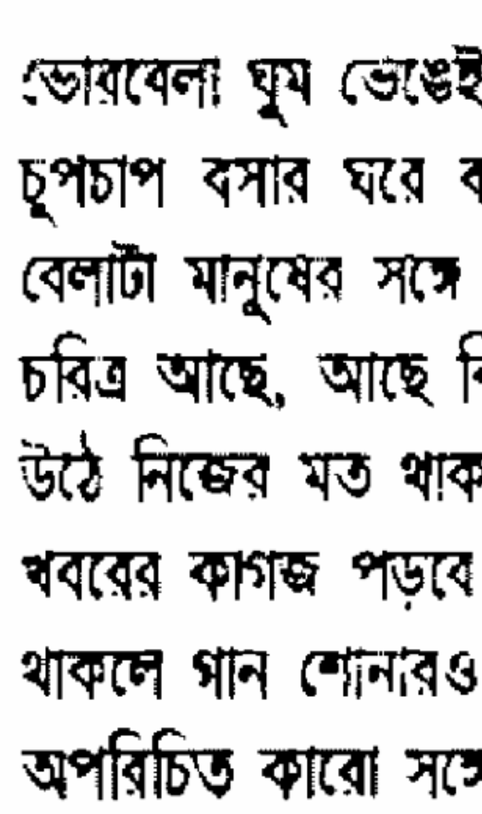

কবি সাহেব

ভোরবেলা ঘুম ভেঙেই যদি শুনি — কেউ একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, চুপচাপ বসার ঘরে বসে আছে, তখন সঙ্গত কারণেই মেজাজ খারাপ হয়। ভোর বেলাটা মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করার জন্যে আদর্শ সময় না। ভোরবেলার নিজস্ব চরিত্র আছে, আছে কিছু আলাদা নীতিমালা। ভোরবেলার নীতিমালা হল, ঘুম থেকে উঠে নিজের মত থাকবে, কোন রকম টেনশান রাখবে না। হাত-পা ছড়িয়ে চা খাবে। খবরের কাগজ পড়বে। মেজাজ ভাল থাকলে গান শোনা যেতে পারে। মেজাজ খারাপ থাকলে গান শোনারও দরকার নেই। ভোরবেলায় যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তা হচ্ছে — অপরিচিত কারো সঙ্গে কথা বলা। এই সময়ে কথা বলতে হবে শুধুমাত্র পরিচিত এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে।

আমার কপাল মন্দ। যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁরা ভোরবেলায় আসেন। যাঁরা আসেন তাঁরা সহজে যেতে চান না। ইশারা-ইঙ্গিতে অনেকভাবে তাঁদের বুঝানোর চেষ্টা করি — 'দয়া করে এখন উঠুন'। আমার ইশারা-ইঙ্গিত হয় তাঁরা বুঝেন না, নয় বুঝেও না বোঝার ভান করেন।

আজ যিনি এসেছেন তাঁকেও আমি বিদেয়-হতে-না-চাওয়া লোকদের দলে ফেললাম এবং মোটামুটি হতাশ হয়েই তাঁর সামনে বসলাম। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের উপর। হালকা পাতলা গড়নের ছোটখাট মানুষ। গায়ের রঙ ধবধবে শাদা। গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে মাথার চুলও শাদা। কোলের উপর কালো চামড়ার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খানিকটা দূরে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁকে দেখেই মনে হচ্ছে, কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকতেই তিনি অভ্যস্ত। আমি বললাম, আপনি কি কোন কাজে এসেছেন?

তিনি মৃদু গলায় বললেন, না।

আমি আঁৎকে উঠলাম। যাঁরা সরাসরি বলেন, কোন কাজে আসেননি, তাঁরা সাধারণত অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে থাকেন। দুপুরের আগে তাঁদের বিদেয় করা যায় না।

আমি বললাম, কি জন্যে এসেছেন আমি কি জানতে পারি?

'ছি পারেন।'

'দয়া করে বলুন।'

'আমি মফস্বলে থাকি। শহরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ কম। বড় শহর আমার ভালও লাগে না।'

আমি ভদ্রলোকের কথার ধরন ঠিক বুঝতে পারছি না। শহর-প্রসঙ্গে তাঁর বিতৃষ্ণা আমাকে শোনানোর কারণও আমার কাছে ঠিক স্পষ্ট হল না। আমি মনের বিরক্তি চেপে সিগারেট ধরালাম।

'শহর পছন্দ করি না, তবু নানান কাজকর্মে শহরে আসতে হয়।'

'তা হয়। পছন্দ না করলেও এই জীবনে আমরা অনেক কিছু সহ্য করি। আপনি কি চা খাবেন?'

'ছি-না। আমার সামান্য কিছু কথা আছে। কথাগুলি বলে আমি চলে যাব।'

আমি আশান্বিত হয়ে বললাম, বলুন। কথা বলে যদি উনি চলে যান তাহলে কথাগুলি শুনে নেয়াই ভাল। সামান্য কথা বলছেন, তাও আশার ব্যাপার, হয়ত, ঘণ্টাখানিকের মধ্যে উদ্ধার পাওয়া যাবে।

'আমার বড়কন্যা-বিষয়ে একটি গল্প আপনাকে শোনাব।'

'শোনান।'

'আমি অনেক রাত জেগে পড়াশোনা এবং লেখালেখি করি — একরাতে লেখালেখি করছি — হঠাৎ শুনি আমার কন্যা খিলখিল করে হাসছে: কিছুক্ষণ থামে, আবার হাসে। আবার থামে, আবার হাসে। আমি বিরক্ত হলাম। তাকে বললাম, হাসছ কেন মা? সে বলল, গল্পের বই পড়ে হাসছি বাবা। আমি বললাম — হাসির গল্প? সে বলল, না, দুঃখের গল্প। কিন্তু মাঝে মাঝে হাসির কথা লেখা। আমি বললাম, নিয়ে আস। আমার মেয়ে নিয়ে এল। আমি সেই বই পড়লাম। আপনার লেখা বই। আমি আগে কখনো আপনার নাম শুনিনি। এই প্রথম শুনলাম।'

'এইটা কি আপনার গল্প?'

'জ্বি।'

'আপনার গল্প শুনে খুশি হয়েছি। আপনি যে আমার একটি বই পড়েছেন সেটা জেনেও ভাল লাগল।'

'আমার কথা একটু বাকি আছে।'

'জ্বি বলুন।'

ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, 'আমি নিজে একটি গল্প গ্রন্থ রচনা করেছি। সেই

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গ্রন্থটি নিয়ে এসেছি।'

এতক্ষণে ভদ্রলোকের আগমনের কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হল। তিনি একজন প্রকাশক। গ্রন্থ প্রকাশে আমার সাহায্যের জন্যে এসেছেন। আমার মন খারাপ হল এই ভেবে যে আমি ভদ্রলোককে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারব না। তাঁর লেখা যত ভালই হোক প্রকাশকরা ছাপবেন না। পরিচিতিহীন মফস্বলের লেখকদের প্রতি ঢাকার প্রকাশকদের কোনই আগ্রহ নেই। আমি বললাম, আপনি কি বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমার সাহায্য চান?

'জ্বি,-না। বইটি প্রকাশিত হয়েছে।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বইটি আমার হাতে দিলেন। আমি বইয়ের পাতা উল্টে চমকে উঠলাম। দুটি কারণে চমকালাম — প্রথম কারণ, বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে আমার নামে। উৎসর্গপত্রে এমন কথা লেখা হয়েছে আমি যার যোগ্য নই। দ্বিতীয় কারণ হল, এই নিরহংকারী চুপচাপ ধরনের মানুষটি একজন বিখ্যাত মানুষ। এতক্ষণ আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। ইনি দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা। গবেষক, কবি ও প্রাবন্ধিক। বাংলা একাডেমী তাঁর একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। লিপির উপর লেখা তাঁর গ্রন্থ "ব্রাহমী অথবা ব্রাহ্মী লিপি ও সম্রাট প্রিয়দর্শী" পশ্চিম বাংলার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য।

লিপিতত্ত্বে এদেশে এবং ভারতে তাঁরচে' বেশি কেউ এসময়ে জানেন বলে আমার জানা নেই।

আমি একই সঙ্গে মুগ্ধ, বিস্মিত এবং লজ্জিত হলাম। এই সরল সাদাসিধা মানুষটিকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি — এ কী কাণ্ড! এতবড় ভুল মানুষ করে? গোলাম মোর্তাজা সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং হাসিমুখে বললেন, আপনি কি একবার আমাদের হবিগঞ্জে যাবেন? আমার বাড়িতে একরাত থাকবেন?

আমি বললাম, অবশ্যই থাকব।

'কথা দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।'

'আমার মেয়েরা খুব খুশি হবে। এরা যে আপনাকে কত পছন্দ করে আপনি তা কখনো জানবেন না। আমি আমার মেয়েদের জন্যে কিছু করতে পারিনি। আপনাকে নিয়ে গেলে ওদের জন্যে কিছু করা হবে।'

'আপনি যখন আমাকে যেতে বলবেন, আমি তখনি যাব।'

'আমি আপনাকে জানাব।'

তিনি আমাকে কিছু জানাতে পারলেন না। হবিগঞ্জ ফিরেই অসুখে পড়লেন — প্রাণঘাতী ব্যাধি — ক্যানসার। চিকিৎসার জন্যে গেলেন জার্মানী। পত্রিকা মারফত তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেলাম। মনটা খারাপ হল। কথা দিয়েছিলাম, কথা রাখা গেল না।

তার প্রায় বছরখানিক পরের কথা — দেওয়ান গোলাম মোর্তাজার পরিবারের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হল — দেওয়ান গোলাম মোর্তাজার নামে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে মোর্তাজা সাহেবের স্ত্রী আমাকে আমন্ত্রণ

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জানালেন মোর্তাজা সাহেবের মৃত্যুদিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। কথা রাখার সুযোগ পাওয়া গেল। আমি তিন কন্যা নিয়ে হবিগঞ্জে উপস্থিত হলাম।

হবিগঞ্জে পৌঁছে মোর্তাজা সাহেবের পরিবারের কাছ থেকে যে ভালবাসা পেলাম তার সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। এরা আমার মত অভাজনের জন্যে ভালবাসার সোনার আসন বানিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমি একেবারেই হকচকিয়ে গেলাম ।

মোর্তাজা সাহেব সেখানে 'কবি সাহেব' নামে পরিচিত। তাঁর বাড়ি হল — কবি সাহেবের বাড়ি। তাঁর মেয়েদের পরিচয় হল — কবি সাহেবের মেয়ে।

কবি-পত্নীর নাম আম্বিয়া খাতুন। অসম্ভব রূপবতী, কঠিন ধরনের মহিলা। থাকেন কানাডায়। স্বামীর মৃত্যুদিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেশে এসেছেন। স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন। লেখক-স্বামীকে পারিবারিক সব দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখতে গিয়ে নিজের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে এখন ক্লান্ত এবং স্বামীর প্রতি কিছুটা হয়ত অভিমানী।

কবি-পত্নী তাঁর সব কন্যাদের স্কুলের ছাত্রদের মত লাইন করে দাঁড়া করালেন। আমাকে দেখিয়ে কঠিন গলায় বললেন, ইনি তোমাদের বাবার বন্ধু। ইনি তোমাদের চাচা। চাচাকে পা ছুঁয়ে সালাম কর।

বড় বড় মেয়ে, সবাই বিবাহিতা। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও বড় বড়। মা'র কথা শোনামাত্র আমাকে হকচকিত করে এরা এক সঙ্গে আমাকে সালাম করবার জন্যে ছুটে এল। একজনকে দেখলাম কাঁদছে।

আমি বললাম, আপনি কাঁদছেন কেন?

সে জবাব দিল না। তাঁর এক বোন বলল, ও তো আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে না। ও কানে শুনতে পায় না। বাচ্চা হবার সময় কি-এক জটিলতায় ওর কান নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে কোন প্রশ্ন করলে কাগজে লিখে করতে হবে।

আমার মনটাই খারাপ হল। আমি এক টুকরা কাগজ নিয়ে লিখলাম — আপনি এত কাঁদছেন কেন?

মেয়েটি তার উত্তরে বলল, চাচা, আপনি অবিকল আমার বাবার মত। নিরহংকারী, সাদাসিধা। আপনাকে দেখে বাবার কথা মনে পড়ছে — এই জন্যে আমি কাঁদছি।

আমি সারাজীবন শুনে এসেছি, 'আমি অহংকারী।' এই প্রথম একটি মেয়ে আমাকে বলল — নিরহংকারী। আমার চোখ প্রায় ভিজে উঠার উপক্রম হল।

কবি-কন্যা বলল, চাচা, আসুন, আমার বাবার লাইব্রেরীটা আপনাকে দেখাই। আমরা বাবার লাইব্রেরীতে যাই না। আজ আপনার সঙ্গে যাব। আর শুনুন, আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।

'আচ্ছা তুমি করেই বলব, তোমরা বাবার লাইব্রেরীতে যাও না কেন?'

'মা এক কাণ্ড করে রেখেছেন, এই জন্যে যেতে ইচ্ছা করে না।'

'কি কাণ্ড!'

'যে কফিনে করে বাবার লাশ জার্মানী থেকে এসেছিল মা সেই কফিনটা লাইব্রেরীতে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'কি?'

'হ্যাঁ, কি ভয়াবহ ব্যাপার দেখুন না। আপনি মা'কে একটু বলবেন কফিনটা যেন বানানো হয়। মা আপনার কথা ফেলতে পারবেন না।'

কবি-পত্নী আমাকে কিছু বলার সুযোগ দিলেন না। তাঁর গলায় বললেন, তোমার বাবার কফিন সরানো হবে না। এটা তোমার বাবার শেষ স্মৃতিচিহ্ন। তোমাদের ভাল লাগুক — না লাগুক — কফিন থাকবে লাইব্রেরীতে।

লাইব্রেরী দেখলাম। বিস্মিত হবার মতই লাইব্রেরী। সবই মূলত লিপি বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ। দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। কবি-পত্নী জানালেন, দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু দামী। মিউজিয়ামকে দিয়ে দেয়া হয়েছে।

লাইব্রেরীতে বসেই গল্পগুজব হতে লাগল। বড় কেতলী করে চা চলে এসেছে। পানের ভর্তি পান। যার ইচ্ছা চা খাচ্ছে, যার ইচ্ছা পান খাচ্ছে। একদল আবার খেতেও বসেছে। বাড়ির পাশেই সামিয়ানা খাটানো। খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে সামিয়ানার নিচে। এত লোক কোত্থেকে এল সেও এক রহস্য।

গল্প করছেন কবি-পত্নী। আমরা শ্রোতা। ভদ্রমহিলার গল্প বলার ভঙ্গি খুব সুন্দর, মাথা দুলিয়ে হাত-পা নেড়ে গল্প করেন। অত্যন্ত আবেগময় অংশগুলি আবেগশূন্যভাবে বলে যান। শুনতে কেমন কেমন জানি লাগে।

'কবি সাহেবের কথা আপনাকে বলি। জমিদারের ছেলে ছিল। রাগ করে সব সম্পত্তি ভাইকে দিয়ে বিবাগী হল। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। কোলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তাও ভাল লাগে না। জন্ম ভবঘুরে বুঝলেন ভাই? পথই হল তার ঘর। কপালের লিখন — বিবাহ হল আমার সাথে। তখন আবার তার লেখার রোগ মাথাচাড়া দিয়েছে। দিনরাত পড়ে আর লেখে। এই যে বইটা দেখছেন ভাই — এই বই লিখতে কবি সাহেবের লেগেছে সাত বৎসর। কি কষ্ট করে লিখেছে! বিছানায় উপুড় হয়ে বসে লিখত। হাতের কনুই থাকত বিছানায়। ঘসায় ঘসায় কনুই-এ ঘা হয়ে গেল। আমি বাজার থেকে তুলা কিনে এনে দিলাম। সেই তুলার প্যাড কনুই-এ রেখে লিখত। সংসার তখন অচল হয়েছে, বুঝলেন ভাই। সম্পূর্ণ অচল। সে তো সংসারে কিছু দেখে না। চালের দাম কত, আলুর দাম কত কিছুই জানে না। সংসার টানি আমি। স্কুলের অতি সামান্য আয়ে বাঁচার চেষ্টা করি। কবি সাহেবকে কিছু বুঝতে দেই না। একদিন কবি সাহেব মন খারাপ করে বললেন, আম্মিয়া, সংসারের জন্যে তো আমি কিছুই করছি না। আমি তাঁকে বললাম, সব মানুষকে আল্লাহ্ কিছু দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। লেখার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়েছেন। তুমি লেখ। সংসার নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

সেও ভাবত না। তাঁর ছেলেমেয়ে কয়টা তাও বোধহয় সে জানত না। হাসবেন না ভাই। অতি দুঃখে এই কথা বলছি। একদিন কি হয়েছে শুনুন -- আমার মেজো ছেলে অসুস্থ। পেট ফুলে ঢোল হয়েছে। ছটফট করে, নিঃশ্বাস নিতে পারে না। আমি ছেলেকে কবি সাহেবের পাশে শুয়ায়ে বললাম — তুমি ছেলেটাকে দেখ, আমি স্কুলে যাই। স্কুল কামাই দিলে আমার তো চলবে না। স্কুলে গেলাম। ফিরে এসে দেখি — কবি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সাহেব লিখতে বসেছে। পাশে আমার ছেলে — এখন যায় তখন যায় অবস্থা। আমাকে দেখে কবি সাহেব বলল, শোন আম্বিয়া, তোমার এই ছেলের মৃত্যু-ক্ষণ উপস্থিত। আমি তার উপর থেকে ভালবাসার দাবী উঠিয়ে নিয়েছি। তুমিও উঠিয়ে নাও। তোমার ছেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে।

আমি আঁৎকে উঠলাম। কি বলে এই লোক! ছেলেকে কোলে নিয়ে দৌড়ে গেলাম এক কবিরাজের কাছে। রিকশাও নিলাম না। কারণ রিকশাভাড়া ছিল না। সেই ছেলেকে কবিরাজ চিকিৎসা করে ভাল করলেন। একদিন ছেলে চলে গেল আমেরিকায়। সেখান থেকে বাবার জন্য সোনার কলম পাঠাল। কবি সাহেব সেই কলম পেয়ে খুশি। ডেকে সবাইকে দেখায়।

বুঝলেন ভাই — কবি সাহেব ছেলেমেয়েদের দিকে চোখ ফেলে নাই। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে কি ভাল তার বাবাকে বাসে! তার বাবাকে তারা যত ভালবাসে তার এক হাজার ভাগের এক ভাগ ভাল আমাকে বাসে না। বাবার কিছু একটা হলে সব ছেলেমেয়ের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।

আরেক দিনের গল্প আপনাকে বলি ভাই। একই সঙ্গে দুঃখের গল্প, আবার হাসিরও গল্প। এই গল্প মনে আসলে আমি কখনো হাসি, কখনো চোখের পানি ফেলি — । হয়েছে কি শুনেন। এক রাতের কথা — আমি ঘুমাচ্ছিলাম। কবি সাহেব আমাকে ডেকে তুলল। বলল, আম্বিয়া, জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ — কি সুন্দর জোছনা হয়েছে — চল, জোছনার মধ্যে হাঁটি।

বুঝলেন ভাই? কথা শুনে আমার ভাল লাগল। এই রকম কথা তো কখনো বলে না; ভাল লাগারই কথা। আমি খুশিমনে কবি সাহেবের সঙ্গে হাঁটতে গেলাম। কবি সাহেব হঠাৎ বললেন, দেখ আম্বিয়া, মাঝে মাঝে আমার মনটা খুব খারাপ হয়।

আমি বললাম, কেন?

যখন শুনি মানুষের ছেলেমেয়েরা মেট্রিক পাস করে, ভাল রেজাল্ট করে, তখন একটু আফসোস হয়। মনটা খারাপও হয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

কবি সাহেব বললেন, তখন মনে হয়, ইস্, আমার যদি এক-আধটা ছেলে-মেয়ে মেট্রিক পাস করত, আমি লোকজনদের বলতে পারতাম।

'কি বলছ তুমি? তোমার যে দুইটা ছেলে মেট্রিক পাস করেছে। এত ভাল রেজাল্ট করেছে তুমি জান না?'

'পাস করেছে জানি না তো! কি আশ্চর্য!'

কবি সাহেব অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই রকম একটা মানুষের সঙ্গে ঘর করেছি ভাই। সৃষ্টিছাড়া মানুষ। আমি খুশি যে আমার আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মার কথা শুনে মেজো মেয়ে রাগী গলায় বলল, মা, তুমি এটা কি রকম কথা বললে? তোমার আগে বাবা মারা যাওয়ায় তুমি খুশি। তোমার এই কথার মানে কি?

আম্বিয়া খাতুন কঠিন গলায় বললেন, মানে আছে রে মা: মানে আছে। মানে ছাড়া আম্বিয়া খাতুন কথা বলে না। তোর বাবার আগে যদি আমি মারা যেতাম — কে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তাহলে এই পাগল মানুষটার সেবা করত? আমি বেঁচে আছি বলেই শেষ সময় পর্যন্ত সেবা করতে পেরেছি। আমি বেঁচে আছি বলেই তোর বাবার মৃত্যুর পর তাঁর নামে ট্রাস্ট করতে পেরেছি। মরে গেলে এইসব হত না রে মা। বেঁচে আছি বলেই হচ্ছে। তোর বাবার দশ বছরের খাটুনীর যে পাণ্ডুলিপি সেটা আমি বেঁচে আছি বলেই প্রকাশ হবে! বেঁচে না থাকলে প্রকাশ হত না। তোর বাবা সেই পাণ্ডুলিপি নিয়ে কি করত? বালিশের নিচে রেখে ঘুমাতো। কাউকে মুখ ফুটে বলত না — পাণ্ডুলিপিটা প্রকাশ করুন। বলতো মুখ ফুটে?

'না।'

'এখন যা, মুখে মুখে আমার সাথে তর্ক না করে — তোর বাবার পাণ্ডুলিপি এনে তোর চাচাকে দেখা।'

মেয়েরা ছুটে গেল বাবার পাণ্ডুলিপি আনতে।

আমি পাণ্ডুলিপি দেখলাম। আমি কোন লিপি বিশারদ নই কিন্তু পাণ্ডুলিপি দেখে বুঝলাম — বিরাট কাজ হয়েছে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব হারুন-অর-রশিদ সাহেব এই পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করেছেন। খুব শিগগিরই তা গ্রন্থাকারে বের হবে।

আম্বিয়া খাতুনের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলাম। গল্পের এক পর্যায়ে তিনি হঠাৎ করে বললেন — ভাই, আপনি কি ভূত-প্রেত এইসবে বিশ্বাস করেন?

আমি বললাম, না।

'আমিও করি না। আমি কোন কিছুই বিশ্বাস করি না। ভূত-প্রেতের নানান ঘটনা শুনি। কিন্তু আমি জানি এর কোন-না-কোন ব্যাখ্যা আছে।'

আমি বললাম, অবশ্যই আছে।

আম্বিয়া খাতুন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি আমার জীবনের একটা ঘটনা আপনাকে বলব। এই ঘটনার ব্যাখ্যা আমি করতে পারি নাই। কবি সাহেবও পারে নাই। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি পারবেন।

'এ রকম মনে হবার কারণ কি?'

'কোন কারণ নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে। গল্পটা বলার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। ভাই, আপনি তো অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বললেন। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন আমি কঠিন ধরনের সাহসী মহিলা?'

'বুঝতে পেরেছি।'

'আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে আমি কখনো মিথ্যা বলি না?'

'তাও বুঝতে পেরেছি।'

'তাহলে গল্পটা শুনুন। খুব মন দিয়ে শুনবেন। আজ থেকে কুড়ি বছর আগের কথা। আমার এক কন্যা জেসমিনের বয়স তখন আড়াই বছর। খুব সুন্দর মেয়ে। ফুটফুটে চেহারা। সারাদিন নিজের মনে খেলে, কথা বলে। আমার বড়ই আদরের মেয়ে। একদিন দুপুর বেলা আমি বাথরুমে গিয়েছি। মফস্বল অঞ্চলের বাথরুম — মূল বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে, নির্জনে। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করামাত্র আমি একজনের কথা শুনলাম। পুরুষ মানুষের গলা। খুব পরিষ্কার স্পষ্ট আওয়াজের কথা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কথাটা সে বলল — ঠিক আমার মাথার ভেতরে। কথাটা হল — "তোমার মেয়ে জেসমিন চৈত্র মাসের বার তারিখে পানিতে ডুবে মারা যাবে। কিছুই করার নাই।" কথা শুনে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ; আমি চিৎকার করতে করতে — কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ঢুকলাম। কবি সাহেবকে বললাম।

আপনাকে আগে বলা হয় নাই — কবি সাহেব ছিলেন ঘোর নাস্তিক। তিনি কোন কিছুই বিশ্বাস করতেন না। আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, এটা আর কিছুই না, তোমার মনের বিকার। তোমার মেয়েটা ছোট, পাশেই পুকুর। সারাক্ষণ তুমি মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা কর। এই জন্যে মনে বিকার উপস্থিত হয়েছে। বিকারের ঘোরে এইসব শুনেছ।

কবি সাহেবের কথায় আমার মন শান্ত হল না। খেতে পারি না। রাতে ঘুমাতে পারি না। চৈত্র মাসের বার তারিখ আসতে বেশি বাকিও নেই। মনে হলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কবি সাহেবকে কিছু বলতে গেলে ও শুধু হাসে।

বারই চৈত্র খুব ভোরবেলা কবি সাহেব আমাকে বলল, তোমার মন যখন এত অস্থির তুমি এক কাজ কর — আজ সারাদিন মেয়েটাকে চোখের আড়াল করো না। সারক্ষণ তাকে চোখে চোখে রাখ। তোমার স্কুলে যাবার দরকার নেই। আমি হেড মিস্ট্রেসের কাছে একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে নিয়ে যাব।

কবি সাহেব তাই করল। নিজেই একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে নিয়ে গেল। আমি সারাদিন জেসমিনকে নিয়ে রইলাম। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করি না। দুপুর বেলা আমার চোখে মরণঘুম নামল। কয়েক রাত অঘুমো কাটিয়েছি । অবস্থা এমন হয়েছে কিছুতেই চোখ খোলা রাখতে পারছি না। ঘুমুতে গেলাম জেসমিনকে নিয়ে দরজা-টরজা সব বন্ধ করে দিলাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। দেখি বিছানায় জেসমিন নেই। বুকে ছ্যাঁৎ করে উঠল। তারপরই দেখি সে ঘরের মেঝেতে আপন মনে একটা বদনা নিয়ে খেলছে। মনটা শান্ত হল। মেয়েটাকে কিছুক্ষণ আদর করলাম। বাইরে থেকে কবি সাহেব বললেন, আম্বিয়া, আমার কাছে কিছু মেহমান এসেছেন। একটু চা করতে পারবে?

আমি চা বানাতে রান্নাঘরে ঢুকলাম। লাকড়ির চুলা ধরতে একটু সময় নিল। যখন আগুন ধরে উঠল তখনি মনে হল — জেসমিন কোথায়? ওকে না আমার চোখে চোখে রাখার কথা! আমি ছুটে শোবার ঘরে ঢুকলাম জেসমিন সেখানে নেই। আমি আর অপেক্ষা করলাম না — দৌড়ে গেলাম পুকুরপাড়ে। গিয়ে দেখি — জেসমিন মাঝপুকুরে ভাসছে।

ভাই, আপনি অনেক জানেন। আপনি পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখেছেন, শুনেছেন। আমার এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? কবি সাহেবের মত ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকবেন না, কথা বলুন।

আম্বিয়া খাতুনের কঠিন চোখ দ্রবীভূত হল। তাঁর চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। তিনি আঁচলে চোখ মুছে মেজো মেয়েকে ডেকে সহজ গলায় বললেন, তোর চাচার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। তাঁকে খেতে দে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



ময়মনসিংহে গ্রন্থমেলা হচ্ছে।

আমি এক ফাঁকে একটু দূরে সরে গিয়ে চা খাচ্ছি। তখনি তাকে দেখলাম। অল্প বয়েসী ছেলে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। আমি বললাম, তুমি কি আমাকে কিছু বলবে?

সে বলল, হ্যাঁ।

'বলে ফেল।'

'আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। আপনি ঠিকঠাক জবাব দেবেন। মিথ্যা জবাব না।'

আমি বললাম, তোমার কেন ধারণা হল আমি মিথ্যা জবাব দেব?

সে চুপ করে রইল। আমি বললাম, কি তোমার প্রশ্ন?

'ব্যর্থ কবিরাই ঔপন্যাসিক হন। আপনি কবি হিসেবে ব্যর্থ বলেই ঔপন্যাসিক হয়েছেন।'

আমি বললাম, এটা তো কোন প্রশ্ন না। তুমি আমার উপর একটি বক্তব্য রেখেছ। আমার তো এখানে বলার কিছু নেই। বলতে চাচ্ছিও না।

ছেলেটি রাগী গলায় বলল, আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনি একজন ব্যর্থ কবি।

আমি লক্ষ্য করলাম, ছেলেটির চোখ-মুখ কঠিন হয়ে গেছে। সে কথা বলছে রাগী ভঙ্গিতে। এইসব ক্ষেত্রে ছেলেটি যা বলছে তাতে রাজি হয়ে গেলেই সমস্যা মিটে যায়। রাজি হয়েও যেতাম। নিজেকে ব্যর্থ কবি বলতে আমার অহংবোধ আহত হবে না। কিন্তু ছেলেটির জেদী ভঙ্গি আমার ভাল লাগল না। কাজেই চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে আমি ছেলেটির মতই চোখ-মুখ কঠিন করে বললাম, নিজেকে ব্যর্থ কবি আমি কেন বলব? আমি তো কবিতা লিখি না। কবিতা লিখে যদি ব্যর্থ হতাম তখন বলতাম আমি ব্যর্থ কবি। আমি যে যুক্তিতে নিজেকে ব্যর্থ গায়ক বা ব্যর্থ অভিনেতা বলব না, একই যুক্তিতে ব্যর্থ কবি অপবাদও মাথা পেতে নেব না।

ছেলেটি আমার যুক্তির ধার দিয়েও গেল না, চোখ-মুখ আরো কঠিন করে বলল, আপনি কবিতা লিখতে পারেন না বলেই উপন্যাস লিখছেন। এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।

'এটা স্বীকার করলে কি তুমি খুশি হও?'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আমার খুশি হওয়া-না হওয়া-কিছু না, আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে আপনি একজন ব্যর্থ কবি।'

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, আচ্ছা বেশ, স্বীকার করলাম।

'মুখে স্বীকার করলে হবে না। কাগজে লিখে দিতে হবে।'

'কাগজ নিয়ে এসো, লিখে দিচ্ছি।'

সে কাগজ নিয়ে এল, আমি সেখানে লিখলাম — আমি কবিতা লিখতে পারি না বলেই গল্প-উপন্যাস লিখি। আমি একজন ব্যর্থ কবি। সই করলাম, তারিখ দিলাম। ছেলেটি যুদ্ধজয়ের আনন্দ নিয়ে চলে গেল।

সে কেন এরকম করল?

কোন কারণে সে কি আমার উপর রেগে ছিল? তাকে রাগাবার মত আমি কি করতে পারি? হয়ত আমার লেখা তার ভাল লাগে না। তা তো হতেই পারে। লেখা ভাল না লাগলে পড়বে না, কিন্তু রাগ করবে কেন? হয়ত সে নিজে একজন কবি। কবিরা অভিমানী হয়, রাগী হয়, এবং কেন জানি খানিকটা ছেলেমানুষও হয়। এদেশের বেশকিছু কবিকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কাব্যপ্রতিভা ছাড়াও আরো যা আছে তা রাগ, অভিমান এবং ছেলেমানুষী।

আমার নিজের কাব্যপ্রতিভা নেই, কিন্তু বাকি তিনটি যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। ময়মনসিংহের ঐ ছেলেটিকে যখন কাগজে লিখে দিলাম — "কবিতা লিখতে পারি না বলেই গল্প-উপন্যাস লিখি" তখন ভুল লিখিনি, ঠিকই লিখেছি। ব্যাপারটা আসলে তাই।

ছাপার অক্ষরে আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা কবিতা। পাঠক-পাঠিকারা শুনে হাসবেন, সেই কবিতা ইংরেজি ভাষায় লেখা। তখন পড়ি বগুড়া জিলা স্কুলে। স্কুল ম্যাগাজিনে লেখা দিতে হবে, চারটা কবিতা (বাংলায়) জমা দিলাম। স্যার বললেন, হাবিজাবি এইসব কি লিখেছিস? অগা-বগা লিখলেই কবিতা হয়?

আমি মরমে মরে গেলাম। স্যার বললেন, ইংরেজি সেকশান খালি যাচ্ছে, যদি পারিস ইংরেজিতে কিছু লিখে দে। সুন্দর করে একটা Essay লিখে নিয়ে আয় — A journey by boat কিংবা Village carnival.

আমি পরদিন একটা ইংরেজি কবিতা লিখে ফেললাম। কবিতার নাম 'God', প্রথম চার লাইন ঃ

Let the Earth move
Let the Sun shine
Let them to prove
All are in a line.

স্যার বললেন — মন্দ না। শেষে মিল আছে।

কবিতা ছাপা হল। কবির ছবিসহ। বাবা কবিতা পড়ে গম্ভীর গলায় বললেন, মধুসূদন হবার চেষ্টা করছিস না-কি? ইংরেজিতে কে তোকে কবিতা লিখতে বলল? বাংলা ভাষাটা আছে কি জন্যে?

ঘটনার তিন বছর পর বাংলা ভাষায় দু'টি কবিতা প্রসব করলাম। 'প্রসব' শব্দটা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার পছন্দ নয় তবু ব্যবহার করলাম এই কারণে যে কবিতা দু'টি বের করতে প্রসব-যন্ত্রণার মতই যন্ত্রণা হল। রাতে ঘুম হয় না। মাথার ভেতর কবিতার লাইন ঘুরে। পুরো কবিতা না, একটা মাত্র লাইন!

কবিতার ছন্দ-টন্দ কিছুই জানি না, অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, পয়ার, অমিত্রাক্ষর এইসব শুনেছি — কোনটা কি জানি না। অথচ দুটা কবিতা লেখা হয়ে গেছে।

তখন পড়ি ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে। ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীরা খুব সাহসী হয়। কাজেই আমিও খুব সাহসী হয়ে এক কাজ করে বসলাম। দু'টি কবিতা কপি করে পাঠিয়ে দিলাম দৈনিক পাকিস্তানে (এখন দৈনিক বাংলা)। তবে নিজের নাম দিলাম না। আমার ছোটবোনের নাম দিলাম — মমতাজ আহমেদ শিখু। ছোটবোনের নাম দেয়ার পেছনে যুক্তি হচ্ছে — কবিতা দুটি আমার কাছে পুরুষ কবির কবিতা হিসেবে বেশ দুর্বল মনে হচ্ছিল। তবে মহিলা কবির লেখা হিসেবে মন্দ নয়! দৈনিক পত্রিকার মহিলা পাতায় ছাপা যায়।

আমার এই বক্তব্যে মহিলারা রাগ করবেন না, ফার্স্ট ইয়ারে পড়া একটি বাচ্চা ছেলে এরকম ভাবলে ক্ষতি নেই। এখন আমি এরকম ভাবি না। মেয়েদের ছোট করে দেখার প্রবণতা আমাদের সমাজে আছে। আমার মধ্যে তা নেই। অনেক অনেক আগেই তা দূর হয়েছে। আমি নিশ্চিত, মেয়েদের মানসিক ক্ষমতা পুরুষদের চেয়ে বেশি। তবে সেই ক্ষমতার অনেকটাই তাঁদের নষ্ট করতে হয় শিশুদের লালন-পালন করে বড় করতে গিয়ে। কিছু ক্ষমতা নষ্ট হয় স্বামী নামক মানুষটিকে সুখী রাখার নানান প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে। তার উপর আছে নিজেকে অটাল করে রাখার এক বিচিত্র প্রবণতা।

মূল গল্পে ফিরে আসি — ছোটবোনের নামে কবিতা পাঠিয়ে অপেক্ষা করছি। ছাপা হবে এমন দুরাশা নেই — কারণ, শুনেছি সম্পাদকরা অপরিচিত কারোর লেখা পড়েন না। তাঁদের এত সময় নেই।

কি আশ্চর্য কাণ্ড! যে সপ্তাহে কবিতা পাঠালাম, তার পরের সপ্তাহে দৈনিক পাকিস্তানের মহিলা পাতায় দু'টি কবিতাই এক সঙ্গে ছাপা হয়ে গেল। শুধু তাই না, সম্পাদিকা একটি চিঠিও পাঠালেন —

"প্রিয় আপা,

কবিতা ছাপা হল। আরো কবিতা পাঠাবেন।"

কি সর্বনাশ! শেষে কি-না মহিলা কবি? সম্পাদিকার চিঠি পাওয়ার পর ঠিক করলাম, না, আর কবিতা না। যথেষ্ট হয়েছে। এবার মন দিয়ে পড়াশোনা করা যাক। কবিতার খাতা নষ্ট করে ফেললাম। কবিতার ভূত মাথা থেকে নেমে গেল।

ছোটবোনের নামে প্রকাশিত আমার সেই দু'টি কবিতার একটির কয়েকটি লাইন তুলে দেয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। কবিতার নাম "একশ' ফানুস"।

দিতে পার একশ' ফানুস এনে
আজন্ম সলজ্জ সাধ
একদিন আকাশে কিছু ফানুস উড়াই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দীর্ঘদিন ধরে গদ্য লিখছি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় — আহা, কেন লেগে থাকলাম না! সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে কবিতাকে কাছে পেতে চাইলে হয়ত সে কাছে আসত। দরজার ওপাশ থেকে ফিরে যেত না। কিংবা কে জানে সে হয়ত এখনো অপেক্ষা করছে — যদি তাকে ডাকি।

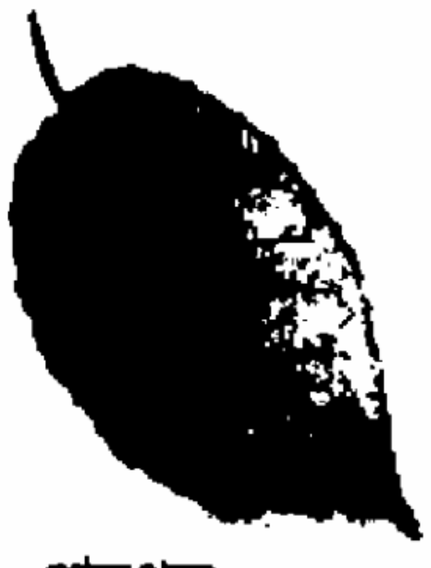

শ্বেতপদ্ম

আমাদের ছোটবেলায় নাপিতের দোকানে কিছু 'অতি আবশ্যকীয়' চিত্রকলা সাজানো থাকতো। এমন কোন নাপিতের দোকান ছিল না যেখানে (১) তীরবিদ্ধ বোরয়াকের ছবি, (২) ক্ষুদিরামের ফাঁসির ছবি, (৩) তাজমহলের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি না ঝুলতো। এই তিন ছবির সঙ্গে চুল কাটার কি সম্পর্ক আমি জানি না — নাপিতরা হয়ত জানেন। তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয়নি।

এই তিন ছবির একটি, তাজমহলের প্রচার অনেক বেশি ছিল। প্রায় প্রতিটি মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের বসার ঘরে ফ্রেমে বাঁধানো সূচিকর্ম হিসেবে তাজমহল থাকত। তার সঙ্গে থাকত দু'লাইনের কবিতা —

ভেতরে তাহার মমতাজ নারী
বাহিরেতে শাহ্‌জাহান।

সবার শেষে থাকত সূচি শিল্পীর নাম এবং তারিখ। তারিখের শেষে ইং অর্থাৎ ইংরেজি সন কিংবা বাং অর্থাৎ বাংলা সন। সেই সময়ে বিয়ে নামক ইন্সটিটিউশনে ঢোকার আগে মেয়েদের অবশ্য শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ডের একটি ছিল -- সেলাইয়ের কাজ। সেলাইয়ের কাজের অনেকগুলি ধাপ ছিল। জরীর তাজমহল হচ্ছে সর্বশেষ ধাপ। সূঁচকর্মের এম.ফিল. ডিগ্রীর মত। মেয়ে দেখতে এসে মুরব্বিরা এক পর্যায়ে বলতেন — কই, তাজমহলটা দেখি?

রূপালী জরীর একটি তাজমহল আমার মাও বানিয়েছিলেন (কবিতা সহ)। সেই তাজমহল দীর্ঘদিন আমাদের বসার ঘরে রবীন্দ্রনাথের ছবির পাশে শোভা পেয়েছে। মা'র তাজমহল দেখে আমি তাজমহলের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলি। এটাকে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য কেন বলা হয় কিছুতেই বুঝতে পারি না। মসজিদের মত একটা দালান, সুন্দর হলেই বা কতটা সুন্দর হবে? যেমন মস্কোর ঘণ্টা। এটিও সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য। ব্যাপার হচ্ছে একটা ঘণ্টা বড় হলেও সেটা ঘণ্টাই। তার সামনে গিয়ে হা করে দাঁড়িয়ে থাকার কি থাকতে পারে? এরচে' ব্যবিলনের শূন্যোদ্যানকে অনেক আকর্ষণীয়

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গান হয়। গান শুনলেই মনে হয় চমৎকার একটা বাগান আকাশে ঝুলছে। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান দেখতে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু তাজমহল না।

শেষ কচলে তিতা বানানোর ব্যাপার তাজমহলের ক্ষেত্রে ঘটেছে। ছবি একে, কবিতা লিখে, গান লিখে তাজমহলকে শুধু যে তিতা বানানো হয়েছে তাই না — গন্ধো তিতা বানানো হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে — অধিকাংশ কবি তাজমহল নিয়ে কবিতা লিখেছেন তাজমহল না দেখে। এর মধ্যে আছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। তাজমহল না দেখেই তিনি যে কবিতা লিখলেন — তার নাম 'তাজমহল'। তবে তাঁর অতি বিখ্যাত কবিতা 'শা-জাহান' অবশ্যি তাজমহল দেখার পরে লেখা [পূর্ণেন্দু পত্রী ঃ সাহিত্যের তাজমহল।]

কবিদের তাজমহল নিয়ে এত যে উচ্ছ্বাস, এত যে লেখালেখি তার সবটাই প্রেম-বিরহ নিয়ে। তাজমহলের সৌন্দর্য নিয়ে কাউকে তেমন মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি। তাজমহলের সৌন্দর্য হয়ত তাঁদের আকৃষ্ট করেনি — তাজমহলে প্রেমের মীথটাই তাঁদের আকৃষ্ট করেছে। যাঁরা তাজমহল দেখেছেন তাঁরা সবাই যে মুগ্ধ হয়ে আহা-উহু করেছেন তা না। অনেকের কাছেই ভাল লাগেনি। অনেকের মধ্যে একজন হলেন রুডইয়ার্ড কিপলিং (নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কথাশিল্পী)। অন্যজনও অতি বিখ্যাত মানুষ। এলডুস হাক্সলি। তিনি বললেন — **'The Taj was a disappointment.'**

তারপরও প্রতিবছর পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে জড় হয়। তারা ফিরে যায়। তাদের মধ্যে একদল আবার আসে। অনেকের নেশা ধরে যায়। ঘুরে ঘুরে আসতেই থাকে। এমন একজন হলেন — নর্থ ডাকোটায় আমি যে বাড়িতে থাকতাম, তার বাড়িউলী। মহিলার বয়স আশির উপরে। তিনি এ পর্যন্ত চারবার 'তাজ' দেখেছেন — আবারো যাবার ইচ্ছা। আমি 'তাজের' এত কাছাকাছি থেকেও তাজ দেখিনি শুনে তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমি প্রস্তরযুগের একজন মানুষ — 'পিকিংম্যান'। তিনি প্রায় ধমক দেয়ার মত বললেন, দেখনি কেন?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, দেখতে ইচ্ছা করেনি।

'কেন দেখতে ইচ্ছা করেনি?'

'আমি তাজমহল সম্পর্কে এত শুনেছি যে দেখতে ইচ্ছা করে না। আমার নিজের কল্পনায় একটা তাজমহল আছে — সেই তাজমহল বাস্তবের চেয়ে সুন্দর বলে আমার ধারণা।'

বুড়ি বলল, খুব ভুল বললে। বাস্তবের তাজমহল তোমার কল্পনার চেয়ে অনেক সুন্দর!

আমি বললাম, কি করে বলছ — আমার কল্পনার তাজমহল তো তুমি দেখনি!

'আমি অনুমান করতে পারি। তুমি আমার উপদেশ শোন — একবার দেখে এসো।'

'আচ্ছা, সময় পেলে এবং সুযোগ পেলে যাব।'

সময় সুযোগ দুই-ই পেয়েছিলাম — দেখতে ইচ্ছা করল না। দু'বার খুব কাছ থেকে (দিল্লী) ঘুরে এসেছি। ট্রেনে চেপে ঘন্টা দু'-একের মধ্যে আগ্রা যাওয়া যায় — যেতে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ইচ্ছা করল না। আমি আমার কল্পনা নষ্ট করতে চাই না। কল্পনা নষ্ট হলে আঘাত পেতে হয়। চীনের মহাপ্রাচীর দেখে এই কষ্ট পেয়েছিলাম। কল্পনায় ভয়াবহ কিছু ভেবে রেখেছিলাম — কাছে গিয়ে মন খারাপ হল। মনে হল — মানুষের ক্ষমতার কি বিপুল অপচয়!

তাজমহল তৈরির কাহিনীও আমাকে কষ্ট দেয়। সম্রাট শা-জাহান যে মূল্যে যমুনার তীরে এ সমাধি সৌধ তৈরি করলেন — সেই মূল্যে প্রেমের সৌধ তৈরি করা যায় না। কিংবদন্তী বলে, ওস্তাদ ইসা আফেন্দি ছিলেন মূল স্থাপত্যবিদ। তিনি কুড়ি হাজার শ্রমিক নিয়ে বাইশ বছরে শেষ করলেন তাজমহল। সম্রাট দেখলেন। তাঁর কাছে মনে হল — সম্রাটের প্রেমের যথাযথ রূপ দেয়া হয়েছে। তিনি খুশি হলেন — এবং ওস্তাদ ইসা খাঁ আফেন্দির মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দিলেন। যেন এই ওস্তাদ দ্বিতীয় কোন তাজ তৈরি করতে না পারেন। শুধু তাই না — তিনি হুকুম দিলেন ক্যালিগ্রাফারদের চোখ উপড়ে ফেলতে — যেন তাজের ক্যালিগ্রাফির মত ক্যালিগ্রাফি আর না হয়। স্থাপত্য বিভাগের সব প্রধানদেরই মৃত্যুদণ্ডাদেশ হল। যারা মর্মর পাথর কাটিত তিনি তাদের হাত কেটে ফেলার হুকুমও দিলেন। একটি মহান শিল্পকর্মের জন্যে এই ছিল তাদের পুরস্কার।

তাজ নিয়ে প্রচলিত এই কিংবদন্তী আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। প্রথমত, শা-জাহান একজন প্রেমিক মানুষ। পত্নী বিয়োগ-ব্যথায় কাতর। এমন একজন মানুষ — এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। তার চেয়েও বড় যুক্তি হচ্ছে -- শা-জাহান যমুনার অপর তীরে একটি কালো তাজমহল বানানোর পরিকল্পনাও করেছিলেন। যা হবে মূল তাজমহলের হুবহু ছবি — শুধু তা করা হবে কালো পাথরে। স্থপতিদের তিনি যদি হত্যা করেন তাহলে কারা বানাবে 'কৃষ্ণতাজ'?

অবশ্যি সম্রাটরা তো সাধারণ মানুষদের মত না। আমাদের কাছে যা নিষ্ঠুরতা তাদের কাছে তা হয়ত না। সম্রাট হুমায়ূনের মত দরদী সম্রাটকেও তো দেখি কত সহজে তাঁর বিদ্রোহী ছোটভাই মীর্জা কামরানের চোখ উপড়ে ফেলার হুকুম দেন। চোখ উপড়ে ফেলার পর সেই অক্ষিগহ্বরে লেবুর রস ঢেলে দেয়া হয়। মীর্জা কামরানের চিৎকারে দিল্লীর পশুপাখি কাঁদতে থাকে। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ূন বিচলিত হন না। তিনি শান্তমুখে তাঁর প্রিয় লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করতে চলে যান।

যাই হোক, এই বহু-বিতর্কিত তাজমহল দেখতে যাবার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত করলাম। তিন কন্যা এবং স্ত্রীকে নিয়ে এক বিকেলে উপস্থিত হলাম তাজের সামনে —।

বিস্ময়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করল না — মানুষের হাত এই জিনিস তৈরি করেছে। মহান শিল্পকর্মের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালে হৃদয়ে প্রবল হাহাকার তৈরি হয়। চোখে জল আসে। আমার চোখ জলে ভরে গেল। জলভরা চোখে দেখলাম — সম্রাটের স্বপ্ন — মানুষের হাতে তৈরি শ্বেতপদ্ম। আমার কল্পনা কখনো এর কাছাকাছি যেতে পারেনি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



শিপ্পা সুলতান

ভাইবোনদের নিয়ে বেড়াতে গিয়েছি যশোহর। আমাদের লম্বা পরিকল্পনা — যশোহর থেকে যাব কুষ্টিয়া — রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি দেখব। তারপর যাব মেহেরপুর, দেখব আমবাগানে মুজিবনগর। আমরা পনেরোজন মানুষ, সম্বল একটা নয় সীটের মাইক্রোবাস। মাইক্রোবাসের ড্রাইভার আমাদের কাদের মিয়া। ড্রাইভিং ছাড়া অন্যসব কাজ সে খুব ভাল জানে। আমার প্রবল সন্দেহ সে ডান চোখে দেখে না। রাস্তার ডানদিকে কোন গাড়ি এলে সে মোটেই বিচলিত হয় না; ঐ গাড়ির দিকে সরাসরি মাইক্রোবাস চালাতে থাকে। আমাদের সবাইকে এক সঙ্গে চেঁচাতে হয় — কর কি? কর কি? কাদেরের যন্ত্রণায় গাড়ির ক্যাসেটে গান শোনা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। গান বাজালেই সে মাথা নাড়তে থাকে এবং দু'হাতে স্টিয়ারিং হুইলে তাল দেয়। হাঁটু নাচায়।

এমন বিপদজনক ড্রাইভার নিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণ কেউ করবে না। কিন্তু আমার উপায় নেই। কাদেরকে নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে গাড়ি নিয়ে নানান কায়দা-কানুন করে যাচ্ছে। উদাহরণ দেই, ফাঁকা রাস্তায় ঘণ্টায় সত্তুর কিলোমিটার বেগে গাড়ি যাচ্ছে। আচমকা সে ব্রেক কষল। আমরা একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়লাম। আমি বললাম, কি ব্যাপার কাদের?

কাদের নির্বিকার গলায় বলল, ব্রেক ঠিক আছে কিনা একটু টেস্ট করলাম।

'টেস্টে কি পাওয়া গেল, ব্রেক ঠিক আছে?'

'জ্বি, ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ্।'

'ভবিষ্যতে এরকম টেস্ট করবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

আরেক দিনের কথা — হঠাৎ কাদেরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে আপন মনে হাসছে। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, হাসছ কেন?

সে আনন্দিত স্বরে বলল, গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম স্যার। ঘুম ভাঙার পরে দেখি গাড়ি ঠিকমতই চলছে। এইজন্যে হাসতেছি। আল্লাহ্পাকের কি কুদরৎ!

'তুমি তো আমাদের সবাইকে মারবে।'

'এটা স্যার ভুল কথা বললেন, হায়াৎ-মউতের মালিক আল্লাহ্পাক। উনার হুকুম ছাড়া কিছু হবে না।'

'তোমার অবস্থা যা, আমার তো মনে হয় উনি খুব শিগগিরই হুকুম দেবেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সাবধানে গাড়ি চালাও, খুব সাবধানে।'

'আমি স্যার খুব সাবধান। এই প্রথম গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়েছি।'

এই সাবধানী ড্রাইভারকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মানে মানসিক নির্যাতনের ভেতর দিয়ে যাওয়া। যশোরে পৌঁছে ঠিক করলাম — প্রোগ্রাম কাটছাঁট করব। যেখানে না গেলেই নয় সেখানে যাব। যেমন যশোরে দু'টি জায়গায় যাওয়ার কথা — সাগরদাঁড়ি, মাইকেল মধুসূদনের বসতবাড়ি। এবং নড়াইল, শিল্পী সুলতানের বাড়ি।

সাগরদাঁড়িতে গেলে বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ মাইকেল মধুসূদনের বিখ্যাত মৃত্যুগাঁথা পড়ে আসা যায় —

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে . . .
তিষ্ঠ ক্ষণকাল . . . "

অন্যদিকে আছেন জীবন্ত কিংবদন্তী শিল্পী সুলতান। যিনি ছবি আঁকেন নাচতে নাচতে। ছবি আঁকার সময় অপার্থিব কিছু যেন তাঁর উপর ভর করে। তিনি ঘোরের মধ্যে চলে যান। বিশাল সব ক্যানভাসে যখন তুলি টানেন তখন তাঁর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপে। এসব অবশ্যি আমার শোনাকথা। তাঁকে আমি কখনো ছবি আঁকতে দেখিনি। তাঁর সম্পর্কে শোনাকথারও কোন অন্ত নেই। বিচিত্র সব গল্প তাঁকে নিয়ে প্রচলিত। একটি হচ্ছে — শিল্পী সুলতানের পাঞ্জাবীর দু'পকেটে দু'টি বিড়াল থাকে। তিনি পাঞ্জাবী গায়ে একবার নিউমার্কেটে এসেছেন। এক পকেটমার মানিব্যাগ হাতানোর জন্যে তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। বিড়াল তার হাত কামড়ে দিল। শুধু যে কামড়ে দিল তাই না, কামড় দিয়ে হাতে ঝুলতে লাগল। কিছুতেই সেই বিড়াল ছাড়ানো যায় না। পকেটমারকে ঘিরে লোকে লোকারণ্য।

শিল্পী সুলতানকে নিয়ে আরেকটি খবর কয়েকদিন আগে পড়লাম। খবরের ক্যাপশান — 'সুলতানের সমুদ্রযাত্রা'। শিল্পী সুলতান ৬০ ফুট লম্বা এক নৌকা বানিয়েছেন। পরিকল্পনা হল — তিনি তাঁর জন্মদিনে নৌকা ভর্তি করবেন তাঁর পোষা পঞ্চাশটা বিড়াল দিয়ে। তারপর যাত্রা করবেন সমুদ্রের দিকে। আর লোকালয়ে ফিরবেন না।

এত কাছে এসে এমন একজন বিচিত্র মানুষের কর্মকাণ্ড না দেখে আসা অন্যায় হবে। আমরা নড়াইলে যাওয়া ঠিক করলাম। মাইক্রোবাসে সবাই বসলাম গাদাগাদি করে। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত স্থানীয় দু'জন গাইডও আমাদের সঙ্গে আছেন। কাদেরকে বললাম — গাড়ি খুব আস্তে চালাবে। যা করতে বলা হয় সে তার উল্টোটা করে। কাজেই সে ঝড়ের গতিতে চলল।

শিল্পী সুলতানের বাড়ি 'চিত্রা' নদীর তীরে। বাড়ির ঠিক পেছনেই শান্ত চিত্রা নদী। কি আশ্চর্য! সেই নদীতে সত্যি সত্যি বিশাল এক রঙিন নৌকা। সমুদ্রযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। আমরা নদীর দিকে তাকিয়ে, নৌকার দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, অপূর্ব! সুলতান সাহেব আনন্দে হেসে ফেললেন। একমাত্র শিশুরাই এত সুন্দর করে হাসতে পারে। তিনি গভীর আগ্রহে বললেন — আমার বাড়িটা দেখুন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গাছপালা দিকে তাকালাম। প্রাচীন কালের মুনি ঋষিদের তপোবন। তপোবন আমি দেখিনি কিন্তু তপোবনের যে ছবি আমার কল্পনায় আছে তার সঙ্গে সুলতান সাহেবের গাছপালা কোন অমিল নেই। চারদিকে বিচিত্র গাছপালা, লতাগুল্ম। আলো এবং আঁধার। নিচে পাতাকার উঠোন, একটা শুকনো পাতাও নিচে পড়ে নেই। আমি কিছু বলার আগেই সুলতান সাহেব বললেন, কী সুন্দর, ঠিক না?

আমি বললাম, খুবই সুন্দর! এতটা সুন্দর ভাবিনি।

'খুশি হয়েছেন?'

'খুব খুশি হয়েছি।'

'কাউকে খুশি হতে দেখলে আমার ভাল লাগে।'

তিনি ক্রমাগত হাসছেন। তাঁর চোখে-মুখে আনন্দ ঝরে পড়ছে। রোগা লম্বা একজন মানুষ। গায়ে শাদা পাঞ্জাবী। ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে মাথার অগোছালো চুল। স্বপ্নময় চোখ। আমি বললাম, আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি ঢাকার পত্রিকায় আপনার সম্পর্কে যেসব খবর ছাপা হয় তা ঠিক না।

সুলতান সাহেব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ছাপা হয়?

'আপনার না-কি পঞ্চাশটা পোষা বিড়াল আছে।'

সুলতান সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, কেন যে এরা বানিয়ে বানিয়ে খবর দেয়। আমার বিড়ালের সংখ্যা খুবই কম — মাত্র পঁচিশ।

'কত বললেন?'

'পঁচিশটা। আর কুকুর তার চেয়েও কম — আটটা মাত্র কুকুর।'

'ও।'

'আপনি দেখবেন?'

'জ্বি দেখব।'

'এরা বড় ভাল।'

সুলতান সাহেব ডাক দিতেই প্রকাণ্ড সব কুকুর নানাদিক থেকে বের হতে শুরু করল। এ কী কাণ্ড! আমি জানলাম, প্রতিটি কুকুর এবং প্রতিটি বিড়ালের আলাদা আলাদা নাম আছে। সেই নামে তাদের ডাকলে তারা সাড়া দেয়।

সুলতান সাহেব তাঁর কুকুরদের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, পত্রিকার লোকেরা বানিয়ে বানিয়ে লেখে। এইসব বানানো লেখা পড়ে আমার মনটা খারাপ হয়। এক পত্রিকায় লিখেছে — আমি না-কি বেজী পুষি। পকেটে বেজীর বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াই।

'আপনি বেজী পুষেন না?'

সুলতান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, না। আমি সাপ পুষি।

'কি পুষেন বললেন?'

'সাপ। আমার গোটা দশেক কেউটে সাপ আছে। দেখবেন?'

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, জ্বি না, দেখব না। এরা থাকে কোথায়?

'বাগানেই ঘোরাফিরা করে। বড় লক্ষ্মী! যখন এঁকেবেঁকে যায়, বড়ই মায়া লাগে।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল — কি শুনছি এসব? বাগানে ঘোরাফেরা করে পোষা কেউটে?

সুলতান সাহেব হাসিমুখে বললেন, লোকজন সাপকে কেন এত ভয় করে আমি কিছুই বুঝি না। আল্লাহ তো এদের খুব পছন্দ করেন।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, আল্লাহ্ এদের পছন্দ করেন?

'অবশ্যই করেন। পছন্দ করেন বলেই এমন তীব্র বিষ এদের এতটা করে দিয়েছেন। অন্য কোন প্রজাতিকে তো এত বিষ দেয়া হয়নি —।'

বাগানে ঘুরে বেড়ানোর প্রাথমিক আনন্দ আমার কেটে গেছে। আমি এখন ঘুরছি ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে। আমার দলের অন্যরাও বিচলিত। তবে সুলতান সাহেবের ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা দেখার উত্তেজনায় মনে হচ্ছে তারা খানিকক্ষণের জন্যে সাপের কথা ভুলে গেছে।

চিড়িয়াখানায় নানান ধরনের জীবজন্তু। প্রকাণ্ড এক সারসপাখিও তাদের মধ্যে আছে। আলাদা আলাদা খাঁচায় নানান প্রজাতির বানর। একটি বিশাল আকৃতির বানর খুব হৈচৈ করছিল। সুলতান সাহেব তাকে আহত গলায় বললেন, তুমি এরকম করছ কেন? তুমি তো বড়ই দুষ্টামি করছ। এরা মেহমান। মেহমানদের সামনে হৈচৈ করা কি ঠিক?

বানর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র হয়ে গেল এবং মাথা চুলকাতে লাগল। যেন সে বলছে — মাফ করে দেবেন স্যার। মিসটেক হয়ে গেছে। আর হবে না।

এর মধ্যে চা দেয়া হয়েছে। চায়ের সঙ্গে দু'তিন রকমের মিষ্টি। নারিকেলের নাড়ু। এক হিন্দু মহিলা তদারকি করছেন। কঠিন ধরনের মহিলা বলে মনে হল। সুলতান সাহেব আমাদের সঙ্গে চা খেতে চাচ্ছেন — মহিলা চা দেবেন না। রাগী গলায় তিনি বললেন, লোভ করবেন না। লোভ করা ভাল না। আপনার শরীর কত খারাপ আপনি জানেন না। রোজ আপনাকে অক্সিজেন খাওয়াতে হয়। আজ সকালেও একবার অক্সিজেন খাওয়ালাম।

বিছানার পাশে অক্সিজেন সিলিন্ডার। এমন অসুস্থ একজন মানুষকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করা ঠিক না। উঠে দাঁড়ালাম। সুলতান সাহেব বললেন, শরীরটা বড় খারাপ করেছে। ছবি আঁকতে পারছি না। একটা বড় কাজে হাত দিয়েছি — কিন্তু . . .। আগেও একবার মরতে বসেছিলাম। রওশন এরশাদ আমাকে ঢাকায় নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন। একমাস হাসপাতালে ছিলাম। তিনি রোজ খাবার পাঠাতেন। যখনই সময় পেতেন আমাকে দেখতে আসতেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কোন্ রওশন এরশাদ?

'এরশাদ সাহেবের স্ত্রী।'

'সে কি!'

'জানি না কি কারণ। উনি আমাকে বড়ই স্নেহ করেন। উনি কেমন আছেন আপনি কি জানেন?'

'জ্বি-না, আমি জানি না। ঐ মহিলার প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আমাকে বড়ই স্নেহ করতেন। মানুষের স্নেহ ভালবাসা খুব কমার জিনিস নয়। আমি ভুলি না। ভালবাসা মনে রাখি।'

সুলতান সাহেব হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। বিষণ্নতা তাঁর চোখ থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, অনেক কিছু করার ইচ্ছা ছিল। করতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে সময় বোধহয় ফুরিয়ে গেল।

আমি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললাম, এখন তো ঢাকা হয়েছে শিল্প-সাহিত্যের কেন্দ্র। ঢাকা থেকে এত দূরে আছেন, আপনার অসুবিধা হয় না?

'না। দূরেই ভাল আছি। কোলাহল ভাল লাগে না। এখানে প্রবল শান্তি অনুভব করি। ফার ফ্রম দি মেডিং ক্রাউড।'

'আপনার রুটিন কি? সময় কাটান কি করে?'

'বেশির ভাগ সময় বাগানে বসে বসে ভাবি।'

'কি ভাবেন?'

সুলতান সাহেব হাসলেন। তিনি কি ভাবেন তা হয়ত কাউকে জানতে দিতে চান না। আমি বললাম, আপনি কি আনন্দে আছেন?

'হ্যাঁ, আনন্দে আছি। খুব আনন্দে আছি। একদল ছেলেমেয়ে আমার কাছে ছবি আঁকা শিখতে আসে। এরা মনের আনন্দে কাগজে রঙ লাগায় — দেখে খুব আনন্দ পাই। নৌকা তৈরি শেষ হলে ওদের নিয়ে বের হয়ে পড়ব।'

'কোথায় যাবেন?'

'সমুদ্রের দিকে যাব। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন নৌকায় অনেক জানালা?'

'লক্ষ্য করেছি।'

'বাচ্চারা বসবে জানালার পাশে। যা দেখবে তার ছবি আঁকবে। ভাবতেই ভাল লাগছে।'

'আমারও ভাবতে ভাল লাগছে।'

আমি বললাম, আজ উঠি।

সুলতান সাহেব বললেন, আরো খানিকক্ষণ বসুন।

বসলাম আরো কিছুক্ষণ। লক্ষ্য করলাম সুলতান সাহেবের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তিনি এই শারীরিক কষ্ট অগ্রাহ্য করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। মনটা খুব খারাপ হল।

বিদায় নেবার আগে সুলতান সাহেবের স্টুডিওতে ঢুকলাম। মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু বিশাল এক ক্যানভাস। ছবি অনেকখানি আঁকা হয়েছে। একদল পেশীবহুল নারী-পুরুষ কাজ করছে। কি অপূর্ব ছবি! শিল্পী সুলতান তাঁর নিজের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছেন ক্যানভাসে। ক'জন মানুষ তা পারে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org



লাউ মন্ত্র

জামালপুর গিয়েছিলাম, আশেক মাহমুদ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মুজিবর রহমান সাহেবের বাসায় দুপুরে খাবার দাওয়াত। খেতে বসেছি — অনেক আয়োজনের একটি হচ্ছে চিংড়ি মাছ এবং লাউয়ের ঘন্ট। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের স্ত্রী শংকিত গলায় জানতে চাইলেন — লাউ সিদ্ধ হয়েছে কিনা। আমি বললাম, হয়েছে। মনে হল তিনি তবুও নিশ্চিন্ত বোধ করছেন না। পাশের জনকে জিজ্ঞেস করলেন। সেও বলল সিদ্ধ হয়েছে। আমি একটু বিস্মিত বোধ করলাম। খেতে ভাল হয়েছে কি-না, ঝাল বেশি কি-না সাধারণত এগুলি জানতে চাওয়া হয়। লাউ সিদ্ধ হয়েছে কি-না সচরাচর জানতে চাওয়া হয় না। কোন ব্যাপার আছে কি?

ব্যাপার অবশ্যই আছে। সেটা জানা গেল রাতে গল্পের আসরে। ভদ্রমহিলা একজনের কাছ থেকে ছেলেবেলায় একটা মন্ত্র শিখেছেন। লাউয়ের দিকে তাকিয়ে সেই মন্ত্র পাঠ করলে লাউ সিদ্ধ হয় না। তিনি না-কি অসংখ্যবার পরীক্ষা করেছেন। একবার মন্ত্র পাঠ করবার পর লাউ যতই জ্বাল দেয়া হোক — নরম হবে না। বরং আরো শক্ত হবে। তিনি যখন লাউ রান্না করেন মন্ত্র ভুলে থাকতে চেষ্টা করেন। তবু এক-আধবার মনে পড়ে যায়। তিনি তটস্থ হয়ে থাকেন — লাউ বুঝি সিদ্ধ হল না।

জগতে প্রচুর মন্ত্র-তন্ত্র আছে। বিশ্বকাপ ফুটবলে একটি আফ্রিকান দল সঙ্গে মন্ত্র পড়ার গুণীনও নিয়ে এসেছিল। সেই গুণীন বিংশ শতাব্দীর টিভি ক্যামেরার সামনে মন্ত্র পাঠ করেছে, শাদা রঙের মুরগী কেটে খেলার মাঠে রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছে। মন্ত্রপাঠে শেষ রক্ষা হয়নি — খেলা জেতা যায়নি। ফুটবল খেলা একটা বড় ব্যাপার। এখানে জয়-পরাজয় আছে। জয়-পরাজয় যেখানে আছে সেখানেই মন্ত্র থাকতে পারে। কিন্তু লাউ সিদ্ধ হবে কি সিদ্ধ হবে না, এ নিয়েও যে মন্ত্র থাকতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

ভদ্রমহিলাকে বললাম, আপনি আমাকে মন্ত্রটা শিখিয়ে দিন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন — কি সর্বনাশ! না না!

তিনি যদি অন্য একজনের কাছে শিখতে পারেন, আমিও তাঁর কাছ থেকে শিখতে পারি। ভদ্রমহিলা আমার এই যুক্তিতে কাবু হলেন না। আমার মন্ত্র শেখা হল না।

আমাদের দেশে মন্ত্র-তন্ত্রের একটা প্রবল জোর সব সময়ই ছিল। সব বিষয়ে মন্ত্র ছিল। বসন্ত রোগ দূরীকরণ মন্ত্র। বসন্ত রোগ আনয়ন মন্ত্র। সাপে কাটার মন্ত্র, বশীকরণ মন্ত্র। বিয়ের মন্ত্র, বিয়ে ভাঙার মন্ত্র।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ব্যাপার হল, একদল শিক্ষিত মানুষ আবার এইসব বিশ্বাস করছেন। শুধু যে বিশ্বাস করছেন তাই না — নিজেদের বিশ্বাস অন্যদের মাঝে ছড়ানোর চেষ্টা করছেন।

এইতো সেদিন মাথাব্যথায় কাতর হয়ে আছি। আমার বড় ভাই স্থানীয় বন্ধু টি এন্ড টি মুনীর আহমেদ সাহেব টেলিফোন করলেন। আমি বললাম, কথা বলতে পারছি না। মুনীর ভাই, প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা। তিনি বললেন, আপনি টেলিফোন ধরে চুপচাপ বসে থাকুন তো, আমি মাথাব্যথা সারিয়ে দিচ্ছি।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কিভাবে সারাবেন?

'মেডিটেশন করে সারানো যায়। আমি সিলভা কোর্স নিয়েছি। আপনি টেলিফোন সিলভার কানে নিয়ে চুপ করে বসুন।'

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা না। যা করতে বলছি করুন।'

আমি মিনিট পাঁচেক টেলিফোন ধরে বোকার মত বসে রইলাম। এবং এক সময় বলতে বাধ্য হলাম যে আপনার মেডিটেশনে তেমন উপকার হচ্ছে না। যদি কিছু মনে না করেন দু'টা প্যারাসিটামল খেয়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকব।

মুনীর আহমেদ সাহেব এক সময় ইনজিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর মত আধুনিক মানুষ যদি বিশ্বাস করেন — টেলিফোনে মাথাধরা সারানো যায় তাহলে আমাদের অশিক্ষিত মানুষজন মন্ত্র-তন্ত্রে কেন বিশ্বাস করবে না?

মন্ত্রপাঠ করে গনগনে কয়লার আগুনের উপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য আমেরিকান টিভিতে (NBC) দেখানো হয়েছিল। ব্যাপারটা আমেরিকানদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। একদল সাহেব মন্ত্র-তন্ত্রের পক্ষে খুব লেখালেখি শুরু করলেন। তখন 'কেলটেকে'র (California Institute o Ÿ Technology) বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন পরীক্ষাটা তাঁরাও করবেন। তাঁরা থিওরী বের করলেন, হাঁটার কায়দা বের করলেন। যে কায়দায় হাঁটলে কয়লার তাপ পায়ের পাতা পুড়িয়ে ফেলার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে না। হাজার হাজার দর্শকের সামনে এই পরীক্ষাটি কেলটেকের বিজ্ঞানী করে দেখালেন, যে গনগনে কয়লার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়। এসব বিজ্ঞানীদের একজন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ জাফর ইকবাল। তার কয়লার উপর দিয়ে হাঁটা নিয়ে দৈনিক বাংলার ফিচার পাতায় একটি ফিচারও প্রকাশিত হয়েছিল।

এইসব ঘটনা মন্ত্র বিশ্বাসী মানুষকে টলাতে পারে না। যে যা বলুক মন্ত্র আছে এই বিশ্বাসে তাঁরা বোধহয় মনে এক ধরনের ভরসা পান। তন্ত্রের মূল উৎপত্তি না-কি কামরূপ কামাখ্যায়। সেটি না-কি নারী রাজত্ব। নারীরা সবাই মন্ত্র-তন্ত্র এবং বশীকরণ বিদ্যায় অতিশয় পটু। তারা সবাই উদ্ভিন্ন যৌবনা এবং পরীর মত রূপবতী। কোন পুরুষ ঐ অঞ্চলে চলে গেলে সহজে জীবন নিয়ে ফিরতে পারে না — অসংখ্য তরুণীর মনোরঞ্জন করতে করতেই তার মৃত্যু হয় (বলাই বাহুল্য — সে মরণও স্বর্গ সমান)। তবে কেউ যদি ফিরতে পারে সে মহা সৌভাগ্যবান। কারণ সে তন্ত্র-মন্ত্র শিখে আসে। বাকি জীবনটা তন্ত্র-মন্ত্র ব্যবহার করে সুখেই কাটিয়ে দিতে পারে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ছোটবেলায় দেখেছি গরুর মন্ত্র জানা গুণীন। বছরের একটা বিশেষ সময়ে এরা উপস্থিত হয়। মন্ত্র পাঠ করে গরুর গায়ে ফুঁ দেয়। এই ফুঁ এমনই জোরালো যে আগামী এক বছর কোন রোগ বালাই গরুকে স্পর্শ করে না। মন্ত্রটা পুরোপুরি আমার মনে নেই, তবে মন্ত্রের শুরু এ রকম —

"গোয়াল ঘরের পাশে
খুক খুক কাশে
ছেলেমেয়েরা হাসে . . . "

গুণীনরা শুধু যদি মন্ত্র পাঠ করে চলে যেত তাহলে ব্যাপারটা তেমন অসহনীয় হত না, কিন্তু মন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তারা নিতান্তই অমানবিক একটা কাজ করে — গরুটাকে হাত-পা বেঁধে শুইয়ে লোহা গনগনে গরম করে গরুর গায়ে ছ্যাঁকা দেয়া হয়। চামড়া পুড়ে ধোঁয়া বের হতে থাকে। বেচারা গরু আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে।

এ জাতীয় নির্যাতন শুধু যে পশুদের উপর হয় তা না — মানুষের উপরও হয়। খুব শৈশবে দেখা ছবি: গ্রামের একটি তরুণী বধূকে ভূতে ধরেছে। ভূতে ধরলে লজ্জা-শরম না-কি থাকে না — মেয়েটি গায়ের কাপড় বারবার ফেলে দিচ্ছে। গ্রামে পর্দা প্রথা কঠিন। কিন্তু ভূতে ধরা মেয়েদের জন্যে মনে হয় পর্দা প্রথার কড়াকড়ি তেমন নেই। অনেক পুরুষ মানুষ উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখছে। যে ওঝা মন্ত্র পাঠ করছে — সেও মাঝ বয়েসী। মন্ত্র পাঠ করার ফলে মেয়েটির সারা গায়ে হাত বুলাবার সুযোগ পাচ্ছে। এই কাজটিতে সে আনন্দ পাচ্ছে বলেই মনে হয়। এক পর্যায়ে মেয়েটি গায়ের সব কাপড় খুলে ফেলল। বড়রা আমাদের তাড়া দিল, পুলাপান কি দেখে? দূর হও, দূর হও। আমরা দূর হলাম। বড়দের জগতের সব কান্ডকারখানা আমরা বুঝি না। দূর হওয়াই ভাল। তাছাড়া ওঝা এখন শুকনা মরিচ পোড়াতে দিয়েছে — মেয়েটির দুই নাকের ফুটায় জ্বলন্ত শুকনো মরিচ ঠেসে ধরা হবে। এই দৃশ্য না দেখাই ভাল।

আমার শহীদুল্লাহ্ হলের বাসায় একবার এক বৃদ্ধা মহিলা তাঁর কলেজে পড়া নাতিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। নাতিকে খুব লায়েক মনে হল। তার গায়ে রঙচঙা শার্ট। দিনের বেলাতেও চোখে কালো চশমা। তাঁদের সঙ্গে পেটমোটা কালো ব্যাগ। ভদ্রমহিলা ব্যাগ খুলে নানান কাগজপত্র বের করতে লাগলেন। কাগজপত্রের সঙ্গে আছে পত্রিকার ক্লিপিং, প্রশংসাপত্র। আমি বললাম, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আগে এইগুলান মন দিয়া পাঠ করেন। পরে কথা বলব। কথার দাম নাই — লেখার দাম আছে।

আমি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে কাগজপত্র পড়ে যা জানলাম তা হচ্ছে — তিনি ক্যানসার, এপিলেপ্সি এবং জলাতংক রোগ সারাতে পারেন। এবং গ্যারান্টি সহকারে সারান। এই তিন কালান্তক ব্যাধি যিনি সারাতে পারেন তাঁর অবস্থা দেখে মায়া লাগে। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। শাড়িতে কোন তালি চোখে পড়ল না, তবে গায়ের চাদরে তালি।

'বুঝলেন ভাইডি, আমি তিন ব্যাধির চিকিৎসক। আফনেরে ভাই ডাকলাম।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আপনে আমিরে মন বুঝলেন।'

আমি বোনের মন তেমন বুঝলাম না। ভদ্রমহিলাকে দেয়া প্রশংসাপত্র দেখতে চাইলাম। একটি প্রশংসাপত্র জনৈক সিভিল সার্জনের দেয়া। তিনি লিখেছেন (ইংরেজি থেকে) — এই মহিলা ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে আক্রান্ত একজনকে সারিয়ে তুলেছেন। তাঁর তাঁর চক্ষুষ সাক্ষী। তিনি এই মহিলার সাফল্য কামনা করেন।

যে মানুষ ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সারিয়ে তুলে তাকে নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে হৈচৈ পড়ে যাওয়ার কথা। সিভিল সার্জন ভদ্রলোক কোন হৈচৈ-এ না গিয়ে একটি প্রশংসাপত্র দিয়েছেন।

আমি বললাম, আপনি কি করে রোগ সারান? অষুধপত্র দেন?

'অষুধপত্র আমার কিছু নাই, ভাইডি। আমার আছে মন্ত্র।'

'মন্ত্র পেয়েছেন কিভাবে?'

'গায়েবীতে পাইছি। একদিন আছরের নামাজ পইড়ে জায়নামাজে বইস্যে তসবি টানতেছি তখন গায়েবীতে পাইলাম --।'

'তিন রোগের জন্যে এক মন্ত্র? না তিন রোগের তিন মন্ত্র?'

'একই মন্ত্র। তয় ভাইডি পড়নের কায়দা ভেন্ন।'

'আমার কাছে কি জন্যে এসেছেন?'

'এইটা কি কথা কলেন ভাইডি? বোন ভাইয়ের কাছে আসবি না?'

'তা তো আসবেই। তবু আপনার কোন উদ্দেশ্য থাকলে বলুন।'

'একটা চিডি যে দেওয়া লাগে ভাইডি। একটা কাগজে লিখে দেবেন — আমার চিকিৎসায় রোগ সারে। তারপরে নাম সই করবেন।'

আমি বিরস গলায় বললাম, ক্যানসার, এপিলেপ্সি এবং জলাতংক এই তিন রোগের যে কোন একটা যদি আমার হয়, আপনাকে খবর দেব। তারপর আপনি এসে মন্ত্রপাঠ করে আমার অসুখ সারাবেন। তখন আমি প্যাডে সুন্দর করে সার্টিফিকেট দেব।

আমার বোন কথা শুনে রেগে গেলেন। খিটখিটে গলায় বললেন — এতগুলান লোক যে চিডি দেল? এরা কি মিথ্যে দেল? এর মধ্যে একজনায় আছে মন্ত্রী। ওরে, সেকান্দর মন্ত্রীর চিডি উনারে দেখা।

সেকান্দর মন্ত্রীর চিঠি বের করে দিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্যাডে প্রশংসাপত্র।

'কি, ভাইডি দেখলেন?'

'জ্বি দেখলাম।'

'বিশ্বেস হল?'

'হয়নি।'

'না হইলে কি আর করা! জোর করে তো বিশ্বেস করানো যায় না! তা ভাইডি, জোহর হয়েছে — জায়নামাজ দিতে বলেন। নামাজ পড়া লাগবে।'

'আপনি নিয়মিত নামাজ পড়েন?'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'এইটা কি কথা বলেন ভাইডি? সাত বছর বয়স থেইকে নামাজ পড়ি। একবার অসুখে নামাজ ক্বাজা গেল। কাফ্ফারা দিলাম।'

আমি বললাম, ইসলাম ধর্মে মন্ত্র-তন্ত্র নিষিদ্ধ, তা কি জানেন না? আমাদের ধর্মে বলা হয়েছে যারা মন্ত্র-তন্ত্র করে এবং যারা এইসব বিশ্বাস করে তারা কবিরা গুনাহ্ করে।

'সবই জানি ভাইডি। তয় এর মধ্যে বিষয় আছে। তুমি বুঝবা না, তোমার জ্ঞান কম।'

আমার বোনকে বিদেয় করতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হল। বোনের হাঁটুতে বাতের ব্যথা, চিকিৎসা করাবেন। সেই চিকিৎসার খরচ বাবদ একশ টাকা, এবং রিকশা ভাড়া বাবদ দশ টাকা দিতে হল।

তিনটি কালান্তক ব্যাধির চিকিৎসায় যিনি সিদ্ধহস্ত তাঁকে সামান্য হাঁটুর ব্যথায় কাতর হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখলাম।

সম্প্রতি আমার বাসায় উই পোকার আগমন ঘটেছে। উই পোকা বই কেটে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। নানান অষুধ পত্র্য দিয়েও তাদের কাবু করা যাচ্ছে না। এরা শুধু যে বই খাচ্ছে তাই না, বইয়ের আলমীরাও খেয়ে ফেলছে। মন খুব খারাপ, এই অবস্থায় আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক বললেন, উইপোকা এম্নিতে দূর হবে না। এরা ভয়াবহ। সব ছারখার করে দেবে। তবে তিনি উইপোকা দূর করার মন্ত্র জানেন। আমি যদি চাই তিনি মন্ত্র পাঠ করে উই পোকা দূর করবেন। আমি বললাম, মন্ত্রে উইপোকা দূর হবে?

'অবশ্যই দূর হবে। মন্ত্র পাঠ করলে রাণী উইপোকা মারা যাবে। উই পোকার বংশবৃদ্ধি হবে না।'

'আপনি কি আগেও উই পোকা দূর করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। পরীক্ষা করতে তো আপত্তি নেই।'

আমি বললাম, এক শর্তে আমি পরীক্ষা করতে রাজি আছি — মন্ত্রটা আপনি কাগজে লিখে দিবেন। তারপর মন্ত্র পাঠ করবেন। ভদ্রলোক রাজী হলেন না। মন্ত্র নাকি লেখাতে নেই। এতে মন্ত্রের জোর কমে যায় এবং যে মন্ত্র প্রকাশ করে দেয় তার ক্ষতি হয়।

যাই হোক, আমি উই পোকা তাড়াবার মন্ত্র জোগাড় করেছি। যাদের বাসায় উই পোকা আছে তারা এই মন্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। মন্ত্র পাঠের নিয়ম হল, উইপোকার কিছু মাটি হাতে নিতে হবে, তাতে সমপরিমাণ লবণ মিশাতে হবে। মাটি এবং লবণ মাখতে মাখতে মন্ত্র পাঠ করতে হবে। অবশ্যই মন্ত্র পাঠের সময় শরীর শুদ্ধ হতে হবে। চোখ থাকবে বন্ধ। মন্ত্র পাঠ শেষ হলে — লবণ-মাখা মাটি উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে দিতে হবে।

মন্ত্রে কাজ হয় কি?

আমার বেলায় হয়নি। তবে আমি অবিশ্বাসী লোক, আমার বেলায় কাজ না হবারই কথা। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

(মন্ত্র)

উত্তর দক্ষিণ সান
বজরং প্রমাণ
উই উই সান॥
বজরং প্রমাণ
পূর্ব পশ্চিম সান
উই উই প্রমাণ॥
কালীর দিব্যি ধরি
অহমস্তি ধাম

দুর্জনং বন্দেৎ
পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ সান॥
উই উই প্রমাণ॥



মাসাউকি খাতাঁওরা

মধ্যবিত্তদের জীবনে উত্তেজনা সৃষ্টির মত ঘটনা বড় একটা ঘটে না। তাদের জীবনযাত্রা খাওয়া, ঘুমানো এবং টিভি দেখার মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমার ছোট ভাইয়ের বাসায় ব্যতিক্রম হল। তাদের বাসায় উত্তেজনা সৃষ্টির মত একটা ঘটনা ঘটার উপক্রম হল। শুনলাম, এক জাপানী যুবক না-কি তার বাসায় একমাস থাকবে। জাপান-বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স প্রোগ্রামের সে একজন কর্মী, বাংলাদেশের গ্রামে দু'বছর কাটাবে। তবে পোস্টিং হবার আগে বাংলাদেশের কোন-এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে তাকে এক মাস কাটাতে হবে, যাতে সে আমাদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পায়।

জাপানী যুবকের জন্যে আমার ছোট ভাইয়ের পল্লবীর বাসার দোতলায় একটা ঘর খালি করা হল। জানালায় নতুন পর্দা দেয়া হল। বিছানায় নতুন চাদর। টেবিলে ফুলদানিতে গোলাপ। বাথরুমে টয়লেট পেপার। বিদেশী অতিথি। আদর-যত্নের যেন ত্রুটি না হয়। এই অতিথি অন্যসব অতিথির মত নয়। সে হচ্ছে পেইং গেস্ট। যে-ক'দিন থাকবে সে-ক'দিনের জন্যে টাকা দেবে। পেইং গেস্ট হলেও তার মূল কাজ আমাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা। আমাদের কালচার সম্পর্কে ধারণা নেয়া। যেহেতু বাঙালি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সংস্কৃতি সম্পর্কে সে ধারণা নেবে। কাজেই আমাদের সচেতন থাকতে হবে, কোন ভুল ধারণা যেন সে না পায়।

তার সন্ধ্যাবেলা আসার কথা। বাসার সবাই বিকেল থেকে সেজেগুজে অপেক্ষা করতে লাগল। বাচ্চাদের উৎসাহই সবচে' বেশি। তারা কথাবার্তা কিভাবে বলবে তাই নিয়ে মহাচিন্তিত। দোকান থেকে কুৎসিত আকৃতির বিশাল সাইজের মিষ্টি আনা হয়েছে, যাতে বিদেশী অতিথিকে মিষ্টির আয়তন দেখিয়ে ভড়কে দেয়া যায়।

অতিথি এল সন্ধ্যাবেলা। পায়ে বুটজুতা, পরনে চকচকে সবুজ লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। আমরা তাকে ভড়কাতে চেয়েছিলাম। বিচিত্র পোশাক দিয়ে শুরুতেই সে আমাদের ভড়কে দিল। অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে বো করল। একবার না, কয়েকবার। তারপর হাসিমুখে পরিষ্কার বাংলায় বলল, আমার নাম মাসাউকি ষাতাঁওরা। আশা করি আপনারা ভাল আছেন। শুভসন্ধ্যা।

আমরা তার পোশাক দেখে মুগ্ধ। তার দুধে আলতা গায়ের রঙ দেখে মুগ্ধ। তার পরিষ্কার বাংলা শুনে মুগ্ধ। জানলাম প্রয়োজনীয় বাংলা সে জাপান থেকেই শিখে এসেছে।

হাসি-খুশি ধরনের নিতান্তই অল্প বয়স্ক একটি ছেলে। শুনেছি, জাতি হিসেবে জাপানিরা খুব বুদ্ধিমান। একে খানিকটা বেকুব ধরনের মনে হল। সে প্রথম দিনেই তার বেকুবির অনেকগুলি প্রমাণ দেখাল। বিশাল আয়তনের সাতটি মিষ্টি খেয়ে বলল, মিষ্টি জাতীয় খাবার আমি পছন্দ করি না।

অনেক বাচ্চাকাচ্চা তার জন্যে অপেক্ষা করছে দেখে সে বাচ্চাদের আনন্দ দেয়া অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে ধরে নিয়ে -- ডিগবাজি, পা উপরে মাথা নিচে দিয়ে দাঁড়ানো জাতীয় কিছু খেলা দেখাল এবং এক সময় হুড়মুড় করে পড়ে গিয়ে একটা চায়ের কাপ ভেঙে ফেলে ভাঙা টুকরাগুলির দিকে খুবই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। একটা ময়লা একশ' টাকার নোট মা'র দিকে বাড়িয়ে বলল, দয়া করে কাপের দামটা এখান থেকে রাখুন। কাপ ভাঙায় আমি বিশেষ 'দুঃখি' হয়েছি।

সাতদিনের মাথায় সে ঘরের লোক হয়ে গেল। রান্নাঘরে ঘুরঘুর করে। কাঁচা মরিচ ছাড়া ভাত খেতে পারে না। আমার মা অবলীলায় তাকে বলেন, দোকান থেকে আধ কেজি লবণ এনে দাও তো। সে ছুটে যায় লবণ আনতে। মশারি খাটানোর জন্যে পেরেক পুঁতে দেয়। একদিন দেখা গেল ঝাড়ু হাতে প্রবল উৎসাহে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। ভিক্ষুক দরজা ধাক্কা দিলে বলছে — "মাফ কর।"

বাসার পাশে এক ধোপার দোকানে তাকে দীর্ঘ সময় কাটাতে দেখা গেল। জানা গেল, ধোপাকে সে একশ' টাকা দিয়েছে, যার বিনিময়ে ধোপা তাকে তার টু-ইন-ওয়ানটি ব্যবহার করতে দেয়। সে সেখানে জাপান থেকে নিয়ে-আসা ক্যাসেটে জাপানি গান শুনে।

তাকে বলা হল যে, বাসাতেই ক্যাসেট প্লেয়ার আছে। সে ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারে। তার জবাবে সে বলল, এই বাসায় সে জাপানি ক্যাসেট বাজাতে চায় না। সে বাঙালি কালচার শিখতে চায়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমাদের সঙ্গে থেকে সে যেসব কালচার শিখল তা বাঙালি কালচারে পড়ে না। পাশ্চাত্যিক কালচার হিসেবে চালানো যায়। কিছু নমুনা দেয়া যাক।

(১) ঘুমুতে যাবার এবং ঘুম থেকে উঠার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যার যখন ইচ্ছা ঘুমুতে যেতে পারে। কেউ রাত দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে আবার অনেকে রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে থাকে। কেউ কেউ ওঠে সূর্য ওঠার আগে এবং প্রার্থনা করে (আমার মা)। কেউ সকাল এগারোটায় অনেক কষ্টে বিছানা থেকে নামে (আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা), এক পাশ চা খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

(২) দেশের বাড়ি থেকে প্রচুর মেহমান আসে। তখন ঘরের মেঝেতে নানা ধরনের বিছানা করা হয়।

(৩) রবীন্দ্র সংগীত, হিন্দী এবং ইংরেজি — এই তিন ধরনের গান সারাক্ষণ ক্যাসেটে বাজতে থাকে। যদিও কাউকে দেখেই মনে হয় না সে গান শুনছে।

মাসাউকিকে দেখে আমরাও জাপানিদের সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা করলাম। যেমন —

ক) জাপানি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ঠিক না। তারা খানিকটা বেকুব ধরনের হয়। (উদাহরণ ঃ একবার বাসায় একটা মিলাদ হল। মাসাউকি সেখানে উপস্থিত। পাত্রে করে আতর-ভেজানো তূলা দেয়া হয়েছে। সবাই তূলা থেকে আঙুলে খানিকটা আতর মাখিয়ে নাকে দিচ্ছে। তূলার পাত্র মাসাউকির সামনে আসতেই সে পুরো তূলার টুকরা মুখে দিয়ে কপ করে গিলে ফেলে — হাঁসের মত গলা টেনে টেনে কাশতে লাগল।)

খ) জাপানিরা খাদ্যের ব্যাপারে গোপালের মত সুবোধ বালক। তাদের যা দেয়া হয় সবই খায়। তবে তারা নুডল্‌স্ খায় না। সবচে' বেশি পছন্দ করে এলু-বার্তা [আলুভর্তা] এবং তিরিকিরি [তরকারি] ।

গ) এদের লজ্জাশরম একটু কম। লুঙ্গি পরে থাকে, ফট করে লুঙ্গি খুলে যায় — তারা তাতে মোটেই বিব্রত বোধ করে না। শুধু ইয়েই ইয়েই জাতীয় শব্দ করে।

ঘ) জাপানিরা খুব রঙচঙে আন্ডারওয়ার পরে। মাসাউকির লুঙ্গি প্রায়ই খুলে যাওয়ায় তার বিচিত্র রঙের আন্ডারওয়ার দেখার সৌভাগ্য আমাদের সবারই হয়েছে।

মাসাউকিকে নিয়ে সবচে' সমস্যায় পড়লেন আমার মা। গ্রামে তাঁর যত আত্মীয়স্বজন আছে তারা সবাই জাপানি দেখার অজুহাতে একবার করে ঢাকা ঘুরে গেল। নিতান্ত অসময়ে ছয়-সাতজন এসে উপস্থিত হয়। তাদের মুখভর্তি হাসি। তারা খুশি খুশি গলায় বলে, জাপানি দেখতে আসছি। তাদের সেই দেখা তিন-চারদিনেও শেষ হয় না। তারা জাপানি দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখে, ঢাকা শহর দেখে, বলাকা সিনেমা হলে সিনেমা দেখে। দেশে ফিরে যাবার সময় বলে — জাপানি দেইখ্যা বড় ভাল লাগল। অতদিন খালি জাপানি জিনিস দেখছি, এখন আল্লাপাক জাপানি আদম দেখাইল। এরার সব ভাল তবে বাংলা ভাষায় একটু দুর্বল।

তারা দেশে ফিরে অন্যদের খবর দেয়। অন্যরা তখন কাপড়-চোপড় গুছিয়ে ঢাকা রওনা দেয়।

একমাস পর হবার পর মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মাসাউকি বিদায় নিয়ে চলে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

যাচ্ছে। বিদায়-দৃশ্য যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং হল। মাসাউকি হড়বড় করে জাপানি ভাষায় একগাদা কথা বলল। মনে হল, তার মধ্যে গভীর আবেগের সঞ্চার হয়েছে। কারণ কথা বলতে বলতে তার গলা ধরে আসছিল। আমরা যে তার জাপানি ভাষা এক বর্ণও বুঝতে পারছি না তা তাকে বুঝতে দিলাম না। আমরা সবাই খুব মাথা নাড়তে লাগলাম। মা'র বাসায় কাজের মেয়ে দু'জনের একজন গলা ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল — মশা ভাইজান যাইতাছে গা [মাসাউকি বাসার বাচ্চাকাচ্চা এবং কাজের মানুষদের কাছে মশাভাই হিসেবে পরিচিত]।

মাসাউকির বিদায়ের ছ'মাস পরের কথা। কোরবানীর ঈদের ছুটিতে আমরা সবাই পল্লবীর মা'র বাড়িতে জড় হয়েছি। এই ঈদ সবাই মিলে মা'র সঙ্গে করি — দীর্ঘদিনের নিয়ম। ঈদের দু'দিন আগে স্যুটকেস হাতে নিয়ে মাসাউকি উপস্থিত। দু'টা একশ' টাকার নোট বের করে মা'র কাছে গিয়ে সে যা বলল তা হচ্ছে, তাকে তিনদিনের ছুটি দিয়েছে। সে আমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছে। দু'শ টাকা সে দিচ্ছে খরচ হিসেবে।

মা বললেন, তুমি আমাদের একটা বড় উৎসবের সময় থাকতে এসেছ। আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি থাক। টাকা লাগবে না। এর পর যতবার ছুটি কাটাতে ইচ্ছা করবে চলে আসবে। তবে তোমার থাকতে অসুবিধা হবে। আমার সব ছেলেমেয়েরা চলে এসেছে। বাসা ছোট।

আমার অসুবিধা হবে না। আমি চেয়ারে 'নিদ্রা' করব।

বলেই সে দেরি করল না, বসার সোফায় তার বিছানা পেতে ফেলল। ঈদ উপলক্ষে তাকে পায়জামা পাঞ্জাবী উপহার দেয়া হল। সে নিজে গিয়ে একটা টুপি কিনে আনল। ঈদ উৎসবের নিয়ম-কানুন নিয়েও তাকে খুব চিন্তিত মনে হল। সে কোন নিয়ম বাদ দিতে চায় না।

গরু কেনার ব্যাপারেও তার খুব আগ্রহ দেখা গেল। সে ঘোষণা করল, গরু কেনার সময় সে সঙ্গে যেতে চায়। এবং সে গরুর গোশ্তের একটা জাপানি প্রিপারেশন আমাদের রেঁধে খাওয়াতে চায়।

আমরা তাকে নিয়েই গরু কিনলাম। গরুর দড়ি ধরে হাঁটিয়ে গরু বাসায় নিয়ে আসার পবিত্র দায়িত্বও তার হাতে পড়ল। সে এক বিচিত্র দৃশ্য! এক জাপানি কোরবানীর গরুর দড়ি ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যে-ই দেখছে সে-ই থমকে দাঁড়াচ্ছে। বুঝতে পারছে না — এই জাপানি সাহেবকে গরুর দাম জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কি-না। যেহেতু কোরবানীর গরুর দাম জিজ্ঞেস করা পবিত্র দায়িত্বের একটি, কাজেই কেউ কেউ ভয়ে ভয়ে এবং খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করছে — গরুর দাম কত?

জাপানি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ছে। বো করছে, তারপর গম্ভীর গলায় বলছে — ইহা কোরবানীর গরু হয়। ইহার দাম হয় অষ্ট হাজার টাকা।

গরুর দাম যতই বলা হোক প্রশ্নকর্তাকে বলতে হবে — সস্তা হয়েছে। খুব সস্তা। খুব জিতেছেন।

প্রশ্নকর্তা নিয়মমাফিক অষ্ট হাজার টাকা দাম শুনে বলেন — সস্তা হয়েছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মাসাউকি বলল, অবশ্যই সস্তা হয়েছে। বার হাজার চেয়েছিল। আমরা মূলামূলি করেছি। (মূলামূলি শব্দ সে সম্প্রতি শিখেছে।)

গাবতলী থেকে পল্লবী — অনেকখানি রাস্তা। সারাপথই মাসাউকি গরুর দাম বলতে বলতে এল। বোঝাই যাচ্ছে এই কাজটায় সে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছে।

বাসায় পৌঁছে সে গরুকে পানি খাওয়াল। গা ডলে দিল। পানি দিয়ে গোসল দিয়ে দিল।

আমার মা বললেন, মাসাউকি নিশ্চয়ই কোন চাষী পরিবার থেকে এসেছে। চাষী পরিবারের ছেলে বলেই গরুর প্রতি এত যত্ন। যত্নটা আমার কাছেও বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল — সে কলা কিনে এনেছে। গরুকে কলা খাওয়াচ্ছে। গাথা আঁচড়ানোর চিরুনী দিয়ে গরুর গলকম্বল আঁচড়ে দিচ্ছে।

যথাসময়ে কোরবানী হয়ে গেল। মাংস রান্না হল। সবাই খেতে বসেছি, মাসাউকির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে রাস্তা থেকে ধরে আনা হল। জানা গেল সে রাস্তার পাশে খুব মন খারাপ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। মন-খারাপের কি কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে জবাব দিল না। বিদেশী অতিথি হিসেবে বিশাল মাংসের বাটি এগিয়ে দেয়া হল তার সামনে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, গরুটাকে অনেক দূর থেকে হাঁটিয়ে আনার জন্যে গরুটার উপর তার মায়া পড়ে গেছে। এই গরুর গোশত সে খেতে পারবে না। গোশত না-খাওয়ার এই অপরাধ আমরা যেন ক্ষমা করে দেই। সে শুধু পোলাও খাবে। তার কোন অসুবিধা হবে না।

আমরা সবাই অবাক হয়ে মাসাউকির দিকে তাকালাম।

ঈদের পরেও সে দু'দিন রইল। ঘরে এত মাংস, সে একটা টুকরাও মুখে দিল না। দূর দেশের বোকাসোকা একটা ছেলে আমাদের সবার মর্মমূলে বড় ধরনের একটা নাড়া দিয়ে গেল। এর প্রয়োজন ছিল।



ইথিনিশ ম্যান

কক্সবাজারে পর্যটনের কিছু কটেজ আছে। এদের বলে ওল্ড কটেজ। সুন্দর সুন্দর নাম — তন্ময়, তটিনি . . .। এক সময় এই কটেজগুলি সমুদ্রের কাছাকাছি ছিল। কটেজের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসলে সমুদ্র দেখা যেত। আজ আর দেখা যায় না। সমুদ্র দূরে সরে গেছে। কটেজগুলি আলাদা হয়ে গেছে। সমুদ্রের সঙ্গে আজ আর তাদের যোগ নেই। পর্যটন নতুন নতুন কটেজ বানিয়েছে, আধুনিক মোটেল তৈরি করেছে — তন্ময় তটিনিকে নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি এবার কি মনে করে পুরানো কটেজগুলির একটায় উঠলাম! এই কটেজে রান্না করে খাবার ব্যবস্থা আছে। মনে করলাম, ব্যাপারটা মন্দ হবে না, বাজার করে রান্নাবান্না করে খাওয়া হবে! পিকনিক-পিকনিক ভাব।

কল্পনা এবং বাস্তবের ভেতরকার দূরত্ব অনেক বেশি! বাস্তবে দেখা গেল, রান্না করে খাওয়ার ব্যাপারটায় যন্ত্রণার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সন্ধ্যাবেলা বাজারে গিয়ে দেখি, অপরিচিত চেহারার কিছু সামুদ্রিক মাছ ছাড়া আর কিছু নেই। গোশত পাওয়া গেল। যিনি গোশত বিক্রি করছেন তিনি নিতান্তই সত্যবাদী। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, কিসের গোশত? তিনি অম্লান বদনে বললেন — বুড়া মহিষ। ইচ্ছা হইলে নেন।

ঢাকার নিউমার্কেট থেকে না জেনে মহিষের গোশত প্রায় রোজই খাচ্ছি। জেনে-শুনে বৃদ্ধ মহিষ খাওয়া অসম্ভব। দুটা মুরগী পাওয়া গেল। মুরগী দু'জনও যথেষ্ট অভিজ্ঞ। ঘণ্টা দুই গনগনে আগুনে জ্বাল দেবার পর অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। যতই জ্বাল হচ্ছে মাংস ততই শক্ত হচ্ছে।

রাত নটায় আমাদের কাজের মেয়েটি এসে বলল, লাকড়ি শেষ হয়ে গেছে। আরো লাকড়ি লাগবে।

আমি লাকড়ি আনতে বের হলাম এবং প্রথমবারের মত উপলব্ধি করলাম, ঢাকার বাসিন্দা যাঁরা গ্যাসের চুলায় রান্না করছেন তাঁরা কত সুখেই না আছেন।

আমাদের খাওয়া শুরু হতে হতে রাত সাড়ে বারোটা বাজল। আমার বড় মেয়ে নোভা খেতে খেতে তার মা'কে বলল, নিজে রান্না করে খাওয়ার এই বুদ্ধি আব্বুকে কে দিয়েছে মা?

নোভার মা আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, তোমার বাবার কি বুদ্ধির কোন অভাব আছে যে অন্যদের কাছ থেকে ধার করবে? সে চলে তার নিজের বুদ্ধিতে। সেই বুদ্ধির ফলাফল তো তোমরা দেখছ — সবাই সমুদ্র দেখে, খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমুচ্ছে। আমরা কেবল খেতে বসেছি। মুরগী এখনো সিদ্ধ হয়নি।

'মুরগী সিদ্ধ হচ্ছে না কেন মা?'

'তোমার বাবা নিজের বুদ্ধি খরচ করে মুরগী কিনেছে তো, তাই সিদ্ধ হচ্ছে না। এই যন্ত্রণার আজই শেষ — কাল থেকে আমরা হোটেলে খাব।'

খাওয়ার শেষে কটেজের বারান্দায় বিরস মুখে বসে মশার কামড় খাচ্ছি। স্বাস্থ্যকর স্থানের মশারাও স্বাস্থ্যবান হবে, বলাই বাহুল্য। এরা মনের সুখে কামড়ে যাচ্ছে। আকাশে বিশাল চাঁদ উঠেছে। গতকাল পূর্ণিমা ছিল। আজ পূর্ণিমার দ্বিতীয় দিবস। পূর্ণিমা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়। কক্সবাজার রওনা হবার আগে পঞ্জিকা দেখে রওনা হয়েছি। সমুদ্রে চাঁদের আলো দেখার মত ব্যাপার! সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্যে আজ তেমন আগ্রহ বোধ করছি না। বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। বাচ্চাদের মা যে পরিমাণ রেগে আছে তাতে মনে হয় না সে আমার সঙ্গে সমুদ্র দেখতে যাবে।

মোটামুটি শীত পড়েছে। চাদরে শরীর ঢেকে আমি বসে আছি। এত সুন্দর জোছনা যে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে না। একা সমুদ্রের কাছে যেতেও ইচ্ছা করছে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

না। সৌন্দর্য একা দেখার জিনিস নয়।

রাত একটার দিকে গুলতেকিন শাল গায়ে দিয়ে বাইরে এসে বলল, চল, তোমার সমুদ্র জোছনা দেখে আসি।

আমি আমার স্ত্রীর এই বাক্যটির জন্যে তার পূর্বের এক হাজার অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম।

সমুদ্রের কাছে কিন্তু যাওয়া হল না। কটেজের বাইরে পা দিয়েই এক ধরনের অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম। দৃশ্যটি বর্ণনা করার চেষ্টা করি —

আমাদের কটেজের ডানপাশে অনেকখানি খালি জায়গা। জায়গাটার এক অংশে বেশকিছু বাঁশ পোঁতা। বাঁশগুলি সুতলি দিয়ে বাঁধা। সেই সব সুতলিতে রঙিন কাগজ, ছেঁড়া কাগজ, কাপড়ের টুকরা সাজানো। বোঝাই যাচ্ছে, যে সাজিয়েছে সে খুব যত্ন করে সাজিয়েছে। কিন্তু সেই সাজানোয় সুন্দরের চেয়ে অসুন্দর অনেক বেশি। তাকালেই মনে এক ধরনের ধাক্কা লাগে।

সাজানোর কাজটি যে করেছে তাকে আমরা এখন দেখলাম। খালি গায়ে রোগা লম্বা একজন মানুষ। তার জ্বলজ্বলে চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে — মানুষটা স্বাভাবিক নয়। আস্তাকুঁড় থেকে সে রাজ্যের ময়লা নিয়ে এসেছে। ময়লা থেকে বেছে বেছে রঙিন কাগজ নিয়ে সুতলিতে সাজাচ্ছে। কাজটা সে মোটেই হেলাফেলার সঙ্গে করছে না। কয়েকটা রঙিন কাগজের টুকরা বের করে সে প্রথমে তার সামনে রাখে। দীর্ঘ সময় কাগজের টুকরাগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবে। তারপর একটা একটা করে কাগজ লাগায়। লাগিয়ে দূর থেকে, কাছে থেকে নানানভাবে সে পরীক্ষা করে।

আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, পাগলদের খুব ভদ্র ভঙ্গিতে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দেয়। ভালভাবেই জবাব দেয়। আমি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি করছেন?

লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। আমি আবার বললাম, আপনি কি করছেন?

লোকটি চিটাগাং-এর কথ্য ভাষায় যা বলল তা হল — তুমি কি দেখতে পারছ না আমি কি করছি?

আমার প্রশ্নটা ছিল বোকার মত। উত্তর শুনে খানিকটা হকচকিয়ে যেতে হল। আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম — সাজাচ্ছেন কেন?

লোকটি সেই প্রশ্নের জবাব দিল না। গভীর মনোযোগে কাগজ বাছতে লাগল। সমুদ্র-জোছনার চেয়ে লোকটির কাণ্ডকারখানা আমার কাছে অনেক আকর্ষণীয় মনে হল। আমি কটেজের বারান্দায় ফিরে গেলাম। গভীর আগ্রহে পাগলের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। কটেজের নাইট গার্ড আমাকে বলল — এই পাগল অনেকদিন থেকে কক্সবাজারে আছে। সারাদিন সে রঙিন কাগজ খুঁজে বেড়ায়। রাত বারোটার পর থেকে সাজাতে শুরু করে; সাজানো শেষ হলে কয়েকটা ইট বিছিয়ে আগুন জ্বালায়। সেই আগুনে নিজের খাবার নিজেই রান্না করে খায়। খাওয়া শেষ হবার পর নিজের শিল্পকর্মের সামনে মূর্তির মত বসে থাকে। রাত এই ভাবে কাটিয়ে ভোর হবার আগে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আগে আবার বের হয়ে পড়ে রঙিন কাগজের খোঁজে।

নাইটগার্ড যা বলল সবই ঘটতে দেখলাম। যা সে বলেনি বা বলতে ভুলে গেছে তাও দেখলাম। লোকটি যে তার শিল্পকর্ম মুগ্ধ হয়ে দেখে তা না, শিল্পকর্মের সামনে কিছুক্ষণ আত্মভোলা ভঙ্গিতে নাচে।

এই লোকটির অতীত ইতিহাস কি?

কেন সে রঙিন কাগজে ঘর সাজায়? কি ভাবে সে? এই রহস্য কোনদিনও জানা হবে না। জগতের অনেক রহস্যের মত এই রহস্যও ঢাকা থাকবে অনেক দিন।

পাগলদের প্রতি আমার আগ্রহ এবং কৌতূহল সীমাহীন। এদের সবারই আলাদা নিজস্ব লজিক আছে। সেই লজিকের কারণে কাউকে কাউকে দেখা যায় গভীর একনিষ্ঠতায় ট্রাফিক কনট্রোল করছে, আবার কাউকে কাউকে দেখা যায় রঙিন কাগজ জড়ো করে বিচিত্র শিল্পকর্ম তৈরি করছে।

ঢাকা কলেজে যখন পড়ি তখন আমার ক্লাসেরই এক ছাত্রের সঙ্গে আমার খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়। চমৎকার ছেলে। ভদ্র, বিনয়ী, মেধাবী। দোষের মধ্যে একটিই — বড় বেশি ইংরেজি বলে। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম ইংলিশম্যান। ইন্টারমিডিয়েট সে আমার সঙ্গেই পাস করল। স্টার মার্কস পেল। তারপর আর তার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ রইল না। দীর্ঘদিন পরের কথা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করছি। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি, আমার ছাত্রদের মাঝে মাথা নিচু করে ইংলিশম্যান বসে আছে। আমি পড়ানো বন্ধ করে বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি অমুক না?

সে ম্লান গলায় বলল, ইয়েস স্যার।

'ক্লাস শেষ হবার পর তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'জ্বি, আচ্ছা স্যার।'

ক্লাসের শেষে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। বেচারা লজ্জায় মরে যাচ্ছে। চেয়ারে বসতে বললাম, কিছুতেই বসবে না। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। তার কাছ থেকে যা জানলাম তা হল — ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর পর তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলে। শেষ পর্যায়ে পাবনা মানসিক হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করানো হয়। এখন সে সুস্থ। আবার পড়াশোনা শুরু করেছে।

আমি তাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলাম। দীর্ঘদিন পার করে আবার পড়াশোনা শুরু করার সৎসাহস তুচ্ছ করার বিষয় নয়। আমি তাকে বললাম, কখনোই আমাকে স্যার ডাকবে না। আগের মত হুমায়ূন করেই ডাকবে।

আমি দূরত্ব দূর করতে চাইলাম, দূর হল না। রাস্তা ঘাটে দেখা হলে অন্য ছাত্রদের মতই বিনীত ভঙ্গিতে সে আমাকে সালাম দেয়। ক্লাসে মাথা নিচু করে বসে থাকে। আমি প্রায়ই আমার রুমে তাকে ডেকে নিয়ে আসি চা খাবার জন্যে। নানান ধরনের গল্প করার চেষ্টা করি: গল্প জমে না। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, পাগল হবার সময়ের কথা কি কিছু মনে আছে?

সে ইতস্তত করে বলল, না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'কোন কিছুই মনে নেই?'

সে চুপ করে রইল। আমি বললাম, যদি মনে থাকে আমাকে বল। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।

সে নিচু গলায় বলল, পাগল হবার আগের সময়টার কথা মনে আছে।

'বল শুনি।'

'আমি আমার পড়ার ঘরে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ঘরটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। দেয়ালগুলো আমার কাছে চলে আসছে। তখন ভয় পেয়ে আমি একটা বিকট চিৎকার দেই।'

'এর পরের কথা তোমার আর কিছু মনে নেই?'

'না। শুধু মনে আছে — সারাক্ষণ একটা কুকুরের মুখ দেখতাম। মুখটা আমার দিকে তাকিয়ে থাকত।'

'কি রঙের কুকুর?'

'ঘিয়া রঙের। কুকুরটার শরীর ছোট কিন্তু মুখটা অনেক বড়। গরুর মুখের মত বড়।'

'আর কিছু তোমার মনে নেই?'

'না।'

ইংলিশম্যান রসায়ন বিভাগে দুই বছর পড়াশোনা করল। থার্ড ইয়ারে উঠে সে আবার পাগল হয়ে গেল। একদিন ক্লাসে এসে উপস্থিত হল সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়। ভয়াবহ ব্যাপার! আমি তাকে ডেকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?

সে হেসে বলল, হ্যাঁ, তুমি হুমায়ূন।

আমি একটি এপ্রন এনে তাকে পরতে দিলাম। সে কোন আপত্তি না করেই এপ্রন পরল। আমি বললাম, তুমি যে কোন কাপড় ছাড়া ডিপার্টমেন্টে এসেছ — এটা কি ঠিক হয়েছে? তোমার বন্ধুরা খুব লজ্জা পাচ্ছে। কেউ কেউ ভয়ও পাচ্ছে। তুমি কি তা বুঝতে পারছ না?

'পারছি।'

'তুমি অসুস্থ। সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত ডিপার্টমেন্টে আসার তোমার কোন দরকার নেই। আর যদি আস কাপড় পরে আসবে, কেমন?'

ইংলিশম্যান ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কাপড় পরলে সে রাগ করে।

'কে রাগ করে?'

'কুকুরটা রাগ করে।'

'কোথায় কুকুর ?'

'এইখানে নাই। রাস্তায় গেলেই আসে।'

'কুকুর রাগ করুক আর যাই করুক — তুমি সবসময় কাপড় পরে থাকবে।'

'আচ্ছা।'

ইংলিশম্যানের এক ভাই পড়তো ফার্মেসী বিভাগে। তাকে খবর দিলাম। বেচারা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কাঁদতে কাঁদতে বড় ভাইকে বাসায় নিয়ে গেল। সমস্যার শেষ হল না। এটা ছিল সমস্যার শুরু। ইংলিশম্যান দু'-তিন দিন পর পরই ডিপার্টমেন্টে আসতে শুরু করল। এসেই সে খোঁজে আমাকে। ব্যাকুল হয়ে ডাকে — হুমায়ূন, হুমায়ূন। আমি একদিন তার ভাইকে ডেকে ধমকে দিলাম। এসব কি! অসুস্থ একটা ছেলেকে আটকে রাখতে হবে। তারা ছেড়ে দিচ্ছে কেন?

আমি তখন বাবর রোডের বাসায় থাকি। এক ছুটির দিন ভোরবেলায় সে আমার বাসায় উপস্থিত। আগের মত অবস্থা। গায়ে কোন কাপড় নেই, শুধু মাথায় একটা রুমাল বাঁধা। কথাবার্তা খুব স্বাভাবিক। আমি বললাম — বাসা চিনলে কিভাবে?

সে হাসল।

আমার বাসা তার চেনার কোনই কারণ নেই। আগে কোনদিন বাসায় নিয়ে আসিনি। ডিপার্টমেন্ট থেকে ঠিকানা জোগাড় করে আসবে, তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেউ তাকে ঠিকানা দেবে না।

আমি তাকে বসার ঘরে এনে বসালাম। নিজের একটা পুরানো প্যান্ট পরিয়ে দিলাম। সে আপত্তি করল না। বরং আগ্রহ করে পরল। চা খেতে দিলাম। চা খেল।

আমি বললাম, ঠিকানা কোথায় পেলে?

ইংলিশম্যান বলল, ঠিকানা লাগে না। আমি আতংকিত বোধ করলাম। সে তো এখন রোজই এখানে আসবে। আমাকে অস্থির করে মারবে।

যা ভাবলাম তাই ঘটল। ইংলিশম্যান কয়েকদিন পরপরই আসে। তবে বিরক্ত করে না। প্রথম দিন সোফার যে জায়গায় বসেছিল রোজ এসে সেই জায়গাটায় বসে। চা দিলে খায়। ঘণ্টা দুই বসে থেকে চলে যায়। আমি তাকে অনেক বুঝালাম — রোজ এভাবে আসা ঠিক না। অনেক সমস্যা হয়। প্রতিবারই সে আন্তরিক ভঙ্গিতে বলে — আর আসব না। কিন্তু আবারো আসে। ইংলিশম্যানের যন্ত্রণায় অবস্থা এমন হল যে আমি বাসা ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবতে লাগলাম। নতুন কোন জায়গায় গিয়ে উঠব যাতে সে আমার খোঁজ না পায়। সেটাও সম্ভব হল না। আমার তখন আর্থিক সামর্থ্য নেই বললেই চলে। কোন রকমে জীবন ধারণ করে আছি। নতুন বাসা ভাড়া নেয়ার অবস্থা নেই। বাবর রোডের যে বাসায় থাকি তা সরকারী বাসা। শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে বরাদ্দ দেয়া। নামমাত্র ভাড়া। আমি মাটি কামড়ে সেখানেই পড়ে রইলাম। ইংলিশম্যান নিয়তির মতো হয়ে গেল। ধরেই নিলাম সে আসবেই। আসেতই থাকবে। হলও তাই।

পাগলদের প্রতি আমাদের সমাজ খুব নিষ্ঠুর আচরণ করে। এই নিষ্ঠুরতা সবচে' বেশি দেখা যায় শিশুদের বেলায়। যে কোন কারণেই হোক শিশুরা পাগল সহ্য করতে পারে না।

ইংলিশম্যান যতবার আমার এখানে এসেছে ততবারই শিশুদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। শিশুরা তাকে তাড়া করে। পাথর ছুঁড়ে। বড়রা তাদের আটকায় না। দূরে দাঁড়িয়ে হাসে। মজা দেখে।

ইংলিশম্যানের উপদ্রব হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল। চার মাস কেটে গেল, তার দেখা নেই। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আশংকা পুরোপুরি গেল না। এটা হয়ত সাময়িক

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] আবার আসতে শুরু করবে। জীবন অর্থহীন করে দেবে। সে এল না। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। মানুষ অস্বস্তিকর স্মৃতি মনে রাখে না। আমিও মনে রাখলাম না। ইংলিশম্যানের কথা ভুলে গেলাম।

এক শীতের সকালের কথা। ছুটির দিন। নিউমার্কেটে এসেছি — কাগজ কিনব। হঠাৎ দেখি ইংলিশম্যান। সুন্দর একটা বাদামী রঙের স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছে। স্যুটটায় তাকে খুব মানিয়েছে। তার গায়ের রঙ ফর্সা। সেই রঙ যেন আরো খুলেছে। মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। চোখে চশমা। চশমার ফ্রেমটাও সুন্দর। ইংলিশম্যানের হাতে অনেকগুলো শপিং ব্যাগ, অনেক কেনাকাটা করেছে বলেও মনে হল।

আমি একবার ভাবলাম দেখা না করে চলে যাই। পরমুহূর্তেই সেই চিন্তা পাথর চাপা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। ইংলিশম্যান আমাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এল।

আমি বললাম, কেমন আছ?

সে বলল, ভাল। মাঝখানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন ভাল।

'করছ কি এখন?'

'বিজনেস করি। বড় ভাই একটা বিজনেসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'কিসের বিজনেস?'

'ডাই বিজনেস। কাপড়ে রঙ দেয়া হয় যে সেই রঙ।'

'একদিন আস আমার বাসায়।'

ইংলিশম্যান বলল, অবশ্যই যাব। তোমার বাসার ঠিকানা দিয়ে যাও।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি আমার বাসার ঠিকানা জান না?

'না। তুমি তো কখনো বাসার ঠিকানা দাওনি।'

আমি একটা কাগজে বাসার ঠিকানা লিখে দিলাম। ইংলিশম্যান সেই কাগজের টুকরা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, আমি অবশ্যই যাব। আমার বউকে নিয়ে যাব। আমি বিয়ে করেছি ভাই।

'কবে বিয়ে করলে?'

'বেশিদিন হয়নি — মাস চারেক। আমার তো পড়াশোনা কিছুই হয়নি — এদিকে লাবনী জেনারেল হিস্ট্রিতে এ বছর এম. এ. পাস করেছে।'

'বাহ্, ভাল তো।'

'দাঁড়াও তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ও পনীর কিনতে গেছে। ভাই, তোমার কাছে সিগারেট আছে? আমাকে একটা সিগারেট দাও। লাবনীর জন্যে সিগারেট খেতে পারি না।'

আমার কাছে সিগারেট ছিল না। আমি দু'টি সিগারেট কিনে নিয়ে এলাম। লাবনীর সঙ্গে পরিচয় হল। শ্যামলা রঙের বড় বড় চোখের মিষ্টি একটা মেয়ে। খুব হাসি-খুশি।

ইংলিশম্যান বলল, হুমায়ূন, আমার খুব ভাল বন্ধু। লাবনী বলল, আপনি ভাল বন্ধু, তাহলে আপনি আমাদের বিয়েতে আসেননি কেন?

ইংলিশম্যান সম্পর্কে আমার লেখা এখানে শেষ করতে পারলে ভাল হত। তা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পারছি না। তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় প্রায় দশ বছর পর। সম্পূর্ণ নগ্ন গায়ে সে বসেছিল ফুটপাতে। তার গা ঘেঁষে একটা ঘিয়া রঙের কুকুর। কুকুরটার মুখ শরীরের তুলনায় বড়। ইংলিশম্যানকে দেখলাম কুকুরটাকে খুব আদর করছে।

পরম রহস্যময় এই জগতের কোন রহস্যই কি আমরা পুরোপুরি জানি?



হিজ মাস্টারস ভয়েস

কুকুর সম্পর্কে আমাদের নবীর (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) একটি হাদিস আছে। হাদিসটি হল — নবী তাঁর সাহাবীদের বলেছেন, কুকুর যদি আল্লাহর সৃষ্টি কোন প্রজাতি না হত তাহলে আমি কুকুর হত্যার নির্দেশ দিতাম।

এই হাদিসটি আমাকে বলেন আমার একজন প্রকাশক — কারেন্ট বুকস-এর মালিক — বইপাড়ায় যিনি হুজুর নামে পরিচিত। একদিন তিনি আমার শহীদুল্লাহ হলের বাসায় এসেছেন। আমি কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম — কুকুর সম্পর্কে আমাদের ইসলাম ধর্ম কি বলে? হুজুর আমাকে এই হাদিসটি শুনালেন।

কুকুর সম্পর্কে নবীজি এমন কঠিন মনোভাব প্রকাশ করেছেন আমার জানা ছিল না। অবশ্যি ছোটবেলায় মা'কে দেখেছি কুকুর ঘরে ঢুকলেই দূর-দূর করে উঠতেন। কুকুর ঘরে ঢুকলে না-কি ঘর অশুচি হয়। ঘরে ফেরেশতা আসে না। এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্পও আছে। ভয়ংকর পাপী এক লোক — তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সে চি চি করে বলল, ওরে, আমি মরতে চাই না রে। তোরা তাড়াতাড়ি একটা কুকুর এনে আমার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দে। লোকটির স্ত্রী অবাক হয়ে বলল, কুকুর বেঁধে রাখলে কি হবে? লোকটি বিরক্ত গলায় বলল, আরে বোকা মাগী, কুকুর বাঁধা থাকলে ফিরিশতা আসবে না। ফিরিশতা না এলে জান কবজ হবে না। সহজ হিসাব।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণী হিসেবে কুকুর গ্রহণযোগ্য না, বিড়াল গ্রহণযোগ্য। ছোটবেলায় নানীজান বলতেন, খবরদার, বিড়ালের গায়ে হাত তুলবি না। বিড়াল নবীজির খুব পেয়ারের জানোয়ার। নবীজি বেড়ালের গায়ে হাত বুলাতেন। ধর্মীয় ট্যাবু সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু কুকুরের আদর বিড়ালের চেয়ে বেশি।

গ্রামের একটি প্রচলিত গল্পে তার প্রমাণ মেলে। গল্পটি হল, কুকুর সব সময় প্রার্থনা করে গৃহস্থের সাত ছেলে হোক। সাত সাতটা ছেলে হলে তারা ফেলে-ছড়িয়ে ভাত খাবে, সেখান থেকে সে ভাগ পাবে। আর বিড়াল বলে, গৃহস্থ অন্ধ হোক। অন্ধ হলে গৃহস্থ বুঝবে না কোন খাবার কোথায়। এই ফাঁকে সে খেয়ে যাবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ক্ষুদ্র প্রাণীটির প্রতি আমার তেমন কোন মমতা নেই। র‍্যাবিজ কেরিয়ার হিসেবেই আমি কুকুরকে দেখি। বগুড়ায় আমি জলাতঙ্কের এক রোগীকে দেখেছিলাম। না দেখলেই ভাল ছিল। ভয়াবহ দৃশ্য! রোগীর কষ্টের বর্ণনা দিচ্ছি না। দেয়া সম্ভবও না। মনে আছে রোগীর বাবা কাঁদতে কাঁদতে সবাইকে বলছিলেন, আপনারা দোয়া করেন যেন আমার ছেলেটা তাড়াতাড়ি মারা যায়।

পঁচিশ বছর আগের দেখা ছবি এখনো দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। যে প্রাণী এই ভয়াবহ ব্যাধির ভাইরাস বহন করে তার প্রতি মমতা থাকার কথাও না। তারপরেও কিছু গোপন ভালবাসা এই প্রাণীটির প্রতি আমার আছে। আমার বড় ভাই ছোটভাইটির জীবন একটি কুকুর তার নিজের জীবনের বিনিময়ে বাঁচিয়েছিল। সেই স্মৃতি ভোলা বা ভোলার চেষ্টা করা অন্যায়।

অরণ্যচারী মানুষের প্রথম সঙ্গী হল কুকুর। মানব জাতির উষালগ্নে এই সাহসী পশু তার পাশে এসে দাঁড়াল, মানুষকে শক্তি ও সাহস দিল। মানুষকে বলল, আমি আছি। আমি তোমার পাশেই আছি। এখনো গভীর রাতে কোন নিঃসঙ্গ মানুষ রাস্তায় হাঁটলে কোত্থেকে একটা কুকুর এসে তার পাশে পাশে চলতে থাকে।

কুকুর প্রসঙ্গে আমার নিজের অভিজ্ঞতার দু'টি গল্প বলি ঃ

শহীদুল্লাহ হলে থাকাকালীন সময়ের ঘটনা। একদিন দুপুরবেলা ঠিক ভাত খাবার সময় কে যেন দরজা ধাক্কাতে লাগল। কলিংবেল টিপছে না, দরজা ধাক্কাচ্ছে — ধরেই ধরে নিলাম ভিক্ষুক। দুপুরবেলা ভাত ভিক্ষা চাওয়ার জন্যে খুব ভাল সময়। আমি দরজা খুলে দেখি বিশাল এক কুকুর। আমাদের দেশি কুকুর এতবড় হয় না। আমি কুকুরটাকে কিছু খাবার দিতে বললাম। খাবার দেয়া হল। সে খাওয়া-দাওয়া করে চলে গেল। পরদিন আবার এল — সেই দুপুরবেলা। আবারো খাবার দেয়া হল। তারপর সে আসতেই থাকল। আমার ছোট মেয়ে একদিন বলল, বাবা দেখ, কুকুরটা ঠিক দু'টার সময় আসে।

কুকুরের নিশ্চয়ই হাতঘড়ি নেই। ঘণ্টা-মিনিট মিলিয়ে তার খেতে আসার কথা নয় — দেখা গেল এই কুকুরটা তাই করছে। ঠিক দু'টার সময়ই আসছে। সময় সম্পর্কে প্রাণিজগতের নিশ্চয়ই নিজস্ব কিছু ব্যাপার আছে। শেয়াল প্রহর ঘোষণা করে তার নিজস্ব সময়ে। তক্ষক ঠিক মধ্যরাতে দু'বার ডাকে। এই কুকুরটিরও নিশ্চয়ই সে রকম কোন ঘড়ি আছে, যা ব্যবহার করে ঠিক দু'টার সময় চলে আসে।

এই অদ্ভুত ঘটনা কিছু নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধবকে দেখিয়ে তাদের চমৎকৃত করা হল। ব্যাপার এমন হল — ঠিক দু'টা বাজতেই আমরা অপেক্ষা করি কখন সে আসবে। সবদিন আসেও না। মাঝে মাঝে এমন হয়েছে পর পর চার-পাঁচদিন দেখা নেই। তারপর একদিন সে উপস্থিত। দরজায় মাথা দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে; ঘড়িতে বাজছে দু'টা। কোথায় সে থাকে — তাও জানি না। যেখানে থাকুক সে যে কষ্টে নেই তা বোঝা যায় তার স্বাস্থ্য দেখে। মনে হয় না সে কখনো ক্ষুধার্ত থাকে, কারণ প্রায়ই দেখা গেছে, দুপুরে সে আসছে ঠিকই কিন্তু কিছু মুখে দিচ্ছে না। যেন সে দেখা করার জন্যেই

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এসেছে। খাবার জন্যে আসেনি।

আমরা কুকুরটার একটা নাম দিলাম, দি ওয়ান্ডারার — পরিব্রাজক। কুকুরদের বাংলা নাম মানায় না বলেই ইংরেজি নাম। তারপর হঠাৎ একদিন দি ওয়ান্ডারার আসা বন্ধ করে দিল। দুপুর হলেই আমরা অপেক্ষা করি, সে আসে না। দুপুরে কেউ দরজা ধাক্কা দিলে আমার বাচ্চারা ছুটে যায় — না, দি ওয়ান্ডারার না — অন্য কেউ। নানান জল্পনা-কল্পনা হয় — কি হল ওয়ান্ডারারের? রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ল? না-কি মিউনিসিপ্যালিটির লোকজন এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল?

একদিন আমাদের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটল, দি ওয়ান্ডারার এসে উপস্থিত। তার চেহারা ভয়ংকর। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে — চোখ রক্তবর্ণ, কিছুক্ষণ পরপর চাপা গর্জন। কালান্তক র‍্যাবিজ নিয়ে সে উপস্থিত। লোকজনের তাড়া খেয়ে সে ফিরে এসেছে পুরানো জায়গায়। এবং আশ্চর্য, এসেছে ঠিক দুপুর দুটায়। কুকুরের বুদ্ধি এবং কুকুরের আবেগ দিয়ে সে হয়ত ধারণা করেছে এই একটি বাড়িতে তার আশ্রয় আছে। এই বাড়ির লোকজন তাকে কিছু বলবে না। তাকে শান্তিতে মরতে দেবে।

আমরা দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে আছি। দরজার বাইরে দি ওয়ান্ডারার। মাঝে মাঝে তার চাপা হুংকার শুনা যাচ্ছে। সে দরজা আঁচড়াচ্ছে। পিপহোলে চোখ রাখলে তার ভয়ংকর মূর্তি দেখা যায়। আমরা ঘরে আটকা পড়ে গেলাম। হলের দারোয়ানরা খবর পেয়ে লাঠি-সোঠা নিয়ে ছুটে এল। দি ওয়ান্ডারারকে হলের সামনে পিটিয়ে মারা হল — আমি আমার তিন কন্যাকে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই হত্যাদৃশ্য দেখলাম। দি ওয়ান্ডারার বারবারই তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। তার চোখে ভয় নয় — তার চোখে রাজ্যের বিস্ময়। কিংবা কে জানে সবই হয়ত আমার কল্পনা — হয়ত কুকুররা বিস্মিত হয় না। মানুষদের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যুগ যুগ ধরেই তো তাদের পরিচয়। মানুষের নিষ্ঠুরতায় তারা বিস্মিত হবে কেন?

আরো একটি কুকুরের কথা বলি। প্রায় তেইশ বছর আগের কথা। আমার বাবার তখন কুমিল্লায় পোস্টিং। আমাদের বাসা ঠাকুরপাড়ায়। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'এ। ছুটিছাটায় কুমিল্লায় যাই। ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফিরে আসি। সেবারও তাই গিয়েছি। ছুটির পুরো সময়টা আমি বাসাতেই থাকি — বই পড়ে এবং গান শুনে সময় কাটাই। গান শোনার রোগ তখন খুব মাথাচাড়া দিয়েছে। বাবা একটি রেকর্ড প্লেয়ার কিনে দিয়েছেন। দিনরাত সেট বাজে। সবার কান ঝালাপালা।

কুমিল্লায় তখন একটাই রেকর্ডের দোকান। 78 RPM-এর ডিস্ক পাওয়া যায়। একদিন ঐ দোকানে গিয়ে রেকর্ড খুঁজছি, বাজিয়ে বাজিয়ে দেখছি — কোন্‌টা নেয়া যায়। কোন গানই মনে ধরছে না। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, দোকানের বাইরে কালো রঙের একটা কুকুর বসে বসে গান শুনছে। হিজ মাস্টারস ভয়েস রেকর্ডের কুকুরের সঙ্গে এই কুকুরটির খুব মিল। বসেও আছে ঠিক সেই ভঙ্গিতে। আমি দোকানদারকে বললাম, এই কুকুর কি প্রায়ই আপনার দোকানে গান শুনতে আসে? দোকানদার মহা বিরক্ত হয়ে বলল, কুকুর গান শুনতে আসবে কেন? কি বলেন এইসব? দোকানদারের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বিরক্তির প্রধান কারণ হচ্ছে — আমি শুধু তার রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছি, কিনছি না। তাছাড়া গান শুনতে কুকুর আসে — এই বাক্যটিও বোধহয় তাকে আহত করল। রেকর্ডের দোকানের কর্মচারীদের মান-অপমান বোধ তীব্র হয়।

যাই হোক, দোকান থেকে বের হয়ে আমি কুকুরটাকে বললাম, গান শুনতে চাইলে আমার সঙ্গে চল। সে আমাকে বিস্মিত করে আমার সঙ্গে রওনা হল। আমি বাসায় এসে ঘোষণা করলাম — সংগীত-প্রেমিক এক কুকুর নিয়ে এসেছি। গান শুনলে সে পাগল হয়ে যায়। কেউ তেমন উৎসাহ বোধ করল না। আমার ছোটবোন বলল, এমন নোংরা কুকুর সে না-কি তার জীবনে দ্বিতীয়টি দেখেনি। আমি বললাম, লাইফবয় দিয়ে একটা গোসল দিলেই চেহারা ফিরে যাবে। রেকর্ড প্লেয়ার বাজালে দেখবি কি কাণ্ড ঘটে। সংগীতের সে বিরাট সমঝদার।

লাইফবয় সাবান কিনে এনে তাকে গোসল দেয়া হল। সে কোনরকম আপত্তি করল না। খেতে দেয়া হল। খুব অনাগ্রহের সঙ্গে খেল। যেন খাওয়াটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেশ আয়োজন করে রেকর্ড প্লেয়ারে গান দেয়া হল। দেখা গেল গানের প্রতি তার কোন আগ্রহই নেই। সে হাই তুলে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ছোটবোন বলল, আধুনিক গান বোধহয় সে পছন্দ করছে না। ক্লাসিক্যাল বেইস-এর কিছু বাজাও। অনেক কিছুই বাজানো হল। আধুনিক, হিন্দী, গজল, রবীন্দ্র সংগীত। অবস্থার উনিশ-বিশ হল না। সংগীত-রসিক হিসেবে বাড়িতে ঢুকে সে স্থান করে নিল বেরসিক হিসেবে। তার সব কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রইল খাওয়া এবং ঘুমে। অন্য কিছুই সে করে না। কুকুর সম্প্রদায়ের প্রধান যে দায়িত্ব — অপরিচিত কেউ এলে ঘেউ-ঘেউ করা — সেই সামান্য দায়িত্ব পালনেও তার ঘোর অনীহা। অপরিচিত কেউ এলে সে যা করে তা হচ্ছে — মাথা উঁচু করে খানিকক্ষণ দেখে, তারপর এক দৌড়ে বাড়ির ভেতরে বারান্দায় চলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু পালিয়ে বেড়ায় বলেই তার নাম রাখা হল পলা [এই পলার উল্লেখ আমার প্রথম গ্রন্থ 'নন্দিত নরক'-এ আছে। বুনু বলছে — দাদা, আমাদের পলার নাকটা এত ঠাণ্ডা কেন?]

খেয়ে খেয়ে এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পলার চেহারা ফিরে গেল কিন্তু সাহস বাড়ল না। বরং সাহস কমে গেল — সে বিড়াল দেখলে ভয় পায়, ইঁদুর দেখলে ভয় পায়। মায়ের পোষা মোরগ নিয়মিত তাকে ঠোকর দিয়ে যায়। সে বিরক্ত হয়, কিন্তু রাগ করে না। ঘোঁৎ জাতীয় শব্দ করে, যার মানে হচ্ছে — কেন বিরক্ত করছ? দেখছ না ঘুমুচ্ছি? আমাদের এক সময় ধারণা হল — বেশি বেশি খাবার খেয়ে এর এই দশা হয়েছে। পেটে খিদে থাকলে এদের শরীরে রাগ আসে — ঘেউ-ঘেউ করে। পলাকে পুরো একদিন উপোস রাখা হল। তাতে সে মোটেই বিচলিত হল না। খাবারের সন্ধানে বাইরে কোথাও গেল না। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল — নিয়তিকে সে গ্রহণ করেছে সহজভাবেই। কে জানে সে হয়ত কুকুর সম্প্রদায়ে অতি উঁচু স্তরের একজন সাধু।

পলা নাম বদলে তার নতুন নামকরণ হল — দি সেইন্ট। ছুটি কাটিয়ে আমি ঢাকায় ফিরে এলাম। গরমের ছুটিতে আবার গেলাম। এই তিন মাসে দি সেইন্টের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে, তবে সাহসের কোন উন্নতি হয়নি। বাইরের কেউ এলে আগের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মত দোড়ে ভেতরে চলে আসে। তবে নিজের অধিকার সম্পর্কে সে দেখলাম এবার বেশ সজাগ। যথাসময়ে খাবার না দিলে রান্নাঘরে ঢুকে মা'র শাড়ির আঁচল কামড়ে ধরে। তবে নিজ থেকে কখনো কোন খাবারে মুখ দেয় না।

সবচে' যা দুঃখজনক তা হল, গান বাজালে তার ঘুমের অসুবিধা হয় বলে সে বড় বিরক্ত হয়। উঠে চলে যায়।

একদিন এক কাণ্ড হল। মুরগি কাটা হচ্ছে। দি সেইন্ট খাবা মেলে মা'র মুরগি-কাটা গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে। এমন সময় টেলিফোন ধরার জন্যে মা মুরগি রেখে ভেতরে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন দি সেইন্ট ঠিক আগের মতই খাবা মেলে বসে আছে। কোত্থেকে এক বিড়াল এসে কাটা মুরগি কামড়াচ্ছে। দি সেইন্ট কিছুই বলছে না। সম্ভবত তার ভদ্রতায় বাঁধছে। মা আমাকে ডেকে বললেন, তুই এই যমের অরুচিকে যেখান থেকে এনেছিস সেখানে ছেড়ে দিয়ে আয়।

আমি মা'র মতই রাগলাম এবং দি সেইন্টের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললাম, ফাজিলের ফাজিল — তুমি বিদায় হয়ে যাও। আর কোনদিন যেন তোমার ছায়া না দেখি। অপদার্থ কোথাকার!

দি সেইন্ট খোলা গেট দিয়ে গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, আপদ বিদেয় হয়েছে। বাঁচা গেছে। ছোট বোন বলল, আপদ মোটেই বিদেয় হয়নি। আপদ হাওয়া খেতে গেছে। হাওয়া খেয়ে ফিরবে। পলা ফিরল না। সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের খারাপ লাগতে লাগল। আমার মা বললেন — আহা, বেচারা বোকা-সোকা — কোথায় আছে কে জানে? আমি বললাম, যাবে কোথায়, খিদে লাগলে নিজেই আসবে।

দি সেইন্ট এল না। পরদিন আমরা খুঁজতে বেরুলাম। কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গা দেখা হল। সে নেই। একটি সামান্য কুকুর আমার কঠিন হৃদয় মর্মাহত হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমার নিজেরও খুব মন খারাপ হল। ত্রিশ টাকা খরচ করে কুমিল্লা শহরে মাইক দিয়ে ঘোষণা দেয়া হল — একটি কালো রঙের দেশী কুকুর হারানো গিয়াছে। কুকুরটার ডান কান সাদা। সে আমলে ত্রিশ টাকা অনেক টাকা। সামান্য কুকুরের জন্যে ত্রিশ টাকা খরচ করার মত সামর্থ্যও আমাদের নেই। তবু খরচ করা হল: তাতেও লাভ হল না।

প্রায় এক বছর পর দি সেইন্ট ফিরে এল। তবে একা না। তার সঙ্গে চারটি ফুটফুটে বাচ্চা। বাচ্চাগুলি কি যে সুন্দর — শুধু তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছা করে। আমি তখন ঢাকায়। আমাকে টেলিগ্রাম করা হল — আমি ক্লাস বাদ দিয়ে কুমিল্লায় চলে এলাম। পলার সামনে দাঁড়িয়ে আন্তরিক ভাবেই বললাম — পলা, তুমি যে তোমার বাচ্চাদের নিয়ে এসেছ এতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমি আমার ব্যবহারের জন্যে লজ্জিত। যতদিন ইচ্ছা তুমি এ বাড়িতে থাকতে পার।

পলা উঠে এসে আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। ঘেউ-ঘেউ করে সে তার বাচ্চাগুলিকে কি যেন বলল, বাচ্চারা চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখতে লাগল। হয়ত

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তার মা বলেছে — মানুষটাকে দেখে রাখ। একে যতটা খারাপ ভাবা গিয়েছিল এ ততটা খারাপ না।

পলা তার বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের বাসাতেই থেকে গেল। তার বাচ্চারা মার মত হয়নি। এরা সবাই দুর্দান্ত সাহসী। অপরিচিত কেউ আমাদের বাসায় বাচ্চাগুলির জন্যে ঢুকতে পারত না। তারা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। তার চেয়েও অবিশ্বাস্য দৃশ্য হচ্ছে — গান বাজলেই সব কটা বাচ্চা এক সঙ্গে ছুটে এসে হিজ মাস্টারস ভয়েসের কুকুরের মত গম্ভীর ভঙ্গিতে কান উঁচু করে বসে থাকত। তাদের চোখের পলক পড়ত না। যতক্ষণ গান বাজত ততক্ষণ এরা কেউ নড়ত না।

এক জীবনে কত অদ্ভুত দৃশ্যই না দেখলাম!



নুহাশ এবং সে

মাঝে মাঝে খুব সাধারণ কিছু দৃশ্য আমাকে অভিভূত করে। দারুণ মন খারাপ করিয়ে দেয়। বরিশাল থেকে লঞ্চে করে ঢাকায় আসছি। সাধারণত ঢাকা-বরিশাল লঞ্চগুলি রাতে চলাচল করে। এক সময় দিনেও লঞ্চ ছিল। আমি নদীর দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে আসব ভেবে দিনের লঞ্চ নিয়েছি বসেছি ছাদে। প্রচুর বাতাস, প্রচুর রোদ গায়ে মাখছি, চমৎকার লাগছে। হাওয়া এবং রোদ বোধহয় ক্ষুধা বৃদ্ধিতে কাজ করে। দুপুর একটায় ক্ষুধার্ত হয়ে নিচে নামলাম। গরম ভাত, টাটকা ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে দুপুরের খাবার সারলাম। লঞ্চের রান্নার কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে — হোটেলের মত এরা প্রচুর মশলা দেয় না। কম মশলায় রাঁধে এবং যত্ন করে রাঁধে। ভরপেট খাবার পরেও খিদে থাকে।

আমি তৃপ্তি করে খেলাম। খাবার পর ডবল পান মুখে দিলাম, সিগারেট ধরালাম, আর তখনি অভিভূত হবার মত দৃশ্যটি দেখলাম। একজন দরিদ্র যাত্রী দুপুরের খাবার খাচ্ছে। একটা পাউরুটি তার হাতে। পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে। অভিভূত হবার মত কোন দৃশ্য নয়। আমাদের এই হতদরিদ্র দেশে শুধু ভাত, শুধু রুটি দিয়ে দুপুরের খাবার অনেকেই খায়। এই দৃশ্য কোন অপরিচিত দৃশ্য নয়। আমরা সব সময় দেখছি। কিন্তু আজকের দৃশ্যটিতে অন্য ব্যাপার আছে। প্রথমত, মানুষটি পাউরুটি খুব আগ্রহ করে খাচ্ছে। তার সমস্ত চিন্তা-চেতনা পাউরুটিতে সীমাবদ্ধ। আশেপাশের জগৎ থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাকে দেখেই মনে হয় — এই শুকনো পাউরুটি চিবিয়ে সে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মানুষটি খেতে বসেছে বেশ আয়োজন করে। তার সামনে কাঁচের গ্লাস ভর্তি পানি। গ্লাসটার উপর একটা পিরিচ বসানো। সেই পিরিচে এক খিলি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সাজানো পান।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত লোকটির খাওয়া দেখলাম। খাওয়া-শেষে গভীর তৃপ্তিতে তার পানি খাওয়া দেখলাম। পান মুখে পুরতে দেখলাম। পান মুখে দেয়া মানুষটিকে মনে হল এই পৃথিবীর সুখী মানুষদের একজন। আমার কাছে মনে হতে লাগল, আহা, এই মানুষটা যদি ইলিশ মাছের টাটকা ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত খেতে পারত তাহলে কি গভীর আনন্দেই না সে খেত ! এই ঘটনা আমি অনেককে বলেছি, তাদের কেউই বুঝতে পারেনি অভিভূত হবার মত এর মধ্যে কি আছে? আমার এক বন্ধু বললেন — এটা হচ্ছে এক ধরনের দুঃখ-বিলাস।. দরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে উচ্চবিত্তের মিথ্যা দুঃখ। শখের দুঃখ।

আমি বললাম, মিথ্যা হবে কেন?

সে বলল, মিথ্যা, কারণ তুমি যদি এতই অভিভূত, তাহলে তুমি তাকে বলতে পারতে — ভাই, আপনি আসুন তো, ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবেন। আমি পয়সা দেব। তুমি তা বলনি। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছ। অন্যের দুঃখ নিয়ে বিলাস করেছ।

বন্ধুর সঙ্গে আমি তর্কে যাইনি। যেতে পারতাম। ফট করে একজনকে বলা যায় না — আপনি ভাত খান, আমি পয়সা দেব। এই কাজটি তখন করা যায় যখন কেউ খেতে চায়। তাছাড়া ঐ মানুষটি নিজের অর্থে কেনা সামান্য খাবার অতি আগ্রহ করে খাচ্ছে — সেখানে আমি উপদ্রবের মত উপস্থিত হয়ে তার খাওয়া নষ্ট করতে পারি না। আমার প্রস্তাবে লোকটি বলে বসতে পারত — আপনি আমাকে খাওয়াবেন কেন? আপনি কে? আমি কি আপনার কাছে ভিক্ষা চেয়েছি?

কেউ হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবেন না, কিন্তু তবু আমার সব সময় মনে হয় দয়া দেখানোর মধ্যেও এক ধরনের দীনতা আছে। আমি দয়া দেখাচ্ছি, কারণ আমার অনেক আছে: 'আমার অনেক আছে' — চিন্তাটিই তো এক ধরনের দীনতা।

আমার ছোটভাই গত বছর আমেরিকা থেকে আমার মা'র নামে এক হাজার ডলার পাঠিয়ে দিল। ডলারের সঙ্গে একটা ছোট্ট চিঠি।

অস্মি., আপনাকে এক হাজার ডলার পাঠালাম। একটা বিশেষ উদ্দেশে ডলার পাঠানো হয়েছে। আমি অনেকদিন দেশের বাইরে আছি। এখানে দান-খয়রাতের তেমন সুযোগ নেই। কেন জানি কিছু দান করতে ইচ্ছা করছে — আপনি ডলার ভাঙিয়ে যে টাকা পাবেন তা দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন। তবে আমাদের দরিদ্র আত্মীয়স্বজনদের এই টাকাটা দেবেন না। আমি টাকা পাঠিয়েছি যারা সত্যিকার অর্থেই ভিক্ষুক — তাদের জন্যে।

মা ডলার ভাঙিয়ে প্রায় আটত্রিশ হাজার টাকার মত পেলেন। অনেক টাকা। ফকিরকে ভিক্ষা দেয়ার জন্যে তো প্রচুরই বলা চলে। এক সপ্তাহ ধরে মা সেই টাকা বিলি করলেন। মা'কে সাহায্য করল আমার সবচে' ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। দু'জনকেই দেখলাম ব্যাপারটায় প্রচুর আনন্দ পাচ্ছে। ফকির ভিক্ষা চাইতে আসে। তার চেহারা, কাপড়-চোপড় দেখে বিবেচনা করা হয় কি পরিমাণ সাহায্য তাকে দেয়া যায়। কেউ

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পনের ৫০ টাকা, কেউ একশ'। দু' একজন মহাসোভাগ্যবান পায় ৫০০ টাকা। এসব ক্ষেত্রে যা হয় — দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে। মহা হৈ-চৈ, মহা ভিড়ে — কেউ কেউ মারাও যায়। আমিও আশঙ্কা করেছিলাম এরকম কিছু হবে। কেন জানি হল না। যা এক জায়গা থেকে টাকা না দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিলেন বলেই খবরটা তেমন জনাজানি হল না।

টাকা বিলি শেষ হবার পর একদিন মা'র কাছে গিয়েছি। তিনি খুব উৎসাহ নিয়ে গল্প করছেন — টাকা পাবার পর একেক জনের কি অবস্থা হল। আমার তখন মনে হল — এই দানে যে আনন্দ আমার মা পেলেন তা অন্যকে সাহায্য করার আনন্দ নয়। ক্ষমতার আনন্দ, এই আনন্দের সঙ্গে কিছুটা হলেও দীনতা মিশে আছে।

অন্যের দুঃখে অভিভূত হয়ে যে দান করা হয় তাতে দীনতার গ্লানি থাকে না। সেই আনন্দের ভাগ আমাদের ভাগ্যে জুটে না বললেই হয়। আমি দেখেছি, অন্যের দুঃখে অভিভূত হয়ে যে দান করা হয় তার বড় অংশই করা হয় সাময়িক ঝোঁকের মাথায়। ঝোঁক কেটে গেলে মনে হয় — এটা কি করলাম?

উদাহরণ দেই — আমার এক দূর-সম্পর্কের মামার গল্প। তিনি একবার গুলিস্তান থেকে রিকশা করে ফিরছেন — প্রচণ্ড শীতের রাত। হঠাৎ লক্ষ করলেন, ফুটপাতে এক ভিখিরি-পরিবার ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে শুয়ে আছে। তাদের সম্বল একটামাত্র কাঁথা। কাঁথায় সবার হচ্ছে না। তারা টানাটানি করছে। মামার মন খুব খারাপ হল। বাসায় পৌঁছে কাউকে কিছু না বলে তাঁর নিজের লেপ নিয়ে বওনা হলেন। মামী বললেন, কি করছ তুমি? লেপ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, চুপ করে থাক। কথা বলবে না। তিনি ওদের লেপ দিয়ে এসে বাসায় ফিরলেন। ততক্ষণে তাঁর ঝোঁক কেটে গেছে। তিনি হায় হায় করছেন -- ছয়শ' টাকা খরচ করে নতুন লেপ বানানো হয়েছে — লেপটা দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। ত্রিশ টাকা দিয়ে একটা পুরানো কম্বল কিনে দিলেই যথেষ্ট হত।

এ জাতীয় ঘটনা আমার নিজের বেলাতেও ঘটেছে। তখন শহীদুল্লাহ হলে থাকি। সন্ধ্যাবেলায় একজন অন্ধ ছেলে এসে উপস্থিত। আমার কাছে সে নালিশ করতে এসেছে। নালিশ করতে এসেছে অন্ধ কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে। সে বল পয়েন্টের ব্যবসা করে। বল পয়েন্ট কিনে ছাত্রদের কাছে বিক্রি করে। অন্ধ কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারি তাঁকে বলেছিলেন -- ব্যবসার জন্যে টাকা দেবেন। এখন দিচ্ছেন না। আমি যদি সেক্রেটারিকে কিছু বলে দেই তাহলে সে টাকাটা পায়। কারণ সেক্রেটারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অন্ধ ছাত্র। আমি দেখলাম — বিরাট যন্ত্রণা। সেক্রেটারীকে কিভাবে পাব? তাকে বলবই বা কি? অন্ধ ছেলেটির জন্যেও মায়া লাগছে। বেচারা কাঁদতে শুরু করেছে। আমি বললাম, ব্যবসা করতে ক্যাপিটেল কত লাগে?

সে বলল, তিনশ' টাকা স্যার।

আমি বিস্মিত। মাত্র তিনশ' টাকা ক্যাপিটেলে ব্যবসা? মানিব্যাগ খুলে তিনশ'র বদলে তাকে পাঁচশ টাকা দিয়ে দিলাম। সে খুশি হয়ে কাঁদতে কাঁদতেই বিদেয় হল। তখন আমার মনে হল — তিনশ' দিলেই তো হত। দু'শ টাকা বাড়তি কেন দিলাম?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল।

কেন আমাদের মধ্যে এই ক্ষুদ্রতা? আমরা কি এই ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উঠতে পারি না? কেন পারি না?

এক দুপুরের কথা। দরজার কড়া নড়ছে। দরজা খুলে দেখি তিনজন ভিখিরি শিশু। সবচে' বড়টির বয়স সাত-আটের বেশি না। তার কোলে দু'বছর বয়সী একজন। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে তিনজনের মুখই আনন্দে উদ্ভাসিত। তারা জানালো, ভাত ল'গবে না। তাদের প্রচুর ভাত আছে। শুধু তরকারি হলেই তারা এখানে বসে খেয়ে নেবে। তরকারি না হলেও অসুবিধা নেই — ডাল দিলেই হবে। তাদের তরকারি দেয়া হল। ইতিমধ্যে আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। ওদের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল এখনো তাদের খাওয়া হয়নি। ডাল এবং তরকারি নিয়ে বসে আছে। সমস্যাটা কি?

সমস্যা হল ভাত নিয়ে। এদের ভাত আছে ঠিকই — কিন্তু তারা খেতে পারছে না, কারণ ভাত বরফের মত শক্ত হয়ে আছে। এক দলা ভাত, ডীপ ফ্রীজে রাখায় জমে পাথর হয়ে আছে। দু'-তিন ঘন্টার আগে এই ভাত মুখে দেয়া যাবে না। বাচ্চারা বরফের দলায় কামড় বসানোর চেষ্টা করেছে — লাভ হয়নি। দাঁত বসানো যাচ্ছে না।

আমাদের বাসায় দেবার মত ভাত নেই। দিতে হলে নতুন করে ভাত চড়াতে হবে। আমি তাই করতে বললাম। হোক গরম ভাত, রান্না হোক — এরা এক বেলা অন্তত আরাম করে খাক। ভাত রান্না করে দেয়া হল। কিন্তু এর মধ্যে এরা ডাল এবং তরকারি চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছে। তাতে এদের অসুবিধা হল না — গরম ভাতই শুধু শুধু মুখ ভর্তি করে খাচ্ছে! দু'বছরের শিশুটিও মহানন্দে ভাত চিবুচ্ছে। এ কোন অদ্ভুত পৃথিবী!

আমরা বিশ্বাস করি — পৃথিবীর সব মানুষ একই বাবা-মা'র সন্তান। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম, আদি মাতা বিবি হাওয়া। একই বাবা-মা'র সন্তান হয়েও আজ আমরা এমনভাবে আলাদা হয়ে পড়লাম কি করে? একদলের কাপড় প্যারিস থেকে ধুইয়ে আনতে হয়, আরেকদলের কোন কাপড়ই নেই।

কাপড় প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলি — আমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান নুহাশ-এর জন্ম হয় শীতকালে। মাঘ মাসের দুর্দান্ত শীত। শীতের বিরুদ্ধে সব ব্যবস্থা নেয়া হল। দুটি রুম-হিটার। নরম লেপ, মাথায় কান-ঢাকা টুপি, হাতে-পায়ে নরম উলের মোজা। সাধ্য কি শীত তাকে স্পর্শ করে? তবু সারাক্ষণ ভয় — এই বুঝি ঠাণ্ডা লেগে গেল। এই বুঝি বুকে কফ বসে গেল। আরো গরম কাপড় দরকার। খবর পাওয়া গেল, গুলশান মার্কেটে স্লীপিং ব্যাগ জাতীয় এক ধরনের কম্বল পাওয়া যায়। বাচ্চাকে ভেতরে ঢুকিয়ে বোতাম লাগিয়ে দিলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত।

গেলাম ব্যাগ কিনতে। ফেরার পথে দেখি ঠিক আমার ছেলের বয়েসী একটি ছেলেকে তার মা মেঝেতে শুইয়ে রেখেছে। বাচ্চাটা আছে চটের বস্তার ভেতর। বস্তায় একটা ফুটো করা হয়েছে। ফুটোর ভেতর দিয়ে বাচ্চাটার ফর্সা মুখ বের হয়ে আছে — সে চোখ বড় বড় করে দেখছে চারপাশের অকরুণ পৃথিবী।

আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা হল — নতুন কেনা স্লীপিং ব্যাগ জাতীয় কম্বলটি এই বাচ্চাটিকে দিয়ে দেই। তারই এটি বেশি দরকার। মা তার বাচ্চাটিকে এর ভেতর ভরে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এই জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারবে। তাদের থাকবে খোলা বারান্দায় — শীতের প্রচণ্ড হাওয়া এই ব্যাগ ভেদ করে বাচ্চাটির গায়ে পৌঁছতে পারবে না।

আমি নিজেকে সামলে নিলাম। নিজেকে বুঝালাম, এদের এই জিনিস দিয়ে কোন লাভ হবে না। ভিখিরী-মা সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কাছে এটা বিক্রি করে দেবে। তাছাড়া বাচ্চাটির শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করে বড় হওয়া দরকার — কারণ তার জন্যে কঠিন সময় অপেক্ষা করছে।

নিতান্তই বাজে যুক্তি। নিজের অপরাধবোধ ঢাকার জন্যে তৈরি করা মিথ্যা যুক্তি। তারপরেও মনটা খারাপ হয়ে রইল। গরম কাপড়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা অসীম বাচ্চাটির দিকে তাকালেই মনে হত, আরেকটি শিশু আছে যে দেখতে ঠিক তার মত, একই জন্মও হয়েছে একই দিনে — সে খালি গায়ে বাস করছে। তার হতদরিদ্র মা তার শরীরের সবটুকু উত্তাপ বাচ্চাটিকে দিতে চেষ্টা করছে। আজকের অতি আধুনিক, সুসভ্য পৃথিবীতে ঐ শিশুটির সম্বল শুধু মার বুকের সামান্য উত্তাপ।



বটবৃক্ষ

রাত এগারোটায় গাড়িতে উঠলাম। যাব ময়মনসিংহ। ঢাকা থেকে ১২৭ কিলোমিটার পথ। তিন ঘণ্টার বেশি লাগার কথা না, কিন্তু ঝুম বৃষ্টি পড়ছে। দশ হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। বুদ্ধিমানের কাজ হবে বৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা করা। সেই অপেক্ষাটুকু করতে পারছি না। খবর এসেছে — আমার নানীজানের স্ট্রোক হয়েছে। শরীরের এক অংশ অবশ। মুখের কথা জড়িয়ে গেছে। তিনি আমাকে শেষবারের মত একবার দেখতে চাচ্ছেন। অন্য ভুবনের দিকে যাত্রার আগে আগে সবাই প্রিয়জনদের দেখতে চায়। আমি নানীজানের অতি প্রিয়দের একজন, কারণ তিনি এক অর্থে আমার দুধ-মা। আমার জন্মের পর পর মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমাকে লালন করার দায়িত্ব চলে যায় নানীজানের কাছে। সেই সময় তাঁর নিজের একটি মেয়ে হয়েছে। তিনি তাঁর ডান বুকের দুধ আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বাঁ দিকেরটা তাঁর কন্যার জন্যে। বুকের দুধের কোন আকর্ষণী ক্ষমতা কি আছে? হয়ত আছে। আমি নানীজানের পাশে উপস্থিত হবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করছি।

নানীজান আমার শৈশবের একটি বড় অংশ দখল করে আছেন। চোখ বন্ধ করলেই নানার বাড়ির সব জায়গায় তাঁকে একসঙ্গে দেখতে পাই। এই দেখছি রান্নাঘরে। পিঠা তৈরি হচ্ছে, তিনি বসেছেন সরঞ্জাম নিয়ে, এই দেখছি উঠোনে, ধান শুকানো হচ্ছে, তিনি এক ফাঁকে এসে কাক তাড়িয়ে গেলেন। এই দেখছি পুকুর ঘাটে। বাচ্চারা সবাই

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পানিতে নামবে — তিনি তাদের একা ছেড়ে দিতে ভরসা পাচ্ছেন না, সঙ্গে আছেন।'

রাতগুলি তো অপূর্ব! তিনিই তখন সম্রাজ্ঞী। গল্পের আসর বসেছে। তিনি একের পর এক ভূতের গল্প বলে যাচ্ছেন। রক্ত জমাট করা ভয়ংকর কিছু গল্প আমি নানীজানের কাছে শুনেছি। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি খুব সাধারণ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভূতের গল্পগুলি এমনভাবে বলেন যে এসব কিছুই না, সব সময় ঘটছে। পান খেতে খেতে একটু নিচু গলায় গল্প শুরু করবেন। ঘটনাটা কোথায় ঘটল সেই বিষয়ে আগে অনেকক্ষণ ধরে বলেন। তারপর হঠাৎ মূল গল্পে চলে যান —

"কি হল শোন। শীতের রাত, মশারি খাটিয়ে শুয়েছি, সঙ্গে আনোয়ারার ছোট মেয়ে। ঘরে একটা হারিকেন জ্বলছে। হঠাৎ দেখি মশারির চারদিকে ছায়ার মত একটা কি-যেন ঘুরছে। চরকির মত ঘুরছে। মানুষের ছায়ার মত ছায়া, নাক-মুখ কিছু বুঝা যায় না, তবে চোখ দুটা দেখা যায় — শাদা ছোট ছোট চোখ। আমি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ডান হাতের আঙ্গুল ছায়াটার দিকে বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলাম — এইটা কি? এইটা কি? ওম্নি ছায়াটা আমার আঙ্গুলে কামড়ে ধরল। এই দেখ এখনো দাগ আছে।

আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আঙ্গুলের দাগ দেখার জন্যে। তারপর ভয়ে ভয়ে বললাম, জিনিসটা কি ছিল?

নানীজান হাই তুলতে তুলতে বললেন, কি আবার? জ্বীন।

যেন জ্বীন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। সব সময়ই চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে — সুযোগ পেলেই মানুষের হাত কামড়ে ধরছে।

আমার ঝিমুনীর মত এসে গেছে।

গাড়ি চলছে ঘণ্টায় কুড়ি কিলোমিটার বেগে। বৃষ্টি কমার লক্ষণ নেই। বরং বাড়ছে। দমকা হাওয়া দিচ্ছে। নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে গান ছেড়ে দিয়েছি। অলিভিয়া নিউটন জনের লালাবাই —

"Precious baby, sweetly sleep,
Sleep in peace.
Sleep in comfort, slumber deep.
I will rock you, rock you, rock you.
I will rock you, rock you, rock you . . . "

ঘুমপাড়ানি গান। স্নায়ুকে কেমন অবশ করে দেয়। আমি চোখ বন্ধ করে পড়ে আছি। গাড়ির ঝাঁকুনি, বৃষ্টির শব্দ, অলিভিয়া নিউটন জনের লালাবাই সব মিলিয়ে অন্যরকম পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি ভাবতে চেষ্টা করছি — পঁচাশি বছর বয়েসী আমার বৃদ্ধা নানীজান ঠিক এই মুহূর্তে কি ভাবছেন। অন্য ভুবনের দিকে যাত্রা শুরুর আগে মানুষ কী ভাবে, একজন অল্পবয়সী মানুষ এরকম অবস্থায় তীব্র হতাশায় ভুগবে। সুন্দর পৃথিবীর কিছুই না দেখে তাকে চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু একজন পরিণত বয়সের মানুষ? সে কি ভাববে? তার ভেতরেও কি হতাশ কাজ করবে? না-কি সে ভাববে — "অনেক তো দেখলাম। আর কত! এবার তোমরা আমাকে বিদায় দাও।"

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার নানীজান আর দশজন বৃদ্ধার মতই সুখ দুঃখের জীবন কাটিয়েছেন। সুখ-দুঃখ দাড়িপাল্লায় মাপা যায় না। মাপা গেলে হয়তবা তাঁর দুঃখের পাল্লাই ভারি হবে। তাঁকে জীবনে বেশ ক'জন সন্তানের মৃত্যুশোক সইতে হয়েছে। স্বামী হারানোর ব্যথায় জর্জরিত হয়েছেন। আবার এগারোটি সন্তানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছেন। প্রথম জীবনে অভাব দেখেছেন। শেষ জীবনে দেখলেন প্রাচুর্য। পুত্র-কন্যা, নাতি নাতনি, এবং নাতি নাতনিদের ছেলেমেয়েতে বটবৃক্ষের মত নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কোন উৎসব উপলক্ষে সবাই যখন জড় হয় তখন মনে হয় হাট বসে গেছে। নানীজান বসে থাকেন জলচৌকিতে, লাইন বেঁধে তাঁকে সালাম করা হয়। বিশাল ডেকচিতে রান্না বসে। পুত্রবধূরা সেই ডেগ তাঁর সামনে এনে বলে, 'মা, আপনি হাত দিয়ে একটু ছুঁয়ে দেন। আমরা রান্না বসাব।' তিনি এক ধরনের গর্ব এবং অহংকারে পাতিল ছুঁয়ে দেন। শুরু হয় উৎসবের বাড়ির রান্না।

ন' বছর বয়সে বৌ হয়ে এ বাড়িতে এসেছিলেন। পার করলেন আশি বছর। কত দীর্ঘ সময়! দীর্ঘ সময়ের কত না আনন্দ-বেদনার স্মৃতি! সব স্মৃতি পেছনে ফেলে কি করে তিনি যাত্রা করবেন অচেনা ঠিকানায়? পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কেউ কি থাকবে তাঁর পাশে? তাঁর মৃত স্বামী, তাঁর মৃত পুত্র-কন্যারা কি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে থাকবে তাঁর পাশে? না-কি যেমন একা পৃথিবীতে এসেছিলেন, তেমনি ফিরেও যাবেন একা? আমি জানি না। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে।

রাত তিনটায় ময়মনসিংহ পৌঁছলাম। বাড়ি অন্ধকার। সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। কলিংবেলের শব্দে বাড়ির মানুষ জেগে উঠল। সবার মুখ হাসি-হাসি। রোগী সামলে উঠেছে। ডাক্তাররা বলেছেন, এযাত্রা টিকে গেছেন। যে হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল সেই হাতে সাড় ফিরে এসেছে। কথা বললে খানিকটা বোঝা যায়।

হৈচৈয়ে নানীজান জেগে উঠলেন। মুখ ভর্তি পান নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কি কাণ্ড! তিনি আরো সুন্দর হয়েছেন। দুধে-আলতায় গায়ের রঙ এখন কেমন ঝিকমিক করছে। লাল টুকটুকে ঠোঁট, পান খাওয়ায় আরো লাল দেখাচ্ছে। আমি পাশে বসে বললাম, রাত তিনটায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমাকে টেনে এনে এখন দিব্যি আরাম করে সুপারি খাচ্ছেন। কাজটা কি ভাল হল?

নানীজান হাসতে হাসতে বললেন, এই পাগলা বলে কি?

আমি বললাম, আমি যেমন ভিজতে ভিজতে এসেছি — আপনাকেও এখন ভিজতে হবে। আপনাকে এখন কোলে করে ছাদে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজাব। ছাড়াছাড়ি নেই।

নানীজানের হাসি আর থামে না। মনে হচ্ছে আসলেই তিনি বৃষ্টিতে ভিজতে চান। ডাক্তার তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেছে। চুপচাপ সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। তিনি তাতে রাজি নন। বাড়ির সবাই জেগেছে, তিনি তাদের সঙ্গে নিশি যাপন করবেন। সবাই চা খাচ্ছে, তিনিও চা খাবেন, গল্প করবেন। যদিও কোন গল্প ঠিকমত করতে পারছেন না। খেই হারিয়ে ফেলছেন। এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যাচ্ছেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

একবার আমাকে বললেন, 'তোর পরীক্ষা কবে রে? পড়াশোনা ঠিকমত করছিস তো?' তাঁর মনেও নেই পরীক্ষার যন্ত্রণা আমি অনেক অনেক আগে শেষ করেছি।

ভোরবেলা ঢাকা রওনা হব। নানীজানকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা নানীজান, আমাকে আপনি একটা কথা বলুন তো। আপনার কাছ থেকে ঠিক জবাবটা চাই।

'কি জানতে চাস?'

'মৃত্যু সম্পর্কে জানতে চাই. মৃত্যুভয় সম্পর্কে জানতে চাই। একজন মানুষ যখন মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থাকে তখন তার কেমন লাগে তা জানতে চাই। মৃত্যুর কথা ভাবতে কি আপনার ভয় লাগে?'

নানীজান কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, না, ভয় লাগে না. মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাল লাগে।

'ঠিক বলছেন তো নানীজান?'

'ঠিকই বলছি।'

'এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে না?'

নানীজান এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। হাসলেন। সেই হাসির কি অর্থ কে জানে।

ঢাকায় ফিরে চলেছি। সুন্দর সকাল। ঝকঝকে রোদ। গাড়ি ছুটে চলেছে ঝড়ের গতিতে। অলিভিয়া নিউটন জনের গান আবারো হচ্ছে,

"Precious baby, sweetly sleep, sleep in peace.
Sleep in comfort, slumber deep.
I will rock you, rock you, rock you,
I will rock you, rock you, rock you . . . "



ভাইভা

চাকরি জীবনের প্রথম দিকে আমার প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন কলেজে পরীক্ষা নিয়ে বেড়ানো। রসায়নের পাস কোর্স, অনার্স, এম. এসসি. সব পরীক্ষাতেই আমি হলাম — বহিরাগত পরীক্ষক। ব্যবহারিক পরীক্ষা নেই, ভাইভা নেই। দূরের সব কলেজে যেতে হয় -- পটুয়াখালি, চাখার, বরগুনা, ফরিদপুর . . .। পরীক্ষা নেয়া খুব যে আনন্দের কাজ তা না, তবে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়। অদ্ভুত অদ্ভুত সব পরিবেশ ও পরিস্থিতি।

একবার মফস্বলের এক কলেজে গিয়েছি। আমাকে থাকতে দেয়া হল এক শিক্ষকের বাসায়। ভদ্রলোকের স্ত্রী বাপের বাড়ি গেছেন। খালি বাসা। আমাদের খাওয়া

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] হোটেল থেকে। মোটা মোটা চালের ভাত। আলুর দম বাদে তরকারি। খাওয়ার পর অনেকক্ষণ মুখ হা করে বসে থাকতে হয়।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমুতে গেছি। শিক্ষক ভদ্রলোক মৃদু কাঁপাকাঁপি করে বললেন — হুমায়ূন সাহেব, আরাম করে ঘুমান, আমি একটা কাজে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হবে। তবে দরজা খুলতে হবে না। আমি বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাব, যাতে আপনার ঘুম ভেঙে উঠতে না হয়। আমি বললাম, ফিরতে কত রাত হবে ?

'এই ধরুন, একটা-দুটা!'

'কি কাজ এত রাতে?'

'ইয়ে মানে — একটু তাস-টাস খেলি।'

'পয়সা দিয়ে খেলেন?'

'আরে না। পয়সা পাব কোথায়? মাঝে মধ্যে খেলাটা ইন্টারেস্টিং করার জন্যে খুব চড়া স্টেকে খেলা হয়। নিতান্তই নির্দোষ আনন্দ।'

ভদ্রলোক নির্দোষ আনন্দের সন্ধানে আমাকে তালা দিয়ে চলে গেলেন। বাড়ি থেকে একবার একটি মাত্র দরজা, সেটি তালাবন্ধ। এই অবস্থায় সারাক্ষণ মনে হয় আগুন লেগে গেলে কি হবে? বেরুব কি করে?

দুশ্চিন্তায় অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হল না। তন্দ্রামত আসে, আবার ভেঙে যায়। আমি ঘড়ি দেখি। রাত দুটার সময় শুরু হল ভূতের উপদ্রব। কলঘরে পানি পড়বার শব্দ হচ্ছে। রান্নাঘরে হাড়ি-কুড়ি নড়ছে। ঝপাং করে বাড়ির টিনের ছাদে কি যেন লাফিয়ে পড়ল। সারা বাড়ি কেঁপে উঠল। নিজেকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম। ছাদে ঝাঁপ দিয়ে যা পড়েছে তা আর কিছুই না, বানর। কিছুক্ষণ পর স্পষ্ট শুনলাম বারান্দায় চটি পায়ে কে যেন হাঁটছে। একবার এ-মাথায় যাচ্ছে, আরেকবার ও-মাথায়। ঘরের বাতি জ্বালিয়ে বিছানায় বসে রইলাম। প্রচণ্ড বাথরুম পেয়েছে, বাথরুমে যাবার সাহস নেই। সেখানে কল থেকে পানি পড়ছে, পানি পড়া বন্ধ হচ্ছে। আবারো পানি পড়ছে। ঘড়িতে রাত বাজে তিনটা। এত ভয় জীবনে পাইনি।

শিক্ষক ভদ্রলোক রাত তিনটার দিকে নির্দোষ আনন্দ শেষ করে ফিরলেন। আমি তাঁকে ঘটনাটা বললাম, তিনি নিতান্তই স্বাভাবিকভাবে বললেন, ও কিছু না, জ্বীন।'

আমি বললাম, জ্বীন মানে?

'এ বাড়িতে একটা জ্বীন থাকে। দুষ্ট প্রকৃতির। আমাদের কিছু বলে না তবে বাইরের কেউ একা থাকলে যন্ত্রণা করে। তবে কারো কোন অনিষ্ট করে না।'

'এসব কি বলছেন ভাই?'

'বিশ্বাস করা-না-করা আপনার ব্যাপার। আমি নিজেও বিশ্বাস করি না। লোকে যা বলে আপনাকে বললাম। আমার স্ত্রী জ্বীনটাকে কয়েকবার দেখেছেন। ছোট সাইজ। গা ভর্তি পশম।'

'জ্বীনের গা ভর্তি পশম?'

'জ্বি। খুব নরম।'

'আপনি হাত দিয়ে দেখেছেন যে নরম?'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আমি হাত দেইনি। আমার স্ত্রী হাত দিয়েছেন। বিড়ালের পশমের মত পশম, তবে আরো সফট।'

বাকি যে ক'রাত ছিলাম, আমিও ভদ্রলোকের সঙ্গে নির্দোষ আনন্দে যেতাম। উনি হাইড্রোজেন নামের একটা খেলা খেলতেন। আমি পাশে বসে ঝিমাতাম।

বরিশাল বি এম কলেজে পরীক্ষা নিতে গিয়েও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার থাকার জায়গা হয়েছে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের অফিসে। একটা চৌকি পেতে থাকার ব্যবস্থা। রাতের বেলা ক্যাম্পাস ফাঁকা হয়ে যায় — কোথাও জনমানব নেই। আমি একা বাতি জ্বেলে জেগে বসে থাকি, ভয়ে ঘুম আসে না। গভীর রাতে জানালায় টুক করে শব্দ হল। আমি ভয়ে শক্ত হয়ে গেছি — আস্তে আস্তে জানালা খুলছে। আমি চিৎকার করে বললাম, কে?

জানালা খোলা বন্ধ হল, তবে সামান্য যা ফাঁক হয়েছে সেই ফাঁক দিয়ে লিকলিকে কালো একটা হাত ঘরের ভেতর ঢুকতে লাগল। মনে হল ঘরে একটা সাপ ঢুকছে। সাপের মাথায় পাঁচটা আঙুল। আমার ধারণা হল — এক্ষুনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। একধরনের ঘোরের মধ্যে বললাম, কে?

বাইরে থেকে উত্তর এল — স্যার আমি।

'আমিটা কে?'

'হুজুরের কাছে আমার একটা দরখাস্ত।'

আস্তে আস্তে হাতের মুঠি খুলে গেল। টপ করে হাত থেকে একটা কাগজ পড়ল। হাত উধাও হয়ে গেল। সাহস সঞ্চয় করে কাগজ কুড়িয়ে নিলাম। সত্যি সত্যি দরখাস্ত! কেমিস্ট্রি বিভাগের জনৈক বেয়ারা দরখাস্ত করেছে আমার কাছে। বিভাগের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত হল। পরের রাতেও একই ব্যাপার। চেয়ারম্যান সাহেবকে জানালাম। তিনি তাকে ডেকে এনে অনেক ধমকাধমকি করলেন। কঠিন গলায় বললেন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চাও ভাল কথা, কর। দিনের বেলা কর। রাতদুপুরে উনাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? ধমকে কাজ হল না। পরের রাতে সে আবার এল। সব মিলিয়ে পাঁচ রাত ছিলাম। প্রতি রাতেই এই কাণ্ড ঘটেছে।

পরীক্ষা নিতে গিয়ে ভয়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মজার অভিজ্ঞতাও হয়েছে। পটুয়াখালি কলেজে পরীক্ষা নিতে গিয়ে এক গায়কের পাল্লায় পড়েছিলাম। সেই গায়কের গানের গলা ছাড়া আর সবই আছে। হাজার হাজার গান তিনি জানেন, সুর জানেন শুধু গলাটা বেসুরো। তিনি গানের পর গান গেয়ে যেতেন। আমি একমনে প্রার্থনা করতাম — হে আল্লাহ পাক! এই গানের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। তোমার কাছে আপাতত আর আমি কিছুই চাই না।

গায়ক ভদ্রলোককে অসংখ্যবার আমার বলার ইচ্ছা হয়েছে, ভাই, আমাকে ক্ষমা করুন। এই অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। তখন বয়স ছিল অল্প, মন ছিল নরম। কঠিন সত্যি কথা বলা সম্ভব হয়নি। পটুয়াখালি থেকে পরীক্ষা শেষ করে চলে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পরদিন দেখি তিনি গাঁদা ফুলের একটা মালা হাতে লেকমার্টে উপস্থিত। আমি গলায় বললাম, আপনার গান খুব মিস করব। চা খাবেন। গান-বাজনা চর্চার ব্যাপার।

'স্যার আপনি কি আমার গান শুনে আনন্দ পেয়েছেন?'

'জ্বি পেয়েছি।'

গায়ক ভদ্রলোক শুধু গাঁদা ফুলের মালা নিয়েই আসেননি। ছোট্ট একটা ফ্লাস্ক এনেছেন। ফ্লাস্ক ভর্তি চা।

'আপনি চা পছন্দ করেন। বাসা থেকে চা বানিয়ে এনেছি। ফ্লাস্কটাও আপনার জন্য কিনেছি। সামান্য উপহার। দরিদ্র মানুষ।'

আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। এটা আশা করিনি। ভদ্রলোককে কেবিনে নিয়ে বসালাম। লঞ্চ ছাড়তে দেরি আছে। কিছুক্ষণ গল্প করা যাক। ভদ্রলোক গল্পের ধার দিয়ে গেলেন না। গাঢ় গলায় বললেন, চলে যাচ্ছেন মনটা খারাপ হয়ে গেছে। লাস্ট একটা গান শুনিয়ে দেই আপনাকে। আপনাকে গান শুনিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। আপনার মত আনন্দ নিয়ে আর কেউ আমার গান শোনে না। কত ফাংশান হয়, অগা, মগা, বগা স্টেজে উঠে গান গায়। আমাকে কেউ ডাকে না। স্যার গাইব?

আমি বিরস গলায় বললাম, গান।

ভদ্রলোক গান ধরল — বিদায়ের গান ঃ

"আমার যাবার সময় হল দাও বিদায়।"

গাইতে গাইতে তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি গাইলেন খুব সুন্দর করে। চারপাশে লোক জমে গেল। আমার নিজের চোখেও পানি এসে গেল।

পরীক্ষা প্রসঙ্গে আরেকটি স্মৃতির কথা বলি। সঙ্গত কারণেই কলেজের নাম উল্লেখ করছি না।

কেমিস্ট্রির অনার্স ব্যবহারিক পরীক্ষা। পাঁচদিন ধরে চলছে। কঠিন পরীক্ষা। ছাত্র-ছাত্রীদের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। এর মধ্যে একজনকে দেখে খুব মায়া লাগল। অল্প বয়েসী একটি মেয়ে — খুব শিগগিরই মা হবে। শারীরিক অস্বাভাবিকতার কারণে সে লজ্জিত এবং সংকুচিত। অন্যদের মত সে পরিশ্রমও করতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর পর টুলে বসে তাকে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। পরীক্ষার কাজগুলিও সে ঠিকমত পারছে বলে মনে হচ্ছে না। আমি কলেজের একজন ডেমনস্ট্রেটরকে বললাম, আপনি ঐ মেয়েটিকে সাহায্য করুন। ওকে বলুন চেয়ারে বসে কাজ করতে। তাকে নিচু একটা টেবিল এনে দিন। যন্ত্রপাতিগুলি টেবিলে রেখে সে কাজ করুক। কোন অসুবিধা নেই।

ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর হয় মৌখিক পরীক্ষা। সবাই মৌখিক পরীক্ষা দিল, শুধু মেয়েটি দিল না। ইন্টারন্যাল একজামিনার আমাকে জানালেন — আজই মেয়েটির একটি বাচ্চা হয়েছে বলে সে পরীক্ষা দিতে পারেনি। ব্যাপারটা বেশ দুঃখজনক। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে মৌখিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত হলে ব্যবহারিক

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পরীক্ষায় পাস হবে না। ব্যবহারিক পরীক্ষা ফেল মানে অনার্স পরীক্ষায় ফেল।

ভাইভা শেষ হল। রেজাল্ট শীট তৈরি করতে করতে রাত দশটা বেজে গেল। সীল গালা আনা হল। রেজাল্ট শীট খামে ঢুকিয়ে সীল গালা করা হবে। তখন আমি বললাম, এক কাজ করলে কেমন হয়? চলুন, আমরা সবাই মিলে মেয়েটার বাসায় চলে যাই। ভাইভা নিয়ে আসি।

কেমিস্ট্রির চেয়ারম্যান সাহেব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না। আমি বললাম, মেয়েটার বাসা কোথায় জানেন?

'বাসা বের করা যাবে তবে শহরে থাকে না। অনেক দূরে থাকে। আপনি কি সত্যি যেতে চান?'

'হ্যাঁ চাই।'

'ইউনিভার্সিটির কোন সমস্যা যদি হয়!'

'আমরা অন্যায় তো কিছু করছি না। বিশেষ পরিস্থিতির কারণে — একজামিনেশন বোর্ডের সব মেম্বার পরীক্ষার্থীর বাসায় উপস্থিত হচ্ছি।'

'এরকম কখনো কি করা হয়েছে?'

'আমার জানামতে করা হয়নি। তবে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে একজন ছাত্রের ভাইভা নেয়া হয়েছে। চলুন যাই।'

'ইউনিভার্সিটি যদি কোন সমস্যা করে?'

'সেই দায়িত্ব আমার। চলুন যাই।'

মেয়েটির বাড়ি শহর থেকে নয়-দশ মাইল দূরে। রিকশা করে, ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাচ্ছি। রাস্তা কারোর চেনা নেই। জিজ্ঞেস করে করে এগুতে হচ্ছে। রাত বারটার দিকে আমরা চারজন শিক্ষক তার বাসায় উপস্থিত হলাম। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। মেয়ের বাবা এবং মা দু'জনেই আনন্দে কাঁদছেন। আশেপাশের সব মানুষ খবর পেয়ে উপস্থিত হয়েছে। এমন একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা কেউ কল্পনাই করেনি। মেয়ের স্বামী সাইকেল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে শহরে ছুটেছে। মিষ্টি আনতে হবে।

আমরা ভাইভা নিতে মেয়ের ঘরে ঢুকলাম। মেয়েটি উজ্জ্বল মুখে শুয়ে আছে। তার পাশে ছোট্ট একটি বাচ্চা। আমরা মেয়েটির ভাইভা নিতে এসেছি শোনার পর থেকে সে নাকি খুব কাঁদছিল, এখন চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিয়েছে। ভাইভা শুরু হল। মেয়েটা বলল, স্যার, আমার বাচ্চাটাকে আগে একটু দেখুন।

আমি বললাম, তোমার বাচ্চা দেখতে তো আসিনি। ভাইভা নিতে এসেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখি তোমার বাচ্চা!

মেয়েটি বাচ্চার মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিল।

বাচ্চা ঘুমুচ্ছে। কি সুন্দর ছোট্ট একটা মুখ। মাথা ভর্তি রেশমী চুল। কি ছোট্ট, কি পাতলা ঠোঁট।

মেয়েটির ভাইভা খুব খারাপ হল। সে অধিকাংশ প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারল না। কিন্তু তাতে সে মোটেও নার্ভাস হল না। সহজ গলায় বলল, স্যার, এবারে অনার্স পরীক্ষা আমি পাস করতে পারব না। থিওরী খুব খারাপ হয়েছে। পড়াশোনা করতে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] কিন্তু আমার মনে কোন আফসোস নেই। আপনারা পরীক্ষা নিতে বাড়িতে [illegible] এইটা আমার জন্য অনেক। আমার মত ভাগ্যবতী মেয়ে এই পৃথিবীতে নেই। [illegible] বলতে মেয়েটি কাঁদতে লাগল।

ঘটনার বর্ণনা এইখানে শেষ করে দিলে পাঠকরা আমার সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা পাবেন। তাঁরা মনে করবেন — হুমায়ূন আহমেদ মানুষটা খুব হৃদয়বান। একজন ছাত্র যেন পরীক্ষায় পাস করতে পারে তার জন্যে রাতদুপুরে কত ঝামেলা করেছেন।

ব্যাপার মোটেই তা নয়। নানান সমস্যার কারণে অনেকেই পরীক্ষা দিতে পারে না, পরের বার পরীক্ষা দেয়। এটা তেমন কোন বড় ব্যাপার না। মেয়েটি পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না এ নিয়ে বিচলিত হয়ে আমি গভীর রাতে তার বাড়িতে উপস্থিত হইনি। এই কাণ্ডটি করেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। আমরা ভাইভা নিতে গভীর রাতে ছাত্রীর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছি এই অদ্ভুত ঘটনায় ছাত্রী এবং তার আত্মীয়স্বজনের মনে কি অবস্থার সৃষ্টি হয় তাই আমি দেখতে চেয়েছিলাম। একদল অভিভূত মানুষ দেখে কী আনন্দ পেতে চেয়েছিলাম। আমি গিয়েছিলাম সম্পূর্ণ আমার নিজের আনন্দের জন্যে। মেয়েটি সন্তানের জন্ম দিয়ে আমাকে গাঢ় আনন্দ পাবার একটি সুযোগ করে দিয়েছিল। তাকে এবং তার বাচ্চাটিকে ধন্যবাদ।



হোটেল আহমেদিয়া

আমি একবার একটা ভাতের হোটেল দিয়েছিলাম। নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে হোটেলের নাম — আহমেদিয়া হোটেল। আসুন, আপনাদের সেই হোটেলের গল্প বলি।

১৯৭১ সনের কথা। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়। বোজার মাস। থাকি মহসিন হলে ৬৪ নম্বর রুমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি তখন ছাত্রদের জন্যে নিরাপদ বলে ধরা হত। কারণ যারা এই সময়ে হলে থাকবে তারা অবশ্যই পাকিস্তান অনুরাগী। হলে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করছে। এরা সবাই শান্ত এবং সুবোধ ছেলে। মুক্তিবাহিনীতে না গিয়ে পড়াশোনা করছে। আমার তখন কোথাও থাকার জায়গা নেই। নানার বাড়ি মোহনগঞ্জে অনেক দিন লুকিয়ে ছিলাম। আর থাকা যাচ্ছে না। আমার নানাজান সেদিনের মুসলিম লীগ কর্মী। তখন শান্তি কমিটির সভাপতি হয়েছেন। নানাজানের শান্তি কমিটিতে যোগ দেবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করছি। আমি আমার নানাজনের জন্যে সাফাই গাইছি না! আমার সাফাইয়ের তাঁর প্রয়োজন নেই। এবু সুযোগ যখন পাওয়া গেল বলি। চারদিকে তখন ভয়ংকর দুঃসময়। আমার বাবাকে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পাকিস্তানী মিলিটারী গুলি করে হত্যা করেছে। নানাজান আমাদের সুদূর বরিশালের গ্রাম থেকে উদ্ধার করে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। তাও এক দফায় পারেননি। কাজটা করতে হয়েছে দু'বারে। তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাকে শান্তি কমিটির সভাপতি করা হল। তিনি না বলতে পারলেন না। না বলা মানেই আমাদের দু' ভাইয়ের জীবন সংশয়। আমাদের আশ্রয় সুরক্ষিত করার জন্যেই মিলিটারীদের সঙ্গে ভাব রাখা তিনি প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তার পরেও আমার মা এবং আমার মামারা নানাজানের এই ব্যাপারটা সমর্থন করতে পারেননি। যদিও নানাজানকে পরামর্শ দিতে কেউ এগিয়ে আসেনি। সেই সাহস তাঁদের ছিল না। তাঁরা নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন নিয়তির হাতে। শান্তি কমিটিতে থাকার কারণে মিলিটারীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কত মানুষের জীবন তিনি রক্ষা করেছেন সেই ইতিহাস আমি জানি এবং যাঁরা আজ বেঁচে আছেন তাঁরা জানেন। গুলির মুখ থেকে নানাজানের কারণে ফিরে-আসা কিছু মানুষই পরবর্তী সময়ে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে মরতে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। তাঁর মত অসাধারণ একজন মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মারা গেলেন, এই দুঃখ আমার রাখার জায়গা নেই!

মিলিটারীরা নানাজানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত সময়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়। বাড়ি ঘুরেফিরে দেখে। একদিন তারা আমাদের দেখে ফেলল। ভুরু কুঁচকে বলল, এরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র? দেখে তো সে রকমই মনে হয়। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে ঘরে বসে আছে কেন? নানাজান কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ঢাকায় পাঠাতে ভরসা পাচ্ছি না বলে আটকে রেখেছি। তবে শিগ্‌গিরই ঢাকা পাঠাব।

আমি নিজেও এক জায়গায় বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে একটি চিঠি পাঠিয়েছি ৬ নম্বর সেক্টরের সালেহ চৌধুরীকে (দৈনিক বাংলার সালেহ চৌধুরী)। তিনি তখন ভাটি অঞ্চলে প্রবল প্রতাপে মুক্তিবাহিনী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি আমার চিঠির জবাব দিলেন না। এটা অবশ্যি আমার জন্যে ভালই হয়েছে। মনের দিক থেকে আমি চাচ্ছি না জবাব আসুক। জবাব এলেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে হবে, এবং অবধারিতভাবে মিলিটারীর গুলি খেয়ে মরতে হবে। এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুকে স্বীকার করে নেবার মত মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। আমি ভীতু হয়ে জন্মেছি।

কাজেই চলে এলাম ঢাকায়, উঠলাম হলে। বলা চলে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার অতি প্রিয়জন -- আনিস ভাইও দেখি হলেই আছেন। আমার পাশের ঘরে থাকেন। ফিজিক্সে পড়াশোনা বাদ দিয়ে তিনি তখন সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করেন, একটা চিত্রনাট্যও তৈরি করেছেন। তাঁর একটা দামী ট্রানজিস্টার রেডিও আছে। সেই ট্রানজিস্টার রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা শোনা হয়। রাত যখন গভীর হয় তখন আমরা চলে যাই ছ'তলায়। সেখানে দু'টি ছেলে আছে (দু'ভাই)। তারা প্ল্যানচেটের বিষয়ে না-কি বিশেষজ্ঞ। তারা প্ল্যানচেটে ভূত নামায়। ভূতের মারফতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কবে দেশ স্বাধীন হবে, এইসব। প্ল্যানচেটে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দেশী বিদেশী সবধরনের ভূত আগে। দেশী ভূতদের মধ্যে সবাই আবার ভুবন বিখ্যাত। তাদের ভূত না বলে আত্মা বলা উচিত। নয়ত তাদের অসম্মান হবে। যেমন রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শেরে বাংলা। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খুবই মিশুক প্রকৃতির, ডাকলেই চলে আসেন। দেশ কবে স্বাধীন হবে জানতে চাইলে বলেন দেশ ধর। ধৈর্য ধরতে শেখ। দু থেকে তিন বছরের মধ্যেই স্বাধীনতা পাবে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার উপর আমাদের আস্থা কম ছিল বলেই সাধহয় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকেও এক রাতে আনা হয়। তিনি এসেই আমাদের স্টুপিড, ননসেন্স বলে গালাগালি করতে থাকেন।

মোটের উপর আমাদের সময়টা ভাল কাটে। ভূত বিশেষজ্ঞ দুই ভাই পরকাল, আত্মা, সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে নানান জ্ঞান দেয়, শুনতে মন্দ লাগে না। সবচে' বড় কথা — মিলিটারী এসে ধরে নিয়ে মেরে ফেলবে, এই সার্বক্ষণিক ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি যার আনন্দ কম নয়। কষ্ট একটাই, খাওয়ার কষ্ট। রোজার সময় বলেই সব দোকান বন্ধ। হোটেল তো বন্ধই, চায়ের দোকানও বন্ধ। হলের মেসও বন্ধ। ধর্মীয় কারণে নয়, নিতান্ত বাধ্য হয়েই হলের অনেকেই রোজা রাখছে। সেখানেও বিপদ আছে। বিকেলে ইফতারী কিনতে নিউমার্কেট গিয়ে একজন মিলিশিয়ার হাতে বেধড়ক মার খেল। মিলিশিয়ার বক্তব্য — রোজার দিনে এই ছাত্র নাকি 'ছোলা ভাজা খাচ্ছিল'।

আমি নিজে ক্ষুধা সহ্য করতে পারি না। খিদে পেলেই চোখে অন্ধকার দেখি। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রথম এবং শেষ রোজা রেখে রোজা বেঁধে ফেলার যে প্রক্রিয়া করে, আমি তা-ও পারি না। প্রথম রোজাটা রাখি -- শেষটা রাখি না, সম্ভব হয় না।

আমি মহাবিপদে পড়লাম। দুপুরে চিনি দিয়ে পাউরুটি খাই — খিদে যায় না। সারাক্ষণ খিদে লেগে থাকে। একদিন দোকান থেকে একটা হিটার কিনে আনলাম, টিনের বাটিতে কিছু চাল ফুটিয়ে নিলাম। ডিম ভাজলাম। লবণ কেনা হয়নি — লবণহীন ডিম ভাজা দিয়ে ভাত খেলাম। অমৃতের মত লাগল! আনিস ভাই এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। পরের দিন ভূত বিশেষজ্ঞ দুই ভাই এসে উপস্থিত। তারা জানতে চায়, তাদের কাছে এলুমিনিয়ামের একটা বড় সসপ্যান আছে, আমরা সেটা চাই কি-না।

আমি বললাম, অবশ্যই চাই।

তখন দুই ভাই মাথা চুলকে বলল, তারা কি আমার সঙ্গে খেতে পারবে? খরচ যা লাগবে দেবে। তারাও না-কি দুপুরে পাউরুটি খেয়ে আছে।

আমি বললাম — অবশ্যই খেতে পারবে।

চতুর্থ দিনে আমাদের সদস্য সংখ্যা হল দশ। অতি সস্তায় দুপুরের খাওয়া। ভাত-ডাল এবং ডিম ভাজি। সবাই খুব মজা পেয়ে গেল। আসলে কারোরই তখন কিছু করার নেই। বিশ্ববিদ্যালয় নামে মাত্র খোলা, কেউ সেখানে যায় না। সবাইকে হলে বন্দী থাকতে হয়। বন্দি জীবনে বৈচিত্র্য হল এই রান্নাবান্না খেলা। আমরা একদিন একটা বড় ফুলস্কেপ কাগজে লিখলাম —

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আহমেদিয়া ভাতের হোটেল

ভাত এক টাকা। ডাল অট আনা। ডিম এক টাকা!

হোটেলের নিয়মাবলী ঃ

১. যাঁহারা খাদ্য গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা সকাল দশটার মধ্যে নাম এন্ট্রি করাইবেন।

২. খাওয়ার সময় ভাত নরম না শক্ত এই বিষয়ে কোন মতামত দিতে পারিবেন না।

ফুলস্কেপ কাগজে আমার ঘরের দরজায় আঠা দিয়ে সেঁটে দেয়া হল।

এক রোববারে ইমপ্রুভ ডায়েটের ব্যবস্থা হল। ভূনা খিচুড়ি এবং ডিম ভাজা। ভূনা খিচুড়ি কি করে রাঁধতে হয় তখন জানি না। ভূত বিশেষজ্ঞ দুই ভাই বলল, তারা জানে — খিচুড়ি তারা রাঁধবে। এই বিষয়ে কাউকে কোন চিন্তা করতে হবে না। শুধু খিচুড়ি না — তারা নাকি 'কলিজি'ও রাঁধবে।

সকাল থেকে রান্নার আয়োজন শুরু হল। সদস্যদের আগ্রহের সীমা নেই। রান্না শেষ হতে হতে দুটো বেজে গেল। আমরা খেতে বসব, তখন হঠাৎ একজন ছুটে এসে বলল, মিলিটারী হল ঘেরাও করে ফেলেছে। আমরা হতভম্ব। হল কেন ঘেরাও করবে? হল তো খুব নিরাপদ হবার কথা। দেখতে দেখতে হলে মিলিটারী ঢুকে পড়ল। ভেড়ার পালের মত আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল নিচে। সবাইকে লাইন বেঁধে দাঁড় করালো। আমরা আতংকে জমে গেলাম। কি হচ্ছে এসব? সব মিলে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্র। হলের কিছু কর্মচারী। হলের সামনে সাক্ষাত মৃত্যুদূতের মত একটি মিলিটারি জীপ, একটি ট্রাক এবং মুড়ির টিন জাতীয় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মুড়ির টিন গাড়িটির দরজা-জানালা সব বন্ধ। তবে ভেতরে লোক আছে। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। গাড়ির একটি ছোট্ট জানালা আধখোলা। জানালার ওপাশে কেউ একজন বসে আছে। বাইরে থেকে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের বলা হল লাইন বেঁধে সেই জানালার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে। জানালার সামনে দিয়ে যাবার সময় — গাড়ির ভেতরে বসা কেউ একজন হঠাৎ বলে বসে — একে আলাদা কর। তাকে আলাদা করা হয়। এইভাবে চারজনকে আলাদা করা হল। তিন জন ছাত্র। একজন হলের কর্মচারী। তিনজন ছাত্রের মধ্যে একজন আমি।

কি সর্বনাশ!-এখন কি করি। মিলিটারী ধরে নিয়ে যাওয়ার নাম তো নিশ্চিত মৃত্যু। এত তাড়াতাড়ি মরে যাব?

আমাদের খোলা ট্রাকে তোলা হল। মিলিটারীরা আমাদের নিয়ে রওনা হল। আমি হলের দিকে তাকালাম, আমার বন্ধুদের দিকে তাকালাম — আমি জানি — এই হল, বন্ধুদের প্রিয় মুখ আমি আর কখনো দেখতে পাব না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল আণবিক শক্তি কমিশন ভবনে। ঐ ভবনটি তখন মিলিটারীদের অস্থায়ী ঘাঁটির একটি। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম আমাদের সবার বিরুদ্ধেই সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, আমরা দেশদ্রোহী। ঢাকায় সেনা বাহিনীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে — কি ভয়ানক অবস্থা। সেখান থেকে গাঁদা করে আমাদের পাঠানো হল বন্দি শিবিরে। বিরাট একটা হলঘরের মত জায়গায় আমাদের রাখা হল। আরো অনেকেই সেখানে আছেন। সবার চোখেই অদ্ভুত এক ধরনের ছায়া। সম্ভবত মৃত্যুর ছায়া। তারা তাকাচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু দেখছে না। মানুষের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য — কৌতূহল — সেই কৌতূহলের কিছুই তাদের চোখে নেই। এখান থেকে একজন একজন করে নিয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে — তারপরই বীভৎস চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। সে চিৎকার মানুষের চিৎকার নয় — পশুর চিৎকার! এক সময় চিৎকারের শব্দ কমে আসে। শুধু গোঙানির শব্দ কানে আসে। সেই শব্দও যখন কমে আসে তখন শুধু ক্লান্ত কাতরধ্বনি কানে আসে, পানি, পানি . . .।

আমি আমার পাশে বসা এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম - এরা কি সবাইকে এ রকম শাস্তি দেয়?

ভদ্রলোক আমার প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে তাকালেন, জবাব দিলেন না। সম্ভবত এ রকম ছেলেমানুষী প্রশ্নের জবাব দিয়ে তিনি সময় নষ্ট করতে চান না।

অনেককেই দেখলাম নামাজ পড়ছেন। নামাজের সময় নয় তবু পড়ছেন, নিশ্চয়ই নফল নামাজ। কি ভয়াবহ আতংক তাদের চোখে-মুখে!

জিজ্ঞাসাবাদ এবং শাস্তির জন্যে আমার ডাক পড়ল রাত এগারোটার দিকে। ছোট্ট একটা ঘরে নিয়ে আমাকে ঢোকানো হল। সেই ঘরের মেঝেতে তখন একজন শুয়ে আছে। লোকটা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু মৃদু গোঙানির শব্দ আসছে। মৃত্যুর আগে মানুষ হয়ত এরকম শব্দ করে। মানুষটার গায়ে একটি গেঞ্জী — গেঞ্জীতে চাপ চাপ রক্ত। এ ছাড়াও ঘরে আরো দু'জন মানুষ? আছে। একজনের মুখে শেভীর দাগ। সে গোশ্ত এবং পরোটা খাচ্ছে। অন্য একজনের হাতে এক কাপ চা। সে পিরিচে ঢেলে ঢেলে চা খাচ্ছে। দু'জনের মুখই হাসি হাসি। মেঝেতে একজন মানুষ মারা যাচ্ছে, তা নিয়ে তাদের কোন রকম মাথাব্যথা নেই। মৃত্যু তখন এতই সহজ। আমি ঘরে ঢুকতেই মুখে শেভীর দাগওয়ালা মানুষটা বলল (উর্দুতে), আমি খাওয়া শেষ করে নেই — তারপর তোমার সাথে খোশ গল্প করব। আপাতত বিশ্রাম কর। হা হা হা।

লোকটার খাওয়া দেখে এই প্রথম মনে হল — আজ সারাদিন আমি কিছু খাইনি। হোটেল আহমেদিয়ায় আজ ইমপ্রুভ ডায়েট রান্না হয়েছে। আমার বন্ধুরা কি কিছু খেতে পেয়েছে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

না, ঐদিন আমার বন্ধুরা কিছু খেতে পারেনি। আমাদের ধরে নিয়ে যাবার পর — তারা সবাই এসে বসল আমার রুমে. আনিস সাবেত বললেন, হুমায়ূনকে বাদ দিয়ে এই খাবার আমি খেতে পারব না, তোমরা খাও। অন্যরাও রাজি হল না। ঠিক করা হল — যদি আমি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসি তাহলে আবারো ইমপ্রুভ ডায়েট রান্না হবে। হৈ চৈ করে খাওয়া হবে। আনিস সাবেত আমার দরজার সামনে থেকে আহমেদিয়া হোটেলের সাইনবোর্ড তুলে ফেললেন।

পরম করুণাময়ের অসীম কৃপায় আমি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসি। বন্ধু-বান্ধবরা তখন নানান দিকে ছড়িয়েছিটিয়ে পড়েছে।

আমি ফিরে আসি জনশূন্য ফাঁকা হলে। জীবিত ফিরে আসার উত্তেজনায় দু'রাত আমি এক ফোঁটা ঘুমুতে পারিনি। বার বার মনে হত এটা হয়ত স্বপ্ন। স্বপ্ন কেটে যাবে, আমি দেখব মুখে শ্বেতী দাগওয়ালা মানুষটা বলছে, একে নিয়ে যাও, মেরে ফেল:

দেখতে দেখতে কুড়ি বছর পার হয়ে গেল। আনিস সাবেত মারা গেল ক্যানসারে। বন্ধু-বান্ধবরা আজ কে কোথায় জানিও না। মাঝে মাঝে হলের সামনের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় মনে হয় — আবার সবাইকে খবর দেয় যায় না? আবার কি হিটার জ্বালিয়ে ভূনা খিচুড়ি রান্না করে সবাইকে নিয়ে খাওয়া যায় না? খেতে খেতে আমরা পুরোনো দিনের গল্প করব। যে দুঃসময় পার হয়ে এসেছি সেই দুঃসময়ের কথা ভেবে ব্যথিত হব।

হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের প্রায়ই দেখতে ইচ্ছা করে। হঠাৎ হঠাৎ এক-আধজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। খানিক আগে একজনের সঙ্গে দেখা হল। সে তার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে গাড়ি থামাল। নেমে এসে আনন্দিত গলায় বলল — আরে তুই?

হাত ধরে সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল তার ছেলেমেয়েদের কাছে। গাঢ় গলায় বলল, পরিচয় করিয়ে দেই। এর নাম হুমায়ূন আহমেদ। আমরা একবার একটা হোটেল দিয়েছিলাম — আহমেদিয়া হোটেল। হুমায়ূন ছিল সেই হোটেলের বাবুর্চি।

বলতে বলতে তার চোখে পানি এসে গেল। সে কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে থাকল। তার ছেলেমেয়েরা বাবার এই কাণ্ডের কোন অর্থ বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আজকালকার ছেলেমেয়ের কাছে আমাদের চোখের এই অশ্রুর কারণ আমরা কোনদিনও স্পষ্ট করতে পারবো না। ৭১-এর স্মৃতির যে বেদনা আমরা হৃদয়ে লালন করি — এরা তার গভীরতা কোনদিনই বুঝবে না। বোঝার প্রয়োজনও তেমন নেই। এরা সুখে থাকুক। কোনদিনও যেন আমাদের মত দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে তাদের যেতে না হয়: এরা যেন থাকে দুধে-ভাতে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



আমার বড় মেয়ে তার কলেজে একটা কোয়েশ্চেনীয়ার জমা দেবে। সেখানে অনেকগুলি প্রশ্নের ভেতর একটা প্রশ্ন হচ্ছে — 'তোমার প্রিয় ব্যক্তি কে?' সে লিখল, আমার মা।

আমি ভেবেছিলাম সে লিখবে — বাবা।

আমার সব সময় ধারণা ছিল আমার ছেলেমেয়েরা আমাকে খুব পছন্দ করে। অন্তত তাদের মা'র চেয়ে বেশি তো বটেই। করাবই কথা, আমি কখনো তাদের বকা-ঝকা করি না। অথচ তাদের মা এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করছে —

'বাথরুম ভেজা কেন?'

'সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পড়তে বস নি। পড়তে বোস।'

'টুথপেস্টের মুখ লাগানো নেই, এর মানে কি?'

'বন্ধুর সঙ্গে এতক্ষণ টেলিফোনে কথা কেন?'

'ফ্রকে ময়লা কিভাবে লাগল?'

'মাছ তো গোটাটাই ফেলে দিলে। বোন-প্লেট থেকে তুলে এনে খাও। তোল বলছি। তোল।'

এই সব যন্ত্রণা আমি তাদের দেই না। খাবার টেবিলে আমি ওদের সঙ্গে মজার মজার গল্প করি। ভিডিও ক্লাবে কোন ভাল ছবি পাওয়া গেলে সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে দেখি। তার চেয়েও বড় কথা, এমন সব কাণ্ড কারখানা মাঝে মাঝে করি যা বাচ্চাদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করবেই। যেমন শহীদুল্লাহ্ হল-এ যখন থাকতাম তখন ভরা জোছনার রাতে বাচ্চাদের ঘুম থেকে তুলে — পুকুরে গোসল করতে নিয়ে যেতাম। বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে সবাইকে নিয়ে পানিতে ভেজা তো আমার চিরকালের নিয়ম। সব সময় করছি। যে মানুষটি এমন সব কাণ্ড কারখানা করে সে কেন প্রিয় হবে না? আমার বড় মেয়ের কোয়েশ্চেনীয়ার দেখে হঠাৎ করে আমার মনে হল — আমি কি এদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছি? যদি দূরে সরে গিয়ে থাকি তাহলে তা কখন ঘটল?

সারাদিন নানান কাজে ব্যস্ত থাকি। ইউনিভার্সিটির কাজ, নাটকের কাজ, লেখার কাজ। এর ফাঁকে ফাঁকে লোক আসছে। প্রকাশকরা আসছেন লেখার তাগাদা নিয়ে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এসেই চলে যাচ্ছেন না, বসছেন, গল্প করছেন। চা খাচ্ছেন। নাটকে অভিনয় করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা আসছে। যে ভাবেই হোক তাদের টিভি নাটকে সুযোগ দিতে হবে। আমার গল্প-উপন্যাস পড়ে খুশি হয়েছে এমন লোকজন আসছে। খুশি হয় নি এমন লোকজন আসছে। আসছে পত্রিকা অফিসের মানুষ। কেউ বুঝতে পারছে না, আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত। আমার বিশ্রাম দরকার। নিরিবিলি দরকার। আমার অনেক দূরে কোথাও চলে যাওয়া দরকার। আমার সবটুকু সময় বাইরের লোকজন নিয়ে নিচ্ছে --। আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে, আমার স্ত্রীর জন্যে একটুও সময় আলাদা নেই।

একটা শর্ট ফিল্ম বানাচ্ছি। সেই ছবির শ্যুটিং-এর কারণে এক সপ্তাহের জন্যে বাইরে যেতে হল। যাবার আগমুহূর্তেও লোকজন এসে উপস্থিত। তাদেরকে বিদেয় করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ট্রেন মিস করব। ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ড্রাইভারকে বললাম, খুব স্পীডে চালাও। ড্রাইভার উল্কার গতিবেগে ছুটল। আর তখন মনে হল, আসার সময় বিদেয় নিয়ে আসা হয় নি। বাচ্চারা হয়ত মনে মনে অপেক্ষা করছে, রওনা হবার আগে আমি বলব — বাবারা, যাই কেমন? সেটা বলা হয় নি। তারা দেখছে অসম্ভব ব্যস্ত এক মানুষকে। একে তারা হয়ত ভালমত চেনেও না। একজন অতি-চেনা মানুষ এম্নি করেই আস্তে আস্তে অচেনা হয়ে যায়। সম্ভবত আমিও অচেনা হয়ে গেছি। তবু ক্ষীণ আশা নিয়ে একদিন মেজো মেয়েকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলাম। গলা নিচু করে কথা বলছি যেন অন্য কেউ কিছু শুনতে না পায়।

'কেমন আছ গো মা?'

'ভাল।'

'খুব ভাল, না মোটামুটি ভাল?'

'খুব ভাল।'

'এখন বল, দেখি তোমার সবচে' প্রিয় মানুষ কে?'

'কোন প্রিয় মানুষ নেই বাবা।'

'না থাকলেও তো এমন মানুষ আছে যাদের তোমার ভাল লাগে। আছে না?'

'হুঁ — মা।'

'মা তোমার সবচে' প্রিয়?'

'হুঁ।'

'আর কেউ আছে?'

'আর ছোট চাচী।'

'আর কেউ?'

'শাহীন চাচা।'

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম লিস্ট লম্বা হচ্ছে — কিন্তু সেই দীর্ঘ লিস্টে আমার নাম নেই। আমাকে সে হিসেবের মধ্যেই আনছে না। এ রকম কেন হবে! দু'দিন আমি খুব চিন্তা করলাম। ভেবেছিলাম ব্যাপারটা নিজের মধ্যেই রাখব। আমার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

"গুলতেকিনকে জানাব না। এক রাতে তাকেও বললাম। সে বলল, কি অদ্ভুত কথা বাবা? বাচ্চারা তোমাকে অপছন্দ করবে কেন? তুমি ওদের খুবই প্রিয়।

'তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলছ?'

'মোটেই না —। আমার ধারণা তোমার মত ভাল বাবা কমই আছে।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, সত্যি। শীলার দুধ খাওয়ার ব্যাপারটা মনে করে। কজন বাবা এরকম করবে? শীলার দুধ খাওয়ার কথা মনে আছে?'

'আছে।'

আমার মেয়ের দুধ খাওয়ার গল্পটা বলি — তার কাছে এই পৃথিবীর সবচে' অপছন্দের খাবার হল দুধ। দুধের বদলে তাকে বিষ খেতে দেয়া হলেও সে হাসিমুখে খেয়ে ফেলবে। সেই ভয়াবহ পানীয় তাকে রোজ বিকেলে এক গ্লাস করে খেতে হয়। আমি আমার কন্যার কষ্ট দেখে, এক বিকেলে তার দুধ চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললাম। তাকে বললাম, মাকে বলিস না আমি খেয়েছি। এরপর থেকে রোজ তার দুধ খেতে হয়। এক সময় নিজের কাছেও অসহ্য বোধ হল। তখন দুজন মিলে যুক্তি করে বেসিনে ফেলে দিতে লাগলাম। বেশিদিন চালানো গেল না। ধরা পড়ে গেলাম।

বাবা হিসেবে আমি যা করেছি তা আদর্শ বাবার কাজ না। তবে শিশুদের পছন্দের বাবার কাজ তো বটেই। গুলতেকিন আমার কন্যার দুধের গল্প মনে করায় আমার উদ্বেগ দূর হল। আমি মোটামুটি নিশ্চিত হয়েই ঘুমুতে গেলাম। যাক, আমি খারাপ বাবা নই — একজন ভাল বাবা। তবু সন্দেহ যায় না।

পরদিন ছোট মেয়ে বিপাশাকে আইসক্রীম খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। সে বিস্মিত, তাকে একা নিয়ে যাচ্ছি। অন্য কাউকে নিচ্ছি না। ব্যাপারটা কি?

তাকে ডলসি ভিটায় কোন্ আইসক্রীম কিনে ফিসফিস করে বললাম, আচ্ছা মা বল তো, কাকে তোমার বেশি পছন্দ? তোমার মাকে, না আমাকে?

সে মুখভর্তি আইসক্রীম নিয়ে বলল, তোমাকে।

তার বলার ভঙ্গি থেকে আমার সন্দেহ হল। আমি বললাম, তোমার মা শিখিয়ে দিয়েছে এরকম বলার জন্যে, তাই না?

'হুঁ।'

'সে আর কি বলেছে?'

'বলেছে — বাবা যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে কে সবচে' প্রিয় তাহলে আমার নাম বলবে না, তোমার বাবার নাম বলবে। না বললে সে মনে কষ্ট পাবে। লেখকদের মনে কষ্ট দিতে নেই।'

সত্যকে এড়ানো যায় না, পাশ কাটানো যায় না। সত্যকে স্বীকার করে নিতে হয়। আমি স্বীকার করে নিলাম। নিজেকে বুঝালাম — আমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা যে কোন ব্যস্ত বাবার ক্ষেত্রেই ঘটবে। একদিন এই ব্যস্ত বাবা অবাক হয়ে দেখবেন এই সংসারে তাঁর কোন স্থান নেই। তিনি সংসারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। সংসারও তাঁর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। এই এক আশ্চর্য খেলা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এই খেলা আমাকে নিয়েও শুরু হয়েছে। আমি একা হতে শুরু হতে করেছি। বন্ধু-বান্ধব কখনোই তেমন ছিল না। এখন আরো নেই। যারা আসেন কাজ নিয়ে আসেন। কাজ শেষ হয়, সম্পর্কও ফিকে হতে শুরু করে। পুরানো বন্ধুদের কেউ কেউ আসেন — তখন হয়ত লিখতে বসেছি। লেখা ছেড়ে উঠে আসতে মায়া লাগছে। তবু এলাম। গল্প জমাতে পারছি না। সারাক্ষণ মাথায় ঘুরছে — এরা কখন যাবে? এরা কখন যাবে? এরা এখনো যাচ্ছে না কেন?

যে আন্তরিকতা, যে আবেগ নিয়ে তাঁরা এসেছেন আমি তা ফেরত দিতে পারলাম না। তাঁরা মন খারাপ করে চলে গেলেন। আমিও মন খারাপ করেই লিখতে বসলাম। কিন্তু সুর কেটে গেছে। লেখার সঙ্গে আর যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে না। যে চরিত্ররা হাতের কাছে ছিল তারা দূরে সরে গেছে। তবু তাদের আনতে চেষ্টা করছি — অনেক কষ্টে কয়েক পৃষ্ঠা লেখা হল। ভাল লাগল না। ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ঘুমুতে গেলাম। মাথা দপ্‌দপ্‌ করছে, ঘুম আসছে না। চা খেলে হয়ত ভাল লাগবে। গভীর রাতে কে চা বানিয়ে দেবে? রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই খুটখাট করছি — গুলতেকিন এসে দাঁড়াল। ঘুম-ঘুম চোখে বলল, তুমি বারান্দায় বস, আমি চা বানিয়ে আনছি।

সে শুধু আমার জন্যে চা আনল না, নিজের জন্যেও আনল। আটতলা ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে দু'জনে চুকচুক করে চা খাচ্ছি। আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ করছি। আমার কারণে এত রাতে গুলতেকিনকে উঠতে হল। লজ্জা কাটানোর জন্যে অকারণেই বললাম, চা খুব ভাল হয়েছে। একসেলেন্ট। সে কিছু বলল না।

আমি বললাম, একটা লেখা মাথায় চেপে বসে আছে, নামাতে পারছি না। কি করি বল তো?

সে হালকা গলায় বলল, লাঠি দিয়ে তোমার মাথায় একটা বাড়ি দেই. তাতে যদি নামে তো নামল। না নামলে কি আর করা।

আমরা দু'জনই হেসে উঠলাম। এতে টেনশান খানিকটা কমল। আমি বললাম, গল্পটা কি শুনতে চাও?

'বল।'

আমি বুঝতে পারছি তার শোনার তেমন আগ্রহ নেই। সারাদিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তারপরেও আমাকে খুশি করার জন্যে জেগে থাকা। আমি প্রবল উৎসাহে গল্পটা বলতে শুরু করেছি —

"মতি নামের একটা লোক। তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। গ্রামের লোকজন মিলে ঠিক করেছে খেজুরের কাঁটা দিয়ে তার দুটা চোখই উপড়ে ফেলা হবে।"

'মতির চোখ তোলা হবে কেন? সে কি করেছে?'

'এখনো ঠিক করি নি সে কি করেছে। তবে গ্রামবাসীর চোখে সে অপরাধী তো বটেই, নয়ত তার চোখ তোলা হবে কেন? তাকে ভয়ংকর কোন অপরাধী হিসেবে আমি দেখাতে চাই না। ভয়ংকর অপরাধী হিসেবে দেখালে আমার পারপাস সার্ভড হবে না।'

'তোমার পারপাসটা কি?'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'চোখ তোলার ব্যাপারটা যে কি পরিমাণ অমানবিক সেটা তুলে ধরা। এমনভাবে গল্পটা লিখব যেন . . . যেন . . .'

'যেন কি?'

'তোমাকে ঠিক বুঝাতে পারছি না। মানে ব্যাপারই হল কি . . .'

গুলতেকিনকে বলতে বলতে গল্প লেখার আগ্রহ আবার বোধ করতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগল, এক্ষুনি লিখে ফেলতে হবে। এক্ষুনি না লিখলে আর লিখতে পারব না। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে বারান্দায় বসে আছি। আকাশে এক ফালি চাঁদও আছে। বারান্দায় সুন্দর জোছনা। অথচ এই জোছনায় আমি গুলতেকিনকে দেখছি না। দেখছি তার জায়গায় মতি মিয়া বসে আছে। তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। সে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছে আমার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে বলছে — আমার ঘটনাটা লিখে ফেললে হয় না? কেন দেরি করছেন?

আমি ক্ষীণ গলায় ডাকলাম, গুলতেকিন!

'কি?'

'ইয়ে, তুমি কি আরেক কাপ চা বানিয়ে দিতে পারবে?'

'শুবে না?'

'না, মানে ভাবছি গল্পটা শেষ করেই ঘুমুতে যাই।'

'সকালে লিখলে হয় না?'

'উহুঁ।'

সে উঠে চলে গেল। রান্নাঘরে বাতি জ্বলল।

কিছুদূর লিখলাম। না, ভাল হচ্ছে না। মতিকে আমি নিজে যেভাবে দেখছি সেভাবে লিখতে পারছি না। নিজের উপর রাগ লাগছে, সেই সঙ্গে আশেপাশের সবার উপর রাগ লাগছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মনে হল, পৃথিবীর কুৎসিততম চায়ে চুমুক দিলাম। না হয়েছে লিকার, না হয়েছে মিষ্টি। নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, এটা কি বানিয়েছ?

ছোট ছেলে নুহাশের ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভাঙলেই সে খানিকক্ষণ কাঁদে। সে কাঁদছে। আমি বিরক্ত হয়ে গুলতেকিনকে বললাম, দাঁড়িয়ে দেখছ কি? কান্নাটা থামাও না।

গুলতেকিন কান্না থামাতে গেল। সে কান্না থামাতে পারছে না। কান্না আরো বাড়ছে। কাঁদতে কাঁদতেই নুহাশ দু'বার ডাকল। বাবা! বাবা! সে নতুন কথা শিখেছে। কি সুন্দর লাগে তার কথা!

আমার উচিত উঠে গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে আদর করা। ইচ্ছা করছে না। বরং রাগে শরীর জ্বলছে। মনে হচ্ছে, এরা সবাই মিলে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যেন আমি লিখতে না পারি। আমি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত গলায় বললাম, সামান্য একটা কান্নাও থামাতে পারছ না! তুমি কি কর?

গুলতেকিন ছেলে কোলে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে যাচ্ছে। খোলা বারান্দায় খানিকক্ষণ হাঁটবে। নুহাশ আমাকে দেখে আবারও কাঁদতে কাঁদতে ডাকল, বাবা,

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাবা! আমি বিচলিত হলাম না। আমার সামনে মতি। কিছুক্ষণের মধ্যে মতির চোখ উপড়ে ফেলা হবে। এমন ভয়াবহ সময়ে ছেলের কান্না কোন ব্যাপারই না। বাচ্চারা অকারণেই কাঁদে। আবার অকারণেই তাদের কান্না থেমে যায়। এর কান্না থামবে। এর দুঃখের অবসান হবে, কিন্তু মতি মিয়ার কি হবে!

ছেলের কান্না থেমেছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মা তাকে বিছানায় শুইয়ে নিজে মাথার কাছে মূর্তির মত বসে আছে। আমার এখন খারাপ লাগতে শুরু করেছে। আমার মনে পড়েছে, নুহাশের সকাল থেকে জ্বর। তার মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমি নিয়ে যাই নি। ডাক্তারের চেম্বারে তিন ঘন্টা বসে থেকে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। তা ছাড়া অসুখ-বিসুখ আমার ভাল লাগে না। একগাদা রোগীর মাঝখানে বসে থাকা! হাতে নম্বর ধরিয়ে দেয়া হয়েছে — বিয়াল্লিশ। ডাক্তার সাহেব দেখছেন সাত নাম্বার। কখন বিয়াল্লিশ আসবে কে জানে?

ডাক্তার নিয়ে যা করার গুলতেকিন করবে। আমি এর মধ্যে নেই।

বাজারে যেতে হবে? নোংরা মাছ-বাজারে থলি হাতে ঘোরা এবং প্রতিটি আইটেমে ঠকে আসা আমাকে দিয়ে হবে না। সেও গুলতেকিনের ডিপার্টমেন্ট।

বাচ্চা-কাচ্চাদের পড়াশোনা দেখা? অসম্ভব ব্যাপার। নিজের পড়া নিয়েই কূল পাচ্ছি না। এদের পড়া কখন দেখব? যা হবার হবে।

সংসার জলে ভেসে যাচ্ছে? যাক ভেসে।

খুব স্বার্থপরের মত কথা। আমি অবশ্যই স্বার্থপর। নিজেরটাই দেখি — আর কিছু না। টিভিতে নাটক চলছে — আমার সমস্ত মমতা নাটকের জন্যে। রেকর্ডিং থেকে রাত বারোটা-একটায় ফিরি। কোন রকম ক্লান্তি বোধ করি না। বাসার সবাই যে না খেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে তা আমার চোখে পড়ে না। নাটক ছাড়া তখন মাথায় আর কিছুই ঢুকে না। এই মুহূর্তে নাটক ছাড়া আমার ভুবনে আর কিছু নেই।

মেয়ের জন্মদিন হবে। সে তার সব বান্ধবীকে দাওয়াত দিয়েছে। না, আমি তো থাকতে পারব না! নাটকের রিহার্সেল আছে। জন্মদিন প্রতি বছর একবার করে আসবে। রিহার্সেল তো প্রতি বছর একবার করে আসবে না। এরা বুঝতে পারে না — নাটকের রিহার্সেল আমার জন্যে এত জরুরি কেন। আমি বুঝতে পারি না জন্মদিন ওদের এত জরুরি কেন? ক্রমে ক্রমেই আমরা দূরে সরে যাই। আমরা ব্যথিত হই। সেই ব্যথা কেউ কাউকে বুঝাতে পারি না।

অন্যসব ছেলেদের মত আমারও ইচ্ছা ছিল নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলব! অন্য দশজনের মত হলে আমার চলবে না। আমাকে আলাদা হতে হবে। চারপাশের মানুষদের মধ্যে যা কিছু ভাল গুণ দেখেছি তাই নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছি —। চেষ্টা পর্যন্তই, লাভ কিছু হয় নি। মানুষ পরিবেশ দিয়ে পরিচালিত হয় না, মানুষের চলিকাশক্তি তার ডি এন এ। যা সে জন্মসূত্রে নিয়ে এসেছে। তার চারপাশের জগৎ তাকে সামান্যই প্রভাবিত করে।

আমি আমার ডি এন এ অণুর গঠন কি জানি না। আমাদের জ্ঞান সেই পর্যন্ত পৌঁছে নি। একদিন পৌঁছবে, তখন সবার ডি এন এ অণুর প্রিন্টআউট তাদের হাতে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পাল্টে দেয়া হবে। তা দেখেই সে বুঝবে সে কেমন। অন্যরাও বুঝবে। সব রকম অস্পষ্টতার অবসান হবে।

মায়েরা তখন বাচ্চার রেজাল্ট কেন খারাপ হয়েছে এ নিয়ে বাচ্চাকে বকাঝকা করবেন না। কারণ তাঁরা ডি এন এ প্রিন্টআউট দেখেই বুঝবেন — এ পরীক্ষায় সে কোনোই তেমন ভাল করবে না। প্রতিদিন একটা করে প্রাইভেট টিউটর গুলে খাইয়ে দিলেও লাভ হবে না। সেই সময় একটি শিশুর জন্মের পরপরই সবাই জানবে, বড় হয়ে এ হবে অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা। সে জোছনা দেখলে অভিভূত হবে, বৃষ্টি দেখলে অভিভূত হবে, সারাক্ষণ তার মাথায় খেলা করবে -- অন্য এক বোধ।

ব্যাপারটা হয়ত খুব সুখকর হবে না, কারণ তখন মানুষের ভেতর রহস্য বলে কিছু থাকবে না। একজন অন্য একজনকে পড়ে ফেলবে খোলা বইয়ের মত। মানুষের চেয়ে বড় অহংকার হল, সে বই নয়। তাকে কখনো পড়া যায় না। তারপরেও মানুষকে বই ভাবতে আমার ভাল লাগে। একেকজন মানুষ যেন একেকটা বই। কোন বই সহজ তড়তড় করে পড়া যায়। কোন বই অসম্ভব জটিল। আবার কোন কোন বইয়ের হরফ অজানা। সেই বই পড়তে হলে আগে হরফ বুঝতে হবে। আবার কিছু কিছু বই আছে যার পাতাগুলি শাদা। কিচ্ছু সেখানে লেখা নেই। বড়ই রহস্যময় সে বই।

আমার নিজের বইটা কেমন? খুব জটিল নয় বলেই আমার ধারণা। সরল ভাষায় বইটি লেখা। যে কেউ পড়েই বুঝতে পারবে।

কিন্তু সত্যি কি পারবে?

সারল্যের ভেতরেও তো থাকে ভয়াবহ জটিলতা। যেখানে আমি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারি না সেখানে বাইরের কেউ আমাকে কি করে বুঝবে?

আমার নিজের অনেকটাই আমার কাছে অজানা। কিছু কিছু কাজ আমি করি — কেন করি নিজেই জানি না। অন্য কেউ আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয় বলে মাঝে মাঝে মনে হয়। আমার এই স্বীকারোক্তি থেকে কেউ মনে না করেন যে, আমি আমার কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব অন্য কোন অজানা শক্তির উপর ফেলে দেবার চেষ্টা করছি। আমি ভাল করেই জানি, আমার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব আমার। অন্যের নয়।

লেখালেখির ব্যাপারটাই ধরা যাক। অনেকবার আমার মনে হয়েছে, লেখালেখির পুরো ব্যাপারটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। নিয়ন্ত্রণ করছে অন্য কেউ। যার নিয়ন্ত্রণ কঠিন। যে নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে বের হওয়ার কোন ক্ষমতা আমার নেই —। নিজের একটা লেখা থেকে উদাহরণ দেই — কৃষ্ণপক্ষ।

মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস লিখব — এই ভেবে শুরু করলাম। শুরুটা হল এই ভাবে —

"নোটটা বদলাইয়া দেন আফা, ছিড়া নোট।"

প্রথম বাক্যটি লিখেই পুরো গল্প মাথায় সাজিয়ে নিলাম —। সমস্যা দেখা দিল তখন। দ্বিতীয় বাক্যটি আর লিখতে পারি না। কত পৃষ্ঠা যে নষ্ট করলাম! প্রতিটিতে একটা বাক্য লেখা — "নোটটা বদলাইয়া দেন আফা, ছিড়া নোট।" বাসার সবাই

Nirjoy

www.BanglaBook.org

অস্থির — হচ্ছে কি এসব? তাদের চেয়েও বেশি অস্থির আমি। পুরো গল্প আমি সাজিয়ে বসে আছি, অথচ লিখতে পারছি না। এ কী যন্ত্রণা! শেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঠিক করলাম, যা হবার হবে। আগে থেকে ঠিকঠাক করা গল্প লিখব না। যা আসে আসুক।

শুরু হল লেখা। পাতার পর পাতা লেখা হতে লাগল। এমন এক গল্প যা আমি লিখতে চাই নি। উপন্যাসের নায়কের ভাগ্য যেন পূর্ব-নির্ধারিত। লেখক হিসেবে তা বদলানোর কোন রকম ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয় নি। আমি একজন কপিরাইটার। কপি করছি, এর বেশি কিছু না। কে করছে কপি? আমার ডিএনএ অণু, না অন্য কিছু?

আমি জানি না। মাঝে মাঝে এই ভেবে কষ্ট পাই — নিজের সম্পর্কে আমরা এত কম জানি কেন? প্রকৃতি কি চায় না আমরা নিজেকে জানি?

এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলি। সন্ধ্যা থেকেই কাজ করছি। খাটের পাশে ছোট্ট টেবিল নিয়ে মাথা গুঁজে লিখে যাচ্ছি। এক মুহূর্তের জন্যেও মাথা তুলছি না। হঠাৎ কি যেন হল। মনে হল — কিছু একটা হয়েছে। অদ্ভুত কিছু ঘটে গেছে। বিরাট কোন ঘটনা, আর আমি তাতে অংশগ্রহণ না করে বোকার মত মাথা গুঁজে লিখে যাচ্ছি। লেখার খাতা বন্ধ করে উঠে পড়লাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কি। অস্থিরতা খুব বাড়ল। একবার মনে হল, এইসব মাথা খারাপের পূর্ব লক্ষণ। মাথা খারাপের আগে আগে নিশ্চয়ই মানুষের এমন ভয়ংকর অস্থিরতা হয়। বারান্দায় এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতার কারণ স্পষ্ট হল -- আজ পূর্ণিমা। আকাশভরা জোছনা। প্রকৃতির এই অসাধারণ সৌন্দর্য উপেক্ষা করে আমি কি-না ঘরের অন্ধকার কোণে বসে আছি?

অনেকেই বলবেন, এটা এমন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা না। যেহেতু জোছনা আমার প্রিয়, আমার অবচেতন মন খেয়াল রাখছে কবে জোছনা। সেই অবচেতন মনই মনে করিয়ে দিচ্ছে। আর কিছু নয়। অবচেতন মনের উপর দিয়ে অনেক কিছু আমরা পার করে দেই। ডাক্তারদের যেমন 'এলার্জি', মনোবিজ্ঞানীদের তেমনি — 'অবচেতন মন'। যখন রোগ ধরতে পারেন না তখন ডাক্তাররা গম্ভীর মুখে বলেন — এলার্জি, মনোবিজ্ঞানী যখন সমস্যা ধরতে পারেন না, তখন বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন -- অবচেতন মনের কারসাজি। আর কিছুই না.

সেই অবচেতন মনটাই বা কি? কতটুক তার ক্ষমতা? লেখকদের লেখালেখি কি অবচেতন মন নামক সমুদ্রে ভেসে উঠে? সেখান থেকে চলে আসে চেতন জগতে? ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে তার আগমন?

সেই ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য জগৎটি আমার জানতে ইচ্ছে করে, বুঝতে ইচ্ছে করে।

অনার্স ক্লাসে আমি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পড়াই। আমাকে পড়াতে হয় ভারনার হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্র। আমি বলি — শোন ছেলেমেয়েরা, কোন বস্তুর অবস্থান ও গতি একই সময়ে নির্ণয় করা যায় না। এই দুয়ের ভেতর সবসময় থাকে এক অনিশ্চয়তা। তুমি অবস্থান পুরোপুরি জানলে গতিতে অনিশ্চয়তা চলে আসবে। আবার গতি জানলে অনিশ্চয়তা চলে আসবে অবস্থানে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ছাত্ররা প্রশ্ন করে — স্যার কেন?

আমি নির্বিকার থাকার চেষ্টা করতে করতে বলি — এটা প্রকৃতির বেঁধে দেয়া নিয়ম। প্রকৃতি চায় না আমরা গতি ও অবস্থান ঠিকঠাক জানি। জ্ঞানের অনেকখানি প্রকৃতি নিজের কাছে রেখে দেয়। প্রকাশ করে না।

'কেন স্যার?'

'জানি না।'

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের অনেক প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতে হয় —"জানি না।"

জ্ঞানের তীব্র পিপাসা দিয়ে মানুষকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনিই আবার জ্ঞানের একটি অংশ মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছেন।

'কেন?'

উত্তর জানা নেই।

এই মহাবিশ্বের বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তরই আমাদের জানা নেই। আমরা জানতে চেষ্টা করছি। যতই জানছি ততই বিচলিত হচ্ছি। আরো নতুন সব প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা নিদারুণ আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন তাঁদের সামনে কঠিন কালো পর্দা। যা কোনদিনই উঠানো সম্ভব হবে না। কি আছে এই পর্দার আড়ালে তা জানা যাবে না।

আমার যাবতীয় রচনায় আমি ঐ কালো পর্দাটির প্রতি ইংগিত করি। আমি জানি না আমার পাঠক-পাঠিকারা সেই ইংগিত কি ধরতে পারেন, না-কি তারা গল্প পড়েই তৃপ্তি পান। উদাহরণ দেই।

'কৃষ্ণপক্ষ' উপন্যাসের নায়ক মুহিবের বিয়ের দিন। একটা কটকটে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি পরে এসেছিল। সবাই তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি করল। ছেলেটি মারা গেল বিয়ের পরদিন। তার স্ত্রী অরুর বিয়ে হল অন্য এক জায়গায়। কেটে গেল দীর্ঘ কুড়ি বছর। কুড়ি বছর পর সেই অরুর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বাড়িতে তুমুল উত্তেজনা। বর এসেছে, বর এসেছে। অরু আগ্রহ করে নিজেও তাঁর কন্যার বর দেখতে গেলেন। ছেলেকে দেখেই তিনি চমকে উঠলেন। তার গায়েও কটকটে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি। যেন এই ছেলে কুড়ি বছর আগের মুহিবের পাঞ্জাবিটা পরে চলে এসেছে।

অনেকেই আমাকে বলেছেন, কৃষ্ণপক্ষ উপন্যাস থেকে হলুদ পাঞ্জাবির অংশটা বাদ দিলে উপন্যাসটা সুন্দর হত। উপন্যাসে এই অংশটুকুই দুর্বল। হিন্দী ছবির মত মেলোড্রামা।

অথচ উপন্যাসটা লেখাই হয়েছে হলুদ পাঞ্জাবির ব্যাপারটির জন্যে। আমি কি আমার বোধ পাঠকদের কাছে ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হচ্ছি? এরা হিমুর বাইরের রূপটি দেখে। তার উদ্ভট কাণ্ডকারখানায় মজা পায় — কিন্তু এর বাইরেও তো হিমুর অনেক

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কিছু বলার আছে। হিমু ক্রমাগত বলেও যাচ্ছে — কেন কেউ তা ধরতে পারছে না। লেখক হিসেবে এরচে' বড় ব্যর্থতা আর কি হতে পারে?

আমি আমার গল্পটা লিখে শেষ করেছি। মতির চোখ উপড়ে ফেলার গল্প সাধ'রণত গল্পগুলি আমি গভীর রাতে শেষ করি। এই প্রথম শেষ করলাম বিকেলে আনন্দে চোখে পানি এসে গেল। চোখ মুছে শোবার ঘরে এসে দেখি — আমার মেয়েরা সবাই সাজ-পোশাক পরছে। একেকজনকে পরীর মত দেখাচ্ছে। আমি বললাম ব্যাপার কি?

ওরা আনন্দে ঝলমল করতে করতে বলল, তুমি কাপড় পরে নাও। দেরি করছ কেন? আমরা বিয়েতে যাব না?

ওদের মা বলল, তোর বাবার চোখ দেখে বুঝতে পারছিস না, সে যাবে না? সে ঘরে চুপচাপ একা একা বসে থাকবে।

বড় মেয়ে দুঃখিত গলায় বলল, বাবা তুমি যাবে না?

আমি বললাম, অবশ্যই যাব। কে বলছে যাব না?

শার্ট-পেন্ট ইস্ত্রি করা নিয়ে অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বিয়েবাড়িতেও সবার সঙ্গে খুব হৈচৈ করলাম। গল্পগুজব, রসিকতা। সবাই ভাবল, বাহ্ লোকটা বেশ মজার তো। কেউ আমার নিঃসঙ্গতা বুঝতে পারল না। শুধু এক ফাঁকে গুলতেকিন এসে বলল, তোমার কি হয়েছে?

আমি জবাব দিলাম না। আমার কি হয়েছে আমি নিজেই কি ছাই জানি? শুধু জানি, মতি মিয়ার গল্প লিখে শেষ করেছি। মতি মিয়া এখন আর আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কাতর অনুনয় করবে না — স্যার, আমার ব্যাপারটা লিখে ফেলুন।

জীবনের গভীরতম বোধকে আমি অনুভব করতে পারি। জোছনার অপূর্ব ফুলকে আমি দেখতে পাই — কিন্তু তারা অন্তরের এতই গভীরে যে, আমি তুলে আনতে পারি না। বারবার হাত ফসকে যায়। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী জেগে আমি অপেক্ষা করি। কোন দিন কি পারব সেই মহান বোধকে স্পর্শ করতে?

নিজেকে বোঝাই — ভাগ্যে যা আছে তা হবে।

Every man's fate
We have fastened
On his own neek.

(সূরা বনি ইস্রাঈল)

আমরা কি করব না করব সবই পূর্ব-নির্ধারিত! কি হবে চিন্তা করে? নিয়তির হাতে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল।

আমি অপেক্ষা করি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



চোখ

খাজ বাদ-আছর খেজুর কাঁটা দিয়ে মতি মিয়ার চোখ তুলে ফেলা হবে। চোখ তুলবে নীলগরের ইদরিস। এই কাজ সে আগেও একবার করেছে।

মতি মিয়াকে আটকে রাখা হয়েছে বরকত সাহেবের বাংলা ঘরে। তার হাত-পা বাঁধা। একদল মানুষ তাকে পাহারা দিচ্ছে। যদিও তার প্রয়োজন ছিল না, পালিয়ে যাওয়া দূরের কথা, মতি মিয়ার উঠে বসার শক্তি পর্যন্ত নেই। তার পাঁজরের হাড় ভেঙেছে। ডান হাতের সব কটা আঙুল থেঁতলে ফেলা হয়েছে। নাকের কাছে সিকনির মত রক্ত ঝুলে আছে। পরনের সাদা পাঞ্জাবি রক্তে মাখামাখি হয়ে গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে। ঘণ্টাখানিক আগেও তার জ্ঞান ছিল না। এখন জ্ঞান আছে, তবে বোধশক্তি ফিরেছে বলে মনে হয় না। তার চোখ তুলে ফেলা হবে এই খবরেও সে বিচলিত হয়নি। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, নয়ন কখন তুলবেন?

এই পর্ব বাদ-আছর সমাধা হবে শুনে সে মনে হল নিশ্চিন্ত হল। সহজ গলায় বলল, পানি খামু, পানি দেন।

পানি চাইলে পানি দিতে হয়। না দিলে গৃহস্থের দোষ লাগে। রোজ হাশরের দিন পানি পিপাসায় বুক যখন শুকিয়ে যায় তখন পানি পাওয়া যায় না। কাজেই এক বদনা পানি এনে মতির সামনে রাখা হল। মতি বিবক্ত গলায় বলল, মুখের উপরে পানি চাইল্যা না দিলে খামু ক্যামনে? আমার দুই হাত বান্ধা। আপনেরার এইটা কেমুন বিবেচনা?

যে বদনা এনেছে সে মোড়ায় বসে থাকা একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, পানি চাইল্যা দিমু হাসান ভাই?

হাসান আলী মতিকে কেন্দুয়া বাজার থেকে ধরে এনেছে। মতির ওপর এই কারণেই তার অধিকার সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। মতির বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে হাসান আলীর মতামত জানা দরকার। হাসান আলী পানি বিষয়ে কোন মতামত দিল না, বিস্মিত হয়ে বলল, হারামজাদা কেমন ঢং-এ কথা কয় শুনছেন? তার চউখ তোলা হইব এইটা নিয়া কোন চিন্তা নাই। ক্যাটক্যাট কইরা কথা বলতেছে। কি আচানক বিষয়! ঐ হারামজাদা, তোর মনে ভয়-ডর নাই?

মতি জবাব দিল না, থু করে থুথু ফেলল। থুথুর সঙ্গে রক্ত বের হয়ে এল। তাকে ঘিরে ভিড় বাড়ছে। খবর ছড়িয়ে পড়েছে। একজন জীবিত মানুষের চোখ খেজুর কাঁটা দিয়ে তুলে ফেলা হবে এমন উত্তেজক ঘটনা সচরাচর ঘটে না। আশা করা যাচ্ছে,

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আছর ওয়াক্ত নাগাদ লোকে লোকারণ্য হবে। মতিকে দেখতে শুধু যে সাধারণ লোকজন আসছে তা না, বিশিষ্ট লোকজনও আসছেন। কেন্দুয়া থেকে এসেছেন রিটায়ার্ড স্টেশন মাস্টার মোবারক সাহেব। নয়াপাড়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবও এসেছেন। হাসান আলী নিজের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে তাঁকে বসতে দিল। তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে চশমা বের করতে করতে বললেন, এরই নাম মতি?

হাসান আলী হাসিমুখে বলল, জ্বে হেডমাস্টার সাব, এই হারামজাদাই মতি। বাদ আছর হারামজাদার চউখ তোলা হইব।

'এরে ধরলা ক্যামনে?'

'সেইটা আপনের এক ইতিহাস।'

পানদানিতে পান চলে এসেছে। হেডমাস্টার সাহেব পান মুখে দিতে দিতে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ঘটনাটা বল শুনি। সংক্ষেপে বলবা।

হাসান আলী এগিয়ে এল। মতিকে ধরে আনার গল্প সে এ পর্যন্ত এগারোবার বলেছে। আরো অনেকবার বলতে হবে। বিশিষ্ট লোকজন অনেকেই এখনো আসেন-নি। সবাই আলাদা আলাদা করে শুনতে চাইবেন। তাতে অসুবিধা নেই। এই গল্প এক লক্ষবার কবা যায়। হাসান আলী কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল।

"ঘরে কেরাছি ছেল না। আমার পরিবার বলল, কেরাছি নাই। আমার মিজাজ গেল খারাপ হইয়া। হাটবারে কেরাছি আনলাম, আর আইজ বলে কেরাছি নাই, বিষয় কি। যাই হউক, কেরাছির বোতল হাতে লইয়া রওনা দিলাম। পথে সুলেমানের সাথে দেখা। সুলেমান কইল, চাচাজী, যান কই? . . .'

মতি নিজেও হাসান আলীর গল্প আগ্রহ নিয়ে শুনছে। প্রতিবারই গল্পের কিছু শাখা প্রশাখা বের হচ্ছে। সুলেমানের কথা এর আগে কোন গল্পে আসেনি। এইবার এল। সুলেমানের ভূমিকা কি কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

হাসান আলী গল্প শেষ করল। হেডমাস্টার সাহেব মুগ্ধ গলায় বললেন, বিরাট সাহসের কাম করছ হাসান। বিরাট সাহস দেখাইছ। কামের কাম করছ। মতির সাথে অস্ত্রপাতি কিছু ছিল না?

'জ্বে না।'

'আল্লাপাক তোমারে বাঁচাইছে। অস্ত্রপাতি থাকলে উপায় ছিল না। তোমারে জানে শেষ কইরা দিত।'

উপস্থিত সবাই মাথা নাড়ল। হেডমাস্টার সাহেব বললেন, চউখ তোলা হইব কথাটা কি সত্য?

'জ্বে সত্য। এইটা সকলের সিদ্ধান্ত। চউখ তুললেই জন্মের মত অচল হইব। থানা-পুলিশ কইরা তো কোন ফয়দা নাই।'

'অতি সত্য কথা, কোন ফয়দা নাই। তবে থানাওয়ালা ঝামেলা করে কিনা এইটা বিবেচনায় রাখা দরকার।'

'আছে, সবই বিবেচনার মইধ্যে আছে। মেম্বর সাব থানাওয়ালার কাছে গেছে।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মতি লক্ষ্য করল, হেডমাস্টার সাহেব তার দিকে তাকিয়ে আছেন। হেডমাস্টার সাহেবের চোখে শিশুসুলভ বিস্ময় ও আনন্দ। মনে হচ্ছে, চোখ তোলার ঘটনা দেখার জন্যে তিনি আছর পর্যন্ত থেকে যাবেন। মতি তেমন ভয় পাচ্ছে না। প্রাথমিক ঝড় কেটে গেছে এটাই বড় কথা। প্রথম ধাক্কায় চোখ তুলে ফেলে দিতে পারত। সেটা যখন যায়নি এখন আশা আছে। আছরের আগেই কেউ-না-কেউ দয়াপরবশ হয়ে বলে ফেলবে — "ঠিক, বাদ দেন। চউখ তুইলা লাভ নাই। শক্ত মাইর দিয়া ছাইড়া দেন।" একজন বললেই অনেকে তাকে সমর্থন করবে। তবে একজন কউকে বলতে হবে। মতি নিজে ক্ষমা চাইলে হবে না। এতে এরা আরো রেগে যাবে। সে দুর্বল হলে সর্বনাশ। দুর্বলকে মানুষ করুণা করে না, ঘৃণা করে। মতি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবে। চোখ বাঁচানোর পথ বের করতে হবে। হাতে অবশ্যি সময় আছে। আছরের এখনো অনেক দেরি। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করাও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা শরীরে যন্ত্রণা, পিপাসায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। পানির বদনা সামনে আছে কিন্তু কেউ মুখে ঢেলে না দিলে খাবে কিভাবে?

হেডমাস্টার সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, কি রে মতি, সিগ্রেট খাবি?

সবাই হো-হো করে হেসে ফেলল: মতি চিন্তিত বোধ করছে। এটা ভাল লক্ষণ না। এরা তাকে দেখে মজা পেতে শুরু করেছে। মানুষ মজা পায় জন্তু-জানোয়ার দেখে। এরা তাকে জন্তু-জানোয়ার ভাবতে শুরু করেছে: হাত-পা বাঁধা একটা ভয়াবহ প্রাণী। ভয়াবহ প্রাণীর চোখ উঠানো কঠিন কিছু না। তাছাড়া দূর দূর থেকে লোকজন মজা পাবার জন্যে আসছে। মজা না পেয়ে তারা যাবে না। মতি হেডমাস্টার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, পানি খাব। একজন বদনার পুরো পানিটা তার মুখের উপর ঢেলে দিল। সবাই আবার হো-হো করে হেসে উঠল। মতির বুক ধক্ করে উঠল: অবস্থা ভাল না: তাকে দ্রুত এমন কিছু করতে হবে যেন সে পশুস্তর থেকে উঠে আসতে পারে। কি করা যায় কিছুই মাথায় আসছে না। চোখ দুটা কি আজ চলেই যাবে? মায়া-মমতা দুনিয়া থেকে উঠে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন তার নত লোকের শাস্তি ছিল মাথা কামিয়ে গলায় জুতার মালা ঝুলানো। তারপর এল ঠেং-ভাঙা শাস্তি, ঠেং ভেঙে লুলা করে দেয়া। আর এখন চোখ তুলে দেয়া। একটা খেজুর কাঁটা দিয়ে পুট করে চোখ বের করে আনা। এতগুলি লোক তাকে ঘিরে আছে, কারো চোখে কোন মমতা নেই। অবশ্যি হাতে এখনো সময় আছে। মমতা চট করে তৈরি হয় না। মমতা তৈরি হতেও সময় লাগে। মতি হাসান আলীর দিকে তাকিয়ে হাসল। মানুষের হাসি খুব অদ্ভুত জিনিস। জন্তু-জানোয়ার হাসতে পারে না। মানুষ হাসে। একজন 'হাসন্ত' মানুষের উপর রাগ থাকে না।

হাসান আলী চেঁচিয়ে উঠল, দেখ, হারামজাদা হাসে। ভয়ের চিহ্নটা নাই। কিছুক্ষণের মইধ্যে চউখ চইল্যা যাইতেছে, তারপরেও হাসি। দেখি, এর গালে একটা চড় দেও দেখি।

প্রচণ্ড চড়ে মতি দলা পাকিয়ে গেল। হাত-পা বাঁধা, নয়ত চার-পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ত। কিছুক্ষণের জন্যে মতির বোধশক্তি লোপ পেল। মাথার ভেতর ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে। চারদিক অন্ধকার। এরা কি চোখ তুলে ফেলেছে? মনে হয় তাই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পানির পিপাসা দূর হয়েছে, পিপাসা নেই। এটা মন্দ না। মাথার ভেতর পাক দিচ্ছে, মনে হচ্ছে সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞান হবার আগে আগে এরকম হয়। অজ্ঞান হওয়া খুব আনন্দদায়ক ব্যাপার। দ্রুত শরীরের ব্যথা-বেদন চলে যায়। শরীর হাল্কা হতে থাকে।

না, চোখ যায়নি। চোখ এখনো আছে। এই তো সবকিছু দেখা যাচ্ছে। মতি মনে মনে বলল, "শালার লোক কি হইছে! মেলা বইস্যা গেছে।" বেলা পড়ে এসেছে। আছর ওয়াক্ত হয়ে গেল ন-কি? না মনে হয়। আলো খুব বেশি। তাকে বাংলা ঘর থেকে বের করে উঠোনে শুইয়ে রাখা হয়েছে। এই জন্যেই আলো বেশি লাগছে।

মতি বলল, কয়টা বাজে?

'কয়টা বাজে তা দিয়া দরকার নাই। সময় হইয়া আসছে। যা দেখনের দেইখ্যা নে রে মতি।'

মতি চারদিকে তাকালো। তার আশেপাশে কোন ছোট ছেলেমেয়ে নেই। মহিলা নেই। এদের বোধহয় সরিয়ে দেয়া হয়েছে। লোকজন তাকে ঘিরে গোল হয়ে আছে। তার সামনে জলচৌকির উপর নীল গেঞ্জি এবং সাদা লুঙ্গি পরে যে বসে আছে সে-ই কি চোখ তুলবে? সে-ই কি নবীনগরের ইদরিস? কখন এসেছে ইদরিস? লোকটার ভাবভঙ্গি দশজনের মত না। তাকাচ্ছে অন্যরকম করে। তার চেয়েও বড় কথা, আশেপাশের লোকজন এখন নীল গেঞ্জিওয়ালাকেই দেখছে। মতির প্রতি তাদের এখন আর কোন আগ্রহ নেই। তারা অপেক্ষা করছে বড় ঘটনার জন্য। নীল গেঞ্জি পরা লোকটার সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা জেনে নেয়া যায়। মতি অপেক্ষা করছে কখন লোকটা তাকায় তার দিকে। যেই তাকাবে ওমনি মতি কথা বলবে। চোখের দিকে না তাকিয়ে কথা বললে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু লোকটা তাকাচ্ছে না।

'ভাইজান, ও ভাইজান।'

নীল গেঞ্জি তাকাল মতির দিকে। মতি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আফনের নাম কি ইদরিস মিয়া? নীল গেঞ্জি জবাব দিল না। মাথা ঘুরিয়ে নিল। মতি আরো আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল, ভাইজান, আফনেই কি আমার চউখ তুলবেন?

পেছন থেকে একজন বলল, হারামজাদা কয় কি! সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে উঠল। এই কথায় হাসির কি আছে মতি বুঝতে পারছে না। কথাটা কি সে বিশেষ কোন ভঙ্গিতে বলেছে? সাধারণ কথাও কেউ কেউ খুব মজা করে বলতে পারে। তার বৌ পারত। অতি সাধারণ কথা এমনভাবে বলত যে হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে যেত। ভাত বেড়ে ডাকতে এসে বলত, ভাত দিছি, আসেন। কষ্ট কইরা তিন-চাইরটা ভাত খান। না, বৌয়ের কথা ভাবার এখন সময় না। এখন নিজের নয়ন বাঁচানোর বুদ্ধি বের করতে হবে। নয়ন বাঁচলে বৌয়ের কথা ভাবা যাবে। নয়ন না বাঁচলেও ভাবা যাবে। ভাবার জন্যে নয়ন লাগে না। বৌয়ের কথা সে অবশ্যি এমনিতেও বিশেষ ভাবে না। শুধু হাজতে বা জেলখানায় থাকলেই তার কথা মনে আসে। তখন তার কথা ভাবতেও ভাল লাগে। মেয়েটার অবশ্যি কষ্টের সীমা ছিল না। সে জেলে গেলেই রাতদুপুরে চৌকিদার, থানাওয়ালা বাড়িতে উপস্থিত হত। বিষয় কি? খোঁজ নিতে আসছে মতি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঘরে আছে কি না। সুদৃশ একটা মেয়ে। খালি বাড়িতে থাকে। খানাওয়ালারা তো রাতদুপুরে সেই বাড়িতে যাবেই। বাড়িতে যাবে। পান খাবে। আরও কত কি করবে। ডাকাতের বৌ হল সবার বৌ। এই অবস্থায় কোন মেয়ে থাকে না। তার বৌ-টা তারপরেও অনেক দিন ছিল। মতি প্রতিবারই বাড়ি ফিরত আতংক নিয়ে। বাড়ির সামনে এসে মনে হত এইবার বাড়িতে ঢুকে দেখবে, বাড়ি খালি। কেউ নেই।

বৌ চলে গেছে গত বৈশাখ মাসে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। পাড়ার কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছিল। কেউ বলতে পারে না। একজন বলল, অনেক দিন তো থাকল, আর কত? বাজারে গিয়া খোঁজ নেও। মনে হয় বাজারে ঘর নিছে। জগতের অনেক সত্যের মত এই সত্যও সে গ্রহণ করেছে সহজভাবে। চোর-ডাকাতের বৌদের শেষ আশ্রয় হয় বাজার। বাজারে তারা মোটামুটি সুখেই থাকে। মুখে রঙ-চঙ মেখে সন্ধ্যাকালে চিকন গলায় ডাকে, ও বেপারি, আহেন, পান-তামুক খাইয়া যান। শীতের দিন শইলডা গরম করন দরকার আছে।

অবসর পেলেই মতি আজকাল বাজারে-বাজারে ঘুরে; বৌটাকে পাওয়া গেলে মনে শান্তি। তাকে নিয়ে ঘর-সংসার আর করবে না। তাতে লাভ কি? বৌটা কোন এক জায়গায় থিতু হয়েছে এটা জানা থাকলেও মনে আনন্দ। মাঝে-মধ্যে আসা যাবে। আপনার মানুষের কাছে কিছুক্ষণ বসলেও ভাল লাগে। আপনার মানুষ সংসারে থাকলেও আপনার, বাজারে থাকলেও আপনার।

বৌ কেন্দুয়া বাজারে আছে এরকম একটা উড়া-খবর শুনে মতি কেন্দুয়া এসেছিল। উড়া-খবর কখনো ঠিক হয় না। তার বেলা ঠিক হয়ে গেল। বৌ এখানেই আছে। নাম নিয়েছে মর্জিনা। বাজারে ঘর নিলে নতুন নাম নিতে হয়। মর্জিনার সঙ্গে দেখা করতে যাবার মুখে এই বিপদ।

আজান হচ্ছে। আছর ওয়াক্ত হয়ে গেছে। মতি অনেক কষ্টে পাশ ফিরল। তারা চোখ কখন তুলবে? নামাজের আগে নিশ্চয়ই না। কিছুটা সময় এখনো হাতে আছে। এর মধ্যে কত কিছু হয়ে যেতে পারে। মহাখালি রেল স্টেশনে সে একবার ধরা পড়ল। তাকে মেরেই ফেলত। ট্রেনের কামরা থেকে একটা মেয়ে ছুটে নেমে এল। চিৎকার করে বলল, আপনারা কি মানুষটাকে মেরে ফেলবেন? খবর্দার, আর না। খবর্দার। মেয়েটির মূর্তি দেখেই লোকজন হকচকিয়ে গেল। লোকজনের কথা বাদ থাক, সে নিজেই হতভম্ব। জীবন বাঁচানোর জন্যে মেয়েটিকে সামান্য ধন্যবাদও দেয়া হয়নি। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। সেই মেয়ে চলে গেছে কোথায় না কোথায়।

আজ এই যে এত লোক চারপাশে ভিড় করে আছে এদের মধ্যেও নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ আছে ঐ মেয়েটির মত। সে অবশ্যই শেষ মুহূর্তে ছুটে এসে বলবে, "করেন কি! করেন কি!" আর এতেই মতির নয়ন রক্ষা পাবে। এইটুক বিশ্বাস তো মানুষের প্রতি রাখতেই হবে। মতি মিয়া অপেক্ষা করে। কে হবে সেই লোকটি। না জানি সে দেখতে কেমন। সেই লোকটির চোখ কি ট্রেনের মেয়েটির চোখের মত মমতামাখা হবে? যে চোখের দিকে তাকালে ভাল হয়ে যেতে ইচ্ছা করে। মতি মিয়া চাপা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করতে তার ভালই লাগে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



পেট্রিফায়েড ফরেস্ট

অভিশাপে পাথর হয়ে যাবার ব্যাপার রূপকথার বই-এ পাওয়া যায়। ঐ যে দুষ্ট যাদুকর রাজকন্যাকে পাথর বানিয়ে ফেলল। বছরের পর বছর রোদ-বৃষ্টিতে পড়ে রইল সেই পাথরের মূর্তি। তারপর এক শুভক্ষণে রাজপুত্র এসে তাকে অভিশাপমুক্ত করল। পাথরের মূর্তি প্রাণ ফিরে পেল। তারা দু'জন সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগল।

শৈশবের রূপকথার গল্পকে গুরুত্ব দেবার কোন কারণ নেই, কিন্তু যৌবনে আবার শৈশবের গল্প নতুন করে পড়লাম। উপন্যাসটির নাম "পেট্রিফায়েড ফরেস্ট" অর্থাৎ প্রস্তরীভূত অরণ্য। এই উপন্যাসের তরুণ নায়ক সন্ধ্যাবেলা বিষণ্ন মুখে 'পেট্রিফায়েড ফরেস্ট'-এ ঘুরে বেড়ায়। চারদিকে পাথরের গাছপালা। তার মাঝে পাথরের মত মুখ করে এ যুগের নায়ক বসে থাকে। আমার কাছে মনে হয়, এ কী ছেলেমানুষি! রূপকথার পাথরের অরণ্য এই যুগে কোত্থেকে আসবে? পাথরের অরণ্য থাকতে পারে না।

আমার অনেক ধারণার মত এই ধারণাও পরবর্তীতে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। প্রস্তরীভূত অরণ্য দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়। সেই গল্প বলা যেতে পারে।

তখন থাকি আমেরিকার নর্থ ডাকোটায়। সংসার ছোট — আমি, আমার স্ত্রী এবং একমাত্র মেয়ে নোভা। টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে মাসে চারশ' ডলারের মত পাই। দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা। ঘুরে বেড়ানোর প্রচণ্ড শখ। শখ মেটানোর উপায় নেই। খুবই খরচান্ত ব্যাপার। আমেরিকা বিশাল দেশ। দেখার জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তখনো কিছুই দেখা হয়নি। ছ'শ ডলার দিয়ে লক্কড় মার্কা একটি ফোর্ড গাড়ি কিনেছি। সেই গাড়ি নিয়ে বেরুতে সাহস হয় না। ইঞ্জিন গরম হলেই এই গাড়ি মহিষের মত বিচিত্র শব্দ করে।

এই অবস্থায় বেড়াতে যাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। আমার পাশের ফ্ল্যাটের মালয়েশিয়ান ছাত্র এক সকালে এসে বলল, আহমাদ, আমি গতকাল একটা নতুন গাড়ি কিনেছি — শেভ্রলেট। পাঁচ হাজার ডলার পড়ল।

আমি বললাম, বাহ, ভাল তো!

'এখন ঠিক করেছি গাড়িটা লং রুটে টেস্ট করব। গাড়ি হচ্ছে স্ত্রীর মত। স্ত্রীকে যেমন পোষ মানাতে হয়, গাড়িকেও পোষ মানাতে হয়। আমি আজ সন্ধ্যায় রওনা হচ্ছি সাউথ ডাকোটায়।'

'খুব ভাল।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'তুমিও আমার সঙ্গে যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে যদিও আমার তেমন পরিচয় নেই, তবু তুমি আমার প্রতিবেশী। তুমি যেমন মুসলমান, আমিও মুসলমান। অবশ্য আমি খারাপ মুসলমান, নিয়মিত মদ খাই।'

আমি মালয়েশিয়ান ছেলেটির কথাবার্তায় চমৎকৃত হলাম। সে বলল, আমি তোমার নাম জানি, কিন্তু তুমি আমার নাম জান না। দশ ডলার বাজি। বল দেখি আমার নাম কি?

আমি বললাম, 'আইজেক।'

'আইজেক হচ্ছে আমার ছেলের নাম, আমার নাম আবদাল। যাই হোক, তুমি তৈরি থেকো। ঠিক সন্ধ্যায় আমরা রওনা হব।'

আমি বললাম, নতুন গাড়িতে যাচ্ছ, তোমার স্ত্রী এবং ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই তো ভাল হবে।

'মোটেই ভাল হবে না। তুমি আমার স্ত্রীকে চেন না। ওকে আমি সহ্য করতে পারি না। তাছাড়া তোমাকে আগেই বলেছি, গাড়ি হচ্ছে স্ত্রীর মত। দু'জন স্ত্রীকে নিয়ে বের হওয়া কি ঠিক?'

আমি আবদালের লজিকে আবারো চমৎকৃত হলাম। তাকে বিনীতভাবে বললাম, আমার পক্ষে আমার স্ত্রী ও কন্যাকে ফেলে একা একা বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হবে না। ওদের মন খারাপ হবে; আমারও ভাল লাগবে না।

আবদাল বিমর্ষ মুখে চলে গেল। আমার স্ত্রী গুলতেকিন বলল, ওর সঙ্গে যেতে রাজি না হয়ে খুব ভাল করেছ, পাগল ধরনের লোক। তবে ওর বউটা খুব ভাল। তার নাম 'বোওজি'। এমন ভাল মেয়ে আমি কম দেখেছি। চেহারাও রাজকন্যাদের মত।

বিকেলে আবদাল আবার এল। তার মুখের বিমর্ষ ভাব দূর হয়েছে। সে হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে, তুমি তোমার স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে নাও। আমি আমারটাকে নিচ্ছি। ঘুরে আসি।

আমি বললাম, এত মানুষ থাকতে তুমি আমাকে নিতে আগ্রহী কেন? আবদাল বলল, অনেকগুলি কারণ আছে — তুমি আমার প্রতিবেশী, তুমি মুসলমান এবং তুমি রোজ বিকেলে তোমার মেয়েকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াও। দেখতে বড় ভাল লাগে। আমারো ইচ্ছে করে আমার ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরতে। তবে আমার ছেলেটা হল মহাশয়তান। মার কাছ থেকে সব শয়তানি বুদ্ধি পেয়েছে। এইজন্যে ওকে কাঁধে নেই না। তাও একদিন নিয়েছিলাম। কাঁধে তোলামাত্র পিসাব করে দিল। প্রাকৃতিক কারণে করেছে তা না, হচ্ছে করে করেছে।

'রাতে রওনা হবার দরকার কি? আমরা বরং ভোরবেলা রওনা হই। দৃশ্য দেখতে দেখতে যাই।'

'আমেরিকায় দেখার মত কোন দৃশ্য নেই। মাইলের পর মাইল ধু-ধু মাঠ। ঐ

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মাঠগুলি গরুর পায়খানা করার জন্য অতি উত্তম। কাজেই রাতে যাচ্ছি। তাছাড়া স্ত্রীকে যেমন রাতে পোষ মানাতে হয়, গাড়িকেও তেমনি রাতে পোষ মানাতে হয়।'

সন্ধ্যা মিলাবার পর আমরা রওনা হলাম। গ্যাস স্টেশনে গ্যাস নেবার জন্যে গাড়ি দাঁড়াল। আবদাল নেমে গেল, গ্যাস নিল, দু' একটা টুকিটাকি জিনিস কিনবে। আবদালের স্ত্রী রোওজি আমার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, ভাইজান, আমি কি আপনার সঙ্গে দুটা কথা বলার অনুমতি পেতে পারি? আমি মেয়েটির চমৎকার ইংরেজি শুনে যেমন মুগ্ধ হলাম, তেমনি মুগ্ধ হলাম তার রূপ দেখে। মালয়েশিয়ানদের চামড়া আমাদের মত শ্যামলা। এই মেয়েটির গায়ের রং দুধে-আলতায় মেশানো। মিশরী মেয়েদের মত টানা-টানা চোখ, লম্বা চুল। লাল টকটকে কমলার কোয়ার মত ঠোঁট।

আমি বললাম, বলুন কি বলবেন। আমি শুনছি।

'আপনি যে আপনার স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া! আপনি থাকায় আমি খুব ভরসা পাচ্ছি — আমার স্বামী খুব দ্রুত গাড়ি চালায়। আপনি একটু লক্ষ রাখবেন।'

'অবশ্যই লক্ষ রাখব।'

'তার চেয়েও বড় সমস্যা, রাতের বেলা হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর সময় সে প্রায়ই স্টিয়ারিং হুইল ধরে ঘুমিয়ে পড়ে।'

'সে কি!'

'জ্বি — অনেকবার বড় ধরনের অ্যাকসিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গেছি।'

'আরো কিছু বলার আছে?'

'এখন বলব না। এখন বললে আপনি ভয় পাবেন। আল্লাহ আল্লাহ করে ট্রিপ শেষ করে ফিরে আসি, তারপর আপনাকে বলব।'

সাউথ ডাকোটায় অনেক দেখার জিনিস আছে। টুরিস্টরা প্রথমে দেখে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা চার প্রেসিডেন্টের মাথা। দল নিয়ে দেখতে গেলাম। আবদাল ভুরু কুঁচকে বলল, এর মধ্যে দেখার কি আছে বুঝলাম না। হাতুড়ি-বাঁটাল দিয়ে পাহাড়গুলি নষ্ট করেছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয়?

রোওজি বলল, আমার কাছে তো খুব সুন্দর লাগছে।

আবদাল বলল, তোমার কাছে তো সুন্দর লাগবেই। তুমি হলে বুদ্ধিহীনা নারী। বুদ্ধিহীনা নারী যা দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়।

আমি রোওজিকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বললাম, আমি বুদ্ধিহীনা নারী নই কিন্তু আমার কাছেও ভাল লাগছে।

'ভাল লাগলে ভাল। তোমরা থাক এখানে, আমি দেখি কোন পাব-টাব পাওয়া যায় কিনা। কয়েকটা বিয়ার না খেলে চলছে না।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আবদাল বিয়ারের খোঁজে চলে গেল।

আমরা অনেক ছবি টবি তুললাম। পাখি টুপিসের মত ঘুরলাম। তারপর আবদালের খোঁজে গিয়ে দেখি সে পাঁড় মাতাল। টেবিল থেকে মাথা তুলতে পারছে না এমন অবস্থা। আমাকে দেখেই হাসিমুখে বলল, খবর সব ভাল?

আমি বললাম, ভাল! তোমার এ কী অবস্থা!

'কোন চিন্তা করবে না। মাতাল অবস্থায় আমি সবচেয়ে ভাল গাড়ি চালাই। চল, রওনা হওয়া যাক।'

'এখনি রওনা হওয়া যাবে না। আরো অনেক কিছু দেখার আছে। তাছাড়া তোমারও মনে হয় বিশ্রাম দরকার।'

'আমার কোনই বিশ্রাম দরকার নেই এবং এখানে দেখারও কিছু নেই।'

'স্ফটিক গুহার খুব নাম শুনেছি। না দেখে গেলে আফসোস থাকবে।'

আবদাল বলল, গুহা দেখার কোন দরকার নেই। গুহা জন্তু-জানোয়ারদের জন্যে। মানুষের জন্যে না।

তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্ফটিক গুহা দেখাতে নিয়ে গেলাম। সারা পৃথিবীতে সত্তুরটির মত স্ফটিক গুহা আছে। সেই সত্তুরটির মধ্যে ষাটটিই পড়েছে সাউথ ডাকোটায়।

পাঁচ ডলারের টিকিট কেটে আমরা স্ফটিক গুহায় ঢুকলাম। সে এক ভয়াবহ সৌন্দর্য! লক্ষ লক্ষ স্ফটিক ঝলমল করছে। প্রকৃতি যেন পাথরের ফুল ফুটিয়েছে। বিস্ময়ে হতবাক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রোওজি মুগ্ধকণ্ঠে বলল, আহ্, কি সুন্দর!

আবদাল বলল, ন্যাকামি করবে না। তোমার ন্যাকামি অসহ্য! পাথর আগে দেখনি? পাথর দেখে 'আহ্ কি সুন্দর' বলে নেচে ওঠার কি আছে? ন্যাকামি না করলে ভাল লাগে না?

রোওজির মনটা খারাপ হল। আমারো মন খারাপ হল। এদের সঙ্গে না এলেই ভাল হত। কিছুক্ষণ পরপর একটি মেয়ে অকারণে অপমানিত হচ্ছে, এই দৃশ্য সহ্য করাও মুশকিল।

মেয়েটি মনে হচ্ছে স্বামীর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। খানিকক্ষণ মন খারাপ করে থাকে। তারপর আবার আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। গুহা থেকে বেরুবার পর গুহার কেয়ারটেকার বলল, কেমন দেখলে?

আমি বললাম, অপূর্ব!

আবদাল বলল, বোগাস! পাথর দেখিয়ে ডলার রোজগার। শাস্তি হওয়া উচিত।

কেয়ারটেকার বলল, স্ফটিক গুহা তোমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি। এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে আছে পেট্রিফায়েড ফরেস্ট। পুরো অরণ্য পাথর হয়ে গেছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঐটি দেখ।

আবদাল বলল, আমি আর দেখাদেখির মধ্যে নেই।

তাকে ছেড়ে গেলে সে আবার কোন একটা পাব-এ ঢুকে পড়বে। আমাদের আর বাড়ি ফেরা হবে না। কাজেই জোর করেই তাকে ধরে নিয়ে গেলাম। দেখলাম পেট্রিফায়েড ফরেস্ট। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! গাছপালা, পোকামাকড় সবই পাথর হয়ে গেছে। এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার যে প্রকৃতিতে ঘটতে পারে তা-ই আমার মাথায় ছিল না। আমি আবদালকে বললাম, কেমন দেখলে?

সে বলল, দূর, দূর।

পেট্রিফায়েড ফরেস্টে ছোট একটা দোকানের মত আছে। সেখানে স্যুভেনির বিক্রি হচ্ছে। পাথর হওয়া পোকা, পাথর হওয়া গাছের পাতা. কোনটির দাম কুড়ি ডলার, কোনটির পঁচিশ।

রোওজি ক্ষীণস্বরে তার স্বামীকে বলল, সে একটা পোকা কিনতে চায়। তার খুব শখ।

আবদাল চোখ লাল করে বলল, খবর্দার, এই কথা দ্বিতীয়বার বলবে না! পোকা কিনবে কুড়ি ডলার দিয়ে? ডলার খরচ করে কিনতে হবে পোকা?

'পাথরের পোকা।'

'পাথরেরই হোক আর কাঠেরই হোক। পোকা হল পোকা। ভুলেও কেনার নাম মুখে আনবে না।'

'অদ্ভুত এই ব্যাপার কি তোমার কাছে মোটেও ভাল লাগছে না?'

'ভাল লাগার কি আছে? আমার বমি করে ফেলার ইচ্ছা হচ্ছে। তোমরা ঘুরে বেড়াও। আমি সুভ্যেনির দোকানে গিয়ে বসি। ওদের কাছে বিয়ার পাওয়া যায় কি-না কে জানে।'

আমরা ঘণ্টাখানিক ঘুরলাম। রোওজি বলল, চলুন ফেরা যাক। ও আবার দেরি হলে রেগে যাবে।

আবদাল রেগে টং হয়ে আছে। আমাকে দেখেই বলল, কুৎসিত একটা জায়গা। বিয়ার পাওয়া যায় না। চল তো আমার সঙ্গে, একটা পাব খুঁজে বের করি। ওরা এখানে থাকুক। আমি বললাম, না খেলে হয় না? আবদাল অবাক হয়ে বলল, বিয়ার না খেলে বাঁচব কিভাবে?

আমি আবদালকে নিয়ে পাবের সন্ধানে বের হলাম। যাবার আগে সে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কয়েকটা হুংকার দিল, খবর্দার, কিছু কিনবে না। পোকা-মাকড় বাসায় নিয়ে গেলে খুনোখুনি হয়ে যাবে। চুলের মুঠি ধরে গেটআউট করে দেব।

পাবে দুজন মুখোমুখি বসলাম।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আবদাল বলল, আমি তোমাকে আলাদা নিয়ে এসেছি একটা গোপন কথা বলার জন্যে।

'গোপন কথাটা কি?'

'রোওজির জন্যে কিছু পাথরের পোকা-মাকড় কিনেছি। আমি সেসব ওকে দিতে পারি না। তুমি দেবে। তুমি বলবে যে, তুমি কিনে উপহার দিচ্ছ।'

আমি তাকিয়ে আছি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

আবদাল বলল, আমি আমার স্ত্রীকে পাগলের মত ভালবাসি। কিন্তু ব্যাপারটা তাকে জানতে দিতে চাই না। জানলেই লাই পেয়ে যাবে। এই কারণেই তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি।

'ও আচ্ছা।'

'মেয়েটা যে কত ভাল তা তুমি দূর থেকে বুঝতে পারবে না।'

'তুমি লোকটাও মন্দ না।'

'আমি অতি মন্দ। ইবলিশ শয়তানের কাছাকাছি। সেটা কোন ব্যাপার না। দুনিয়াতে ভাল-মন্দ দুধরনের মানুষই থাকে। থাকে না?'

'হ্যাঁ, থাকে।'

'এখন তুমি কি আমার স্ত্রীকে এইসব পোকা-মাকড়গুলি উপহার হিসেবে দেবে?'

'তুমি চাইলে অবশ্যই দেব। কিন্তু আমার ধারণা, তোমার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে — এইসব উপহার আসলে তোমারই কেনা।'

'না, বুঝতে পারবে না। আমি আমার ভালবাসা সব সময় আড়াল করে রেখেছি। ওর ধারণা হয়ে গেছে, ওকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।'

'এতে লাভটা কি হচ্ছে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না।'

'লাভটা বলি — কোন একদিন রোওজি হঠাৎ করে সবকিছু বুঝতে পারবে — বুঝতে পারবে আমার সবই ছিল ভান। তখন কি গভীর আনন্দই না পাবে! আমি সেই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করছি।'

আবদাল বিয়ারের অর্ডার দিয়েছে। দু' জগ ভর্তি বিয়ার। নিমিষের মধ্যে একটা জগ শেষ করে সে বলল, জিনিসটা মন্দ না।

আমরা আবার পেট্রিফায়েড ফরেস্টে ফিরে গেলাম। রোওজি ক্ষীণস্বরে তার স্বামীকে বলল, সে ছোট্ট একটা গোবরে পোকা কিনতে চায়। কি সুন্দর জিনিস! আবদাল চোখ লাল করে বলল, আবার! আবার ন্যাকামি ধরনের কথা?

আমরা প্রস্তরীভূত অরণ্য দেখে ফিরে যাচ্ছি। আবদাল ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। মাতাল অবস্থায় সে আসলেই ভাল গাড়ি চালায়। পেছনের সীটে বিষণ্ন মুখে রোওজি বসে আছে। কারণ গাড়িতে উঠার সময় সে আবদালের কাছ থেকে একটা কঠিন ধমক খেয়েছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



উৎসব

ঈদের আগের দিন বিকেলে আমাদের বাসায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। বেশ বড় রকমের দুর্ঘটনা। আমার মেয়ের ঈদের জামাটা তার এক বান্ধবী দেখে ফেললো। দেখার কোন সম্ভাবনা ছিলো না। বাক্সে তালাবন্ধ করে একটা কাগজের প্যাকেটে মুড়ে রাখা হয়েছিলো। কপাল খারাপ থাকলে যা হয় — বোতাম লাগাবার জন্যে জামা বের করা হয়েছে ওমনি বান্ধবী এসে হাজির। আমার মেয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার জামা লুকাতে পারলো না। সে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলো — জামা পুরানো হয়ে গেছে। জামা পুরানো হয়ে গেছে।

সবকিছুই পুরানো করা চলে। ঈদের জামা জুতো তো পুরানো করা চলে না। জুতোর প্যাকেটটি বুকের কাছে নিয়ে রাতে ঘুমুতে হয়। জামাটা খুব কম করে হলেও পাঁচবার ইস্ত্রি করতে হয়। এবং দিনের মধ্যে অন্তত তিনবার বাক্স খুলে দেখতে হয় সব ঠিক আছে কি না। কিন্তু অন্য কেউ দেখে ফেললেই সর্বনাশ। ঈদের আনন্দের পনেরো আনাই মাটি।

বান্ধবী জামা দেখে ফেলেছে এই দুঃখে আমার মেয়ে যখন কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেললো, তখন বললাম, চল যাই আরেকটা কিনে দেব। রাত দশটায় তাকে নিয়ে জামা কিনতে বেরুলাম। চারদিকে কি আনন্দ! কি উল্লাস! শিশুদের হাতে বেলুন। মায়েদের মুখভর্তি হাসি। হাতে কেনাকাটার ফর্দ। বাবারা সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটছেন।

আগে যেসব ছোট ছোট শিশু শুকনো মুখে পলিথিনের ব্যাগ বিক্রি করতো, তারা আজ খুব হাসছে, খুব বিক্রি হচ্ছে ব্যাগ। এক ভদ্রলোককে দেখলাম তিনটি ব্যাগ কিনলেন। তিন টাকা দাম। তিনি একটা কচকচে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, যা দুটাকা তোর বকশিশ। ছোট বাচ্চাটি পাঁচ টাকার নোটটি নিশানের মত এক হাতে উঁচু করে ধরে ছুট চলে গেলো।

আমার মনে হলো আজ রাতে কোথাও কোন দুঃখ নেই। আজ কোন স্বামী-স্ত্রীর ভেতর ঝগড়া হবে না। প্রেমিকারা আজ সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখবে ভুলে-যাওয়া প্রেমিকদের। একজন ভিখিরিও হয়ত তার বহুদিনের শখ মেটানোর জন্যে দেড় টাকা খরচ করে একটা ৫৫৫ সিগারেট কিনে ফেলবে। উড়ির চরে আজ রাতে কোন বৃষ্টি হবে না। শিশুদের আনন্দ আমাদের সব দুঃখ ঢেকে ফেলবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাস্তব অবশ্যই অন্যরকম। অনেক বাড়িতে অন্য সব রাতের মত আজ রাতেও হাঁড়ি চড়বে না। উপোসী ছেলেমেয়েরা মুখ কালো করে ঘুরঘুর করবে। যাদের বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে, তাদের দুঃখও কি কম? হয়তো কারোর একটি ছোট্ট ছেলে ছিল, আজ সে নেই। সে তার বাবা মার কাছে নতুন শার্ট-প্যান্টের বায়না ধরেনি। ঘুমুতে যাবার সময় মাকে জড়িয়ে ধরে বলেনি, আম্মা, খুব ভোরে ডেকে দিও। আজ রাত ঐ পরিবারটির বড় দুঃখের রাত! বাবা-মা আজ রাতে তাদের আদরের খোকনের ছবি বের করবেন। শূন্য ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখবেন। এখনো খোকনের ছোট্ট জুতো জোড়া সাজানো, তার ছোট্ট শার্ট, ছোট্ট প্যান্ট আলনায় ঝুলছে। শুধু সে নেই। আগামীকাল ভোরে হৈ-হৈ করে সে ঘর থেকে বেরুবে না।

ঈদের নামাজ পড়লাম নিউ মার্কেটের মসজিদে। ফিরবার পথে দেখি আজিমপুর কবরস্থানের গেট খুলে দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ সেখানে। একজন বাবা তার তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কবরস্থানে এসেছেন। ছেলেমেয়েদের গায়ে ঝলমলে পোশাক। ওরা একটি কবরের পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কবরটির উপরে একটি ময়লা কাগজ পড়ে ছিলো। বড় মেয়েটি সে কাগজটি তুলে ফেলে গভীর মমতায় কবরের গায়ে হাত রাখলো। বাবাকে দেখলাম রুমাল বের করে চোখ মুছছেন। এটি কার কবর? বাচ্চাগুলির মার? আজকের এই আনন্দের দিনে এই মা ফিনি রান্না করেননি। গভীর মমতায় শিশুদের নতুন জামা পরিয়ে দেননি। নতুন শাড়ি পরে তিনি আজ আর লজ্জিত ভঙ্গিতে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায় বলেননি — কি, তোমাকেও সালাম করতে হবে নাকি?

আসলে আমাদের সবচে' দুঃখের দিনগুলিই হচ্ছে উৎসবের দিন।*



উমেশ

উমেশের সঙ্গে আমার পরিচয় নর্থ ডাকোটার ফার্গো সিটিতে। মাদ্রাজের ছেলে। বানরের মত চেহারা। স্বভাব-চরিত্রও বানরের মত — সারাক্ষণ তিড়িং-বিড়িং করছে।

---

* এই লেখাটা ঈদের লেখা হিসেবে দৈনিক বাংলায় ছাপা হয়। তার কিছুদিন পর আমার ছোট্ট ছেলেটি মারা যায়। আমি অবিকল এই রচনাটির মত আমার তিনটি বাচ্চা এবং স্ত্রীকে নিয়ে ঈদের দিন আমার বাচ্চাটির কবর দেখতে যাই। আমার বাচ্চারা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে . .

.।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গলা খাঁকারি দিয়ে থুথু ফেলছে। হাসেও বিচিত্র ভঙ্গিতে খিক্‌খিক্‌ করে, থেমে থেমে শব্দ হয়, সমস্ত শরীর তখন বিশ্রীভাবে দুলতে থাকে।

সে এসেছে জৈব রসায়নে M.S. ডিগ্রী নিতে। আমি তখন পড়াশোনার পাট শেষ করে ফেলেছি। একটা ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার কিনেছি, দিন-রাত খট্‌খট্‌ শব্দে থিসিস টাইপ করি। একেকটা চ্যাপ্টার লেখা শেষ হয়, আমি আমার প্রফেসরের কাছে নিয়ে যাই। তিনি পড়েন এবং হাসিমুখে বলেন, অতি চমৎকার হয়েছে। তুমি এই চ্যাপ্টারটা আবার লেখ।

আমি হতাশ হয়ে বলি, অতি চমৎকার হলে নতুন করে লেখার দরকার কি? প্রফেসরের মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হয়। তিনি বলেন, অতি চমৎকার তো শেষ কথা নয়। অতি চমৎকারের পরে আছে অতি অতি চমৎকার। আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার লিখতে বসি। এই সময়ে উমেশের আবির্ভাব হল মূর্তিমান উপদ্রবের মত। তার প্রধান কাজ হল 'আবে ইয়ার' বলে আমার ঘরে ঢুকে পড়া। এবং আমাকে বিরক্ত করা।

আমেরিকায় সে পড়াশোনা করার জন্যে আসেনি। তার মূল উদ্দেশ্য সিটিজেনশীপ। অন্য কোনভাবে আমেরিকা আসার ভিসা পাওয়া যাচ্ছিল না বলেই সে স্টুডেন্ট ভিসায় এসেছে। এখন তার দরকার — 'সবুজপত্র' বা গ্রীনকার্ড। ঐ বস্তু কি করে পাওয়া যায় সেই পরামর্শ করতেই সে আমার কাছে আসে।

আমি প্রথম দিনেই তাকে বলে দিলাম, আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। জানার আগ্রহও বোধ করিনি। আমি এসেছি পড়াশোনা করতে। ঐ পর্ব শেষ হয়েছে, এখন দেশে চলে যাব। উমেশ চোখ মুখ কুঁচকে 'আবে বুরবাক . . . ' শব্দ দুটি দিয়ে একগাদা কথা বলল, যার কিছুই আমি বুঝলাম না। হিন্দী আমি বুঝতে পারি না। তাছাড়া উমেশ কথা বলে দ্রুত। তবে তার মূল বক্তব্য ধরতে অসুবিধা হল না। মূল বক্তব্য হচ্ছে — হুমায়ূন, তুমি মহা বুরবাক। এমন সোনার দেশ ছেড়ে কেউ যায়?

কাজের সময় কেউ বিরক্ত করলে আমার অসহ্য বোধ হয়। এই কথা আমি উমেশকে বুঝিয়ে বললাম। সে বিস্মিত হয়ে বলল, আমি তো বিরক্ত করছি না। চুপচাপ বসে আছি। তুমি তোমার কাজ কর।

সে চুপচাপ মোটেও বসে থাকে না। সারাক্ষণ তিড়িং-বিড়িং করে। এই বসে আছে, এই লাফ দিয়ে উঠছে। তাছাড়া তার শিস দিয়ে গান গাওয়ার শখও আছে। সে শিস দিয়ে নানান ধরনের সুর তৈরির চেষ্টা করে। সেই সুরের তালে পা নিজেই মুগ্ধ হয়ে নাচায়।

সব মানুষের জীবনেই কিছু উপগ্রহ জুটে যায়। উমেশ হল আমার উপগ্রহ সে জৈব রসায়নের তিনটা কোর্স নিয়েছে। এর মধ্যে একটা ল্যাব কোর্স। কাজ করে আমার ঘরের ঠিক সামনের ঘরে। কাজ বলতে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করা, ধোয়াধুয়ি করা, তারপর আমার সামনে এসে বসে থাকা। পা নাচানো এবং শিস দেয়া। আমি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তাকে বললাম, কেস যখন নিয়েছ মন দিয়ে কেসগুলি করা দরকার। তুমি তো সারাক্ষণ আমার সামনে বসেই থাক।

সে হাসিমুখে বলল, M.S. ডিগ্রীর আমার কোন শখ নেই। আমার দরকার সিটিজেনশীপ। স্টুডেন্ট ভিসা যাতে বজায় থাকে এই জন্যেই কোর্স নিলাম। পড়াশোনা করে হবেটা কি ছাতা?

আমি বললাম, অনেক কিছুই হবে। একটা আমেরিকান ডিগ্রী পেলে এ দেশে চাকরি পেতে তোমার সুবিধা হবে। চাকরি পেলে গ্রীনকার্ড পাবে।

'আবে ইয়ার — সাচ বাত।'

উমেশকে এই উপদেশ দেয়ার মূল কারণ অন্য। আমি চাচ্ছিলাম তাকে পড়াশোনায় ব্যস্ত করে তুলতে, যাতে সে আমাকে মুক্তি দেয়। সিন্দাবাদের ভূতের মত সে কেন আমার উপর ভর করল কে জানে! এমন না যে, এই নর্থ ডাকোটায় আমিই একমাত্র কাল চামড়া। কাল চামড়া প্রচুর আছে। ভারতীয় ছাত্রই আছে দশ-বার জন। অনেকে পরিবার নিয়ে আছে। নর্থ ডাকোটা ইউনিভার্সিটির ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন বেশ বড় এসোসিয়েশন। তারা প্রতিমাসেই টিকিট কেটে হিন্দী ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করে। দোল উৎসব হয়। এর বাড়ি, ওর বাড়ি পার্টি লেগে থাকে। উমেশ ওদের সঙ্গে থাকতে পারে। তা কেন সে থাকছে না? কেন চেপে আছে আমার কাঁধে?

যে কোন কারণেই হোক তার ধারণা হয়েছে, এই বিদেশে আমিই তার সবচে' নিকটজন। কাজেই আমার সময় নষ্ট করার পূর্ণ অধিকার তার আছে। একদিন না পেরে তাকে কফিশপে নিয়ে কফি খাওয়ালাম এবং শীতল গলায় বললাম, উমেশ, একটা কথা শুনলে তোমার হয়ত খারাপ লাগবে, তবু কথাটা তোমাকে বলা দরকার।

'বল।'

'আমি তোমাকে খুবই অপছন্দ করি।'

উমেশ বলল, কেন, আমার চেহারা খারাপ বলে?

আমি কি বলব বুঝতে পারলাম না। উমেশ বলল, আমার চেহারা খুব খারাপ তা আমি জানি। স্কুলে আমার নাম ছিল 'ছোটে হনুমান'। কিন্তু চেহারা তো বন্ধুত্বের অন্তরায় হতে পারে না। ভুল বলেছি?

'না, ভুল বলনি।'

'আমি তোমাকে খুব বিরক্ত করি তা আমি জানি। কি করব বল, আমার ভাল লাগে না। ল্যাবে কাজ করতে ভাল লাগে না। পড়াশোনা করতে ভাল লাগে না।'

'আমার সামনে বসে শিস দিয়ে গান গাইতে ভাল লাগে?'

'হুঁ।'

'শোন উমেশ। আমি একা একা কাজ করতে পছন্দ করি। তুমি যে আমার সামনে বসে থাক, এতে আমার কাজ করতে অসুবিধা হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'আমাকে থিসিস লেখার কাজটা দ্রুত শেষ করতে হবে।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা।'

'তুমি যদি আর আমাকে বিরক্ত না কর তাহলে ভাল হয়।'

উমেশ কফির মগ হাত দিয়ে সরিয়ে উঠে চলে গেল। একবার ফিরেও তাকালো না। আমার খানিকটা খারাপ লাগলেও মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আসলেই মুক্তি পেয়েছি কি-না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না।

মুক্তি পেলাম। উমেশ আর আমার ঘরে আসে না। তার সঙ্গে দেখা হলে সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। আমার সামনের ল্যাবে সে রোজই আসে। একা একা কাজ করে। করিডোরে দাঁড়িয়ে উদাস মুখে সিগারেট খায়। আমার সাড়া পেলে চট করে ল্যাবে ঢুকে যায়। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এতটা কঠিন না হলেও পারতাম।

মাসখানিক পরের কথা। নিজের ঘরে বসে কাজ করছি। হঠাৎ ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠল। আমি বিচলিত হলাম না। এখানে কিছুদিন পরপর ফায়ার ড্রিল হয়। অ্যালার্ম বেজে উঠে। তখন ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে মাঠে দাঁড়াতে হয়। ফায়ার মার্শাল আসেন — পরীক্ষা করে দেখেন জরুরি অবস্থায় সব ঠিকঠাক থাকবে কি-না। আজও নিশ্চয়ই তেমন কিছু হচ্ছে। আমি বিরক্ত মুখে ঘর থেকে বের হলাম। অকারণে খোলামাঠে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। প্রচণ্ড শীতে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা কোন সুখকর অভিজ্ঞতা নয়।

করিডোরে এসে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল; কারণ আজকেরটা ফায়ার ড্রিল নয়। পালে বাঘ পড়েছে। এবার সত্যি সত্যি আগুন লেগেছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলি বের হচ্ছে উমেশের ল্যাব থেকে। সাদা ও কালো ধোঁয়ার জটিল মিশ্রণে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উমেশ।

আমি আতংকে জমে গেলাম। ল্যাবে আগুন মানেই ভয়াবহ ব্যাপার। প্রচুর দাহ্যবস্তুতে ল্যাব থাকে ভর্তি। বোতলে ভর্ব থাকে ফসফরাস। জার ভর্তি তীব্র গাঢ়ত্বের এসিড। আছে নানান ধরনের অক্সিডাইজার। এরা মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে দেবে। ল্যাব অগ্নিকাণ্ড সব সময়ই ভয়াবহ হয়। প্রায়ই দেখা যায় এইসব ক্ষেত্রে শুধু ল্যাব নয়, পুরো বিল্ডিং উড়ে যায়।

আমি লক্ষ করলাম, আমেরিকান ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকরা ছুটে বের হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে তীব্র আতংক। বিল্ডিং-এর বৈদ্যুতিক দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার নিজেরও ইচ্ছ হল ছুটে বের হয়ে যাই। কিন্তু ল্যাবে উমেশ একা। সে গরুর মত বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি চিৎকার করে বললাম, দেখছ কি, বের হয়ে আস।

উমেশ বিড়বিড় করে বলল, নড়তে পারছি না।

উমেশের কি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম। তীব্র আতংকে রিগরাস মর্টিসের মত হয়। শরীরের সমস্ত মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়। মানুষের নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না।

আমি চিরকালের ভীতু মানুষ। কিন্তু সেদিন অসীম সাহসের কিংবা অসীম বোকামির পরিচয় দিয়ে ল্যাবে ঢুকে পড়লাম। প্রথম চেষ্টা করলাম উমেশকে টেনে বের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

করতে। পারলাম না -- তবে শরীর পাথরের মত ভারি। উমেশ বলল, তুমি থেকো না। তুমি বের হও। এক্ষুনি এক্সপ্লোশন হবে।

প্রাণী হিসেবে মানুষের অবস্থান আসলেই অনেক উপরে। আমি এই অসহায় ছেলেটিকে একা ফেলে রেখে বের হতে পারলাম না। আমার বুকের ভেতর থেকে কেউ-একজন বলল, না, তা তুমি পার না। অথচ বাসায় আমার স্ত্রী আছে। ছোট ছোট দু'টি মেয়ে - লোভা, শীলা। ছোট মেয়েটি সবে কথা শিখেছে। তাদের কথা মনে পড়ল না। প্রচণ্ড বিপদে আল্লাহকে ডাকতে হয়। সুরা পড়তে হয়। আমার কোন সুরা মনে পড়ছে না।

বিল্ডিং-এর ইলেকট্রিক লাইন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পুরো বিল্ডিং অন্ধকার। আগুনের হলকায় অস্পষ্টভাবে সবকিছু চোখে আসছে। আমি চলে গিয়েছি এক ধরনের ঘোরের মধ্যে। হুস করে বড় একটা আগুন ধরল। তার আলোয় চোখে পড়ল, দেয়ালে বিরাট একটা কেমিক্যাল ফায়ার এক্সটিংগুইসার। সাধারণত ল্যাবের আগুনে এদের ব্যবহার করতে হয়। কিভাবে এদের ব্যবহার করতে হয় তাও জানি না। গায়ে বড় বড় অক্ষরে নির্দেশনামা আছে। চেষ্টা করা যাক। আমি ছুটে গেলাম ফায়ার এক্সটিংগুইসারের দিকে। নির্দেশ নাম্বার ওয়ান — বড় লিভারটি টেনে নিচে নামাও। কোনটি বড় লিভার? দু'টিই তো এক রকম লাগছে। নির্দেশ নাম্বার দুই — ছোট লিভারটির কাউন্টার ক্লক ঘুরাও। কাউন্টার ক্লক মানে কি? ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিক? ঘড়ির কাঁটা কোনদিকে ঘুরে?

আশ্চর্যের ব্যাপার, ফায়ার এক্সটিংগুইসার চালু করতে পারলাম। এই অদ্ভুত যন্ত্রটি মুহূর্তের মধ্যে পুরো ল্যাব সূক্ষ্ম সাদা ফেনায় ঢেকে দিল। আমরা ডুবে গেলাম ফেনার ভেতর। আগুন নিভে গেল। তারো মিনিট দশেক পর ফায়ার সার্ভিসের মুখোশ পরা লোকজন আমাদের দুজনকে উদ্ধার করল। উমেশকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। তার কথাও বন্ধ হয়ে গেছে। কথা বলতে পারছে না। জিহ্বাও শক্ত হয়ে গেছে।

উমেশকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম, সে আমাকে দেখে আনন্দিত হবে। তা হল না। মুখ কালো করে বলল, তুমি কেন এসেছ? তুমি তো আমাকে দেখতে পার না। আমি শুধু তোমাকে বিরক্ত করি। তুমি চলে যাও।

আমি হাসলাম।

উমেশ হাসল না। চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল। সে আসলেই আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

সে যে আমার ব্যবহারে কি রকম আহত হয়েছিল তা বুঝলাম যখন দেখলাম — তাকে আগুন থেকে উদ্ধারের মত ঘটনাতেও সে অভিভূত হয়নি। আমাকে দেখলে আগের মতই চোখ ফিরিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে যায়। সে নর্থ ডাকোটা থেকে চলে গেল মুরহেড স্টেটে। যাবার আগের দিন আমাকে একটা খামবন্ধ চিঠি দেয়া হল। চিঠিটি তার লেখা না। তার বাবার লেখা। ভদ্রলোক লিখেছেন —

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জনাব,

আপনি আমার মা-হারা পুত্রের জীবন রক্ষা করেছেন। এর প্রতিদান আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বর আপনাকে তার প্রতিদান দেবেন। ঈশ্বর কোন সৎকর্ম অবহেলা করেন না। উমেশ লিখেছে, আপনি তার জন্যে আপনার জীবন বিপন্ন করেছেন। আপনার থিসিসের কাগজপত্র আগুনে নষ্ট হয়েছে। আপনাকে আবার নতুন করে লিখতে হয়েছে। আমি নিজে একজন পাপী মানুষ। পাপী মানুষের প্রার্থনায় ফল হয় না, তবু আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে আপনার জন্যে প্রার্থনা করি। যতদিন বাঁচব, করব। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আমেরিকার পর্ব শেষ করে দেশে ফিরছি। হেক্টর এয়ারপোর্টে অনেকেই আমাকে বিদায় দিতে এসেছে। হঠাৎ দেখি দূরে উমেশ দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই সে চোখ নামিয়ে নিল। দ্রুত চলে গেল ভেন্ডিং মেশিনের আড়ালে। আমি এগিয়ে গেলাম।

উমেশ বলল, আমি তো তোমাকে বিদায় দিতে আসিনি। আমি যাব লস এঞ্জেলস। তার টিকিট কাটতে এসেছি।

'ঠিক আছে। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হল। খুব ভাল লাগছে। একদিন তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। তার জন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। প্লেনে ওঠার আগে তোমার হাসিমুখ দেখে যেতে চাই।'

উমেশ বলল, আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছি। আমি আসলে তোমাকে বিদায় দিতেই এসেছি।

উমেশ আমাকে জড়িয়ে ধরল। সে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে।

প্লেনে ওঠার আগে সিকিউরিটি চেকিং-এ যাচ্ছি। বন্ধু-বান্ধবরা হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। রুমাল উড়াচ্ছে। শুধু উমেশ দু'হাতে তার মুখ ঢেকে আছে। সে তার কান্নায় বিকৃত মুখ কাউকে দেখাতে চাচ্ছে না।

সে

এরশাদ সাহেবের সময়কার কথা। সরকারি পর্যায়ে শিলাইদহে রবীন্দ্রজয়ন্তী হবে। আমার কাছে জানতে চাওয়া হল আমি সেই উৎসবে যোগ দেব কি-না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যে কোন নিমন্ত্রণে আমি আছি। এরশাদ সাহেবের উদ্যোগে অনুষ্ঠান হচ্ছে, হোক না, আমি কোন সমস্যা দেখছি না। রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসার অধিকার সবারই আছে।

যথাসময়ে শিলাইদহে উপস্থিত হলাম। কুঠিবাড়িতে পা দিয়ে গায়ে রোমাঞ্চ হল। মনে হল পবিত্র তীর্থস্থানে এসেছি। এক ধরনের অস্বস্তিও হতে লাগল, মনে হল — এই যে নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। চারদিকে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলা ছড়িয়ে আছে। কবির কত স্মৃতি, কত আনন্দ-বেদনা মিশে আছে প্রতি ধূলিকণায়। সেই ধূলার উপর দিয়ে আমি হেঁটে যাব, তা কি হয়? এত স্পর্ধা কি আমার মত অভাজনের থাকা উচিত?

নিজের মনে ঘুরে বেড়াতে এত ভাল লাগছে! কুঠিবাড়ির একটা ঘরে দেখলাম কবির লেখার চেয়ার টেবিল। এই চেয়ারে বসেই কবি কত-না বিখ্যাত গল্প লিখেছেন। কুঠিবাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখে পড়ল কবির প্রিয় নদী প্রমত্তা পদ্মা। ১২৯৮ সনের এক ফাল্গুনে এই পদ্মার দুলুনি খেতে খেতে বজরায় আধশোয়া হয়ে বসে কবি লিখলেন,

শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

একদিকে উৎসব হচ্ছে, গান, কবিতা আলোচনা, অন্যদিকে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি নিজের মনে। সন্ধ্যাবেলা কুঠিবাড়িতে গানের অনুষ্ঠানে আমি নিমন্ত্রিত অতিথি, উপস্থিত না থাকলে ভাল দেখায় না বলে প্যান্ডেলের নিচে গিয়ে বসেছি। শুরু হল বৃষ্টি, ভয়াবহ বৃষ্টি। সেই সঙ্গে দমকা বাতাস। বাতাসে সরকারি প্যান্ডেলের অর্ধেক উড়ে গেল। আমি রওনা হলাম পদ্মার দিকে। এমন ঝমঝমে বৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয়ই ভিজতেন। আমি যদি না ভিজি তাহলে কবির প্রতি অসম্মান করা হবে।

বৃষ্টিতে ভেজা আমার জন্য নতুন কিছু না। কিন্তু সেদিনকার বৃষ্টির পানি ছিল বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। আর হাওয়া? মনে হচ্ছে সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসছে। আমি ঠকঠক করে কাঁপছি। নব ধারা জলে স্নানের আনন্দ ধুয়ে-মুছে গেছে। রেস্ট হাউসে ফিরে শুকনো কাপড় পরতে পারলে বাঁচি।

কাঁপতে কাঁপতে ফিরছি। পদ্মা থেকে কুঠিবাড়ি অনেকটা দূর। কাঁচা রাস্তা। বৃষ্টির পানিতে সেই রাস্তা কাদা হয়ে গেছে। দ্রুত হাঁটা যাচ্ছে না। জায়গাটাও অন্ধকার। আধাআধি পথ এসে থমকে দাঁড়ালাম। কে যেন রাস্তার পাশে গাছের নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক আলো করে বিদ্যুৎ চমকালো। আর তখনি আমার সারা শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, গাছের নিচে যুবক বয়সের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন। এটা কি কোন মায়া? কোন ভ্রান্তি? বিচিত্র কোন হেলুসিনেশন? আমার চিন্তা-চেতনা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বলেই তাঁকে দেখছি?

আমি চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই ছায়ামূর্তি বলল, কে, হুমায়ূন ভাই না?

নিজেকে চট করে সামলে নিলাম। রবীন্দ্রনাথের প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই আমাকে হুমায়ূন ভাই বলবে না। আমি ভৌতিক কিছু দেখছি না। এমন একজনকে দেখছি যে আমাকে চেনে, এবং যাকে অন্ধকারে খানিকটা রবীন্দ্রনাথের মত দেখায়। ছায়ামূর্তি বলল, হুমায়ূন ভাই, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কোথায় যাচ্ছেন?

আমি বললাম, কুঠিবাড়ির দিকে যাচ্ছি। আমি কি আপনাকে চিনি?

'জ্বি না, আপনি আমাকে চেনেন না। হুমায়ূন ভাই, আমি আপনার অনেক ছোট। আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।'

'তোমার নাম কি?'

'রবি।'

'ও আচ্ছা, রবি।'

আমি আবার বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। নাম রবি মানে? হচ্ছেটা কি?

রবি বলল, চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাই।

'চল।'

ভিজতে ভিজতে আমরা কুঠিবাড়িতে উপস্থিত হলাম। ঝড়ের প্রথম ঝাপটায় ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল, এখন আবার এসেছে। চারদিকে আলো ঝলমল করছে। আলোতে আমি আমার সঙ্গীকে দেখলাম, এবং আবারো চমকালাম। অবিকল যুবক বয়সের রবীন্দ্রনাথ। আমি বললাম, তোমাকে দেখে যে আমি বারবার চমকাচ্ছি তা কি তুমি বুঝতে পারছ?

'পারছি। আপনার মত অনেকেই চমকায়। তবে আপনি অনেক বেশি চমকাচ্ছেন।'

'তোমার নাম নিশ্চয়ই রবি না?'

'জ্বি না। যারা যারা আমাকে দেখে চমকায় তাদের আমি এই নাম বলি।'

'এসো, আমরা কোথাও বসে গল্প করি।'

'আপনি ভেজা কাপড় বদলাবেন না? আপনার তো ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'লাগুক ঠাণ্ডা।'

আমরা একটা বাঁধানো আমগাছের নিচে গিয়ে বসলাম। রবি উঠে গিয়ে কোত্থেকে এক চা-ওয়ালাকে ধরে নিয়ে এল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। আমি আধভেজা সিগারেট ধরিয়ে টানছি। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি। সেই চা-ও বৃষ্টির

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পানির মতই ঠাণ্ডা খুবই লৌকিক পরিবেশ। তারপরেও আমি লক্ষ্য করলাম, আমার বিস্ময়বোধ দূর হচ্ছে না।

রবি হাসিমুখে বলল, হুমায়ূন ভাই! আমি ভেবেছিলাম আপনি খুব সিরিয়াস ধরনের মানুষ। আপনি যে বাচ্চাদের মত বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দ করেন তা ভাবিনি। আপনাকে দেখে আমার খুব মজা লেগেছে।

আমি বললাম, তোমাকে দেখে শুরুতে আমার লেগেছিল ভয়। এখন লাগছে বিস্ময়।

'আপনি এত বিস্মিত হচ্ছেন কেন? মানুষের চেহারার সঙ্গে মানুষের মিল থাকে না?'

'থাকে, এতটা থাকে না।'

রবির সঙ্গে আমার আরো কিছুক্ষণ গল্প করার ইচ্ছা ছিল। সম্ভব হল না। সরকারি বাস কুষ্টিয়ার দিকে রওনা হচ্ছে। বাস মিস করলে সমস্যা। রবি আমার সঙ্গে এল না। সে আরো কিছুক্ষণ থাকবে। পরে রিকশা করে যাবে। তবে সে যে ক'দিন অনুষ্ঠান চলবে, রোজই আসবে। কাজেই তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ রয়ে গেল।

রাতে রেস্ট হাউসে ফিরে আমার কেন জানি মনে হল পুরো ব্যাপারটাই মায়া। ছেলেটির সঙ্গে আর কখনোই আমার দেখা হবে না। রাতে ভাল ঘুমও হল না।

আশ্চর্যের ব্যাপার! পরদিন সত্যি সত্যি ছেলেটির দেখা পেলাম না। অনেক খুঁজলাম। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, দেখতে অবিকল রবীন্দ্রনাথের মত এমন একজনকে দেখেছেন?

তারা সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি কিছুক্ষণ আগেই গাঁজা খেয়ে এসেছি। ঐ জিনিস তখন কুঠিবাড়ির আশেপাশে খাওয়া হচ্ছে। লালন শাহ্-র কিছু অনুসারী এসেছেন। তাঁরা গাঁজার উপরই আছেন। উৎকট গন্ধে তাঁদের কাছে যাওয়া যায় না। তাঁদের একজন আমাকে হাত ইশারা করে কাছে ডেকে বলছেন, আচ্ছা স্যার, রবিঠাকুর যে লালন শাহ্-র গানের খাতা চুরি করে নবেল পেল এই বিষয়ে ভদ্রসমাজে কিছু আলোচনা করবেন। এটা অধীনের নিবেদন।

তৃতীয় দিনেও যখন ছেলেটার দেখা পেলাম না, তখন নিশ্চিত হলাম, ঝড়-বৃষ্টির রাতে যা দেখেছি তার সবটাই ভ্রান্তি। মধুর ভ্রান্তি। নানান ধরনের যুক্তিও আমার মনে আসতে লাগল। যেমন, আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি কর?' সে জবাব দেয়নি। আমার সঙ্গে সরকারি বাসে আসতেও রাজি হয়নি। নিজের আসল নামটিও বলেনি।

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে দেখি সে প্যান্ডেলের এক কোণায় চুপচাপ বসে আছে। আমি এগিয়ে গেলাম।

'এই রবি, এই!'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রবি হাসিমুখে তাকাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল। আমি বললাম, এই ক'দিন আসনি কেন?

'শরীরটা খারাপ করেছিল। ঐ দিন বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেল।'

'আজ শরীর কেমন?'

'আজ ভাল।'

'এই ক'দিন আমি তোমাকে খুব খুঁজেছি।'

'আমি অনুমান করেছি। আচ্ছা হুমায়ূন ভাই, দিনের আলোতেও কি আমাকে রবীন্দ্রনাথের মত লাগে?'

'হ্যাঁ লাগে, বরং অনেক বেশি লাগে।'

সে ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, দেখুন মানুষের ভাগ্য! আমি শুধু দেখতে রবীন্দ্রনাথের মত এই কারণে আপনি কত আগ্রহ করে আমার সঙ্গে কথা বলছেন।

'তার জন্য কি তোমার খারাপ লাগছে?'

'না, খারাপ লাগছে না। ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে। নিজেকে মিথ্যামিথ্যি রবীন্দ্রনাথ ভাবতেও আমার ভাল লাগে।'

'তুমি টিভিতে কখনো নাটক করেছ?'

'কেন বলুন তো?'

'তোমাকে আমি টিভি নাটকে ব্যবহার করতে চাই।'

'আমি কোনদিন নাটক করিনি কিন্তু আপনি বললে আমি খুব আগ্রহ নিয়ে করব। কি নাটক?'

'এই ধর, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাটক। যৌবনের রবীন্দ্রনাথ। কুঠিবাড়িতে থাকেন। পদ্মার তীরে হাঁটেন গান লিখেন, গান করেন। এইসব নিয়ে ডকুমেন্টারি ধরনের নাটক।'

'সত্যি লিখবেন?'

'হ্যাঁ লিখব একটা কাগজে তোমার ঠিকানা লিখে দাও।'

'ঠিকানা আপনি হারিয়ে ফেলবেন। আমি বরং আপনাকে খুঁজে বের করব।'

ছুটির সময়ে মন সাধারণত তরল ও দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ছুটির সময়ে দেয়া প্রতিশ্রুতি পরে আর মনে থাকে না! আমার বেলায় সেরকম হল না। আমি ঢাকায় ফিরেই টিভির নওয়াজিশ আলি খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার পরিকল্পনার কথা বললাম। তিনি এক কথায় বাতিল করে দিলেন। তিনি বললেন, রবিঠাকুরকে সরাসরি দেখাতে গেলে অনেক সমস্যা হবে। সমালোচনা হবে। রবীন্দ্র-ভক্তরা রেগে যাবেন। বাদ দিন। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

মাস তিনেক পর ছেলেটার সঙ্গে আবার দেখা হল টিভি ভবনে। সে আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল — নাটকটা লিখেছি কি-না। আমি সত্যি কথাটা তাকে বলতে পারলাম না। তাকে বললাম, লিখব লিখব। তুমি তৈরি থাক।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আমি তৈরি আছি। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।'

'চেহারাটা ঠিক রাখ, চেহারা যেন নষ্ট না হয়।'

আমি টিভির আরো কিছু লোকজনের সঙ্গে কথা বললাম। কোন লাভ হল না। ছেলেটির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। আমি বলি হবে হবে, দেখা কর। এই মিথ্যা আশ্বাস যতবার দেই ততবারই খারাপ লাগে। মনে মনে বলি, কেন বারবার এর সঙ্গে দেখা হয়? আমি চাই না দেখা হোক। তারপরেও দেখা হয়।

একদিন সে বলল, হুমায়ূন ভাই, আপনি কি একটু তাড়াতাড়ি নাটকটা লিখতে পারবেন?

'কেন বল তো?'

'এমনি বললাম।'

'হবে হবে, তাড়াতাড়িই হবে।'

তারপর অনেক দিন ছেলেটির সঙ্গে দেখা নেই। নাটকের ব্যাপারটাও প্রায় ভুলে গেছি। ব্যস্ত হয়ে পড়েছি অন্য কাজে। তখন ১৪০০ সাল নিয়ে খুব হৈচৈ শুরু হল। আমার মনে হল, এ-ই হচ্ছে সুযোগ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাটকটা লিখে ফেলা যাক। নাটকের নাম হবে ১৪০০ সাল; প্রথম দৃশ্যে কবি একা একা পদ্মার পাড়ে হাঁটছেন, আবহ সংগীত হিসেবে কবির বিখ্যাত কবিতাটি (আজি হতে শতবর্ষ পরে . . .) পাঠ করা হবে; কবির মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে একঝাঁক পাখি। কবি আগ্রহ নিয়ে তাকাবেন পাখির দিকে, তারপর তাকাবেন আকাশের দিকে।

দ্রুত লিখে ফেললাম। আমার ধারণা, খুব ভাল দাঁড়াল। নাটকটা পড়ে শুনালে টিভি-র যে কোন প্রযোজকই আগ্রহী হবেন বলে মনে হল। একদিন ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করছি টিভি-র বরকতউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে। পাশে আছেন জিয়া আনসারী সাহেব। তিনি কথার মাঝখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, রবিঠাকুরের ভূমিকায় আপনি যে ছেলেটিকে নেবার কথা ভাবছেন তাকে আমি চিনতে পারছি। গুড চয়েস।

আমি বললাম, ছেলেটার চেহারা অবিকল রবিঠাকুরের মত না?

'হ্যাঁ। তবে ছেলেটিকে আপনি অভিনয়ের জন্যে পাবেন না।'

'কেন?'

'ওর লিউকোমিয়া ছিল। অনেক দিন থেকে ভুগছিল। বছরখানিক আগে মারা গেছে।'

আমি অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। গভীর আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে ছেলেটা অপেক্ষা করছিল। তার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। সে কাউকে তা জানতে দেয়নি।

বাসায় ফিরে নাটকের পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেললাম। এই নাটকটি আমি রবিঠাকুরের জন্যে লিখিনি। ছেলেটির জন্যে লিখেছিলাম। সে নেই, নাটকও নেই।*

---

* ছেলেটির নাম নিয়ে আমি সমস্যায় পড়েছি। নাম মনে করতে পারছি না। ভোরের কাগজের সাংবাদিক জনাব সাজ্জাদ শরিফের ধারণা তার নাম হাফিজুর রশিদ। ডাক নাম রঞ্জু।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



নারিকেল-মামা

তাঁর আসল নাম আমার মনে নেই।

আমরা ডাকতাম 'নারকেল-মামা'। কারণ নারকেল গাছে উঠে নারকেল পেড়ে আনার ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। পায়ে দড়ি-টড়ি কিচ্ছু বাঁধতে হত না। নিমিষের মধ্যে তিনি উঠে যেতেন। নারকেল ছিঁড়তেন শুধু হাতে। তাঁর গাছে ওঠা, গাছ থেকে নামা, পুরো ব্যাপারটা ছিল দেখার মত। তাঁর নৈপুণ্য যে কোন্ পর্যায়ের তা দেখাবার জন্যেই একদিন আমাকে বললেন, এই পিঠে ওঠ্। শক্ত কইরা গলা চাইপা ধর্। আমি তাই করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে তরতর করে নারকেল গাছের মগডালে উঠে দুই হাত ছেড়ে নানা কায়দা দেখাতে লাগলেন। ভয়ে আমার রক্ত জমে গেল। খবর পেয়ে আমার নানাজান ছুটে এলেন। হুংকার দিয়ে বললেন, হারামজাদা, নেমে আয়।

এই হচ্ছেন আমাদের নারিকেল-মামা। আত্মীয়তা-সম্পর্ক নেই। নানার বাড়ির সব ছেলেরাই যেমন মামা, ইনিও মামা। আমার নানার বাড়িতে কাম্লা খাটেন। নির্বোধ প্রকৃতির মানুষ। খুব গরম পড়লে মাথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে যায়। কিংবা কে জানে মাথা হয়ত তাঁর সব সময়ই এলোমেলো । শুধু গরমের সময় অন্যরা তা বুঝতে পারে।

নারিকেল-মামার মাথা এলোমেলো হবার প্রধান লক্ষণ হল — হঠাৎ তাঁকে দেখা যাবে গোয়ালঘর থেকে দড়ি বের করে হনহন করে যাচ্ছেন। পথে কারো সঙ্গে দেখা হল, সে জিজ্ঞেস করল, কই যাস্?

নারিকেল-মামা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলবেন, ফাঁস নিব। উঁচা লম্বা একটা গাছ দেইখ্যা ঝুইল্যা পড়ব।

প্রশ্নকর্তা তাতে বিশেষ বিচলিত হয় না। বিচলিত হবার তেমন কারণ নেই। এই দৃশ্য তার কাছে নতুন নয়। আগেও দেখেছে। একবার না, অনেকবার দেখেছে। প্রশ্নকর্তা শুধু বলে, আচ্ছা যা। একবার জিজ্ঞেসও করে না, ফাঁস নেবার ইচ্ছেটা কেন হল।

তাঁর আত্মহননের ইচ্ছা তুচ্ছ সব কারণে হয়। তাঁকে খেতে দেয়া হয়েছে। ভাত-তরকারি সবই দেয়া হয়েছে। কিন্তু লবণ দিতে ভুলে গেছে। তিনি লবণ চেয়েছেন। যে ভাত দিচ্ছে সে হয়ত শুনেনি। তিনি শান্তমুখে খাওয়া শেষ করলেন। পানি খেলেন। পান মুখে দিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকে গেলেন দড়ির খোঁজে। এই হল ব্যাপার।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সবই আমার শোনা কথা। আমরা বছরে একবার ছুটির সময় নানার বাড়ি বেড়াতে যেতাম। থাকতাম দশ পনেরো দিন। এই সময়ের মধ্যে নারিকেল-মামার দড়ি নিয়ে ছোটাছুটির দৃশ্য দেখিনি। তাকে আমার মনে হয়েছে অতি ভাল একজন মানুষ। আমাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টায় তাঁর কোন সীমা ছিল না। একটা গল্পই তিনি সম্ভবত জানতেন। সেই গল্পই আমাদের শোনাবার জন্যে তাঁর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। কাঁইক্যা মাছের গল্প।

এক দীঘিতে একই কাঁইক্যা মাছ বাস করত। সেই দীঘির পাড়ে ছিল একটা চাইলতা গাছ। একদিন কাঁইক্যা মাছ চাইলতা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। হঠাৎ একটা চাইলতা তার গায়ে পড়ল। সে দারুণ বিরক্ত হয়ে বলল,

চাইল্তারে চাইলতা তুই যে আমায় মাইলি?

উত্তরে চাইলতা বলল,

কাঁইক্যারে কাঁইক্যা, তুই যে আমার কাছে আইলি?

এই হল গল্প। কেনই-বা এটা একটা গল্প, এর মানে কি আমি কিছুই জানি না। কিন্তু এই গল্প বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে নারিকেল-মামার চোখে পানি এসে যেত। আমি তাঁর কাছে এই গল্প বারবার শুনতে চাইতাম তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখার জন্যে।

সেবার রোজার ছুটিতে নানার বাড়ি গিয়েছি। তখন রোজা হত গরমের সময়। প্রচণ্ড গরম। পুকুরে দাপাদাপি করে অনেকক্ষণ কাটাই। আমরা কেউই সাঁতার জানি না। নারিকেল-মামাকে পুকুর পাড়ে বসিয়ে রাখা হয় যাতে তিনি আমাদের দিকে লক্ষ রাখেন। তিনি চোখ-কান খোলা রেখে মূর্তির মত বসে থাকেন। একদিন এইভাবে বসে আছেন। আমরা মহানন্দে পানিতে ঝাঁপাচ্ছি, হঠাৎ শুনি বড়দের কোলাহল — ফাঁস নিছে। ফাঁস নিছে।

পানি ছেড়ে উঠে এলাম। নারিকেল-মামা নাকি ফাঁস নিয়েছে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। নানার বাড়ির পেছনের জঙ্গলে জামগাছের ডালে দড়ি হাতে নারিকেল-মামা বসে আছেন। দড়ির একপ্রান্ত জামগাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা। অন্য প্রান্ত তিনি তাঁর গলায় বেঁধেছেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ার মত ডালের দু'দিকে পা দিয়ে বেশ আয়েশ করে বসে আছেন।

আমরা ছোটরা খুব মজা পাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা লোক দড়িতে ঝুলে মরবে, সেই দৃশ্য দেখতে পাব -- এটা সে সময় আমাদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। বড়রা অবশ্যি ব্যাপারটাকে মোটেও পাত্তা দিল না। আমার নানাজান বললেন, আজ গরমটা অতিরিক্ত পড়েছে। মাথায় রক্ত উঠে গেছে। তিনি নারিকেল-মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, নাম্ হারামজাদা! নারিকেল-মামা বিনীত গলায় বললেন, 'জ্বে না মামুজী। ফাঁস নিমু।'

'তোরে মাইরা আজ হাড্ডি গুঁড়া করব। খেলা পাইছস? দুইদিন পরে পরে ফাঁস নেওয়া। ফাঁস অত সস্তা। রোজা রাখছস?'

'রাখছি।'

'রোজা রাইখ্যা যে ফাঁস নেওন যায় না এইটা জানস?'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'জ্বে না।'

'নাইম্যা আয়। ফাঁস নিতে চাস ইফতারের পরে নিবি। অসুবিধা কি? দড়িও তোর কাছে আছে। জাম গাছও আছে। নাম কইলাম। রোজা রাইখ্যা ফাঁস নিতে যায়! কত বড় সাহস! নাম।'

নারিকেল-মামা সুড়সুড় করে নেমে এলেন। মোটেও দেরি করলেন না। আমাদের মন কি যে খারাপ হল। মজার একটা দৃশ্য নানাজানের কারণে দেখা হল না। নানাজানের ওপর রাগে গা জ্বলতে লাগল। মনে ক্ষীণ আশা, ইফতারের পর যদি নারিকেল-মামা আবার ফাঁস নিতে যান।

ইফতারের পরও কিছু হল না। খাওয়া-দাওয়ার পর নারিকেল-মামা হৃষ্টচিত্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোত্থেকে যেন একটা লাটিম জোগাড় করলেন। শহর থেকে আসা বাচ্চাদের খুশি করার জন্যে উঠোনে লাটিম খেলার ব্যবস্থা হল। আমি এক ফাঁকে বলেই ফেললাম, মামা, ফাঁস নিবেন না? তিনি উদাস গলায় বললেন, যাউক, রমজান মাসটা যাউক। এই মাসে ফাঁস নেয়া ঠিক না।

'রমজানের পরে তো আমরা থাকব না। চলে যাব। আমরা দেখতে পারব না।'

নারিকেল-মামা উদাস গলায় বললেন, এইসব দেখা ভাল না গো ভাইগ্না ব্যাটা। জিহ্বা বাইর হইয়া যায়। চউখ বাইর হইয়া যায়। বড়ই ভয়ংকর।

'আপনি দেখেছেন?'

'ভাইগ্না ব্যাটা কি কয়? আমি দেখব না! একটা ফাঁসের মরা নিজের হাতে দড়ি কাইট্যা নামাইছি। নামাইয়া শইল্যে হাত দিয়ে দেখি তখনও শইল গরম। তখনও জান ভেতরে রইছে। পুরাপুরি কবজ হয় নাই।'

'হয়নি কেন?'

'মেয়েছেলে ছিল। ঠিকমত ফাঁস নিতে পারে নাই। শাড়ি পেঁচাইয়া কি ফাঁস হয়? নিয়ম আছে না? সবকিছুর নিয়ম আছে। লম্বা একটা দড়ি নিবা। যত লম্বা হয় তত ভাল। দড়ির এক মাথা বানবা গাছের ডালে, আরেক মাথা নিজের গলায়। ফাঁস গিট্টু বইল্যা একটা গিট্টু আছে। এইটা দিবা। তারপরে আল্লাহর কাছে তওবা কইরা সব গোনার জন্যে মাফ নিবা। তারপর চউখ বন্ধ কইরা দিবা লাফ।'

'দড়ি যদি বেশি লম্বা হয় তাহলে তো লাফ দিলে মাটিতে এসে পড়বেন।'

'মাপমত দড়ি নিবা। তোমার পা যদি মাটি থাইক্যা এক ইঞ্চি উপরেও থাকে তাইলে হবে। দড়ি লম্বা হইলে নানান দিক দিয়া লাভ। দশের উপকার।'

দড়ি লম্বা হলে দশের উপকার কেন তাও নারিকেল-মামা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

'ফাঁসের দড়ি নানা কাজে লাগে বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা? এই দড়ি সোনার দড়ির চেয়েও দামী। এক টুকরা কাইট্যা যদি কোমরে বাইন্ধ্যা ধর তা হইলে বাত-ব্যাধির আরাম হয়। ঘরের দরজার সামনে এক টুকরা বাইন্ধ্যা থুইলে ঘরে চোর-ডাকাত ঢোকে না। এই দড়ি সন্তান প্রসবের সময় খুব কাজে লাগে। ধর, সন্তান প্রসব হইতেছে না — দড়ি আইন্যা পেটে ছুঁয়াইবা, সাথে সাথে সন্তান খালাস।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। ফাঁসির দড়ি মহামূল্যবান। অনেক ছোট্ট ছোট্ট পুলাপান আছে বিছানায় পেসাব কইরা দেয়। ফাঁসের দড়ি এক টুকরা মুনাসির সাথে বান্ধিয়া দিলে আর বিছানায় পেসাব করব না। এই জন্যেই বলতেছি, যত লম্বা হয় ফাঁসের দড়ি ততই ভাল। দশজনের উপকার। ফাঁস নিলে পাপ হয়। আবার ফাঁসের দড়ি দশজনের কাজে লাগে বইল্যা পাপ কাটা যায়। দড়ি যত লম্বা হইব পাপ তত বেশি কাটা যাইব। এইটাই হইল ঘটনা। মৃত্যুর পরে পরেই বেহেশতে দাখিল।'

নারিকেল-মামার মৃত্যু হয় পরিণত বয়সে। ফাঁস নিয়ে না — বিছানায় শুয়ে। শেষ জীবনে পক্ষাঘাত হয়েছিল, নড়তে-চড়তে পারতেন না। চামচ দিয়ে খাইয়ে দিতে হত। মৃত্যুর আগে গভীর বিষাদের সঙ্গে বলেছিলেন — আল্লাহপাক আমার কোন আশা পূরণ করে নাই। ঘর দেয় নাই, সংসার দেয় নাই। কিছুই দেয় নাই। ফাঁস নিয়া মরণের ইচ্ছা ছিল এটাও হইল না। বড়ই আফসোস!



পরীক্ষা

একটা নির্দিষ্ট বয়সের বাবা-মা'রা মনে করতে শুরু করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা বোধহয় তাঁদের আর ভালবাসে না, বোধহয় তারা এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিজেদের সংসার নিয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তবে এই ব্যাপারে তাঁরা পুরোপুরি নিশ্চিতও হতে পারেন না। এক ধরনের সন্দেহ থাকে — হয়ত এখনো ভালবাসে। হয়ত বাবা মা'র প্রতি ভালবাসা নিঃশেষ হয়নি। এই সংশয়-জড়ানো দোদুল্যমান সময়ে বাবা-মা'রা নানান ধরনের ছোটখাট পরীক্ষা করতে থাকেন। ছেলেমেয়েদের ভালবাসা এখনো আছে কি-না তা নিয়ে পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলাফল নিয়েও তাঁরা সংশয়ে ভুগেন। কোন ফলাফলই তাঁদের ১০০ ভাগ নিশ্চিত করতে পারে না।

আমার মা বর্তমানে এ জাতীয় মানসিক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর ছ'টি ছেলেমেয়েকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। তাদের আচার-আচরণ থেকে ধরার চেষ্টা করছেন — ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর প্রতি ভালবাসা কতটুকু অবশিষ্ট আছে।

ভালবাসা মাপার মত কোন যন্ত্র আমাদের হাতে আসেনি। সমস্যাটা এইখানেই। ভালবাসা ধরতে হয় আচার-আচরণে — হাব-ভাবে। একজনের আচার-আচরণের সঙ্গে অন্যের আচার-আচরণের কিছুমাত্র মিল নেই বলে ভালবাসা'র প্রমাণ সংগ্রহ করাও এক সমস্যা। কাজেই আমার মা নানান ধরনের পরীক্ষা শুরু করলেন!

Nirjoy

www.BanglaBook.org

যেমন অনেকদিন পার করে আমার বাসায় এলেন। রাতে না খেয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, শরীর ভাল না। উদ্দেশ্য — দেখা, তার ছেলে এই খবরে কতটা বিচলিত হয়। সে কি সাধাসাধি করে খেতে বসায়, না নির্বিকার থাকে। না-কি অতি ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার ডেকে আনে।

এই জাতীয় পরীক্ষায় আমি কখনো পাস করতে পারি না। আমার অন্য ভাই-বোনরাও পারে না। সবাই ভাব করে, বয়স হয়েছে, এখন শরীর তো খারাপ করবেই। শুধু আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাই মায়ের অতিরিক্ত ভক্ত বলে ব্যস্ত হয়ে উঠে। জোর করে তাঁকে টেবিলে এনে খাওয়ায় — খাওয়াতে না পারলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনতে যায়। তার একজন পরিচিত প্র্যাকটিসহীন ডাক্তার আছেন। যাঁকে যে কোন সময় কল দিলে চলে আসেন। আমাদের মধ্যে মা'র ভালবাসা পরীক্ষায় সেই শুধু অনার্সসহ পাস। আমরা ফেল।

আমার বন্ধু মোজাম্মেল হোসেন সাহেবের মাও এই আমার মা'র মতই ছেলেমেয়েদের ভালবাসা আছে কি নেই পরীক্ষা শুরু করেছেন। তিনি শারীরিকভাবে বেশ সুস্থ। তবু একদিন দেখা যায়, কোন এক ছেলে বা মেয়ের কাছে গিয়ে অকারণে অনেকক্ষণ কাশলেন, হাঁচলেন। নিজেই নিজের কপালের উত্তাপ দেখলেন। তাঁর উদ্দেশ্য — ছেলেমেয়েরা কেউ তাঁর আচার-আচরণ দেখে জিজ্ঞেস করে কি-না — মা তোমার কি শরীর খারাপ? কি আশ্চর্য! তোমার শরীর খারাপ আমাদের বলবে না? দেখি কাপড় পর, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

তিনি বিরস গলায় বললেন, বাদ দে, ডাক্তারের কাছে কি নিবি! বয়স হয়েছে, গলায় রোগ-ব্যাধি তো হবেই।

'কথা বলে সময় নষ্ট করো না তো মা। কাপড় পর। ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।'

তিনি আনন্দিত চিত্তে কাপড় পরতে চলে যান। ছেলেমেয়েরা তাঁকে ভালবাসে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হন।

আমার বন্ধু এবং বন্ধুর বোনরা তাঁদের মা'র এই ব্যাপারটা জানেন। তারা এখন নিয়ম করে সবাই তাঁদের মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। একেক জনের একেক ডাক্তার। মা মহাখুশি। তাঁর সময় কাটে ডাক্তারের কাছে ঘুরে ঘুরে।

আমার মা'র প্রসঙ্গে ফিরে আসি — তিনি আমাদের নিয়ে অনেক ছোটখাট পরীক্ষা করলেন। বেশির ভাগ পরীক্ষার ফল হল — অনিশ্চিত। নিশ্চিত পরীক্ষা দরকার। কাজেই তিনি সেই পরীক্ষার জন্যে তৈরি হলেন। এক সন্ধ্যায় শুনলাম, তিনি বেশ কিছুদিন দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকবেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, এটা শুনেই তাঁর ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠবে — আরে না, অসম্ভব! আপনি দেশে যাবেন কি? না না, দেশে যেতে হবে না।

কিন্তু তা বলা হল না। মা দেশে চলে গেলেন। আর ফেরার নাম নেই। সাত দিনের বেশি যে মহিলা তাঁর ছেলেমেয়েদের না দেখে থাকতে পারেন না তিনি এক মাস কাটিয়ে দিলেন। ভাবলেন, ছেলেমেয়েরা খোঁজখবর করবে। আসতে না পারলেও চিঠি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দেবে। না, কেউ চিঠিও দিল না। তিনি নিজেই লজ্জার মাথা খেয়ে সবার কাছে চিঠি লিখলেন — অতি সংক্ষিপ্ত পত্র।

'আমি ভাল আছি। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না। নামাজ পড়বে।
সর্বদা আল্লাহ্‌পাককে স্মরণ করবে। ইতি তোমার মা।"

আমরা কেউ সেই চিঠির জবাব দিলাম না। আসলে মা'র অভিমানের গুরুত্বই কেউ ধরতে পারলাম না। এই বয়সে তিনি যে ছেলেমেয়েদের এক ডিগ্রি পরীক্ষায় ফেলবেন সেটা কে অনুমান করবে? আমরা ভাবলাম, নিজের বাড়িতে থাকতে মা'র নিশ্চয় খুব ভাল লাগছে! ভাল না লাগলে তো চলেই আসবেন।

দু' মাস কেটে গেল। আমার ছোট মেয়ে একদিন বলল, আজ রাতে দাদীকে স্বপ্নে দেখেছি। দাদীকে দেখতে ইচ্ছা করছে। তখন আমার মনে হল, আরে তাই তো — অনেক দিন মা'কে দেখি না। বাসাটা খালি। আচ্ছা চল, মা'কে ধরে নিয়ে আসি। মাইক্রোবাস নিয়ে চলে যাই ময়মনসিংহ! সবাইকে খবর দেয়া যাক। ক্ষীণ একটা আপত্তি উঠল — এই গভীর রাতে বাস নিয়ে এতদূর যাওয়াটা কি ঠিক হবে? সেই আপত্তি বাচ্চাদের উৎসাহের কাছে টিকল না। এক্ষুনি যেতে হবে। এক্ষুনি। রাত এগারোটায় বাস ভর্তি করে আমরা সব ভাই-বোন, তাদের বাচ্চা-কাচ্চারা রওনা হলাম।

ময়মনসিংহ পৌঁছলাম রাত দু'টায়। মা তাঁর এক ভাইয়ের বাসায় আছেন। সেই বাসার ঠিকানা জানা নেই। ঠিকানা খুঁজে বাসা বের করতে করতে রাত তিনটা বেজে গেল। রাত তিনটায় কড়া নেড়ে মা'র ঘুম ভাঙানো হল।

বাচ্চা-কাচ্চারা চেঁচিয়ে বলল, দাদীমা, তোমাকে নিতে এসেছি।

মা'র চোখ ভিজে উঠল। তিনি কপট বিরক্তিতে বললেন, এদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছি। কোথাও গিয়ে যে শান্তিমত দু'-একটা দিন থাকব সেই উপায় নেই। রাত তিনটার সময় উপস্থিত হয়েছে। ছেলেমেয়েগুলিরও কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই — রাত তিনটায় দুধের বাচ্চা নিয়ে সব রওনা হয়েছে। রাস্তায় যদি বিপদ-আপদ কিছু ঘটতো? এদের বুদ্ধি-শুদ্ধি কি কোন কালেই হবে না?

মা তার বুদ্ধি-শুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেমেয়েদের বকাঝকা করতে করতে নিজের ব্যাগ গুছাতে শুরু করেছেন। ছেলেমেয়েদের ভালবাসা টের পাবার যে কঠিন পরীক্ষা মা শুরু করেছিলেন আমরা সবাই সেই পরীক্ষায় ফেল করতে করতে ভাগ্যক্রমে লেটার মার্ক পেয়ে পাস করে গেলাম।

ঢাকায় ফেরার পথে মনে হল, এই দিন খুব দূরে নয় যখন ভালবাসার পরীক্ষা নেবার কেউ থাকবে না। পরীক্ষায় পাস-ফেল নিয়ে আমাদের চিন্তিত হতে হবে না। আমরা সবাই নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার অফুরন্ত সুযোগ পাব।

বাসের পেছনের সীটে দাদীর পাশে কে বসবে তা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। মা'র গলা শুনতে পাচ্ছি — তোরা কি যে যন্ত্রণা করিস! এই জন্যেই মাঝে-মধ্যে তোদের ছেড়ে চলে যাই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



আমার বন্ধু সফিক

ইদানীং পুরানো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলে বড় ধরনের ধাক্কা খাই — কি চেহারা একেকজনের — দাঁত পড়ে গেছে, গালের চামড়া গেছে কুঁচকে, মাথায় অল্প কিছু ফিনফিনে চুল। কলপ দিয়ে সেই চুলের বয়স কমানো হয়েছে কিন্তু সাদা সাদা গোড়া উঁকি দিচ্ছে।

ওদের দিকে তাকালে মনে হয় — হায় হায়, আমার এত বয়স হয়ে গেছে? এখন কি তাহলে যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করব? মীরপুর গোরস্থানে জমি দেখতে যাব?

আয়নায় যখন নিজেকে দেখি তখন এতটা বয়স মনে হয় না। হাস্যকর হলেও সত্যি, নিজেকে যুবক-যুবকই লাগে। ঐ তো কি সুন্দর চোখ! চোখের নিচে কালি পড়েছে। এট' এমন কিছু না, রাত জাগি, কালি তো পড়বেই। কয়েক রাত টিকমত ঘুমুতে পারলে চোখের কালি দূর হয়ে যাবে। মুখের চামড়ার বলিরেখা? ও কিছু না। অনেক যুবক ছেলেদের মুখেও এমন দাগ দেখা যায়। মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে? এটা কোন ব্যাপারই না। চুল পাকা বয়সের লক্ষণ নয়। মানুষের বয়স শরীরে না, মনে।

আমাদের মত বয়েসীদের হঠাৎ রঙিন কাপড়ের দিকে ঝুঁকে যেতে দেখা যায়। চক্রাবক্রা হাওয়াই শার্ট পরে এরা তেজী তরুণের মত হাঁটতে চেষ্টা করে — জরাকে অগ্রাহ্য করার হাস্যকর চেষ্টা। চোখে-মুখে এমন একটা ভাব যেন এইমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পড়া চুকিয়ে রাস্তায় নেমেছি। বান্ধবীকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কোন কাফেতে চা খেতে যাব কিংবা বাদাম ভাঙতে ভাঙতে রাস্তায় হাঁটব।

এরকম একদিনের কথা। নাপিতের দোকান থেকে চুল কেটে বের হয়েছি। চুল কাটার ফলে গোড়ার শাদা চুল বের হয়ে এসেছে। বিশ্রী দেখাচ্ছে। মেজাজ খারাপ করে এক পান-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছি। সিগারেট কিনে বাসায় ফিরব। হঠাৎ দেখি যুবক একটা ছেলে কদবেল কিনছে। সে বসেছে উবু হয়ে। বেল শুঁকে শুঁকে দেখছে। তার পেছনেই শাড়ি পরা এক তরুণী। তরুণী লজ্জা পাচ্ছে বলে মনে হল। ছেলেটিকে খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আবার চিনতেও পারছি না। সে দুটা কদবেল কিনে উঠে দাঁড়াল। আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, আরে তুই!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এ হচ্ছে আমাদের সফিক। ঢাকা কলেজে এক সঙ্গে পড়েছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। তারপর যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে।

সফিক বলল, তুই এত বিশ্রী করে চুল কেটেছিস। তোকে দেখাচ্ছে পকেটমারের মত।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার হতভম্ব ভাব তখনো কাটে নি। আমি অবাক হয়ে সফিককে দেখছি। ব্যাটার বয়স বাড়ে নি। এখা তাকে স্পর্শ করে নি। তাকে ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র বললে কেউ অবিশ্বাস করবে না।

সফিক বলল, দোস্ত, এ হচ্ছে আমার বড় মেয়ে। ফার্মাসিউটিক্যালস থেকেও ইয়ারে পড়ে। এর নাম শাপলা। শাপলা মা, চাচাকে পা ছুঁয়ে সালাম কর্।

আমি বললাম, বাজারের মধ্যে কিসের সালাম?

'বাজার-টাজার বুঝি না। সালাম করতে হবে।'

মেয়ে একগাদা লোকের মধ্যেই নিচু হয়ে সালাম করল। সফিক আমার হাত ধরে বলল, চল আমার সাথে।

'কোথায়?'

'আমার বাসায়, আবার কোথায়?'

'আরে না। চুল কেটেছি — গোসল করব।'

'কোন কথা না। শাপলা মা — তুই শক্ত করে চাচার একটা হাত ধর্। আমি আরেক হাত ধরছি। দু'জনে মিলে টেনে নিয়ে যাব।'

আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে হল। ছোট্ট ফ্ল্যাট বাড়ি। বোঝাই যাচ্ছে আর্থিক অবস্থা নড়বড়ে। বসার ঘরে বার ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি। ইদানীং টিভির মাপ থেকে অর্থনৈতিক অবস্থা আঁচ করার একটা সুবিধা হয়েছে। সফিক আমাকে টানতে টানতে একেবারে রান্নাঘরে নিয়ে উপস্থিত -- দাঁড়া, বৌকে অবাক করে দিই -- সে তোর নাটক দেখে গ্যালন গ্যালন চোখের পানি ফেলে। চোখের পানির মূল মালিক ধরে নিয়ে এসেছি।

রান্নাঘরে আমাকে দেখে সফিকের স্ত্রী অত্যন্ত বিব্রত হল এবং দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। স্বামীর পাগলামির সঙ্গে বেচারী বোধহয় এত দিনেও মানিয়ে নিতে পারে নি।

'ছিঃ ছিঃ, কি অবস্থা রান্নাঘরের! এর মধ্যে আপনাকে নিয়ে এসেছে ওর কোনদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না। ও কি ছাত্র-জীবনেও এরকম ছিল?'

আমি জবাব দিতে পারলাম না। ছাত্র-জীবনে সফিক কেমন ছিল আমার মনে নেই। ডিম-সিদ্ধ তার খুব পছন্দের খাবার ছিল — এইটুকু মনে আছে। সিদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে আস্ত মুখে ঢুকিয়ে দিত। এই সময় তার আরামে চোখ বন্ধ হয়ে যেত।

আমি লক্ষ্য করলাম, সফিকের বয়স না বাড়লেও তার স্ত্রীর ঠিকই বেড়েছে। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হয়, জীবন-যুদ্ধে তিনি পরাজিত। ক্লান্তি ও হতাশা তাঁকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। অসুখ-বিসুখেও মনে হয় ভুগছেন। যতক্ষণ কথা বললেন, ক্রমাগত কাশতে থাকলেন —। কাশতে কাশতে বললেন, আপনি এসেছেন আমি খুশি হয়েছি। আপনাকে যে যত্ন-টত্ন করব সেই সামর্থ্য নেই। সংসারের অবস্থা ভাঙা নৌকার মত। কোনমতে টেনে নিচ্ছি। ইভিনিং শিফটে একটা স্কুলে কাজ করি। ঐ বেতনটাই ভরসা। কাজটা না থাকলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করতে হত।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, সফিক কিছু করে না?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] ও একটা ব্যাংকের ম্যানেজার। তাতে লাভ কিছু নেই। আপনি আপনার [illegible] জিজ্ঞেস করুন তো — পুরো বেতন কখনো সে আমার হাতে দিয়েছে কি না। [illegible] মাস যায় একটা পয়সা আমাকে দেয় না। আপনিই বলুন, আমি কি [illegible]গুলোকে পানি খাইয়ে মানুষ করব?'

সফিক বলল, চুপ কর। প্রথম দিনেই কী অভিযোগ শুরু করলে। এইসব বলার সুযোগ আরো পাবে। আজ না বললেও চলবে। ফাহিন করে চা বানাও। হুমায়ূন খুব চা খায়। সে আগের জন্মে চা বাগানের কুলী ছিল।

সফিকের স্ত্রী কঠিন গলায় বলল, ভাই, চা আপনাকে খাওয়াচ্ছি — কিন্তু আমার কথা আপনাকে শুনতে হবে। এবং যাবার আগে আপনার বন্ধুকে বুঝিয়ে বলে যেতে হবে — তার নিজের সংসারটাই আসল —। আগে সংসার দেখতে হবে . . .

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, ভদ্রমহিলার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে।

বেড়াতে এসে এ কী পারিবারিক সমস্যার মধ্যে পড়লাম! সফিক প্রায় জোর করে তার স্ত্রীকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিল। আমি বললাম, তোর সমস্যাটা কি?

'আরেক দিন বলব।'

'আজই শুনে যাই।'

সফিক খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সমস্যা বলা শুরু করল। সফিকের জবানীতেই তার সমস্যা শুনি।

'বুঝলি দোস্ত, তখন সবে চাকরি পেয়েছি। বিয়ে-টিয়ে করিনি। নিউ পল্টন লাইনে এক কামরার একটা বাসা নিয়ে থাকি। দেশে টাকা পাঠাতে হয় না। বেতন যা পাই নিজেই খরচ করি। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হৈ-চৈ। এখানে ওখানে বেড়ানো খানিকটা বদ অভ্যাসও হয়ে গেল — মাঝে-মধ্যে মদ্যপান করা। বন্ধু-বান্ধব এসে ধরে — একটা হুইস্কির বোতল কিনে আন। বেতন পেয়েছিস, সেলিব্রেট কর। কিনে ফেলি। অভ্যাসটা স্থায়ী হল না, কারণ আমার বডি সিস্টেম এলকোহল সহ্য করে না। সামান্য খেলেও সারা রাত জেগে থাকতে হয় — এবং অবধারিতভাবে শেষ রাতে হড়হড় করে বমি হয়।

এক রাতের কথা — সামান্য মদ্যপান করে বাসায় ফিরছি। সামান্যতেই নেশা হয়ে গেছে। একটা রিকশা নিয়েছি। মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে রিকশা থেকে পড়ে যাব। অনেক কষ্টে হুড ধরে বসে আছি, এমন সময় এক লোক তার ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষা চাইতে এল। তার ছেলের চিকিৎসার জন্যে খরচ। আমি ছেলেটিকে দেখে চমকে উঠলাম। সাত-আট বছর বয়স। ফুটফুটে চেহারা। সম্পূর্ণ নগ্ন। নগ্ন থাকার কারণ হল — তার অসুখের ডিসপ্লে নগ্ন না হলে সম্ভব নয়। ছেলেটির অণ্ডকোষ ফুটবলের মত প্রকাণ্ড। তাকালেই ঘেন্না হয়। আমি দ্রুত একটা একশ' টাকার নোট বের করে দিলাম। ছেলের বাবা আনন্দের হাসি হাসল। এই হাসি দেখেই মনে হল — এই লোক তো ছেলের চিকিৎসা করাবে না। ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষা করাই তার পেশা। ছেলে সুস্থ হলে বরং তার সমস্যা।

আমি বললাম, রোজ ভিক্ষা করে কত পাওয়া যায়?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সে গা-ছাড়া ভাব করে বলল, ঠিক নাই। কোনদিন বেশি, কোনদিন কম।

'আজ কত পেয়েছ? আমারটা বাদ দিয়ে কত?'

'আছে কিছু।'

'কিছু-টিছু না। কত পেয়েছ বল।'

লোকটি বলতে চায় না। কেটে পড়তে চায়। আমি তখন পেশাগত: মাথার ঠিক নেই। আমি হুংকার দিলাম, যাচ্ছ কোথায়? এক পা গেছ কি খুন করে ফেলব: বল আজ কত পেয়েছ - -?

'ধরেন দুই শ'।'

'তুমি কি এই ছেলেকে চিকিৎসার জন্যে কোন দিন হাসপাতালে নিয়ে গেছ? বল ঠিক করে, মিথ্যা কথা বললে খুন করে ফেলব।'

সে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। আমি বললাম, এখনি চল আমার সাথে হাসপাতালে। মেডিকেল কলেজে আমার এক বন্ধু আছে, ডাক্তার -- তাকে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। বাচ্চা কোলে নিয়ে রিকশায় উঠে আস।

সে কিছুতেই আমার সঙ্গে যাবে না। আমি নিয়ে যাবই। মাতালদের মাথায় একটা কিছু ঢুকে পড়লে সহজে বের হতে চায় না। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ -- চিকিৎসা করবেই। এর মধ্যে আমার চারদিকে লোক জমে গেছে। সবাই আমাকে সমর্থন করছে। লোকটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেছে। সে মিনমিন করে বলল, ডাক্তার অপারেশন করব। অপারেশন করলে আমার পুলা মারা যাইব।

আমি আবারো হুংকার দিলাম -- ব্যাটা ফাজিল। ছেলের অসুখের চিকিৎসা করবে না। অসুখ দিয়ে ফায়দা লুটবে -- চল্ হাসপাতালে।

অসাধ্য সাধন করলাম। দুপর রাতে এদের হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। বন্ধুকে খুঁজে বের করলাম। সে বিরক্ত হয়ে বলল, এই দুপুর রাতে রোগী ভর্তি করব কি ভাবে? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? এই যন্ত্রণা কোত্থেকে জুটিয়েছিস?

আমি বললাম, কিচ্ছু শুনতে চাই না। তুই এর ব্যবস্থা করবি। খরচ যা লাগে আমি দিব।

ব্যবস্থা একটা হল। দেখা গেল, অসুখ তেমন জটিল নয়। খাদ্যনালীর অংশবিশেষ মূত্রথলিতে নেমে গেছে। ডাক্তার খাদ্যনালীটা উপরে তুলে দেবে। মূত্রনালীর ফুটো ছোট করে দেবে। অসুখটা হল খারাপ ধরনের হার্নিয়া।

অপারেশনের তারিখ ঠিক হল। আমি মহাখুশি। শুধু ছেলের বাবা কেঁদে-কেটে অস্থির। তার ধারণা, ছেলে মারা যাচ্ছে। তার একটাই ছেলে। স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেকে নিয়ে সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। একটাই তার একমাত্র শখ। মনে মনে বললাম, হারামজাদা! ছেলের অসুখ হওয়ায় মজা পেয়ে গেছিস? দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো বার করছি। শুওর কা বাচ্চা। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। ছেলেকে শুধু যে ভাল করব তাই না স্কুলেও ভর্তি করাব। মজা বুঝবি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

অপারেশন হয়ে গেল। সাকসেসফুল অপারেশন। ছেলেটিকে অপারেশন টেবিল থেকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নেয়া হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ইনটেনসিভ কেয়ারে নেয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে ছেলেটা মারা গেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হায়, হায়! এ কি সর্বনাশ! আমার কারণে ছেলেটা মারা গেল? ছেলের বাবার সঙ্গে দেখা করার সাহসও হল না। আমি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে চলে এলাম।

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম — আর পরোপকার করতে যাব না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। সারারাত এক ফোঁটা ঘুম হল না। কেন ছেলেটা মরে গেল? কেন?

বুঝলি দোস্ত, ছেলেটা মারা যাবার পর আমার আসল সমস্যা শুরু হল। আমার রোখ চেপে গেল। ঠিক করলাম — যখন যেখানে অসুস্থ ছেলেপেলে দেখব, চিকিৎসা করাব। দেখি কি হয়। দেখি এরা বাঁচে না মরে। সেই থেকে শুরু।

রাস্তায় অসুখ-বিসুখে কাতর কাউকে দেখলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। টাকা-পয়সা সব এতেই চলে যায়।

তারপর বিয়ে করলাম। সংসার হল। অভ্যাসটা গেল না। চিকিৎসার খরচ আছে; আমি বেতনও তো তেমন কিছু পাই না। সংসারে টানাটানি লেগেই থাকে। বিয়ের সময় তোর ভাবী বেশ কিছু গয়না-টয়না পেয়েছিল। সব বেচে খেয়ে ফেলেছি। এই নিয়েও সংসারে অশান্তি। হা হা হা।

'কতজন রোগী এই ভাবে সুস্থ করেছিস?'

'অনেক।'

'আর কেউ মারা যায় নি?'

'না। আর একজনও না। প্রথমজনই শুধু মারা গেল। আর কেউ না।'

'এই মুহূর্তে কারোর চিকিৎসা করছিস?'

'হ্যাঁ, এখনো একজন আছে। জয়দেবপুরের এক মেয়ে। ঠোঁট কাটা। প্লাস্টিক সার্জারী করে ঠোঁট ঠিক করা হবে।'

আমি মুগ্ধ গলায় বললাম, তুই যে কত বড় কাজ করছিস সেটা কি তুই জানিস?

সফিক অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বড় কাজ করছি, না ছোট কাজ করছি তা জানি না, তবে আমার একেকটা রোগী যেদিন সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে, সেদিন যে আমার কত আনন্দ হয় তা শুধু আমিই জানি। এই আনন্দের কোন তুলনা নেই। প্রতিবারই আমি আনন্দ সামলাতে না পেরে হাউমাউ করে কাঁদি। লোকজন, ডাক্তার, নার্স সবার সামনেই কাঁদি!

বলতে বলতে সফিকের চোখে পানি এসে গেল। পানি মুছে সে স্বাভাবিক গলায় বলল, তারপর দোস্ত, তোর খবর বল। তুই কেমন আছিস?

আমি মনে মনে বললাম, শারীরিকভাবে আমি ভাল আছি। কিন্তু আমার মনটা অসুস্থ হয়ে আছে — তুই আমার মন সুস্থ করে দে। এই ক্ষমতা অল্প কিছু সৌভাগ্যবানদের থাকে। তুই তাদের একজন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



মিসির আলি ও অন্যান্য

কিশোর বয়সে সুবোধ ঘোষের একটি উপন্যাস পড়েছিলাম — 'শুন বরনারী'! উপন্যাসের মূল চরিত্র একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, হিমাদ্রী। অনেকদিন সেই ডাক্তারের ছবি আমার চোখে ভাসতো। মাঝে মাঝে রাস্তায় কাউকে দেখে চমকে উঠে ভাবতাম, আরে, ইনি তো অবিকল হিমাদ্রীর মত। কিশোর বয়সে মাথায় অনেক পাগলামি ভর করে। সেই পাগলামির কারণেই হয়ত এক সন্ধ্যাবেলায় হিমাদ্রী বাবুর কাছে এক পাতার একটা চিঠি লিখে ফেললাম। চিঠিতে অনেক সমবেদনার কথা বলা হল। চিঠি পাঠানো যায় কি করে? হিমাদ্রী বাবুর ঠিকানা আমি জানি না, সুবোধ ঘোষের ঠিকানাও জানা নেই। চিঠিটা অনেক দিন অভ্যক্ত খাতায় বন্দী হয়ে পড়ে রইল। এক সময় হারিয়েও গেল। একজন মুগ্ধ কিশোরের আবেগ ও ভালবাসা হিমাদ্রী কিংবা সুবোধ ঘোষ জানতে পারলেন না।

চিঠিটি কিন্তু হারায়নি। প্রকৃতি কোন কিছুই হারাতে দেয় না। যত্ন করে তুলে রাখে। কোন এক বিশেষ সময়ে বিশেষ মুহূর্তে সেই হারানো জিনিস বের করে এনে সবাইকে হকচকিত করে দেয়। আমার বেলায় এই ব্যাপারটা ঘটল। লক্ষ্মীপুর থেকে সপ্তম শ্রেণীর জনৈক বালক মিসির আলিকে একটা একপাতার চিঠি লিখল। মিসির আলির প্রতি সমবেদনায় সেই চিঠি পূর্ণ। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এই চিঠির ভাষা এবং আমার চিঠির ভাষা একই রকম। যেন প্রকৃতি পঁয়ত্রিশ বছর পর আমার চিঠিই আমাকে ফেরত পাঠাল।

আমার উপন্যাসে বারবার ফিরে আসা চরিত্রগুলিকে নিয়ে একটা লেখা তৈরি করতে বলা হয়েছে। লিখতে গিয়ে তাই মিসির আলির কথাই প্রথম মনে পড়ল। তাঁকে দিয়েই শুরু করি।

মিসির আলি

মিসির আলি মানুষটা দেখতে কেমন? আমি ঠিক জানি না। জানলে বই-এ তাঁর চেহারার বর্ণনা থাকতো। তেমন কোন বর্ণনা নেই। চশমা পরেন এটা বলা হয়েছে। চশমা তো আর চেহারার বর্ণনা হবে না। চশমা অনেকেই পরেন।

বলা হয়েছে, তীক্ষ্ণ চোখে তিনি তাকান। সেই তীক্ষ্ণ চোখও তো কারোর বোঝার উপায় নেই। কারণ চোখ ঢাকা থাকে চশমার মোটা কাচের আড়ালে। মানুষটার কি মাথাভর্তি চুল? না-কি টাক-মাথা? চুলের কথা কোন উপন্যাসে বলিনি, তবে চুল

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আছে' চুল যে আছে তা বুঝলাম মিসির আলিকে নিয়ে প্রচারিত দু'টি টিভি নাটকে। নাটক দু'টিতে মিসির আলির চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা আবুল হায়াত। টেকো মিসির আলিকে দেখে চমকে উঠলাম। চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করল, না না, মিসির আলির মাথায় টাক নেই। তাঁর মাথাভর্তি ঘন চুল। এখন বললে তো হবে না, বই-এ কিছু বলিনি।

মিসির আলিকে নিয়ে যখন কিছু লিখি তখন কি কেন চেহারা আমার মনে ভাসে? সচেতনভাবে কিছু ভাসে না। অবচেতন মনে নিশ্চয়ই ছবি আঁকা থাকে। সেই ছবি সাধারণ মানুষের ছবি। অন্তর্মুখী একজন মানুষ, যিনি বই পড়তে ভালবাসেন। অন্তর্মুখী মানুষরা অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করেন না, কিন্তু মিসির আলি পছন্দ করেন। প্রায়ই দেখা যায় — আগ্রহ নিয়ে তিনি অনেককে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেন। অন্তর্মুখী মানুষ এই কাজটি কখনো করবে না। এই মানুষটির প্রধান গুণ কি? আমার মতে, কৌতূহল এবং বিস্ময়বোধ করার অসাধারণ ক্ষমতা। কৌতূহল আমাদের সবারই আছে, কিন্তু কৌতূহল মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় পরিশ্রমটি আমরা করি না। করতে চাই না। অন্তর্মুখী মানুষ হয়েও মিসির আলি কিন্তু এই পরিশ্রমটা করেন। উদাহরণ দেয়া যাক। উদাহরণ থেকে মিসির আলির কৌতূহলের ধরন পরিষ্কার হবে। আমরা প্রায়ই ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানা জাতীয় সাইনবোর্ড দেখি। খুব কি কৌতূহলী হই? মিসির আলি কিন্তু হন। যেমন,

"মুগদাপাড়া থেকে যে রাস্তাটা মান্ডার দিকে গিয়েছে তার প্রথম ডানদিকের বাঁকে বেশ কয়টা দোকান। একটা স্টেশনারী শপ, দু'টা সাইকেল টায়ারের দোকান, একটা সেলুন এবং একটি হেকিমী ঔষধের দোকান। সাইনবোর্ডে লেখা — ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানা। হেকিম আবদুর রব।

মিসির আলি ইদানিং এই পথে যাওয়া-আসা করেন, কারণ তিনি বাসা নিয়েছেন মান্ডায়। ঢাকায় আসতে হলে তাঁকে অতীশ দীপংকর রোড ধরতে হয়। এই পথে আসা ছাড়া উপায় নেই। দোকানগুলির সামনে এসে তিনি থমকে দাঁড়ান। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানার দিকে তাকান।

মানুষের কৌতূহল জাগ্রত করার মত তেমন কিছু দোকানে নেই। ভেতরটা অন্ধকার। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে পুরানো ভারী আলমিরা। আলমিরার পাল্লা কাঠের বলে ভেতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। দু'পাশে বইয়ের র‍্যাকের মত বেশ কিছু র‍্যাক। র‍্যাক ভর্তি কাচের এবং চিনামাটির বৈয়ম। সব দোকানেই টেবিল বা টেবিল জাতীয় কিছু থাকে। এখানে নেই। দু'টা বেতের চেয়ার পাশাপাশি বসানো। একটিতে সারাক্ষণ ভয়ংকর রোগা, লম্বা এবং অস্বাভাবিক ফর্সা একজন মানুষ বসে থাকেন। সম্ভবত তিনিই হেকিম আবদুর রব। তাঁর হাতে একটা পত্রিকা থাকে, তবে সব সময় পত্রিকা পড়েন না। বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায়, হাতে পত্রিকা আছে ঠিকই, কিন্তু ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন রাস্তার দিকে।

মিসির আলি এখন পর্যন্ত এই দোকানে দ্বিতীয় কোন মানুষ দেখেননি। সঙ্গত কারণেই হেকিমী, আয়ুর্বেদী জাতীয় চিকিৎসার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে আসছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এই দোকানের সামনে এলেই মিসির আলির জানতে ইচ্ছা করে, এই লোকটির সংসার কি করে চলে? অনেক ব্যাপার আছে জানতে ইচ্ছা করলেও জানা যায় না। মিসির আলির পক্ষে সম্ভব নয় দোকানে ঢুকে হেকিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনার কাছে তো কখনো কাউকে আসতে দেখি না। আপনার সংসার কি করে চলে?

মানুষটা দিনের পর দিন খবরের কাগজ হাতে নিয়ে কি ভাবেন, তাও মিসির আলির জানতে ইচ্ছে করে। নিজে নিঃসঙ্গ বলেই বোধহয় আরেকজন নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। এবং প্রায়ই ভাবেন কোন একদিন দোকানটির সামনে রিকশা থেকে নেমে পড়বেন। কৌতূহল মিটিয়ে নেবেন। সেই কোন-একদিন এখনো আসছে না। কেন আসছে না এই নিয়েও মিসির আলি ভেবেছেন। তাঁর ধারণা, মানুষের কৌতূহলের একটি থ্রেসহোল্ড লিমিট আছে। কৌতূহল সেই লিমিটের নিচে হলে মানুষ কখনো তা মেটাতে চেষ্টা করে না। যখন লিমিট অতিক্রম করে কেবল তখনি কৌতূহল মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড শুরু করে। রাস্তায় কোন ভিখিরী শিশুকে একা একা কাঁদতে দেখলে আমাদের কৌতূহল হয়। জানতে ইচ্ছে করে কেন সে কাঁদছে। কিন্তু সেই কৌতূহল থ্রেসহোল্ড লিমিটের নিচে বলে কখনো জিজ্ঞেস করা হয় না — এই মেয়ে কাঁদছ কেন?

পৌষ মাসের এক বিকেলে মিসির আলির কৌতূহল থ্রেসহোল্ড লিমিট অতিক্রম করল। তিনি দাওয়াখানার সামনে রিকশা থেকে নামলেন। এম্নিতেই হেকিম সাহেবের ঘর থাকে অন্ধকার। আজ আরো অন্ধকার লাগছে, কারণ সন্ধ্যা হয় হয় করছে, আকাশ মেঘলা। ঘরে এখনো বাতি জ্বালানো হয়নি।

খবরের কাগজ হাতে চেয়ারে বসে থাকা ভদ্রলোক চোখ তুলে মিসির আলির দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি নিস্পৃহ। সেখানে আগ্রহ বা অনাগ্রহ কোন কিছুরই ছোঁয়া নেই। দূর থেকে ভদ্রলোকের বয়স বোঝা যাচ্ছিল না। এখন বোঝা যাচ্ছে। বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে, তবে হালকা পাতলা গড়ন বলে বোঝা যাচ্ছে না। এই বয়সে মানুষের মাথার চুল কমে যায়, তবে ভদ্রলোকের বেলায় তা হয়নি। তাঁর মাথা ভর্তি ধবধবে শাদা চুল।

মিসির আলি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, আমি একটা সামান্য জিনিস আপনার কাছে জানতে এসেছি। আমি আপনার কাছেই থাকি, মান্ডার নয়াবাজারে।

'বসুন।'

মিসির আলি বসলেন। ভদ্রলোক খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, কি জানতে চান বলুন?

ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ পরিষ্কার। মানুষের গলার শব্দেও বয়সের ছাপ পড়ে। এই ভদ্রলোকের তা পড়েনি। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে খানিকটা বিরক্ত হচ্ছেন। মিসির আলির অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল।

'কি জানার জন্য এসেছেন বলুন?'

'আপনার দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা — ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানা। ইউনানী তিব্বিয়া — শব্দ দু'টার মানে কি?'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'এটা জানার জন্যে এসেছেন?'

'জ্বি।'

'কেন জানতে চান?'

'কৌতূহল, আর কিছু না।'

'আপনি কি করেন?'

'তেমন কিছু করি না। এক সময় অধ্যাপনা করতাম। এখন সাইকোলজির উপর একটা বই লেখার চেষ্টা করছি। আপনিই কি হেকিম আবদুর রব?'

'না। হেকিম আবদুর রব আমার দাদা। আমরা চার পুরুষের হেকিম। আমি হচ্ছি শেষ পুরুষ। আপনি শুধুমাত্র ইউনানী এবং তিব্বিয়া এই শব্দ দুটির অর্থের জন্যে আমার কাছে এসেছেন দেখে বিস্ময় বোধ করছি। অর্থ বলছি। আপনি কি চা খাবেন? সন্ধ্যাবেলা আমি এক কাপ চা খাই।'

'চা কি দোকান থেকে আনাবেন?'

'না, আমি নিজেই বানাব। ভাল কথা, আপনার নাম জানা হয়নি।'

'আমার নাম মিসির আলি।'

'মিসির আলি সাহেব, আপনি কি ধূমপান করেন?'

'জ্বি করি।'

'আমার নাম আবদুল গনি। হেকিম আবদুল গনি। আপনি বসুন, আমি চা বানাচ্ছি।'

মিসির আলি বসে রইলেন। আবদুল গনি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। দোকানের পেছনে, র‍্যাকগুলির ওপাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। চায়ের সরঞ্জাম সেখানেই রাখা। মিসির আলি লক্ষ করলেন, বেশ দামী একটি ইলেকট্রিক কেতলিতে চায়ের পানি গরম হচ্ছে। চা দেওয়াও হল দামী কাপে। ভদ্রলোক সিগারেটের টিন বের করলেন। আবদুল্লাহ নামের মিশরীয় সিগারেট। ড্যাম্প যাতে না হয় তার জন্যে বাজারজাত করা হয় টিনের কৌটায়। বাংলাদেশে এই বস্তু সচরাচর চোখে পড়ে না।

আবদুল গনি সাহেব চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আমার বড় মেয়ে কায়রোতে থাকে। সে মাঝে-মধ্যে উপহার হিসেবে এটা-সেটা পাঠায়। চায়ে চিনি হয়েছে?

'জ্বি।'

'এখন আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। ইউনানী শব্দটা এসেছে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর ইউনান থেকে। ইউনান হল — গ্রীস দেশ। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর ইউনান বা গ্রীস ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রের লীলাভূমি। হিপোক্রেতিসের মত পণ্ডিত এবং গ্যালেনের মত চিকিৎসকের কারণে চিকিৎসা শাস্ত্রের চরম উন্নতি হয়। গ্রীস থেকে এই বিদ্যা মুসলিম চিকিৎসকদের হাতে আসে। যেহেতু ইউনান হচ্ছে এই শাস্ত্রের কেন্দ্রভূমি, কাজেই তাঁরা এর নাম দেন ইউনানী।'

'আর তিব্বিয়া? তিব্বিয়াটা কি?'

'তিব্বিয়া এসেছে 'তিব্ব' থেকে। আরবিতে 'তিব্ব' মানে চিকিৎসা সম্পর্কিত। আপনার কৌতূহল কি মিটেছে?'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'ছি।'

'আরো কিছু জানতে চাইলে আসবেন। এই বিষয়ে আমার কিছু পড়াশোনা আছে। আজ তাহলে উঠুন। সন্ধ্যার পর আমি দোকান বন্ধ করে দি। আমার চোখের অসুবিধা আছে। রাতে আমি ভাল দেখি না।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, রোগী আপনার কাছে কেমন আসে?

'আসে না। আসার কথাও না। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা অনেক দূর এগিয়েছে। এদের হাতে আছে শক্তিশালী এন্টিবায়োটিক, সালফা ড্রাগ। চিকিৎসা পদ্ধতি সহজ হয়েছে, দ্রুত হয়েছে। হেকিমী বিদ্যা আগে যেখানে ছিল এখনো সেখানেই আছে।'

'আপনার কথা থেকে তো মনে হচ্ছে বর্তমান আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার শুরুটা হচ্ছে ইউনানী।'

'হ্যাঁ তাই। বর্তমান কালের ডাক্তাররা হিপোক্রেটিস শপথ নেন। ইউনানী শাস্ত্রের উন্নতি হয় হিপোক্রেটিসের পৃষ্ঠপোষকতায়। মিসির আলি সাহেব, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। আজ তাহলে আপনি আসুন। রাতে আমি একেবারেই চোখে দেখি না। রিকশা এসে আমাকে বাড়িতে নিয়ে যায়।"

মিসির আলি ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

তাঁর কৌতূহল শুধু ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানায় নয় — তাঁর কৌতূহল পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেও। তিনি এই সব বিজ্ঞাপন গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েন। শুধু পড়েই ভুলে যান না। ভাবেন। আবারো উদাহরণ —

"পত্রিকায় ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বের হয়েছে। সব পত্রিকায় নয়, একটি মাত্র পত্রিকায়। হারানো বিজ্ঞপ্তি, বাড়ি ভাড়া, ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে নতুন ধরনের একটি বিজ্ঞাপন। শিরোনাম — পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার শব্দটির আলাদা একটি মোহ আছে। বিজ্ঞাপনটা অনেকেই পড়ল। কেউ মাথা ঘামাল না। কারণ একটা অংকের ধাঁধা দেয়া। বলা হয়েছে, কেউ এটা পারলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কোন ঠিকানা নেই, বক্স নম্বর দেয়া। অল্প বয়েসী কিছু উৎসাহী ছেলেপুলে ধাঁধাটি নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা করল। কেউ মনে হয় সমাধান করতে পারল না। কারণ পরের সপ্তাহে আবার বিজ্ঞাপনটি বেরুল। তার পরের সপ্তাহে আবার। পরপর চার সপ্তাহ ছাপা হবার পর বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু না, অন্য একটি পত্রিকায় আবার ছাপা হল। সেই পত্রিকায় পরপর চার সপ্তাহ ছাপা হবার পর অন্য একটি পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনটি এ রকম —

পুরস্কৃত করা হবে

নীচে একটি অংকের সমস্যা দেয়া হল।
এর সমাধান কেউ করতে পারলে তাকে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পুরস্কৃত করা হবে। সমাধান ও পূর্ণ
নাম-ঠিকানাসহ যোগাযোগ করুন।
জিপিও পোস্ট বক্স নং ৩১১

$$\begin{vmatrix} ২১১ & ৭৩০ \\ ১০১ & ১২ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ১১ \\ ০ \end{vmatrix} = ১১ ৫$$

$$\begin{vmatrix} ২০০০ & ৭ \\ ১৫১ & ৪০ \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} ৪৩১ \\ ? \end{vmatrix} = ১ ১৭$$

ছমাস ধরে বিজ্ঞাপন ঘুরে ঘুরে সব ক'টি বড় বড় পত্রিকায় ছাপা হল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল। কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। পত্র-পত্রিকায় বিচিত্র সব জিনিস ছাপা হয়। দেশে বাতিকগ্রস্তের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে বাড়ছে। বাতিকগ্রস্তরা নিজেদের বাতিক অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়। এ জন্যে পয়সা খরচ করতে তাদের বাধে না। অংকের বিজ্ঞাপনটি নিশ্চয়ই এ রকম অংকের বাতিকওয়ালা কেউ দিয়েছে। কিছুদিন পর আবার নতুন কোন ধাঁধা তার মাথায় আসবে। আবার পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেবে।"

মিসির আলি এক সকালে বিজ্ঞাপনটা পড়লেন। কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন, যদি অঙ্ক সমস্যার কোন সমাধান করা যায়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মিসির আলি সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। কারণ তিনি অতিমানব নন। সাধারণ একজন মানুষ। সুন্দর যুক্তি দাঁড় করাতে পারেন। সর্বপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করতে পারেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এ জগতে কোন রহস্য নেই। কারণ প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না। তারপরেও বারবার প্রকৃতির রহস্যের কাছে তিনি পরাজিত হন। এই পরাজয়ে আনন্দ আছে। সে আনন্দ মিসির আলি পান না। পাঠক হিসেবে আমরা পাই। মিসির আলি চরিত্রটির ধারণা কোত্থেকে পেলাম, কিভাবে পেলাম সেই প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছি। নতুন করে সেই প্রসঙ্গে লিখতে ইচ্ছা করছে না বরং ভূমিকার অংশবিশেষ তুলে দি —

"তখন থাকি নর্থ ডাকোটার ফার্গো শহরে। এক রাতে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি মন্টানায়। গাড়ি চালাচ্ছে আমার স্ত্রী গুলতেকিন। পেছনের সীটে আমি আমার বড় মেয়েকে নিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। গুলতেকিন তখন নতুন ড্রাইভিং শিখেছে। হাইওয়েতে এই প্রথম বের হওয়া। কাজেই কথাবার্তা বলে তাকে বিরক্ত করছি না। চুপ করে বসে আছি এবং খানিকটা আতঙ্কিত বোধ করছি। শুধু মনে হচ্ছে, অ্যাকসিডেন্ট হবে না তো! গাড়ির রেডিও অন করা। কান্ট্রি মিউজিক হচ্ছে। ইংরেজি গানের কথা মন দিয়ে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শুনতে ইচ্ছে করে না। কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না এই অবস্থা। হঠাৎ গানের একটা কলি শুনে চমকে উঠলাম —

Close your eyes and try to see

বাহ্, মজার কথা তো! আমি নিশ্চিত, মিসির আলি চরিত্রের ধারণা সেই রাতেই আমি পেয়ে যাই: মিসির আলি এমন একজন মানুষ যিনি দেখার চেষ্টা করেন চোখ বন্ধ করে। চোখ খুলেই যেখানে কেউ দেখে না সেখানে চোখ বন্ধ করে পৃথিবী দেখার এক আশ্চর্য ফলবতী চেষ্টা।

মিসির আলিকে নিয়ে লিখলাম অবশ্যি তারো অনেক পরে। প্রথম লেখা উপন্যাস 'দেবী'। মিসির আলি নামের অতি সাধারণ মোড়কে একজন অসাধারণ মানুষ তৈরির চেষ্টা 'দেবী'তে প্রথম করা হয়। মিসির আলি এমন একজন মানুষ যাঁর কাছে প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলাই একমাত্র সত্য। রহস্যময়তায় অস্পষ্ট জগৎ ইনি স্বীকার করেন না। সাধারণত যুক্তিবাদী মানুষ আবেগবর্জিত হন। যুক্তি এবং আবেগ পাশাপাশি চলতে পারে না। মিসির আলির ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রমের চেষ্টা করা হল। যুক্তি ও আবেগকে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দিলাম। . . ."

মিসির আলিকে নিয়ে আর কি লিখি! সবই তো মনে হয় লেখা হয়ে গেছে। একটা কথা না বললে প্রসঙ্গ অপূর্ণ থাকবে। কথাটা হল — মিসির আলি আমার প্রিয় চরিত্রের একটি। তাঁকে নিয়ে লিখতে আমার সব সময়ই ভাল লাগে। এই নিঃসঙ্গ, হৃদয়বান, তীক্ষ্ণ ধীশক্তির মানুষটি আমাকে সব সময় অভিভূত করেন। যতক্ষণ লিখি, ততক্ষণ তাঁর সঙ্গ পাই। বড় ভাল লাগে।

হিমু

হিমুর ভাল নাম হিমালয়।

বাবা খুব আদর করে ছেলের নাম হিমালয় রাখলেন, যাতে ছেলের হৃদয় হিমালয়ের মত বড় হয়। আকাশ রাখতে পারতেন। আকাশ হিমালয়ের চেয়েও বড়, বিস্তৃত। আকাশ রাখলেন না, কারণ আকাশ স্পর্শ করা যায় না। হিমালয় স্পর্শ করা যায়।

বাবা হিমালয়কে মহাপুরুষ বানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা করে যদি ডাক্তার, ইন্‌জিনীয়ার বানানো যায়, তাহলে মহাপুরুষ বানানো যাবে না কেন? ট্রেনিং-এ মহাপুরুষ কেন হবে না? তিনি ছেলেকে মহাপুরুষ বানানোর বিশেষ ট্রেনিং দেয়া শুরু করলেন। হিমালয় কি মহাপুরুষ হল? না হয়নি। সে যা হয়েছে তা হচ্ছে — 'হিমু'।

হিমুকে নিয়ে প্রথম লিখি মধুবাক্ষী। মধুবাক্ষীর পর, দরজার ওপাশে — সর্বশেষ গ্রন্থের নাম — 'হিমু'।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আসলে হিমু কে? খুব সচেতন পাঠক চট করে হিমুকে চিনে ফেলবেন, কারণ হিমু হল মিসির আলির উল্টো পিঠ। বিজ্ঞানের ভাষায় এন্টি-মিসির আলি।

হিমুর কাজকর্ম রহস্যময় জগৎ নিয়ে। সে চলে এন্টি-লজিকে। সে বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে ঘুরে। রাত জেগে পথে পথে হাঁটে কিন্তু সেই সবচে' বেশি অন্তর্মুখী। মিসির আলি চোখ বন্ধ করে পৃথিবী দেখেন। সে চোখ খোলা রাখে কিন্তু কিছুই দেখে না।

মিসির আলি দেখতে কেমন আমি যেমন জানি না, হিমু দেখতে কেমন তাও জানি না। কোন বই-এ হিমুর চেহারার বর্ণনা নেই। যা আছে তাও খুব সামান্য। সে বর্ণনা থেকে চরিত্রের ছবি আঁকা যায় না। আমার নিজের মনে যে ছবিটি ভাসে তা হল — হাসি-খুশি ধরনের একজন যুবকের ছবি। যে যুবকের মুখে আছে কিশোরের সারল্য। শুধু চোখ দু'টি মিসির আলির চোখের মতই তীক্ষ্ণ। তবে এই দু'টি তীক্ষ্ণ চোখে কৌতুক ঝিকমিক করে। যেন সে সবকিছুতেই মজা পায়।

হিমুকে আনতে হয়েছে একটি বিশেষ কারণে। মিসির আলির জগৎ যে একমাত্র জগৎ নয় তা দেখানোর জন্যেই হিমুর প্রয়োজন হল। লজিক খুব ভাল কথা, সেই সঙ্গে এন্টি-লজিকও যে লজিক এই তথ্যটিও মনে রাখা দরকার। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনে এসে পৃথিবী থেমে যায়নি। বস্তুজগতের মূল অনুসন্ধান করতে করতে এখন বিজ্ঞানীরা পাচ্ছেন — আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক, চার্ম, স্ট্রেঞ্জ . . . হচ্ছে কি এসব! — কোথায় যাচ্ছি আমরা? আমরা কি খুব ধীরে ধীরে লজিকের জগতের বাইরে পা বাড়াচ্ছি না? এই জগতের কথা তো মিসির আলিকে দিয়ে বলানো যাবে না। আমাদের দরকার একজন হিমু।

সম্প্রতি এক ইন্টারভ্যুতে আমাকে জিজ্ঞেস করা হল -- কার প্রভাব আপনার উপর বেশি — হিমুর, না মিসির আলির? আমি একটু থমকে গেলাম। দু'টি চরিত্রই আমার তৈরি। প্রশ্নকর্তার কি উচিত ছিল না জিজ্ঞেস করা — আপনার প্রভাব এই দু'টি চরিত্রের উপর কেমন পড়েছে?

পরক্ষণেই মনে হল প্রশ্নকর্তা ঠিক প্রশ্নই করেছেন — এক সময় আমি এদের সৃষ্টি করেছিলাম কিন্তু এরা এখন আমার পুরো নিয়ন্ত্রণে নেই। এদের ভেতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এরাই বরং এখন আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমার নিজের সত্তার ৩০% হিমু, ৩০% মিসির আলি। বাকি চল্লিশ কি আমি জানি না। জানতে চাইও না।

মহামতি ফিহা

আমার লেখা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে ফিহা ঘুরেফিরে আসেন। হিমু এবং মিসির আলির মত তিনি কিন্তু এক ব্যক্তি নন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। কোনটাতে তিনি মহাগণিতজ্ঞ। কোনটাতে পদার্থবিদ। যিনি চতুর্মাত্রিক জগতের সন্ধান দিয়েছেন। আমি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞান আমার অতিপ্রিয় বিষয়ের একটি। মহাপুরুষদের জীবনী আমি যতটুক আগ্রহ নিয়ে পড়ি, মহান বিজ্ঞানীদের জীবনীও ঠিক ততটুক আগ্রহ

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নিয়েই পড়ি। সৃষ্টির বহস্য জানার জন্যে যে ব্যাকুলতা বিজ্ঞানীদের মধ্যে কাজ করে সেই ব্যাকুলতা মহাপুরুষদের ব্যাকুলতার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়, আমি আমার লেখায় ঠিক এই কারণেই মহান বিজ্ঞানীদের ছবি এঁকেছি গভীর মমতায়। যেমন — ফিহা। ইনি দেখতে কেমন? চোখ বন্ধ করলে যে ছবিটি ভেসে ওঠে তা অনেকটা আইনস্টাইনের ছবির মত। তবে মাথার সব চুল ধবধবে শাদা। চোখে মুখে একটু রাগী ভঙ্গি আছে। এই রাগী ভঙ্গিটি কেন আছে আমি ঠিক জানি না। ইনি বাস করেন শিশুদের জগতে। কেউ কখনো সেই জগৎ থেকে মহামতি ফিহাকে বের করতে পারে না। মজাটা এখানেই। মিসির আলি, হিমু এবং ফিহাদের একটা জায়গায় মিল -- এরা সবাই সিঙ্গল, বন্ধুহীন। সচেতন পাঠকরা এর থেকে কিছু বের করতে পারেন?

জরী, পরী, তিলু, বিলু, নীলু ও রানু

নারী চরিত্রে এই নামগুলি আমি বারবার ব্যবহার করেছি। এবং এখনো করছি। বারবার ব্যবহার করা হলেও এরা একই চরিত্র নয়। আলাদা চরিত্র। উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এইসব দিনরাত্রির নীলু হল বড় ভাবী। আর নীল হাতীর নীলুর বয়স হল সাত।

সে যাই হোক, আমার নায়িকারা সবাই অসম্ভব 'রূপবতী'। ওরকম কেন? রূপ দেয়ার ক্ষমতা যখন আমার হাতে তখন কেন জানি কার্পণ্য করতে ইচ্ছে করে না।

আমার ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত যত লেখালেখি তার বেশির ভাগ নায়িকা পরী, তিলু, বিলু, নীলু, রানু। নামগুলি সহজ এবং ঘরোয়া। ব্যবহার করতে ভাল লাগে। খুব পরিচিত মনে হয়।

ছাব্বিশ বছর বয়সে একটি বালিকার সঙ্গে পরিচয় হবার পর নতুন একজন নায়িকা লেখায় উঠে আসে। তার নাম জরী। বলাই বাহুল্য, সেও অসম্ভব রূপবতী। এই নায়িকা আমার পরবর্তী সব লেখাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে। কারণ যে বালিকার ছায়া দিয়ে জরী নামক চরিত্রের সৃষ্টি, সেই বালিকাটি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। সাতাশ বছর বয়সে তাকে আমি বিয়ে করি। তখন তার বয়স মাত্র পনেরো। এই মেয়েটি আমার লেখালেখিতে খুব কাজে আসে। না, রাত জেগে চা বানানোর কথা বলছি না। আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই বলেই কিশোরীর বিচিত্র মনোজগৎ সম্পর্কে জানতে পারি। একজন কিশোরীর তরুণীতে রূপান্তরের সেই বিস্ময়কর প্রক্রিয়াটিও দেখা হয়। সবই উঠে আসে লেখায়।

আমার প্রথম দিকের লেখায় নায়িকাদের বয়স খুব কম — কারণ আমার স্ত্রী, তার বয়স কম। আস্তে আস্তে আমার নায়িকাদের বয়স বাড়ে, কারণ আমার স্ত্রীর বয়স বাড়ছে। ইদানিংকালের উপন্যাসে আমার নায়িকারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। কারণ গুলতেকিন (আমার স্ত্রীর কথা বলছি) বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। তাহলে কি এই দাঁড়াবে যে সে যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে তখন আমার নায়ক–নায়িকারা হবে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নিজেকে এই ভেবে সান্ত্বনা দেই — না তা কেন হবে? আমার মেয়েরা এখন বড় হচ্ছে; আরো খুব কাছ থেকে তাদের দেখছি। এরা হবে আমার ভবিষ্যৎ উপন্যাসের নায়িকা।

এখনো আমার কত কথা জমা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, কিছুই তো বলা হয়নি, অথচ সময় কত দ্রুত চলে যাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বছরের ছুটি নিয়েছিলাম। সেই ছুটিও ফুরিয়ে যাচ্ছে, অথচ একটি পৃষ্ঠাও লেখা হয়নি। মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়। বুকের ভেতর ধক্ করে উঠে। মনে হয় —

"ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে।"

আমি প্রার্থনা করি — হে মঙ্গলময়, তুমি আমাকে শক্তি দাও। ক্ষমতা দাও যেন আমি আমার কাজ শেষ করতে পারি। তুমি আমাকে পথ দেখাও। আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না।

গুলতেকিন একসময় জেগে উঠে বলে, কি হয়েছে?

আমি হেসে তাকে আশ্বস্ত করি। সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আমি জেগে থাকি। আমার ঘুম আসে না।



বর্ষাযাপন

কয়েক বছর আগের কথা। ঢাকা শহরের এক কম্যুনিটি সেন্টারে বিয়ে খেতে গিয়েছি। চমৎকার ব্যবস্থা। অতিথির সংখ্যা কম। প্রচুর আয়োজন। থালা-বাসনগুলি পরিচ্ছন্ন। যারা পোলাও খাবেন না তাঁদের জন্যে সরু চালের ভাতের ব্যবস্থা। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দেখলাম বেশকিছু বিদেশী মানুষও আছেন। তাঁরা বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে আগ্রহী। দেখাবার মত কোন অনুষ্ঠান নেই বলে কন্যা-কর্তা খানিকটা বিব্রত। এটা শুধুমাত্র খাওয়ার অনুষ্ঠান তা বলতে বোধহয় কন্যা-কর্তার খারাপ লাগছে। বিদেশীরা যতবারই জানতে চাচ্ছে, মূল অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে? ততবারই তাঁদের বলা হচ্ছে, হবে হবে।

কোণার দিকের একটা ফাঁকা টেবিলে খেতে বসেছি। আমার পাশের চেয়ারে এক বিদেশী ভদ্রলোক এসে বসলেন। আমার কিছুটা মেজাজ খারাপ হল। মেজাজ খারাপ হবার প্রধান কারণ — ইনি সঙ্গে করে কাঁটা চামচ নিয়ে এসেছেন। এঁদের এই আদিখ্যেতা সহ্য করা মুশকিল। কাঁটা চামচ নিশ্চয়ই এখানে আছে। সঙ্গে করে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি আগেও লক্ষ করেছি, যারা কাঁটা চামচ দিয়ে খায় তারা হাতে যারা খায় তাদের বর্বর গণ্য করে। যেন সভ্য জাতির একমাত্র লগো হল

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কাঁটা চামচ। পাশের বিদেশী তাঁর পরিচয় দিলেন। নাম পল অরসন। নিবাস নিউমেক্সিকোর লেক সিটি। কোন এক এনার্জি ও র সঙ্গে যুক্ত আছেন। বাংলাদেশে এসেছেন অল্প দিন হল। এখনো ঢাকার বাইরে যাননি। বিমানের টিকিট পাওয়া গেলে সামনের সপ্তাহে কক্সবাজার যাবেন।

কিছু জিজ্ঞেস না করলে অভদ্রতা হয় বলেই বললাম, বাংলাদেশ কেমন লাগছে?

পল অরসন চোখ বড় বড় করে বলল, Oh, wonderful!

এদের মুখে Oh wonderful শুনে আহ্লাদিত হবার কিছু নেই। এরা এমন বলেই থাকে। এরা যখন এদেশে আসে তখন তাদের বলে দেয়া হয়, নরকের মত একটা জায়গায় যাচ্ছ। প্রচণ্ড গরম। মশা-মাছি। কলেরা-ডায়ারিয়া। মানুষগুলিও খারাপ। বেশির ভাগই চোর। যারা চোর না তারা ঘুষখোর। এরা প্রোগ্রাম করা অবস্থায় আসে, সেই প্রোগ্রাম ঠিক রেখেই বিদেয় হয়। মাঝখানে Oh wonderful জাতীয় কিছু ফাঁকা বুলি আওড়ায়।

আমি পল অরসনের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বললাম, তুমি যে ওয়ান্ডারফুল বললে, শুনে খুশি হলাম। বাংলাদেশের কোন্ জিনিসটা তোমার কাছে ওয়ান্ডারফুল মনে হয়েছে?

পল বলল, তোমাদের বর্ষা।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। এ বলে কি! আমি আগ্রহ নিয়ে পলের দিকে তাকালাম। পল বলল, বৃষ্টি যে এত সুন্দর হতে পারে এদেশে আসার আগে আমি বুঝতে পারিনি। বৃষ্টি মনে হয় তোমাদের দেশের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। তুমি শুনলে অবাক হবে, আমি একবার প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে রিকশার হুড ফেলে মতিঝিল থেকে গুলশানে গিয়েছি। আমার রিকশাওয়ালা ভেবেছে, আমি পাগল।

আমি পলের দিকে ঝুঁকে এসে বললাম, তোমার কথা শুনে খুব ভাল লাগল। অনেক বিদেশীর অনেক সুন্দর কথা আমি শুনেছি, কিন্তু তোমার মত সুন্দর কথা আমাকে এর আগে কেউ বলেনি। এত চমৎকার একটি কথা বলার জন্যে তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হল।

পল অবাক হয়ে বলল, আমি কি অপরাধ করেছি?

'পকেট থেকে কাঁটা চামচ বের করে অপরাধ করেছ।'

পল হো-হো করে হেসে ফেলল। বিদেশীরা এমন প্রাণখোলা হাসি হাসে না বলেই আমার ধারণা। পল অরসনের আরো কিছু ব্যাপার আমার পছন্দ হল। যেমন, খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, নাও, সিগারেট নাও।

বিদেশীরা এখন সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে। তারা সিগারেট তৈরি করে গরিব দেশগুলিতে পাঠায়। নিজেরা খায় না। ভাবটা এরকম — অন্যরা মরুক, আমরা বেঁচে থাকব। তারপরেও কেউ কেউ খায়। তবে তারা কখনো অন্যদের সাধে না।

আমি পলের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলাম। পানের ডাল' সাজানো ছিল। পল নিতান্ত পরিচিত ভঙ্গিতে পান মুখে দিয়ে চুন খুঁজতে লাগল। এধরনের সাহেবদের সঙ্গে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ গল্প করা যায়। বর্ষা নিয়েই কথা বলা যেতে পারে। তাছাড়া গরম পড়েছে প্রচণ্ড। এই গরমে বৃষ্টির কথা ভাবতেও ভাল লাগে। আমি বললাম, পল, তোমার বর্ষা কখন ভাল লাগে?

পল অরসন অবিকল বৃদ্ধা মহিলাদের মত পানের পিক ফেলে হাসিমুখে বলল, সে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছি দুপুরে। প্লেন থেকে নেমেই দেখি প্রচণ্ড রোদ, প্রচণ্ড গরম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। আমি ভাবলাম, সর্বনাশ হয়েছে! এই দেশে থাকব কি করে? বনানীতে আমার জন্যে বাসা ঠিক করে রাখা হয়েছিল। সেখানে এয়ারকুলার আছে বলে আমাকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছে। আমি ভাবছি, কোনমতে বাসায় পৌঁছে এয়ারকুলার ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকব। ঘরে কোন চৌবাচ্চা থাকলে সেখানেও গলা ডুবিয়ে বসে থাকা যায়।

বাসায় পৌঁছে দেখি, এয়ারকুলার নষ্ট। সারাই করার জন্যে ওয়ার্কশপে দেয়া হয়েছে। মেজাজ কি যে খারাপ হল বলার না। ছটফট করতে লাগলাম। এক ফোঁটা বাতাস নেই। ফ্যান ছেড়ে দিয়েছি, ফ্যানের বাতাসও গরম।

বিকেলে এক মিরাকল ঘটে গেল। দেখি, আকাশে মেঘ জমেছে। ঘন কালো মেঘ। আমার বাবুর্চি ইয়াছিন দাঁত বের করে বলল, কালবোশেখী কামিং স্যার। ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না। মনে হল, আনন্দজনক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝপ করে গরম কমে গেল। হিমশীতল হাওয়া বইতে লাগল। শরীর জুড়িয়ে গেল। অতপর নামল বৃষ্টি। প্রচণ্ড বর্ষণ, সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। বাবুর্চি ইয়াছিন ছুটে এসে বলল, স্যার, শিল পড়তাছে, শিল। বলেই ছাদের দিকে ছুটে গেল। আমিও গেলাম পেছনে পেছনে। ছাদে উঠে দেখি, চারদিকে মহা আনন্দময় পরিবেশ। আশেপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি করে শিল কুড়াচ্ছে। আমি এবং আমার বাবুর্চি আমরা দুজনে মিলে এক ব্যাগ শিল কুড়িয়ে ফেললাম। আমি ইয়াছিনকে বললাম, এখন আমরা এগুলি দিয়ে কি করব?

ইয়াছিন দাঁত বের করে বলল, ফেলে দিব।

আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। প্রথম তুষারপাতের সময় আমরা তুষারের ভেতর ছোটাছুটি করতাম। তুষারের বল বানিয়ে একে অন্যের গায়ে ছুঁড়ে দিতাম। এখানেও তাই হচ্ছে। সবাই বৃষ্টির পানিতে ভিজে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

আমি পলকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,

এসো কর স্নান নবধারা জলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে।

পল বলল, তুমি কি বললে?

'রবীন্দ্রনাথের গানের দুটি লাইন বললাম। তিনি সবাইকে আহ্বান করছেন — বর্ষার প্রথম জলে স্নান করার জন্যে!'

'বল কি : তিনি সবাইকে বৃষ্টির পানিতে ভিজতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

'তিনি আর কি বলেছেন?'

'আরো অনেক কিছুই বলেছেন। তাঁর কাব্যের একটা বড় অংশ জুড়েই আছে বর্ষা।'

'বল কি!'

'শুধু তাঁর না, এদেশে যত কবি জন্মেছেন তাঁদের সবার কাব্যের বড় একটা অংশ জুড়ে আছে বর্ষা।'

পল খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, বর্ষা নিয়ে এ পর্যন্ত লেখা সবচে' সুন্দর কবিতাটি আমাকে বল তো, প্লীজ।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম,

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।

'এই এক লাইন?'

'হ্যাঁ, এক লাইন।'

'এর ইংরেজি কি?'

'এর ইংরেজি হয় না।'

'ইংরেজি হবে না কেন?'

'আক্ষরিক অনুবাদ হয়। তবে তার থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে —

Patter patter rain drops, flood in the river.'

পল বিস্মিত হয়ে বলল, আমার কাছে তো মনে হচ্ছে খুবই সাধারণ একটা লাইন।

'সাধারণ তো বটেই। তবে অন্যরকম সাধারণ। এই একটি লাইন শুনলেই আমাদের মনে তীব্র আনন্দ এবং তীব্র ব্যথাবোধ হয়। কেন হয় তা আমরা নিজেরাও ঠিক জানি না।'

পল হা করে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, বর্ষা সম্পর্কে এরকম মজার আর কিছু আছে?

আমি হাসিমুখে বললাম, বর্ষার প্রথম মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের কিছু মাছের মাথা খারাপের মত হয়ে যায়। তারা পানি ছেড়ে শুকনায় উঠে আসে।

'আশা করি তুমি আমার লেগ পুলিং করছ না।'

'না, লেগ পুলিং করছি না। আমাদের দেশে এরকম ফুল আছে যা শুধু বর্ষাকালেই ফুটে। অদ্ভুত ফুল। পৃথিবীর আর কোন ফুলের সঙ্গে এর মিল নেই। দেখতে সোনালি একটা টেনিস বলের মত। যতদিন বর্ষা থাকবে ততদিন এই ফুল থাকবে। বর্ষা শেষ, ফুলও শেষ।'

'ফুলের নাম কি?'

'কদম।'

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, এই ফুল সম্পর্কে একটা মজার ব্যাপার হল — বর্ষার প্রথম কদম ফুল যদি কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে দেয় তাহলে তাদের সম্পর্ক হয় বিষাদময়। কাজেই এই ফুল কেউ কাউকে দেয় না।

'এটা কি একটা মীথ?'

'হ্যাঁ, মীথ বলতে পার।'

পল তার নোটবই বের করে কদম ফুলের নাম লিখে নিল। আমি সেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের চারটি চরণও লিখে দিলাম।

তুমি যদি দেখা না দাও
করো আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।

(If thou showest me not thy face,
If thou leavest me wholly aside,
I know not how I am to pass
These long rainy hours.)

পল অবসনের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। তবে ঘোর বর্ষার সময় আমি যখন রাস্তায় থাকি তখন খুব আগ্রহ নিয়ে চারদিকে তাকাই, যদি রিকশার হুড-ফেলা অবস্থায় ভিজতে ভিজতে কোন সাহেবকে যেতে দেখা যায়।

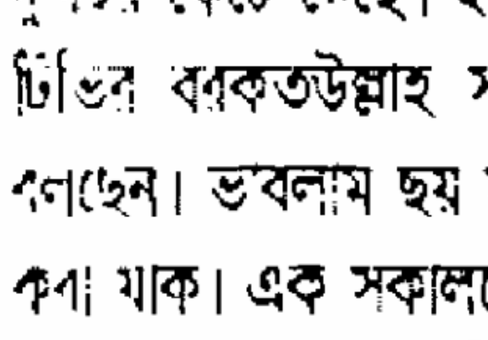

ফ্রাংকেনস্টাইন

আমি কি করে এক দানব তৈরি করলাম সেই গল্প আপনাদের বলি। অয়োময়ের পর দু'বছর কেটে গেছে। হাতে কিছু সময় আছে। ভাবলাম সময়টা কাজে লাগানো যাক। টিভির বরকতউল্লাহ সাহেব অনেক দিন থেকেই তাঁকে একটা নাটক দেবার কথা বলছেন। ভাবলাম ছয় সাত এপিসোডের একটা সিরিজ নাটক তাঁকে দিয়ে আবার শুরু করা যাক। এক সকালবেলা তাঁর সঙ্গে চা খেতে খেতে সব ঠিক করে ফেললাম। নাটক লেখা হবে ভূতপ্রেত নিয়ে। নাম ছায়াসঙ্গী। দেখলাম নাটকের বিষয়বস্তু শুনে তিনি তেমন ভরসা পাচ্ছেন না। আমি বললাম, ভাই আপনি কিছু ভাববেন না। এই নাটক দিয়ে আমরা লোকজনদের এমন ভয় পাইয়ে দেব যে তারা রাতে বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে পারবে না।

বরকতউল্লাহ সাহেব বিরস গলায় বললেন, মানুষদের ভয় দেখিয়ে লাভ কি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

অত্যন্ত যুক্তিসংগত প্রশ্ন। যেভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন তাতে যে কেউ ঘাবড়ে যাবে। আমি অবশ্যি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হলাম যে ভয় পাবার মধ্যেও আনন্দ আছে। কে না জানে সুকুমার কলার মূল ব্যাপারটাই হল আনন্দ। বরকতউল্লাহ সাহেব নিরস্ত্র হলেন। আমি পরদিনই গা ছমছমানো এক ভূতের নাটক নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত। নাটক পড়ে শুনালাম। নিজের নাটক পড়ে আমার নিজেরই গা ছমছম করতে লাগলো। বরকতউল্লাহ সাহেব বললেন, অসম্ভব! এই নাটক বানানোর মত টেকনিক্যাল সাপোর্ট আমাদের নেই। আপনি সহজ কোন নাটক দিন।

আমার মনটাই গেল খারাপ হয়ে। আমি বললাম, দেখি।

'দেখাদেখি না। আপনাকে আজই নাটকের নাম দিতে হবে। টিভি গাইডে নাম ছাপা হবে।'

আমি একটা কাগজ টেনে লিখলাম, কোথাও কেউ নেই।

বরকত সাহেব বললেন, কোথাও কেউ নেই মানে কি? আমি তো আপনার সামনেই বসে আছি।

আমি বললাম, এটাই আমার নাটকের নাম। এই নামে আমার একটা উপন্যাস আছে। উপন্যাসটাই আমি নাটকে রূপান্তরিত করে দেব।

বরকত সাহেব আঁৎকে উঠে বললেন, না না, নতুন কিছু দিন। উপন্যাস তো অনেকের পড়া থাকবে। গল্প আগেই পত্রিকায় ছাপা হয়ে যাবে।

আমি বললাম, এটা আমার খুব প্রিয় লেখার একটি। আপনি দেখুন সুবর্ণাকে পাওয়া যায় কি-না। সুবর্ণাকে যদি পাওয়া যায় তাহলে কম পরিশ্রমে সুন্দর একটা নাটক দাঁড়া হবে।

'সুবর্ণাকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে কি আপনি নতুন নাটক লিখবেন?'

'হ্যাঁ লিখব।'

সুবর্ণাকে পাওয়া গেল। আসাদুজ্জামান নূর বললেন, তিনি বাকেরের চরিত্রটি করতে চান। বাকেরের চরিত্রটি তাঁকেই দেয়া হল। 'ফ্রাংকেনস্টাইন' তৈরির দিকে আমি খানিকটা এগিয়ে গেলাম। বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইনের দানবটা তো মানুষ এক নামে চেনে। বাকের হল সেই 'ফ্রাংকেনস্টাইন'।

নাটকটির সপ্তম পর্ব প্রচারের পর থেকে আমি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম। সবাই জানতে চাচ্ছে বাকেরের ফাঁসি হবে কি-না। রোজ গাদা-গাদা চিঠি। টেলিফোনের পর টেলিফোন। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এই ব্যাকুলতার মানেটা কি? আমি নাটক লিখতে গিয়ে মূল বই অনুসরণ করছি। বই-এ বাকেরের ফাঁসি আছে। নাটকেও তাই হবে। যারা আমাকে চিঠি লিখেছেন তাদের সবাইকেই আমি জানালাম, হ্যাঁ ফাঁসি হবে। আমার কিছু বক্তব্য আছে। বাকেরকে ফাঁসিতে না ঝুলালে সেই বক্তব্য আমি দিতে পারব না। তাছাড়া আমাকে মূল বই অনুসরণ করতে হবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] অধ্যাপিকা আমাকে জানালেন — 'শেক্সপিয়রের রোমিও জুলিয়েট [illegible] লেখা। কিন্তু যখন রোমিও জুলিয়েট ছবি করা হল তখন নায়ক, নায়িকার [illegible] দেখানো হল। আপনি কেন দেখাবেন না? আপনাকে দেখাতেই হবে'।

[illegible] যন্ত্রণা!

[illegible] এটা যন্ত্রণার শুধু শুরু। তবলার ঠুকঠাক। মূল বাদ্য শুরু হল নবম পর্ব [illegible] পর। আমি দশ বছর ধরে টিভিতে নাটক লিখছি এই ব্যাপার আগে দেখিনি। [illegible], মিটিং, মিছিল — 'হুমায়ূনের চামড়া তুলে নেব আমরা।' রাতে ঘুমুতে পারি [illegible] দুটা তিনটায় টেলিফোন। কিছু টেলিফোন তো রীতিমত ভয়াবহ — 'বাকের [illegible] কিছু হলে রাস্তায় লাশ পড়ে যাবে।' আপাতদৃষ্টিতে এইসব কাণ্ডকারখানা [illegible] খারাপ লাগার কথা নয়, বরং ভাল লাগাই স্বাভাবিক। আমার একটি নাটক [illegible] এতসব হচ্ছে এতে অহংবোধ তৃপ্ত হওয়ারই কথা। আমার তেমন ভাল লাগল না। আমার মনে হল একটা কিছু ব্যাপার আমি ধরতে পারছি। দর্শক রূপকথা দেখতে [illegible] কেন? তারা কেন তাদের মতামত আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে? আমি কি লিখব বা না লিখব সেটা তো আমি ঠিক করব। অন্য কেউ আমাকে বলে দেবে কেন?

বাকেরের মত মানুষদের কি ফাঁসি হচ্ছে না?

এ দেশে কি সাজানো মামলা হয় না?

নিরপরাধ মানুষ কি ফাঁসির দড়িতে ঝুলে না?

ঐ তো সেদিনই পত্রিকায় দেখলাম ৯০ বছর পর প্রমাণিত হল লোকটি নির্দোষ। অথচ হত্যার দায়ে ৪০ বছর আগেই তার ফাঁসি হয়ে গেছে।

সাহিত্যের একটি প্রচলিত ধারা আছে যেখানে সত্যের জয় দেখানো হয়। অত্যাচারী মোড়ল শেষ পর্যায়ে এসে মৃত্যুবরণ করেন জাগ্রত জনতার কাছে। বাস্তব [illegible] সেরকম নয়। বাস্তবে অধিকাংশ সময়েই মোড়লরা মৃত্যুবরণ করেন না। বরং বেশ সুখে-শান্তিতেই থাকেন। ৭১-এর রাজাকাররা এখন কি খুব খারাপ আছেন? আমার তো মনে হয় না। কুত্তাওয়ালীরা মরেন না, তাদের কেউ মারতে পারে না। ক্ষমতাবান লোকদের নিয়ে তারা মচ্ছব বসায়। দূর থেকে আমাদের তারা নিয়ন্ত্রণ করে।

আমি আমার নাটকে কুত্তাওয়ালীর প্রতি ঘৃণা তৈরি করতে চেয়েছি। তৈরি করেছিও। কুত্তাওয়ালীকে মেরে ফেলে কিন্তু সেই ঘৃণা আবার কমিয়েও দিয়েছি। আমরা হাঁপ ছেড়ে ভেবেছি — যাক দুষ্ট শাস্তি পেয়েছে! কিন্তু কুত্তাওয়ালী যদি বেঁচে থাকতো তাহলে আমাদের ঘৃণা থেমে যেত না, প্রবহমান থাকতো। দর্শকরা এক ধরনের চাপ নিয়ে ঘুমুতে যেতেন।

আমার মূল উপন্যাসে কুত্তাওয়ালীর মৃত্যু হয়নি, নাটকে হয়েছে। কেন হয়েছে? হয়েছে, কারণ মানুষের দাবীর কাছে আমি মাথা নত করেছি। কেনই বা করব না? মানুষই তো সব, তাদের জন্যেই তো আমার লেখালেখি। তাদের তীব্র আবেগকে আমি মূল্য দেব না তা তো হয় না। তবে তাঁদের আবেগকে মূল্য দিতে গিয়ে আমার কষ্ট হয়েছে। কারণ আমি জানি, আমি যা করছি তা ভুল। আমার লক্ষ্য মানুষের বিবেকের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

উপর চাপ সৃষ্টি করা। সেই চাপ সৃষ্টি করতে হলে দেখাতে হবে যে কুত্তাওয়ালীরা বেঁচে থাকে। মারা যায় বাকেররা।

যে কারণে নাটকে কুত্তাওয়ালীর বেঁচে থাকা প্রয়োজন ছিল ঠিক সেই কারণেই বাকেরের মৃত্যুরও প্রয়োজন ছিল। বাকেরের মৃত্যু না হলে আমি কিছুতেই দেখাতে পারতাম না যে এই সমাজে কত ভয়াবহ অন্যায় হয়। আপনাদের কি মনে আছে যে একজন মানুষ (?) পনেরো বছর জেলে ছিল যার কোন বিচারই হয়নি। কোর্টে তার মামলাই ওঠেনি। ভিন দেশের কোন কথা না। আমাদের দেশেরই কথা।

ভয়াবহ অন্যায়গুলি আমরাই করি। আমাদের মত মানুষরাই করে এবং করায়। কিছু কিছু মামলায় দেখা গেছে পুলিশ অন্যায় করে, পোস্টমর্টেম যে ডাক্তার করেন তিনি অন্যায় করেন, ধুরন্ধর উকিলরা করেন। রহিমের গামছা চলে যায় করিমের কাঁধে।

পত্রিকায় দেখলাম, ১৮০ জন আইনজীবী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন আমি নাকি এই নাটকে খারাপ উকিল দেখিয়ে তাঁদের মর্যাদাহানি করেছি। আমি ক্ষমা প্রার্থনা না করলে তারা আদালতের আশ্রয় নেবেন। উকিল সাহেবদের অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, এই নাটকে একজন অসম্ভব ভাল উকিলও ছিলেন। মুনার উকিল। যিনি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন সত্য প্রতিষ্ঠার। একশত আশিজন আইনজীবী নিজেদেরকে সেই উকিলের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে বদ উকিলের সঙ্গে করলেন। কেন?

আমাদের সমাজে কি কুত্তাওয়ালীর উকিলের মত উকিল নেই? এমন আইনজীবী কি একজনও নেই যারা দিনকে রাত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন না? মিথ্যা সাক্ষী কি আইনজীবীদেরই কেউ কেউ তৈরি করে দেন না? যদি না দেন, তা হলে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেন কাঁদে?

অতি অল্পতেই দেখা যাচ্ছে সবার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। আমরা কি করি না করি তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের ভাবমূর্তি বজায় থাকলেই হল। হায়রে ভাবমূর্তি!

আমি মনে হয় মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। নাটকটির শেষ পর্যায়ে আমি টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন করলাম। শেষ পর্বের জন্যে আমি দু'ঘন্টা সময় চাইলাম। আমার পরিকল্পনা ছিল প্রথম এক ঘন্টায় শুধু কোর্ট দেখাব, পরের এক ঘন্টা যাবে বাকি নাটক। কোর্ট দৃশ্যের পর পনেরো দিন অপেক্ষা করা দর্শকের জন্যে কষ্টকর, নাটকের জন্যেও শুভ নয়। যে টেনশান কোর্ট দৃশ্যে তৈরি হবে, পনেরো দিনের বিরতিতে তা নিচে নেমে যাবে। টেনশান তৈরি করতে হবে আবার গোড়া থেকে। আমার বিশ্বাস ছিল টেলিভিশন আমার যুক্তি মেনে নেবে। অতীতে আমার 'অয়োময়' নাটকের শেষ পর্বের জন্য দু'ঘন্টা সময় দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া আমার সবসময় মনে হয়েছে, টেলিভিশনের উপর আমার খানিকটা দাবী আছে। গত দশ বছরে টিভির জন্যে কম সময় তো দেইনি। আবেদনে লাভ হল না। টিভি জানিয়ে দিল — এই নাটকের জন্যে বাড়তি সময় দেয়া হবে না। দর্শকদের জন্যে টিভি, টিভির জন্যে দর্শক নয় — এই কথাটা টিভির কর্তাব্যক্তিরা কবে বুঝবেন কে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জানে। আমি ৭০ মিনিটে গল্পের শেষ অংশ বলার প্রস্তুতি নিলাম। কোর্টের দৃশ্য, কুত্তাওয়ালীর হত্যা দৃশ্য, বাকেরের ফাঁসি সব এর মধ্যেই দেখাতে হবে। শুধু দেখালেই হবে না — সুন্দর করে দেখাতে হবে। দর্শকদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে গভীর বেদনাবোধ।

সন্ধ্যাবেলা হাত-মুখ ধুয়ে লিখতে বসলাম, রাতে ভাত খেতে গেলাম না। পুরোটা এক বৈঠকে বসে শেষ করতে হবে। রাত তিনটায় লেখা শেষ হল। আমি পড়তে দিলাম আমার স্ত্রী গুলতেকিনকে। সে বলল, তোমার কোন একটা সমস্যা আছে। মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। আমি লক্ষ করেছি, তুমি অনেকখানি মমতা দিয়ে একটি চরিত্র তৈরি কর, তারপর তাকে মেরে ফেল। তুমি এইসব দিনরাত্রি'তে টুনীকে মেরেছ। এবার মারলে বাকেরকে।

আমি তাকে কোন যুক্তি দিলাম না। ক্লান্ত হয়ে ঘুমুতে গেলাম। ঘুম হল না। আবার উঠে এসে বারান্দায় বসলাম। অনেকদিন পর ভোর হওয়া দেখলাম। ভোরের প্রথম আলো মনের অস্পষ্টতা কাটাতে সাহায্য করে। আমার বেলাতেও করলো। আমার মন বলল, আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বাকেরকে মরতেই হবে।

যেদিন নাটক প্রচারিত হবে তার আগের দিন রাতে দৈনিক বাংলার আমার সাংবাদিক বন্ধু হাসান হাফিজ ব্যস্ত হয়ে টেলিফোন করলেন। আমাকে বললেন, আগামীকাল প্রেসক্লাবের সামনে বাকের ভাইয়ের মুক্তির দাবীতে সমাবেশ হবে। সেখান থেকে তারা আপনার এবং বরকতউল্লাহ সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করবে। পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। আপনি সরে যান।

নিজের ঘরে বসে সবাইকে নিয়ে আমার নাটক দেখার অভ্যাস। এই প্রথমবার নাটক প্রচারের দিন বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যেতে হল। খবর নিয়ে জানলাম, বাড়ির সামনের রাস্তায় কয়েকটা ককটেল ফাটানো হয়েছে। রাগী কিছু ছেলে ঘোরাফেরা করছে। পুলিশ চলে এসেছে। বাসায় ফিরলাম রাত একটায়। দরজার ফাঁক দিয়ে কারা যেন দু'টা চিঠি রেখে গেছে। একটা চিঠিতে লেখা, 'বাকেরের যেভাবে মৃত্যু হল আপনার মৃত্যুও ঠিক সেইভাবেই হবে। আমরা আপনাকে ক্ষমা করলেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।' রাত দু'টার সময় ধানমন্ডি থানার একজন সাব ইন্সপেক্টর সাহেব আমাকে জানালেন, আপনি কোন ভয় পাবেন না। আমরা আছি।

প্রচন্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে রাতে ঘুমুতে গেলাম। এপাশ-ওপাশ করছি। কিছুতেই ঘুম আসছে না। আমার ছোট মেয়েটাও জেগে আছে। সেও ঘুমুতে পারছে না। তার নাকি বাকের ভাইয়ের জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি মেয়েকে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। মেয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাবা তুমি উনাকে কেন মেরে ফেললে? আমি মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, গল্পের একজন বাকের মারা গেছে যাতে সত্যিকার বাকেররা কখনো না মারা যায়।

কথাটা হয়তো আমার ক্লাস ফোরে পড়া মেয়ের জন্যে একটু ভারী হয়ে গেল। ভারী হলেও এটাই আমার কথা। এই কথা নাটকের ভেতর দিয়ে যদি বুঝাতে না পেরে থাকি তবে তা আমার ব্যর্থতা। আমি আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে চেষ্টা করেছি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার চেষ্টায় কোন খাদ ছিল না। এইটুকু আমি আপনাদের বলতে চাই। বাকেরের মৃত্যুতে আপনারা যেমন ব্যথিত আমিও ব্যথিত। আমার ব্যথা আপনাদের ব্যথার চেয়েও অনেক অনেক তীব্র। বিজ্ঞানী ডঃ ফ্রাংকেনস্টাইন নিজের তৈরি দানবটাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে নিজেই ধ্বংস হলেন নিজের সৃষ্টির হাতে। আমি বেঁচে আছি; কিন্তু বাকের নামের একটি চরিত্রও তৈরি করেছিলাম। আজ সে নেই। মুনা আছে, সে কোনদিনই বাকেরকে নিয়ে দৃষ্টিতে ভিজতে পারবে না। মুনার এই কষ্ট আমি বুকে ধারণ করে আছি। আপনারা ভুলে যাবেন। আমি তো ভুলব না। আমাকে বেঁচে থাকতে হবে মুনার কষ্ট হৃদয়ে ধারণ করে।



চাম্নি পসর রাইত

আলাউদ্দিন নামে আমার নানাজানের একজন কামলা ছিল। তাকে ডাকা হত আলাদ্দি। কামলা শ্রেণীর লোকদের পুরো নামে ডাকার চল ছিল না। পুরো নাম ভদ্রলোকদের জন্যে। এদের আবার নাম কি? একটা কিছু ডাকলেই হল। 'আলাদ্দি' যে ডাকা হচ্ছে এই-ই যথেষ্ট।

আলাউদ্দিনের গায়ের রঙ ছিল কুচকুচে কালো। এমন ঘন কৃষ্ণবর্ণ সচরাচর দেখা যায় না। মাথাভর্তি ছিল বাবরি চুল। তার চুলের যত্ন ছিল দেখার মত। জবজবে করে তেল মেখে মাথাটাকে সে চকচকে রাখতো। আমাকে সে একবার কানে কানে বলল, বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা, মানুষের পরিচয় হইল চুলে। যার চুল ঠিক তার সব ঠিক।

কামলাদের মধ্যে আলাউদ্দিন ছিল মহা ফাঁকিবাজ। কোন কাজে তাকে পাওয়া যেত না। শীতের সময় গ্রামে যখন যাত্রা বা গানের দল আসতো তখন সে অবধারিতভাবে গানের দলের সঙ্গে চলে যেত। মাসখানিক তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যেত না। অথচ শীতের মরশুম হচ্ছে আসল কাজের সময়। এমন ফাঁকিবাজকে কেউ জেনে-শুনে কামলা নেবে না। নানাজান নিতেন, কারণ তাঁর উপায় ছিল না। আলাউদ্দিন বৈশাখ মাসের শুরুতে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে চোখে সুরমা দিয়ে উপস্থিত হত। নানাজানের পা ছুঁয়ে সালাম করে তৃপ্ত গলায় বলতো, মামুজী, দাখিল হইলাম।

নানাজান চেঁচিয়ে বলতেন, যা হারামজাদা, ভাগ।

আলাউদ্দিন উদাস গলায় বলতো, ভাইগ্যা যামু কই? আল্লাপাক কি আমার যাওনের জায়গা রাখছে? রাখে নাই। তার উপরে একটা নয়ন নাই। নয়ন দুইটা ঠিক থাকলে হাঁটা দিতাম। অফমান আর সহ্য হয় না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এর উপর কথা চলে না। তাকে আবারো এক বছরের জন্যে রাখা হত। বারবার সাবধান করে দেয়া হত যেন গানের দলের সঙ্গে পালিয়ে না যায়। সে আল্লার নামে, পাক কোরানের নামে, নবীজীর নামে কসম কাটতো — আর যাবে না।

'মামুজী, আর যদি যাই তাইলে আপনের গু খাই।'

সবই কথার কথা। গানের দলের সঙ্গে তার গৃহত্যাগ ছিল নিয়তির মতো। ফেরানোর উপায় নেই। নানাজান তা ভালমতই জানতেন। বড় সংসারে অকর্মা কিছু লোক থাকেই। এদের উপদ্রব সহ্য করতেই হয়।

আলাউদ্দিনের সঙ্গে আমার পরিচয় নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে। আমরা থাকতাম শহরে। বাবা ছুটি-ছাঁটায় আমাদের নানার বাড়ি নিয়ে যেতেন। আমরা অল্প কিছুদিন থাকতাম। এই সময়টা সে আমাদের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকতো। রাতে গল্প শোনাতো। সবই তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প। তার চেয়েও যা মজার তা হল, তার প্রতিটি গল্পের শুরু চান্নি পসর রাইতে।

'বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা, সেইটা ছেল চান্নি পসর রাইত। আহারে কি চান্নি। আসমান যেন ফাইট্যা টুকরা টুকরা হইয়া গেছে। শইলের লোম দেহা যায় এমুন চান্দের তেজ।'

সাধারণত ভূত-প্রেতের গল্পে অমাবস্যার রাত থাকে। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে অন্ধকার রাতের দরকার হয়। কিন্তু আলাউদ্দিনেব ভূতগুলিও বের হয় চান্নি পসর রাতে। যখন সে বাঘের গল্প বলে, তখন দেখা যায় তার বাঘও চান্নি পসর রাতে পানি খেতে বের হয়।

ছোটবেলায় আমার ধারণা হয়েছিল, এটা তার মুদ্রাদোষ। গল্পে পরিবেশ তৈরির এই একটি কৌশলই সে জানে। দুর্বল গল্পকারের মত একই টেকনিক সে বারবার ব্যবহার করে।

একটু যখন বয়স হল তখন বুঝলাম চাঁদনি পসর রাত আলাউদ্দিনের অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয় বলেই এই প্রসঙ্গে সে বারবার ফিরে আসে। সব কিছুই সে বিচার করতে চায় চান্নি পসর রাতের আলোকে। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। নানাজানদের গ্রামের স্কুলের সাহায্যের জন্য একটা গানের আসর হল। কেন্দুয়া থেকে দু'জন বিখ্যাত বয়াতী আনা হল। হ্যাজাক লাইট-টাইট জ্বালিয়ে বিরাট ব্যাপার। গান হলও খুব সুন্দর। সবাই মুগ্ধ। শুধু আলাউদ্দিন দুঃখিত গলায় জনে জনে বলে বেড়াতে লাগলো, হ্যাজাক বাত্তি দিয়া কি আর গান হয়? এই গান হওয়া উচিত ছিল চান্নি পসর রাইতে। বিরাট বেকুবি হইছে।

সৌন্দর্য আবিষ্কার ও উপলব্ধির জন্যে উন্নত চেতনার প্রয়োজন। তাহলে কি ধরে নিতে হবে আমাদের আলাউদ্দিন উন্নত চেতনার অধিকারী ছিল? যে সৌন্দর্যের উপাসক সে সবকিছুতেই সৌন্দর্য খুঁজে পায়। আলাউদ্দিন তো তা পায়নি। তার সৌন্দর্যবোধ চান্নি পসর রাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন তো হবার কথা না। মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো আলাউদ্দিনের জোছনা-প্রীতির অন্য ব্যাখ্যা দেবেন। তারা বলবেন — এই লোকের অন্ধকার-ভীতি আছে। চাঁদের আলোর জন্যে তার এই আকুলতার পেছনে আছে তার আঁধার-ভীতি Dark Fobia. যে যাই বলুন, আমাকে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জোছনা দেখাতে শিখিয়েছে আলাউদ্দিন। রূপ শুধু দেখলেই হয় না। তীব্র অনুভূতি নিয়ে দেখতে হয়। এই পরম সত্য আমি জানতে পারি মহামূর্খ বলে পরিচিত বোকা-সোকা একজন মানুষের কাছে। আমার মনে আছে, সে আমাকে এক জোছনা রাতে নৌকা করে বড় গাঙে নিয়ে গেল। যাবার পথে ফিসফিস করে বলল, চাচ্চি পসর দেখেন লাগে পানির উফরে, বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা। পানির উফরে চান্দের খেলাই অন্য রকম।

সেবার নদীর উপর চাঁদের ছায়া দেখে তেমন অভিভূত হইনি, বরং নৌকা ডুবে যাবে কি-না এই ভয়েই অস্থির হয়েছিলাম। কারণ নৌকা ছিল ফুটো, গলগল করে পাটাতন দিয়ে পানি ঢুকছিল। ভীত গলায় আমি বললাম, পানি ঢুকছে মামা।

'আরে থও ফালাইয়া পানি, চান্নি কেমন হেইডা কও।'

'খুব সুন্দর।'

'খাইয়া ফেলতে মনে লয় না কও দেহি।'

জোছনা খেয়ে ফেলার তেমন কোন ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবু তাকে খুশি করার জন্যে বললাম, হ্যাঁ। আলাউদ্দিন মহাখুশি হয়ে বলল, আও, তাইলে চান্নি পসর খাই। বলেই সে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদের আলো খাওয়ার ভঙ্গি করতে লাগলো। সে এক বিচিত্র দৃশ্য! আমি আমার একটি উপন্যাসে (অচিনপুর) এই দৃশ্য ব্যবহার করেছি। উপন্যাসের একটি চরিত্র নবু মামা জোছনা খেত।

আলাউদ্দিন যে একজন বিচিত্র মানুষ ছিল তা তার আশেপাশের কেউ ধরতে পারেনি। সে পরিচিত ছিল অকর্মা বেকুব হিসেবে। তার জোছনা-প্রীতিও অন্য কেউ লক্ষ করেছে বলে মনে হয় না। তার ব্যাপারে সবাই আগ্রহী হল যখন সে এক শীতে গানের দলের সঙ্গে চলে গেল, এবং ফিরে এলো এক রূপবতী তরুণীকে নিয়ে। তরুণীর নাম দুলারী। তার রূপ চোখ-ঝলসানো রূপ।

নানাজী গম্ভীর গলায় বললেন, এই মেয়ে কে?

আলাউদ্দিন মাথা চুলকে বলল, বিবাহ করেছি মামুজী। বয়স হইছে। সংসার-ধর্ম করা লাগে। নবীজী সবেরে সংসার-ধর্ম করতে বলছেন।

'সেইটা বুঝলাম। কিন্তু এই মেয়ে কে?'

'হেইটা মামুজী এক বিরাট ইতিহাস।'

'ইতিহাসটা শুনি।'

ইতিহাস শুনে নানাজান গম্ভীর হয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, এরে নিয়া বিদায় হ। আমার বাড়িতে জায়গা নাই।

আলাউদ্দিন স্টেশনের কাছে ছাপড়া ঘর তুলে বাস করতে লাগল। ট্রেনের টাইমে স্টেশনে চলে আসে, কুলিগিরি করে। ছোটখাট চুরিতেও সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। থানাওয়ালারা প্রায়ই তাকে ধরে নিয়ে যায়। তার বৌ নানাজানের কাছে ছুটে আসে। নানাজান বিরক্তমুখে তাকে ছাড়িয়ে আনতে যান। নিজের মনে গজগজ করেন — এই যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না!

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নানাজানকে যন্ত্রণা বেশিদিন সহ্য করতে হল না। আলাউদ্দিনের বৌ এক শীতে এসেছিল, আরেক শীতের আগেই মারা গেল। আলাউদ্দিন স্ত্রীর লাশ কবরে নামিয়ে নানাজানকে এসে কদমবুসি করে ক্ষীণ গলায় বলল, দাখিল হইলাম মামুজী।

বছর পাঁচেক পরের কথা। আমার দেশের বাইরে যাওয়া ঠিক হয়েছে। আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে নানার বাড়ি গিয়ে দেখি, আলাউদ্দিনের অবস্থা খুব খারাপ। শরীর ভেঙে পড়েছে। মাথাও সম্ভবত খানিকটা খারাপ হয়েছে। দিন-রাত উঠোনে বসে পাটের দড়ি পাকায়। দড়ির সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলে। খুবই উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক কথাবার্তা। তার একটি চোখ আগেই নষ্ট ছিল। দ্বিতীয়টিতেও ছানি পড়েছে। কিছু দেখে বলে মনে হয় না। চোখে না দেখলেও সে চান্নি পসর সম্পর্কে এখনো খুব সজাগ। এক সন্ধ্যায় হাসিমুখে আমাকে বলল, ও ভাইগ্না ব্যাটা, আইজ যে পুরা চান্নি হেই খিয়াল আছে? চান্নি দেখতে যাবা না? যত পার দেইখ্যা লও। এই জিনিস বেহেশতেও পাইবা না।

সেই আমার আলাউদ্দিনের সঙ্গে শেষ চাঁদনি দেখতে যাওয়া। সে আমাকে মাইল তিনেক হাঁটিয়ে একটা বিলের কাছে নিয়ে এল। বিলের উপর চান্নি নাকি অপূর্ব জিনিস। আমাদের চান্নি দেখা হল না। আকাশ ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। মেঘ কাটল না। এক সময় টুপটুপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আলাউদ্দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, চান্নি আমরার ভাগ্যে নাই। ভাগ্য খুব বড় ব্যাপার ভাইগ্না ব্যাটা। ভাগ্যে না থাকলে হয় না।

আমরা ভিজতে ভিজতে ফিরছি। আলাউদ্দিন নিচু স্বরে কথা বলে যাচ্ছে, ভাগ্যবান মানুষ এই জীবনে একজন দেখছি। তোমার মামীর কথা বলতেছি। নাম ছিল দুলারী। তার মরণ হইল চান্নি পসর রাইতে। কি চান্নি যে নামল ভাইগ্না! না দেখলে বিশ্বাস করবা না। শইল্যের সব লোম দেহা যায় এমন পসর। চান্নি পসরে মরণ তো সহজে হয় না। বেশির ভাগ মানুষ মরে দিনে। বাকিগুলো মরে অমাবস্যায়। তোমার মামীর মত দুই-একজন ভাগ্যবতী মরে চান্নি পসরে। জানি না আল্লাপাক আমার কপালে কি রাখছে। চান্নি পসরে মরণের বড় ইচ্ছা।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর খবর আমি পাই আমেরিকায়। তার মরণ চাঁদনি পসরে হয়েছিল কি-না তা চিঠিতে লেখা ছিল না, থাকার কথাও নয়। কার কি যায় আসে তার মৃত্যুতে? সেই রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আমার স্ত্রীকে বললাম, গুলতেকিন, চল যাই জোছনা দেখে আসি। সে বিস্মিত হয়ে বলল, এই প্রচণ্ড শীতে জোছনা দেখবে মানে? তাছাড়া জোছনা আছে কি-না তাই-বা কে জানে।

আমি বললাম, থাকলে দেখব, না থাকলে চলে আসব।

গাড়ি নিয়ে বের হলাম। পেছনের সীটে বড় মেয়ে নোভাকে শুইয়ে দিয়েছি। সে আরাম করে ঘুমুচ্ছে। মেয়ের মা বসেছে আমার পাশে। গাড়ি চলছে উল্কার বেগে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গুলতেকিন বলল, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, মন্টানার দিকে। মন্টানার জঙ্গলে জোছনা দেখব। সে যে কি সুন্দর দৃশ্য তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না।

গাড়ির ক্যাসেট চালু করে দিয়েছি। গান হচ্ছে — আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে। আমার কেন জানি মনে হল আলাউদ্দিন আমার কাছেই আছে। গাড়ির পেছনের সীটে আমার বড় মেয়ের পাশে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। গভীর আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে সে আমার কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছে।



লালচুল

ভদ্রলোকের বয়স সত্তুরের মত।

মাথার চুল টকটকে লাল। মাথার লালচুলের জন্যেই হয়ত তাঁকে রাগী-রাগী দেখাচ্ছে। তাছাড়া কোমরের মাংসপেশীতে টান পড়ায় তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভঙ্গিটা অনেকটা সাপের ফণা তোলার মত। যেন এক্ষুনি ছোবল দেবেন। আমি বললাম, স্লামালিকুম।

তিনি বললেন, হুঁ।

সালামের উত্তরে সালাম দেয়াটাই প্রচলিত বিধি। তিনি হুঁ বলে এড়িয়ে গেলেন। তবে আপ্যায়ন বা শিষ্টতার কোন অভাব হল না। আমাকে হাত ধরে বসালেন। কাজের ছেলেকে চা দিতে বললেন।

আমার কাছে মনে হল ভদ্রলোক অসুস্থ। তাঁর মাথার চুল যেমন লাল চোখ দুটিও লাল। খুব ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছেন। আমি এত দ্রুত কাউকে চোখের পাতা ফেলতে দেখিনি। বয়স বাড়লে মানুষ ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলে কি-না তাও লক্ষ করিনি। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ভদ্রলোক বললেন, আমার চোখে সমস্যা আছে। চোখে অশ্রুগ্রন্থি বলে কিছু ব্যাপার আছে। সেখান থেকে জলীয় পদার্থ বের হয়ে সব সময় চোখ ভিজিয়ে রাখে। আমার ঐসব গ্রন্থি নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি বললাম, আপনার চুল এমন লাল কেন?

উনি বললেন, রঙ দিয়ে লাল করেছি। মেন্দী পাতা এবং কাঁচা হলুদের সঙ্গে সামান্য খানকুনি পাতা বেটে মিশিয়ে একটা পেস্টের মত তৈরি করে চুলে মাখলেই চুল এমন লাল হয়। আপনি যখন আমার মত বুড়ো হবেন, মাথার চুল সব পেকে যাবে,

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তখন মাথায় রঙ ব্যবহার করতে পারেন। মাথায় রঙ ব্যবহার করা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ নয়। নবী-এ-করিমের হাদিস আছে। তিনি 'খেজাব' ব্যবহার করার পক্ষে মত দিয়েছেন। 'খেজাব' হচ্ছে এক ধরনের রঙ যা চুলে লাগানো হয়।

'ও আচ্ছা।'

'মাথাভর্তি সাদা চুল আমার পছন্দ না। সাদা চুল হল White Flag, যা মনে করিয়ে দেয় খেলা শেষ হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে নাও। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা শেষ প্রহর।'

'আপনি তৈরি হতে চাচ্ছেন না!'

'তৈরি তো হয়েই আছি। শাদা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে সবাইকে জানাতে চাচ্ছি না।'

ভদ্রলোকের বাড়ি প্রকাণ্ড। বেশির ভাগ প্রকাণ্ড বাড়ির মত এ বাড়িটিও খালি। তাঁর দুই মেয়ে। দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তারা স্বামীর সঙ্গে বাইরে থাকে। পত্নী বিয়োগ হয়েছে চার বছর আগে। এগারো কামরার বিশাল বাড়িতে ভদ্রলোক কিছু কাজের লোকজন নিয়ে থাকেন। পুরোপুরি নিঃসঙ্গ মানুষরা নানান ধরনের জটিলতায় ভুগেন। বিচিত্র সব কাজকর্মে তাঁরা থাকতে চেষ্টা করেন। সঙ্গী হিসেবে এরা কখনোই খুব ভাল হয় না। কারণ তারাই সঙ্গী হিসেবে কাউকে গ্রহণ করতে চান না।

এই ভদ্রলোকও দেখলাম তার ব্যতিক্রম নন। তিনি দেখলাম, এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারছেন না। জায়গা বদল করছেন। এবং কিছুক্ষণ পরপর ঘরের ছাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছেন। ভাবটা এ রকম যেন ঘরের ছাদটা কিছুক্ষণের মধ্যে ভেঙে তাঁর মাথায় পড়ে যাবে।

আমি যে কাজের জন্যে এসেছিলাম সেই কাজ সারলাম। ভদ্রলোকের ছোট মেয়ের স্বামীর ঠিকানা দরকার ছিল। তিনি ঠিকানা দিতে পারছেন না, তবে টেলিফোন নাম্বার দিলেন। আমি চা খেয়ে উঠতে যাচ্ছি তিনি বললেন, আহা, বসুন না। বসুন। আরেকক্ষণ বসুন। গল্প করুন।

নিঃসঙ্গ একজন বৃদ্ধের অনুরোধ এড়ানো মুশকিল। আমি বসলাম, কিন্তু কি বলব ভেবে পেলাম না। এই বয়সের মানুষ কি ধরনের গল্প পছন্দ করে? পরকালের গল্প? ধর্ম? আমি জানি, একটা বিশেষ বয়সের পর মানুষজন ঘোর আস্তিক হয়ে যায়। কঠিনভাবে ধর্ম-কর্ম পালন করে। ধর্মের কথা শুনতে ভালবাসে। মৃত্যুতেই সব শেষ না — মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই তাদের জন্যে মৃত্যু নামক অমোঘ বিধান মেনে নিতে সাহায্য করে।

আমি বললাম, আপনি বলুন আমি শুনি। পরকাল সম্বন্ধে বলুন। মৃত্যুর পর কি হবে?

তিনি চোখ পিটপিট করে বললেন, মৃত্যুর পর কি হবে মানে? কিছুই হবে না। শরীর পঁচে-গলে যাবে। শরীরের যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস আছে — ইলেক্ট্রন,

Nirjoy

www.BanglaBook.org

প্রোটন, নিউট্রন এরা ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস-এর ক্ষয় নেই। কাজেই এদেরও ক্ষয় হবে না।

'আপনি কি ধর্ম-টর্ম বিশ্বাস করেন না?'

তিনি উত্তরে এমন সব কথা বলতে লাগলেন যা শুনলে ঘোর নাস্তিকরাও নড়ে-চড়ে বসবে এবং বলবে — বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি ভাল না। সালমান রুশদী তার কাছে কিছু না। একটু আগে যিনি নবীজীর খেজাব ব্যবহারের হাদিস দিলেন সেই তিনিই তাঁর সম্পর্কে এমন সব উক্তি করতে লাগলেন যা শুনলে নিরীহ টাইপের মুসলমানরাও চাকু হাতে তাঁর পায়ের রগ খুঁজতে বের হয়ে যাবে। এই আলোচনা আমার তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। আরবের মরুভূমির একজন নিরক্ষর ধর্মপ্রচারক হয়েও যিনি সেই সময়কার ভয়াবহ আইয়ামে জাহেলিয়াত লোকজনদের মন মানসিকতাই শুধু পরিবর্তন করেননি — সারা পৃথিবীতে এই ধর্মের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে তুচ্ছ করা ঠিক না। সমাজে অবিশ্বাসী তো থাকতেই পারে। অবিশ্বাসীদের যে কুৎসা ছড়াতে হবে তা তো না। আমি লক্ষ করেছি, অবিশ্বাসীরা কুৎসা ছড়ানো তাঁদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। বছর দু'-এক আগে যীশু খ্রিস্ট সম্পর্কে জনৈক আমেরিকান স্কলার (?)-এর একটি লেখা পড়েছিলাম, যাতে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, যীশু খ্রিস্ট ছিলেন একজন হমোসেক্সুয়েল।

আমি লালচুল এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্কে যেতে পারতাম। ইচ্ছা করল না। তার চেয়েও বড় কথা, ধর্ম সম্পর্কে আমার পড়াশোনাও তেমন নেই। ভদ্রলোকের দেখলাম পড়াশোনা ব্যাপক। কোরান শরীফ থেকে মূল আরবী এবং সেখান থেকে সরাসরি ইংরেজী অনুবাদ যেভাবে স্মৃতি থেকে বের করতে লাগলেন তা আমার মত মানুষকে ভড়কে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমার উঠা দরকার। উসখুস করছি। ভদ্রলোক যে উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছেন তাতে তাঁকে থামাতেও মন সায় দিচ্ছে না। তিনি এর মধ্যে চায়ের কথা বলেছেন। আমি তাতেও আগ্রহ বোধ করছি না। এ বাড়িতে কাজের মানুষ চা বানানো এখনো শিখেনি। আগের চা-টা দু' চুমুক দিয়ে রেখে দিয়েছি। নতুন চা এরচে' ভাল হবে এই আশা করা বৃথা। এমন সময় এক কাণ্ড হল, লালচুল ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু বসুন। মাগরেবের নামাজের সময় হয়েছে। নামাজটা শেষ করে আসি। মাগরেবের নামাজের জন্যে নির্ধারিত সময় আবার অল্প। আমি মনে মনে বললাম — "হলি কাউ।"

ভদ্রলোক নামাজ পড়ার জন্যে সময় বেশি নিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে বসলেন। হাসিমুখে বললেন, স্যরি, আপনাকে বসিয়ে রাখলাম। তাহলে আবার ডিসকাশন শুরু করা যাক – তিনি আবারো কথা বলা শুরু করলেন। কথার মূল বিষয়

Nirjoy

www.BanglaBook.org

হচ্ছে — ধর্ম মানুষের তৈরি, আল্লাহ্ মানুষ তৈরি করেননি। মানুষই আল্লাহ্ তৈরি করেছে।

আমি বললাম, আপনি ঘোর নাস্তিক। কিন্তু একটু আগে নামাজ পড়তে দেখলাম। নামাজ পড়েন!

'হ্যাঁ পড়ি। গত পঁচিশ বছর যাবত পড়ছি। খুব কমই নামাজ ক্বাজা হয়েছে।'

'রোজাও রাখেন?'

'অবশ্যই।'

'পঁচিশ বছর ধরে রাখছেন?'

'হবে, তবে দু'বার রাখতে পারিনি। একবার গল ব্ল্যাডারের জন্যে অপারেশন হল তখন, আরেকবার — হার্নিয়া অপারেশনের সময়। দুটাই পড়ে গেল রমজান মাসে।'

'ঘোর নাস্তিক একজন মানুষ নামাজ-রোজা পড়ছেন এটা আপনি ব্যাখ্যা করবেন কি ভাবে? আপনি তো মন থেকে কিছু বিশ্বাস করছেন না। অভ্যাসের মত করে যাচ্ছেন। তাই না কি!'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। আমি বললাম, না-কি আপনার মনে সামান্যতম হলেও সংশয় আছে?

'না, আমার মনে কোন সংশয় নেই। আমার নামাজ-রোজার পেছনে একটি গল্প আছে। শুনতে চাইলে বলতে পারি।'

'বলুন।'

'আমি জজীয়তি করতাম। তখন আমি বরিশালের সেসান ও দায়রা জজ। আমি কঠিন প্রকৃতির মানুষ। খানিকটা বোধহয় নির্দয়। অপরাধ প্রমাণিত হলে কম শাস্তি দেবার মানসিকতা আমার ছিল না। অপরাধ করেছে, শাস্তি ভোগ করবে। এই আমার নীতি। দয়া যদি কেউ দেখাতে চায় তাহলে আল্লাহ্ বলে যদি কেউ থাকে সে দেখাবে। আল্লাহ্ দয়ালু। আমি দয়ালু না।

এই সময় আমার কোর্টে একটি মামলা এল। খুনের মামলা। সাত বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে খুন হয়েছে। পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে গেছে, তারপর সে আর তার স্বামী মিলে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। জমিজমা নিয়ে শত্রুতার জের। সাক্ষ্য-প্রমাণ সবই আছে। আমার মনটা খারাপ হল। শত্রুতা থাকতে পারে। তার জন্যে বাচ্চা একটা মেয়ে কেন প্রাণ হারাবে? মেয়েটার বাবা সাক্ষ্য দিতে এসে কাঁদতে কাঁদতে কাঠগড়াতেই অজ্ঞান হয়ে গেল।

মামলা বেশিদিন চলল না। আমি মামলার রায় দেবার দিন ঠিক করলাম। যেদিন রায় হবে তার আগের রাতে রায় লিখলাম। সময় লাগল। হত্যা মামলার রায় খুব সাবধানে লিখতে হয়। এমনভাবে লিখতে হয় যেন আপিল হলে রায় না পাল্টায়। আমি মৃত্যুদণ্ড দেব, আপিলে তা খারিজ হয়ে যাবে, তা হয় না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি স্বামীটিকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। তার স্ত্রীকেও মৃত্যুদণ্ড দেবার ইচ্ছা ছিল। এই মহিলাই বাচ্চা মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এসেছে। প্রধান অপরাধী সে। আইনের হাত সবার জন্যেই সমান হলেও মেয়েদের ব্যাপারে কিছু নমনীয় থাকে। আমি মহিলাকে দিলাম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

রায় লেখা শেষ হল রাত তিনটার দিকে। আমি হাত মুখ ধুয়ে নিজেই লেবু সরবত বানিয়ে খেলাম। খুব ক্লান্ত ছিলাম। বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর ঘুম। এমন গাঢ় নিদ্রা আমার এর আগে কখনো হয়নি।

আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের অংশটি মন দিয়ে শুনুন। স্বপ্নে দেখলাম, ৭/৮ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে। কোঁকড়ানো চুল। মেয়েটি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তার নাম-টাম কিছুই বলল না। কিন্তু মেয়েটিকে দেখেই বুঝলাম -- এ হল সেই মেয়ে যার হত্যার জন্যে আমি রায় লিখেছি। একজনের ফাঁসি এবং অন্যজনের যাবজ্জীবন। আমি বললাম, কি খুকী, ভাল আছ?

মেয়েটি বলল, হুঁ।

'কিছু বলবে খুকী?'

'হুঁ।'

'বল।'

মেয়েটি খুব স্পষ্ট করে বলল, আপনি ভুল বিচার করেছেন। এরা আমাকে মারে নি। মেরেছে আমার বাবা। বাবা দা দিয়ে কুপিয়ে আমাকে মেরে দাটা ওদের খড়ের গাদায় লুকিয়ে রেখেছে। যাতে ওদেরকে মামলায় জড়ানো যায়। ওদের শাস্তি দেয়া যায়। আমাকে মেরে বাবা ওদের শাস্তি দিতে চায়।

'তুমি এসব কি বলছ? অন্যকে শাস্তি দেয়ার জন্য কেউ নিজের মেয়েকে মারবে?'

মেয়েটি জবাব দিল না। সে তার ফ্রকের কোণা দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। দেখলাম ভোর প্রায় হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফজরের আজান হল। আমি রান্নাঘরে ঢুকে নিজেই এক কাপ চা বানিয়ে খেলাম। স্বপ্নের ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দিলাম না। স্বপ্ন গুরুত্ব দেয়ার মত কোন বিষয় না। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এইসবই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। আমি মামলাটা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। স্বপ্ন হচ্ছে সেই চিন্তারই ফসল। আর কিছু না।

স্বপ্নের উপর নির্ভর করে বিচার চলে না।

রায় নিয়ে কোর্টে গেলাম। কোর্ট ভর্তি মানুষ। সবাই এই চাঞ্চল্যকর মামলার রায় শুনতে চায়।

রায় প্রায় পড়তেই যাচ্ছিলাম হঠাৎ কি মনে হল — বলে বসলাম, এই মামলার তদন্তে আমি সন্তুষ্ট নই। আবার তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছি। কোর্টে বিরাট হৈচৈ হল। আমি কোর্ট এডজর্নড করে বাসায় চলে এলাম। আমার কিছু বদনামও হল। কেউ কেউ

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বলতে লাগল, আমি টাকা খেয়েছি। আমি নিজে আমার দুর্বলতার জন্যে মানসিকভাবে খানিকটা বিপর্যস্তও হলাম। আমার মত মানুষ স্বপ্নের মত অতি তুচ্ছ একটা ব্যাপার দ্বারা পরিচালিত হবে, তা হতে পারে না। আমার উচিত জজীয়তি ছেড়ে দিয়ে আলুর ব্যবসা করা।

যাই হোক, সেই মামলার পুনঃ তদন্ত হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েটির বাবা নিজেই হত্যাপরাধ স্বীকার করল। এবং আদালতের কাছে শাস্তি প্রার্থনা করল। আমি তার ফাঁসির হুকুম দিলাম। বরিশাল সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি কার্যকর হল। ঘটনার পর আমার মধ্যে সংশয় ঢুকে গেল। তাহলে কি পরকাল বলে কিছু আছে? মৃত্যুর পর আরেকটি জগৎ আছে? ঘোর অবিশ্বাস নিয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা শুরু করলাম। নামাজ-রোযা আরম্ভ হল। আশা ছিল, এতে আমার সংশয় দূর হবে। যতই পড়ি ততই আমার সংশয় বাড়ে। ততই মনে হয় God is created by man. তারপর নামাজ পড়ি এবং প্রার্থনা করি — বলি, হে মহাশক্তি, তুমি আমার সংশয় দূর কর। কিন্তু এই সংশয় দূর হবার নয়।

'নয় কেন?'

কারণ আমাদের পবিত্র গ্রন্থেই আছে — সূরা বাকারার সপ্তম অধ্যায়ে বলা আছে —

"Allah hath set a seal
On their hearts and on their hearing
And on their eyes is a veil."

"আল্লাহ তাদের হৃদয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে ঢেকে দিয়েছেন,
এবং টেনে দিয়েছেন চোখের উপর পর্দা।"

আমি তাদেরই একজন। আমার মুক্তি নেই।

ভদ্রলোক চুপ করলেন। আমি বিদায় নেবার জন্যে উঠলাম। তিনি আমাকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আপনি আসছেন কেন? আপনি আসবেন না। তিনি মুখ কুঁচকে বললেন, আমাদের নবীজীর একটা হাদিস আছে। নবীজী বলেছেন — কোন অতিথি এলে তাঁকে বিদায়ের সময় বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিও।

এই বলেই তিনি বিড়বিড় করে নবী সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর কিছু কথা বলে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। সম্ভবত এশার নামাজের সময় হয়ে গেছে।

Nirjoy